বর্ষ—৩০ সংখ্যা—১

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০)

158.3
ব০২।২৫
ব৮ ৩৩
সং ১-৪
১৯৭০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মাতৃবাণী		
সাবিত্রী	...	
দুঃখাভিসার	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	১৫
চেরী ফুল	শ্রীমা	২৫
নীল বিহঙ্গ	শ্রীঅরবিন্দ	২৬
প্রদীপ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	২৭
মা	সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত	২৮
শ্রীঅরবিন্দের সমাধিতে	ঐ	২৯
গান	অরুণা দেবী	৩০
আলোক ও আঁধার	সুধীরকুমার চৌধুরী	৩১
ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে	শ্রীঅরবিন্দ	৩৪
শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা	পবিত্র	৫৪
নায়ের সঙ্গে কথা		৬২
কঠিন ডানায় ওড়া		৮৪

পত্রিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০.০০	বার্ষিক	৩০০.০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০.০০		২০০.০০
ভিতরের মলাট	১৫০.০০		৫২০.০০
বাহিরের মলাট	২০০.০০		৬০০.০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম দেড় টাকা

Edited By : Nolini Kanta Gupta
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

বর্ষ—৩০ সংখ্যা—২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে এপ্রিল, ১৯৭০)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মাতৃবাণী	
সাবিত্রী	...
দুই সূত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু
নানাদের মেলে	শ্রীঅরবিন্দ
শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা	পবিত্র
মায়ের সঙ্গে কথা	বীরবাহু
কঠিন ডানায় ওড়া	

বর্তিকার নিয়মাবলী

২২শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০.০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০.০০		২০০.০০
ভিতরের মলাট	১৫০.০০		৫২০.০০
বাহিরের মলাট	২০০.০০		৬০০.০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম দেড় টাকা

Edited By : Nolini Kanta Gupta
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by : AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

বর্ষ—৩০ সংখ্যা—৩

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(১৫ই আগস্ট, ১৯৭০)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাবিত্রী	...	৫
শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৮
আমাদের নেতা	শ্রীঅরবিন্দ	১২
দেহ-রহস্য	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	২৪
ভারতীয় সংস্কৃতির স্বপক্ষে	শ্রীঅরবিন্দ	৩০
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	৪৯
গীতিগুচ্ছ (গান)	শ্রীনলিনীকান্ত সরকার	৬১
বিজয়ার পত্র (কবিতা)	নিশিকান্ত	৬৫
শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা	পবিত্র	৬৬
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী		৭২
মায়ের সঙ্গে কথা	...	৭৭
কঠিন ডানায় ওড়া	বীরবাহু	৯২

বর্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০.০০	বার্ষিক	৩০০'০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০.০০		২০০.০০
ভিতরের মলাট	১৫০.০০		৫২০.০০
বাহিরের মলাট	২০০.০০		৬০০.০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম দেড় টাকা

Edited By : Nolini Kanta Gupta
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by : AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—4

বর্ষ—৩০ সংখ্যা—৪

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(নভেম্বর ২৪, ১৯৭০)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মাতৃবাণী	
সাবিত্রী	...
খানারের মেয়ে	শ্রীঅরবিন্দ
প্রলয়পয়োধিজলে	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু
তীর্থসলিল (কবিতা)	সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত
ভালোবাসা	
শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা	পবিত্র
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী	শ্রীমা
পথের কথা	
কঠিন ডানায় ওড়া	বীরবাহু
ভস্মকেশ্বর	সমীরকান্ত গুপ্ত
সূচীপত্র (১৯৫৩-৫৭)	

বর্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০.০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০.০০		২০০.০০
ভিতরের মলাট	১৫০.০০		৫২০.০০
বাহিরের মলাট	২০০.০০		৬০০.০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

দাম দেড় টাকা

Edited By : Nolini Kanta Gupta
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by : AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—4

সূচীপত্র

১৯৫৩—১৯৫৭

সন	বর্ষ	সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
১৯৫৩	১৩	১	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
২১-২			যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ		৬
			দিব্যজীবন	অনির্বাণ		১৮
			আত্মার অধিরোহণ	শ্রীমা		৩৪
			কেনোপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন	৩৮
			শ্রীমায়ের কথাবার্তা			৫১
			শ্রীঅরবিন্দ (কবিতা)	শ্রীসজনীকান্ত দাস		৫৯
১৯৫৩	১৩	২	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
২৪-৪			ঋগ্বেদ	শ্রীঅরবিন্দ		৬
			আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীমা		১০
			দিব্য-জীবন	অনির্বাণ		১৮
			যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ		৩৬
			কেনোপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন	৪৬
			শ্রীমা'র জন্মদিন	শ্রীসোমনাথ মৈত্র		৫৫
			সাবিত্রী	শ্রীঅরবিন্দ		৫৭
			নির্ভরতা (কবিতা)	রবি গুপ্ত		৬৫
১৯৫৩	১৩	৩	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
১৫-৮			তপোদেব অগ্নি	শ্রীঅরবিন্দ		৫
			শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলী	শ্রীঅরবিন্দ		৯
			যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ		১৮
			আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীমা		২৮
			দিব্য-জীবন	অনির্বাণ		৩৫
			সব চেয়ে বড়ো (কবিতা)	নিশিকান্ত		৪৮
			কেনোপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন	৪৯
			শিশুসঙ্গে শ্রীমা			৬৩
			সঙ্গী (কবিতা)	রবি গুপ্ত		৭১
			১৫ই আগস্টের বাণী	শ্রীঅরবিন্দ		৭২

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
১৯৫৩ ১৩ ৪	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
২৪-১১	যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ		৬
	দিব্য-জীবন	অনির্বাণ		১৪
	কেনোপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন	২৫
	বাণীমূর্ত্তি শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসজনীকান্ত দাস		৩৮
	শ্রীঅরবিন্দ সমাধি সমীপে (কবিতা)	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়		৪৩
	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
	যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ		৫
	দিব্য-জীবন	অনির্বাণ		১৭
	ঈশোপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ		৩৩
	রাতের রাধিকা (কবিতা)	নিশিকান্ত		৪৫
	বার্ণার্ড শ	নিশিকান্ত		৪৬
	কাল-প্রহর (The Phantom Hour)	শ্রীঅরবিন্দ	নিশিকান্ত	
	আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীমা		
১৯৫৪ ১৪ ২	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
২৪-৪	যোগসমন্বয়	শ্রীঅরবিন্দ		৫
	দিব্য-জীবন	অনির্বাণ		১৬
	সাবিত্রী	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	২৯
	মৃত্যুভয় ও তা জয়ের উপায়	শ্রীমা	শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত	৩৪
	শিশুসঙ্গে	শ্রীমা		৩৯
	শ্রীঅরবিন্দের যোগের বৈশিষ্ট্য	বিজয়কান্ত রায়চৌধুরী		৪১
	আলোর চকোর (কবিতা)	শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়		৪৫
	বৃহদারণ্যক	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন	৪৭
১৯৫৪ ১৪ ৩	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	
১৫-৮	পূর্ণতা	শ্রীঅরবিন্দ		
	উপনিষদে পূর্ণযোগ	শ্রীঅরবিন্দ		
	ঈশোপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ		
	ঋগ্বেদ	শ্রীঅরবিন্দ		
	বার্ণার্ড শ	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত	
	শারীর চেতনার ক'টি অভিজ্ঞতা	শ্রীমা		

সন	বর্ষ	সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
			দিব্য-জীবন	অনির্বাণ		২৫
			ঈশোপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ		৩৮
১৯৫৪	১৪	৪	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	
২৪-১১			শারীর চেতনার আরো অভিজ্ঞতা	শ্রীমা		
			একটি স্বপ্ন	শ্রীমা		
			শ্রীঅরবিন্দের একখানি পুরোনো পত্র			৯
			দিব্য-জীবন	অনির্বাণ		১৩
			শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে	শ্রীসজনীকান্ত দাস		৩০
			ঈশোপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন	৩৪
			শিশুসঙ্গে শ্রীমা			৫৩
			আবির্ভাব (কবিতা)	রবি গুপ্ত		৬২
১৯৫৫	১৫	১	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	
২১-২			মানুষের উপকার	শ্রীমা		
			নববর্ষের পূর্বমুহূর্তে	শ্রীমা		
			অকপটতা	শ্রীমা		
			ঈশোপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ		
			দিব্য-জীবন	অনির্বাণ		
			নির্ঝর (কবিতা)	নিশিকান্ত		
			সূর্যমুখী (কবিতা)	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়		
১৯৫৫	১৫	২	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
২৪-৪			দিব্য-জীবন	অনির্বাণ		৫
			শিশুসঙ্গে শ্রীমা			২০
			ঈশোপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ		৩১
			মায়ের উপস্থিতি	শ্রীঅরবিন্দ	পশুপতি ভট্টাচার্য্য	৩৯
			তুচ্ছতার মায়া (সনেট)	নিশিকান্ত		৪২
			আঁধার ও আলো	নিশিকান্ত		৪৩
১৯৫৫	১৫	৩	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	
১৫-৮			নারী সমস্যা	শ্রীমা		

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্তিকা

সন	বর্ষ	সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
			মা কে ?	শ্রীঅরবিন্দ	পশুপতি ভট্টাচার্য্য	১০
			যোগের প্রথম পাঠ (Elements of yoga)	শ্রীঅরবিন্দ	পৃথ্বীন্দ্রনাথ	
			দিব্য-জীবন	অনির্বাণ		
			জন্মদিনে (কবিতা)	নিশিকান্ত		
			উত্তম রহস্য	শ্রীমা		
			সাবিত্রী	শ্রীঅরবিন্দ		
১৯৫৫	১৫	৪	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	
২৪-১১			যোগের প্রথম পাঠ (Elements of yoga)	শ্রীঅরবিন্দ	পৃথ্বীন্দ্রনাথ	
			ভবানী মন্দির	শ্রীঅরবিন্দ		
			সিদ্ধি—অতীতে ও ভবিষ্যতে	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		
					বিজয়কান্ত রায়চৌধুরী	১৮
			দিব্য-জীবন	অনির্বাণ		২১
			সাবিত্রী	শ্রীঅরবিন্দ		৪১
			পুনর্ভ গোলাপ (Rose of God)	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	
			দেবদূত চিন্তাশক্তি Thought the Paraclete	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৪৫
			বিস্মরণ (কবিতা)	নিশিকান্ত		৪৬
			অভিমান (কবিতা)	পৃথ্বীন্দ্রনাথ		৪৮
১৯৫৬	১৬	১	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	
২১-২			ব্যাধি	শ্রীমা		
			কুণ্ডলিত বিশ্ব The yoga of Sri Aurobindo (part VII)	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	বিজয়কান্ত রায়চৌধুরী	১৯
			শিশুসঙ্গে শ্রীমা			১৬
			দিব্য জীবন	অনির্বাণ		২১
			ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনী			৩৭
১৯৫৬	১৬	২	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
২৪-৪			বৃহৎ উপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন	৫

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
	শ্রীঅরবিন্দের যোগ The Yoga of Sri Aurobindo (part VII)	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	বিজয়কান্ত রায়চৌধুরী	১৯
	একত্বের মধ্যে নানাত্ব	শ্রীঅরবিন্দ		২৪
	দিব্য-জীবন	অনির্বাণ		৩৩
	সর্বময়ী (কবিতা)	পৃথ্বীন্দ্রনাথ		৪৭
১৯৫৬ ১৬ ৩	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
১৫-৮	মানস-সরোবরের অরবিন্দ	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়		৫
	প্রশ্নোপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন	৬
	দিব্য-জীবন	অনির্বাণ		১৯
	উর্বশী	শ্রীঅরবিন্দ		৩২
	কবি শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসুকুমার সেন		৩৮
	বিবর্তন-ইতিহাসে এক অধ্যায়	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৪৪
	বৌদ্ধ অবদান	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৪৯
	আশ্রম বালক বালিকাদের প্রতি	শ্রীমা		৫২
	"ভালোবাসি সূর্য্যের কিরণ"	বাদলবরণ		৫৫
১৯৫৬ ১৬ ৪	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	
২৪-১১	অতিমানসের আবির্ভাব (শিশুসঙ্গে শ্রীমা)			
	যোগের প্রথম পাঠ (Elements of Yoga)	শ্রীঅরবিন্দ	পৃথ্বীন্দ্রনাথ	১১
	কর্মের আদর্শ ও সাধুসঙ্গের ফল	শ্রীঅরবিন্দ		১৩
	ভারতীয় নাটক (Kalidas)	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	১৫
	ঐতরেয় উপনিষদ	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন	২০
	দিব্য-জীবন	অনির্বাণ		২৮
	দিব্যজীবনের সন্ধানে	পশুপতি ভটাচার্য		৪০
	স্বদেশীর দীক্ষা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৪৬
	হাসি (কবিতা)	নিশিকান্ত		৪৮
১৯৫৭ ১৭ ১	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	
২১-২	মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা		

সন বর্ষ সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
	আমির প্রকৃতি ও লক্ষ্য	শ্রীমা		২০
	কল্পনীল গল্প (Conte Saphirin)	শ্রীমা		
	সত্যে আরোহণ	শ্রীমা		
	দিব্য-জীবন	অনির্বাণ		
	শ্রীঅরবিন্দ ও মানুষের দুঃখমুক্তি	সোমনাথ মৈত্র		
	বিদ্যুন্মতী (কবিতা)	নিশিকান্ত		
	সত্যে আরোহণ (চিত্র)	শ্রীমা		
১৯৫৭ ১৭ ২	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	
২৪-৪	শ্রদ্ধা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		
	ভগবানে বিলীন হওয়া (Yoga of Sri Aurobindo Part VIII)	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	পশুপতি ভট্টাচার্য	৮
	যোগের প্রথম পাঠ (Elements of Yoga)	শ্রীঅরবিন্দ	পৃথ্বীন্দ্রনাথ	১৩
	উপনিষদের সাহিত্যশ্রী	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনলিনীকান্ত সেন	১৭
	বরফের বামনরাজা	শ্রীমা		২৮
	মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা		৩০
	দিব্য-জীবন	অনির্বাণ		৪১
১৯৫৭ ১৭ ৩	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
১৫-৮	ঋষিদৃষ্টিতে মৃত্যু	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৫
	গল্প	শ্রীমা		১০
	মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা		১৫
	বাসবদত্তা	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	১৫
	ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে কালিদাসের বিচার	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	১৯
	যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ	অনির্বাণ		৪৫
	আত্মার অসীমতা (কবিতা)	শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীসনীরকান্ত গুপ্ত	৫৪
	প্রণাম (উৎসব-সঙ্গীত)	নিশিকান্ত		৫৫
	অন্তরালে (কবিতা)	রবি গুপ্ত		৫৬

সূচীপত্র

সন	বর্ষ	সংখ্যা	বিষয়	লেখক	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
১৯৫৭	১৭	৪	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১
২৪-১১			জীবন-মাটা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত		৬
			মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	পশুপতি ভটাচার্য	১১
			১৫ই আগষ্টের তাৎপর্য্য	শ্রীমা		৪১
			শিশুসঙ্গে শ্রীমা	শ্রীমা		৪৩
			যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ	অনির্বাণ		৪৮

Victory is for the most persistent.
—The Mother

DAGA & Co. (P) Ltd.

16, Hare Street

Calcutta-1

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০

(নিয়মিতভাবে খণ্ডে খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে)

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

সত্যকে জয় করা দুরূহ এবং কষ্টসাধ্য। এ বিজয়লাভ করতে হ'লে সত্যাকার যোদ্ধা হতে হয়, এমন যোদ্ধা কিছুকেই যে ভয় করবে না, কোন শত্রুকে নয়, মৃত্যুকেও নয়, সকলের সঙ্গে হোক, সকলের বিরুদ্ধে হোক, শরীর নিয়ে হোক, শরীর ছাড়া হোক, প্রযত্ন চলেছে সর্বদা; তার পরিণাম হবেই বিজয়।

—শ্রীমা

মাতৃবাণী

ভগবান হলেন সেই পরিপূর্ণতা যার দিকে আমরা সকলে চলেছি।
যদি চাও আমি তোমাকে সেদিকে নিয়ে যেতে পারি সাগ্রহে।
নির্ভর রেখ।

*

এই যেন হয় আমাদের জীবনের একমাত্র প্রয়োজন, ভগবানকে উপলব্ধি করা।

*

কোন চেষ্টাই ব্যর্থ নয়। ঊর্দ্ধের উত্তর আসে সর্ব্বদাই অনুভব না করতে পারলেও।

*

অন্য ক্ষেত্রে যেমন, শরীরের মধ্যেও ভগবানের দিকে নিজেকে খুলে ধরা নির্ভর করে ভগবানের কাছে আন্তরিক ও একান্ত সমর্পণের উপর।

*

শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতি

যে শিক্ষা তুমি দিতে চাও, নিজের জীবনে তা স্থাপন করবে।
নূতন চেতনার কথা বলছ, তাকে তোমার অন্তরে প্রবেশ করতে দাও, সে নিজেই তার গুপ্ত রহস্য তোমার কাছে ব্যক্ত করবে।
কারণ কেবল তখনই তুমি যোগ্যতার সঙ্গে তার সম্বন্ধে কথা বলতে পারবে।

নূতন চেতনার মধ্যে উত্তীর্ণ হতে হ'লে প্রথম প্রয়োজন হ'ল এমন মানস বিনয় যে দৃঢ় বিশ্বাস করে, তার যা কিছু জ্ঞান হয়েছে বলে মনে করে তা কিছুই নয় যা জানবার বাকী আছে তার তুলনায়।
যা কিছু বাহ্যতঃ তুমি শিক্ষা করেছ তা হ'ল সোপান মাত্র, তাকে আশ্রয় করে ঊর্দ্ধতর জ্ঞানে উঠে যাবার জন্যে!

*

মৃত্যু হল শরীর কোষসমূহ যে চেতনা ধারণ করে তার মূল কেন্দ্র হতে বিচ্যুতি।
অমৃতত্বের দিকে প্রথম পদক্ষেপ হল যান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাকৃত কেন্দ্রিকতা।

ছোটদের প্রশ্ন :

মা, তুমি আমাদের খবরের কাগজ পড়তে বারণ করেছ। তা হলে ত জগতের কোথায় কি ঘটছে কিছুই জানতে পারব না, অজ্ঞ হয়ে থাকব।

মায়ের উত্তর : আমি ত পড়তে বারণ করিনি, আমি বলেছি খবরের কাগজে যা-কিছু পড় তাকে নির্জলা সত্য বলে মেনে নেবেনা। যা ছাপা হয় তাই যে সত্য তা নয়।

প্রশ্ন : খবরের কাগজ পড়ে কি করে জানব কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা? জগতে কোনটি সত্য ঘটনা তা জানবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি?

মায়ের উত্তর শ্রেষ্ঠ উপায় হল আমাদের নিজের ভিতরের সত্যকে আবিষ্কার করা, তাহ'লেই যেখানেই সত্য রয়েছে সেখানেই তাকে চিনে নিতে পারব।

*

কথা শোনা ভাল বটে কিন্তু যথেষ্ট নয়,
বুঝতে হবে।
বোঝা ভাল কিন্তু যথেষ্ট নয়,
কাজে করতে হবে।

*

অর্থ-নিয়ন্তাদের, ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা ভবিষ্যতের কর্মে সহযোগী হতে পারে, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই সে সুযোগ গ্রহণ করেনি; তাদের দৃঢ় প্রত্যয় ভবিষ্যতের চেয়ে অর্থেরই ক্ষমতা বেশি।

কিন্তু ভবিষ্যতের দুর্বার শক্তির নীচে তারা সবাই নিষ্পিষ্ট হয়ে যাবে।

*

প্রশ্ন : মা, তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, নূতন জগৎ যে তৈরী হয়ে চলেছে তাতে আমরা সাহায্য করতে পারি কিনা? কি রকমে আমরা সাহায্য করতে পারি?

মায়ের উত্তর নিজেকে পরিবর্তন করে, নূতন চেতনা গ্রহণ করে।

সাবিত্রী

[এ যাবৎ সাবিত্রী থেকে তোমাদের পড়ে শুনিয়েছি স্বর্গের বার্তা অর্থাৎ নূতন জগৎ, নূতন মানুষ, নূতন ভবিষ্যৎ কি রকমের হবে সেই মহা গৌরবের সমুজ্জ্বল চিত্র। এখন শুনবে অন্য রকমের কথা, তোমরা দেখবে বিপরীত চিত্র ; কারণ বলা হয়েছে, স্বর্গের রাস্তা হল নরক, স্বর্গে পৌঁছতে হলে নরকের মধ্য দিয়ে যেতেই হবে। এই হল সৃষ্টির চিরন্তন ব্যবস্থা :—

None can reach heaven who has not passed through hell.

এই নরক যে কি ভীষণ নারকীয়, দান্তেও সে মর্মান্তিক চিত্র দিতে পারেননি। দান্তে দিয়েছেন দৈহিক নরকের চিত্র, আমাদের পৌরাণিক নরকের চিত্রও ঐ জাতীয়। এখানে হল চেতনার নরক অর্থাৎ চেতনা যেখানে অবলুপ্ত প্রায়, বিকৃত কলুষিত। এখানে আমাদের বুক বেঁধে সাহসে ভর করে ধীর স্থির দৃঢ়পদে চলতে হবে, আলো এখানে নেই, শুধু আঁধার আঁধার আর হাহাকার।]

দ্বিতীয় পর্ব—সপ্তম সর্গ

রাত্রিগর্ভে অবতরণ

মন তার মুক্ত প্রাণধারা থেকে, প্রশান্ত জ্ঞানলাভের জন্য,
হৃদয় অন্ধতা থেকে বেদনা থেকে বিচ্ছিন্ন,
বিচ্ছিন্ন অশ্রুর দাবী থেকে, অজ্ঞানের বন্ধন থেকে,
ফিরে দাঁড়াল সে বিপুল বিশ্ব-বিফলতার হেতু আবিষ্কারের জন্য।
প্রকৃতির প্রকট মূর্তি থেকে চক্ষু ফিরিয়ে নিল
দৃষ্টি নিক্ষেপ করল অদৃশ্য বৃহতের মধ্যে—
সেই ভীতিকর অজ্ঞাত অনন্ত
প্রসুপ্ত যে অন্তহীন বিশ্বকুণ্ডলীর পশ্চাতে ;
তার কালহীন প্রসারে বহন করে সে ব্রহ্মাণ্ডকে,
তারই সত্তার চূর্ণ তরঙ্গাবলী আমাদের জীবন যত।
লোক যত গঠিত তারই অচেতন শ্বাস-প্রশ্বাসে,
জড় ও মন তারই রূপ, তারই শক্তি,
আমাদের জাগ্রত চিন্তা তার স্বপ্নের সৃষ্টি।
প্রকৃতির গহ্বরের উপরে যে আবরণ, তা বিচ্ছিন্ন এখন ;
দেখল সে জগতের চিরস্থায়ী বেদনার উৎস

আর অজ্ঞানের অন্ধকার গর্ভের ব্যাদিত আনন।
যে পাপ জীবনের মূলে রয়েছে সুরক্ষিত
মাথা তুলে দাঁড়াল সে তার চোখে চোখ দিয়ে :
অস্পষ্ট এক সাগর তীরে আন্তর আকাশ যেখানে মিলিয়ে গিয়েছে,
নিঃসঙ্গ এক পাহাড়ের শিখর থেকে—যেখান হতে দেখা যায় যা-কিছু আছে সব—
এক অমর নির্জ্ঞান জেগে উঠল,
দৃষ্টিহারা আরত রিক্ত আঁখি তার বিস্ময়-ভরে চেয়ে রয় কালের আর রূপের দিকে,
চেয়ে রয় পলকহীন জীবন্ত শূন্যের নব নব উদ্ভাবনের দিকে,
আর সেই অতলের দিকে যেখান থেকে উঠে এসেছে আমাদের আদি আরম্ভ।
পিছনে তার দেখা দেয় রাত্রির ধূসর রেখা-খচিত মুখাবরণ,
সাক্ষী রূপে দেখে সে সৃষ্ট যত বস্তুর আদি জন্ম,
সর্ব্বত্র রয়েছে এক অস্ফুট নেপথ্য অধিষ্ঠান,
যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর ভীতিস্থান বিপরীত নিয়তি এক,
মৃত্যু সেখানে দেখা দেয় জীবনের অনোদর বীজরূপে,
বিশ্বের উৎপত্তি আর বিনাশ এখান হতে।
এখন তবে গভীর গহ্বরের অন্ধকার রহস্য থেকে
আবরণের শূন্য অভ্যন্তর থেকে
সন্তর্পণে উঠে আসে কি এক রূপহারা চিন্তাবৃত্তি।
কালাত্মক প্রভাব এক নিভৃতে ছেয়ে আসে জীবসকলের উপর
তার মারণ স্পর্শ অমর আত্মাকে অনুসরণ করে চলে,
জীবনের উপর এসে পড়ে মৃত্যুর অঙ্গুলি-তর্জন
আর ভ্রান্তি শোক দুঃখ ঘিরে ধরে
আত্মার আপন সংকল্পকে—লক্ষ্য যার সত্য আর আনন্দ আর আলোক ;
কুণ্ডলিত বিকৃতি এক দাবী জানায়
হবে সে সত্তার আপন ধারা, প্রকৃতির সত্য প্রবেগ ;
বিরোধী-বিকারী মন এক কর্ম্মে রত,
সচেতন জীবনের ছন্দে ছন্দে
সত্যকে কলুষিত করে তার নিজস্ব বিধি-বিধান দিয়ে,
আত্মার প্রগতি দেয় সে রুদ্ধ করে,
জ্ঞানকে পীড়িত করে সংশয়ের প্রলেপ দিয়ে,
নেপথ্য দেবতাদের বাণী করে সে অপহরণ,
মুছে দেয় চিহ্ন যত জীবনের তীর্থপথে,
কাল-উৎকীর্ণ দূত লিপি যত করে উৎসাদিত।
বিশ্ববিধানের প্রতিষ্ঠার উপরে

তুলে ধরে তার দুঃশাসনের লৌহস্তম্ভাবলী,
জ্যোতি ও প্রেম অবধি সেই ছদ্মবেশ দুর্গ্রহের মোহে
পরিহার করে দেবতাদের জ্যোতির্ময় প্রকৃতি,
আশ্রয় করে গিয়ে অধোগত দেবতা আর ভ্রান্তিকর যত সূর্য্যালোকে,
এই সব হয়ে ওঠে সংকট আর দুর্গতি,
বিকৃত মাধুর্য্য আর স্বর্গের অভিশাপ।
শক্তি এক তার কুরূপে ভূষিত করে দিব্যতন বস্তুকেও,
দুঃখের বাতাস বয়ে যায় বিশ্বের উপরে,
নিথা ঘিরে ধরে প্রতি চিন্তাকে, প্রতি ক্রিয়া
বহন করে সর্ব্বদা ত্রুটি আর ব্যর্থতার চিহ্ন,
উর্দ্ধাশী প্রয়াস নিয়ে আসে বিফলতা অথবা শূন্যগর্ভ সফলতা।
জানে না কেহ পতনের হেতু তার,
ধূসর মুখোস অর্দ্ধস্ফুট কথা বলে, শব্দ যায় না শোনা তার ;
তবু অজ্ঞান-হৃদয়-তলে বীজ এক বপন করা হ'ল,
তারই কৃষ্ণকায় ফল বেদনা আর মৃত্যু আর অভিশাপ ;
হিমজর্জর অদৃশ্যের শীতার্ত্ত প্রান্তর হতে,
রাত্রির ধূসর অবগুণ্ঠনে আপনাকে আবৃত করে,
উঠে এল ছায়াময় বিভীষণ যত বার্ত্তাবহ,
ভীতিকর এক শক্তিমত্ত জগতের অধিবাসী করে আক্রমণ,
পরম পাপের প্রতিভূ সব।
অশ্রুত কণ্ঠেরা নিঃশব্দে বলে কথা,
অলক্ষিত হস্তে বপন করে বিষবীজ,
যায় না দেখা রূপ কোন কিছু, ঘোর কর্ম্ম এক চলে তবু,
অটল আদেশ লিখিত হয় কুটিল অক্ষর-চিহ্নে,
পাপের বিধান আর করাল নিয়তি লভিল প্রতিষ্ঠা।
জীবনদেব দৃষ্টি দিল অশ্বপতির অভিমুখে ঘোর-বর্ণ আর এক চক্ষু দিয়ে
তারও সৌন্দর্য্য দেখে সে, দেখে বস্তুর অন্তরে উৎসুক হৃদয়খানি,
সামান্য সুখে অবাধ পরিতৃপ্ত যে,
সত্যের প্রেমের তুচ্ছ স্পন্দনেই সাড়া দেয় যে।
দেখে সে, জীবনধারায় হিরণ্ময় সূর্য্যালোক, তার সুদূর নীল আকাশ,
তার পত্র-পল্লবের সবুজ শোভা, ফুলের বর্ণ আর গন্ধ,
শিশুদের মাধুর্য্য, বন্ধুজনের ভালবাসা,
রমণীর সৌন্দর্য্য, মানুষের কোমল হৃদয় ;
দেখে তবু সে আরও ভীতিকর শক্তিসংঘ যারা জীবনধারায় যথেচ্ছা প্রচালও করে,

নিজে সে বেদনা যত পথে পথে বিকীর্ণ করে,
দেখে নিয়তি নেপথ্যে অপেক্ষায় রয়েছে মানুষের অদৃশ্য পদক্ষেপ তরে
দেখে তার পাপ, তার দুঃখ, তার শেষদান, মৃত্যু।
হতাশার অবক্ষয়ের নিঃশ্বাস এক
চলে দেখে দেখে, জীবনের পরিণতি করে কলুষিত
অন্তরাত্মার পূর্ণায়ত বীজে পচন ধরায়
প্রগতি হয় মৃত্যুর পরিবেশক,
নিহত আলোকের বিধানে আসক্ত জগৎ এক
আলিঙ্গনে ধরে রাখে শমন কবলিত সত্তার পুতিগন্ধময় দেহ,
সমাদর করে, কুটিল রূপাবলী স্বাধীন আর অভিনব সত্য বলে,
পান করে সৌন্দর্য্যেরে কুৎসিতের আর পাপের মধ্যে,
মনে করে আনন্দিত তারা দেবতার ভোজন-উৎসবে,
কলুষতা আস্বাদন করে তীব্রাস্বাদী আশ্চার্য্য যেন ;
শুরুতার বাতাসের পরে নেমে আসে অন্ধকার এক,
প্রকৃতির ওষ্ঠাধর হতে দূর করে দেয় উজ্জ্বল সুহাস্য,
হৃদয়ের সহজ বিশ্বাস নিহত এখন,
দৃষ্টিতে তার পরিয়ে দেয় ভয়ের কুটিল রেখা,
হিংসা আত্মার সহজ শ্রেয়কে কলুষিত করে
গড়ে তোলে কৃত্রিম পাপ আর পুণ্য,
স্থাপন করে তাদের অন্তরাত্মার সরল স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণার আসনে,
দ্বৈতের নিধ্যা প্রকৃতিকে পীড়িত করে,
তাদের মূঢ়ল যাত্রা নিষিদ্ধ আবেগকে আরও শাণিত করে ধরে ;
পাপ হয় এক কপটতা শ্রেয় থেকে নিষ্কৃতির উপায়,
অহং আপনাকে পরিপুষ্ট করে বকধর্ম্ম আর পাপের আশ্রয়ে,
উভয়ে মিলে হয়ে ওঠে নরকের বাহন।
পরিত্যক্ত হয়ে স্তূপীকৃত হয়ে, চিরকালের বৈচিত্র্যহীন একই পথের ধারে
ফেলে রাখা হয়েছে প্রাচীন সহজ ভোগসব,
রাত্রির গর্ভে জীবনধারা যেখানে নেমে গিয়েছে সেই উষর নিঃসঙ্গ প্রান্তরে।
জীবনের সব মহিমা স্তিমিত হয়ে গিয়েছে, সংশয়ের মালিন্য অর্জন করেছে,
সকল সৌন্দর্য্য একখানি জরাগ্রস্ত আননে পরিণত হয়েছে,
সকল শক্তির নাম হয়েছে ভগবৎ-অভিশপ্ত উৎপীড়ন,
আর সত্য হয়েছে মনের প্রয়োজনে গড়া কল্পনা
আনন্দের অনুধাবন এখন হয়েছে শ্রান্তিকর শিকার যাত্রা
আর জ্ঞান পরিণত হয়েছে এক সংশয়ী অজ্ঞানে।

দুঃখাভিসার

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

দুঃখভোগ মানুষের নিয়তি—চিরন্তন নিয়তি। আমি বলছি প্রধানত শারীর দুঃখ বা শরীরের মধ্যে জমাট হয়েছে যে-দুঃখ তার কথা। দুঃখ সে এড়াতে পারেনা, এড়াতে চায় কি? দুঃখকে এড়ায় না, সহ্য করে চলে। যতটা পারে সহ্য করে, তারপর ভুলে যায় যতদিন না আর একটা দুঃখের আঘাত এসে পড়ে। এইভাবেই তার জীবন কাটে। দুঃখকে সহ্য করে সে চলে বটে কিন্তু আঘাতে আঘাতে শেষে দেখা যায় সে পাষাণবৎ বোধহীন অসাড় হয়ে গিয়েছে। দান্তের এক নরকবাসী জীব বলছে "আমি কখনও চোখের জল ফেলিনি, অন্তরে পাথর হয়ে গিয়েছি।" মানুষের এ পরিণাম কাম্য কি?

সজ্ঞানে দুঃখ জয় করা একটা সাধনা এবং তার নানা ধারা ও প্রক্রিয়া আছে। প্রথমেই বলতে হয় গীতার পথ—সুখদুঃখে সমে কৃত্বা—অর্থাৎ এমন একটা ভাবের মধ্যে বা চেতনার মধ্যে পৌঁছান যেখানে সুখ এবং দুঃখ একই বোধ হয়—রামকৃষ্ণ যে রকমে টাকা ও মাটির একত্ব অনুভব করতেন। এর অর্থ মনকে চেতনাকে অর্থাৎ তোমার নিজেকে সরিয়ে ধরা দুঃখের অনুভূতি থেকে, দুঃখ রয়েছে, শরীর তা ভোগ করছে, প্রাণে বা মনেও হয়তো তার তরঙ্গ রয়েছে কিন্তু তুমি তা থেকে পৃথক, তুমি দেখছ শুধু তা পর্দার ছবির মত, তুমি উদাসীন সাক্ষী। এই হল দুঃখকে এড়িয়ে যাওয়া। এরকম স্থিতি অসম্ভব নয়, এ হ'ল অভ্যাসের অধ্যবসায়ের ফল।

কঠোর তপস্বী যারা, কৃচ্ছ্র সাধনা করেন যাঁরা, এই যেমন পঞ্চাগ্নির মধ্যে আসীন থাকা অথবা লৌহকণ্টক শয্যায় শয়ন গ্রহণ, এসব সম্ভব হয় চেতনার প্রত্যাহারের ফলে। অবশ্য যারা যোগী, সত্যকার অধ্যাত্মসাধক তাদের পক্ষে এই প্রত্যাহার কষ্টকৃত শ্রমসাধ্য না হয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখকর হয়, কারণ তাদের প্রত্যাহারের লক্ষ্য থাকে বরণীয় এক বস্তু অর্থাৎ মনকে ঘুরিয়ে তারা নিবদ্ধ করতে পারে অন্যত্র উর্দ্ধতর আনন্দময় এক বস্তুর মধ্যে।

এই যে প্রত্যাহারের পথ, পরম "নেতি নেতি" ধারা, তার চূড়ান্ত বর্ণনা দিয়েছেন আচার্য শঙ্কর তাঁর নির্বাণ-স্তোত্রে—

ওং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহম্
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমির্ন তেজো ন বায়ু
শ্চিদানন্দরূপো শিবোঽহম্ শিবোঽহম্।

বুদ্ধদেবও অনুরূপ পথ অনুসরণ করেছেন—তবে "শিবং"-এর পরিবর্তে তিনি স্থাপন করেছেন শূন্যম্।

আসলে এ হল দুঃখকে এড়িয়ে যাওয়ার বা ফাঁকি দিয়ে পালাবার পথ। অন্য পথ আছে, অন্য সাধক আছেন যাঁরা দুঃখকে এড়িয়ে যেতে চান না, দুঃখের সম্মুখীন হয়ে দুঃখকে যাঁরা চান জয় করতে। বলেছি যাঁরা শরীরকে ইচ্ছা করে পীড়ন করেন, উৎপীড়ন করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছে এই বীরভাব, ক্ষাত্রভাব যে দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে দুঃখকে বশীভূত করব। এই বশীভূত করার অর্থ একদিকে নিজেকে শরীর-প্রাণকে সমস্ত আধারকে নিঃসাড় করে ধরা। এই নিঃসাড়তা নিষ্ফল না হয়ে সফল ও সার্থক হতে পারে তখনই যখন এটা উপায় হয় ভিতরে নূতন রকমের একটা সাড়া জাগাবার জন্য অন্য ক্ষেত্রে, অন্য বুধে—শঙ্কর যে চিদানন্দের কথা বলেছেন।

কিন্তু দুঃখকে আরও অন্যভাবে অনেকে জয় করতে চেয়েছেন দুঃখের সম্মুখীন হয়ে দুঃখকে আলিঙ্গন করে, দুঃখের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দুঃখকে সুখে পরিণত করা। বৈষ্ণব সাধকেরা এদিকের একটা ধারা করে দিয়েছেন—শ্রীরাধার দুঃখ-কষ্ট-সন্তাপ, লাঞ্ছনা গঞ্জনা এমন কি শারীর পীড়ন এমন একটা নিবিড় তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভবের মধ্যে গলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন যে দুঃখ পরম আনন্দে পরিণত হয়ে গিয়েছে, কারণ তিনি বলতে পেরেছেন, শুধু বলতে পারা নয়, অণুতে অণুতে অনুভব করেছেন "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

খ্রীষ্টের সাধনায় দুঃখের সাধনা একটা বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। এক হিসাবে বলা যেতে পারে দুঃখের সমাদর ও রূপান্তর সাধনই খ্রীষ্টীয় সাধনার মূল রহস্য। আর একটি যেন ইহুদীদের—খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভব যেখানে—তাদের জাতিগত ধর্ম : Suffering is the badge of our tribe—বলেছেন তাঁদের একজন প্রতিনিধি (শেক্সপীয়ার)। খ্রীষ্ট নিজে কি রকমে দুঃখের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছিলেন তা এক শিক্ষণীয় বিষয়। তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এই বিষপাত্র দূরে ফেলে দেওয়া কিন্তু তখনই আবার মন পরিবর্তন করে তাকে গ্রহণ করলেন, স্বীকার করলেন তার সমস্তখানির ভিতর দিয়ে চলে যেতে। আপনার ক্রুশ আপনার পৃষ্ঠে বহন করে উঠে চললেন পাহাড়ের চূড়ায় যে পর্যন্ত না তাঁকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল সেই ক্রুশে। ভগবৎ-নির্ভরতা—এক তীব্র নির্ভরতা তাঁর দুঃখের রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিল—The zeal for the Lord has eaten me up—নিজের সত্তাকে, নিজের দুঃখকে হারিয়ে দিতে পেরেছিলেন এক পরম উল্লাসের মধ্যে। এই আদর্শ উদাহরণই অনুসরণ করেছে যুগযুগান্তর খ্রীষ্টীয় শহীদেরা। আগুনে যখন দেহ পুড়ছে তখন আগুনের স্পর্শ তাঁরা অনুভব করেননি, অনুভব করেছেন ভগবানের তীব্র প্রেম। তাঁদের চেতনায় অনুভবের গঠনই এমন হয়েছিল যে তার শেষে দুঃখ বা দুঃখজনক বিষয় পরিবর্তিত হয়ে যেত, অর্জন করত যেন

বিপরীত গুণ। মনের প্রাণের বৃত্তি একান্ত একাগ্র হলে এই রূপান্তরকারী প্রভাব ও শক্তি অর্জন করতে পারে।

তাহলে দুঃখকে এড়িয়ে নয়, দুঃখ হতে আপনাকে সরিয়ে দিয়ে নয়, দুঃখের সম্মুখীন হয়ে, দুঃখকে আলিঙ্গন করে এইভাবে দুঃখ জয় করা হয়েছে কয়েকটি বিশেষ সাধনার ধারায়।

কিন্তু একেও পরম জয় বা জয়ের শেষ সীমানা বলা যেতে পারে না। আরও পূর্ণতর জয়, একটা অতিনব জয় লাভ করা যেতে পারে, মানুষের নিয়তি চলেছে সেই দিকে। শহীদদের ভক্তদের ভগবৎ-অনুরাগীদের এই যে দুঃখ জয় ফলতঃ তা দুঃখকে সম্পূর্ণ লোপ করে দেওয়া নয়, তা হল আসলে দুঃখকে অভিভূত করে রাখা। মানসিক একটা সঙ্কল্পের, প্রাণের একটা আবেগের একান্ত তীব্রতা দুঃখের অনুভবকে এতখানি ডুবিয়ে রাখে, মনে হয় যেন তা সর্ব্বতোভাবে মুছে গিয়েছে, লুপ্ত হয়েছে। মনের বা প্রাণের সে শক্তি নেই যা দুঃখের কণাকে সম্পূর্ণ গালিয়ে দিতে পারে। শরীরের জড়কণায় যে আঘাত বা দুঃখ-তরঙ্গ তা নিঃশেষে দূর হতে পারে শরীরেরই অন্তর্গত জড়েরই অন্তরে আর একটি নিবিড় গভীর সত্যের স্পর্শে।

তবে আমরা এখানে সৃষ্টির একটা গুহ্যতম রহস্যের মধ্যে পৌঁছে যাই। তা হল সৃষ্টির স্বরূপের কথা, দুঃখেরও স্বরূপের কথা। সৃষ্টির এই যে দুঃখময় রূপ এ রকমটি হয়েছে তার হেতু, সে তার স্বরূপ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। যাকে বলি দুঃখ, দুঃখ সে হয়েছে কারণ তার যে স্বরূপ সুখ তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। দুঃখ যদি মুখ ফিরিয়ে তাকায় আপনার স্বরূপের দিকে তবে সে আর দুঃখ থাকে না—লবণের পুতুল লবণ-সমুদ্রে মিলিয়ে যাওয়ার মত। দুঃখের পক্ষে দুঃখ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া অর্থ দুঃখ হতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে সরে দাঁড়ান নয়, যেটা হল বলেছি বৈদান্তিক পন্থা। এ হল দুঃখের অন্তরে গভীরে প্রবেশ করে তাকে ভেদ করে যেন ওপারে চলে যাওয়া, ওপারে অর্থ দুঃখেরই অন্য পৃষ্ঠে। তখন দেখি কেবল সুখই রয়েছে, সে সুখ কেবল ও-পারের চেতনাগত নয়, এপারকেও সে অঙ্গীভূত করে নিয়েছে, আমরা যাকে বলি একটা পরম রূপান্তর সাধন করে।

দুঃখের, ভবব্যাধির মূল হল জড়কণার মধ্যে দেহগত পদার্থের অণুর মধ্যে, অজ্ঞান অচেতনা যেখানে ঘনীভূত, নিবিড়, নিরেট। মনে বা প্রাণে যে দুঃস্থতা তারও বীজ এই মনের ও প্রাণেরই অড়স্তরের তলে—আর এ সকলেরই মূল বীজ হল আবার জড়ের জড়তম কোষে। উচ্চতর মনের প্রাণের ভাবপ্লাবনে এই জড়বেদীকে ডুবিয়ে দিতে পারি, লুকিয়ে রাখতে পারি, তাতে ব্যাধির সাময়িক উপশম হতে পারে, কিন্তু পূর্ণ নিরাকরণ হয় না। জড়ের বীজ পর্য্যন্ত উৎপাটন করে ফেলতে হবে। আধ্যাত্মিক সিদ্ধির প্রসঙ্গে প্রাচীনেরা তাই বলেছেন সর্ব্ব বীজক্ষয়ের কথা, বীজকে ধ্বংস করতে হবে, অগ্নি-সংযোগে ভস্মে পরিণত করতে হবে। আমরা কিন্তু বীজের ধ্বংসের কথা বলিনা, আমরা বলি বীজের নব সঞ্জীবনের কথা।

এ সম্ভব হবে—আমরা বলছিলাম—জড়ের অন্তর-ভেদ সাধনার কল্যাণে। জড়তম অণুর মধ্যে যে চিন্ময়ী আত্মগোপন করে রয়েছে তাকে আবিষ্কার করা, তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া। যে জড়কণা অজ্ঞান জমাট নিরেট সে যখন সজ্ঞান স্বচ্ছ সুনম্য হয়েছে এবং আপনাকে তলিয়ে নিয়ে প্রসারিত করে তার অন্তর্যামীর মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে অর্থাৎ বাহিরের এই গাঢ় রূপ গঠন ভেদ করে ও-পারে চলে গিয়েছে আপনাকে উল্টে ধরেছে যেন, তখন সে লাভ করেছে নব-স্থিতি। তার যে শুধু চেতনার পরিবর্তন হয়েছে তা নয় তার এসে গিয়েছে একটা বস্তুগত নবগঠন যাকে আমরা বলি রূপান্তর। অন্তরের চেতনার রূপান্তর প্রমূর্ত বাহিরে জড়-রূপান্তরে। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—

The Spirit shall look out through Matter's gaze
And Matter shall reveal the Spirit's face.

জড়ের দৃষ্টি দিয়ে আত্মা চেয়ে দেখবে
জড় ব্যক্ত করে ধরবে আত্মার মুখমণ্ডল।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা বসু

(১৮)

কর্মযোগের শেষ পর্বে এসে এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে কর্মাধ্যক্ষকে (Master of the work) নিয়ে। এর আগে ব্রহ্মসংকল্প ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ও সদাচারের আদর্শ নিয়ে যে বিশদ আলোচনা করা হল, তাতে আমরা দেখেছি কর্মের মূলে রয়েছে এক সঙ্কল্প—বলতে পারি তাঁরই সত্যসঙ্কল্প। কর্ম করার মূলে যে কামনা—সে তাঁরই ইচ্ছা। সে কিন্তু আমাদের কামনা নয়, অথচ আমাদের কর্মযোগের ফলস্বরূপ তাঁরই সত্য সঙ্কল্প রূপায়িত হয়ে উঠবে, এ তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু আমাদের কামনায় আমরা জড়িয়ে পড়ি বলেই আমাদের কামসঙ্কল্প সত্য হয়ে উঠতে পারে না। তাঁর সঙ্কল্প বা সত্য সঙ্কল্পে সেই "সোঽকাময়ত" "তদৈচ্ছৎ" তাঁরই কামনা তাঁরই ইচ্ছার কথা ঘোষিত হয়েছে। তারপর সেই কামনা ও সঙ্কল্প ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির তিন গুণের ধারায় কেমন করে প্রকাশিত হল, এটা বুঝে দেখতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন। জগৎ এই তিন গুণের লীলায় চলেছে। গুণাতীত অবস্থায় উর্ধ্বে থেকে ওপারে উত্তিয়ে যাওয়া হ'ল যোগের ভাষায় উত্তার, গুণের ক্রিয়া সেখানে স্তব্ধ। সেখানেই থেকে গেলে শক্তির সম্যক্ পরিচয় মেলে না, তাই গুণলীলার ভিতরেও শক্তিকে চিনে নিতে হবে। আমরা যাকে বলি জীবশক্তি, তা ঈশ্বর-শক্তি বা ব্রহ্ম-সঙ্কল্পের মধ্যেই বিধৃত। সেই ব্রহ্ম-সঙ্কল্প-শক্তি যেমন গুণের ক্রিয়ায় ক্রীড়াবান তেমন গুণক্ষোভের অতীত তার সৌম্যশান্তিতে ও গুণাতীতে ঈশ্বর-শক্তি-(Supreme Will-Power) স্বরূপে বিরাজমান। তাহলে আমরা বলতে পারি, যদি তাঁর মধ্যে এই গুণাতীততা গুণসাম্য ও গুণক্ষোভ একই সঙ্গে থাকতে পারে, তাহলে আমাদের প্রকৃতিও স্বরূপে তাই। সদাচারের আদর্শে গুণাতীত থেকে উজানে যাবার অবস্থায় গুণক্ষোভে বিচলিত না হবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কর্ম করতে আবার নেমে আসতে যদি গুণক্ষোভে ভয় পাই, তাহলে পূর্ণযোগ হল না। সেই রামকৃষ্ণদেবের কথা যে "নি"তে গলার সুর চড়িয়ে তো থেকে যাওয়া যায় না। "সা"তে নেমে আসতে হয়। বিবেকানন্দ নির্বীজ সমাধিতে মগ্ন হয়ে থেকে যেতে চাইলে রামকৃষ্ণদেব তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন, বলেন "তুই তো বড় হীনবুদ্ধি। সমাধির পারে যা! সমাধি তো তুচ্ছ কথা।" পরে তিনি বলেছিলেন যে এই চাবি বন্ধ করে কাছে রেখে দিলেন, লোকশিক্ষার কাজ শেষ হলে তবে সেই চাবি খুলে পাকা ফলটি দেবেন।

তাহলে সংসারে থেকে কর্ম করাটাই ক্ষতির কারণ হবে, তা বলা যায় না। গীতা

বলেছেন কর্ম বন্ধন হয়ে দাঁড়ায়, যদি সেটা যজ্ঞ রূপে অনুষ্ঠিত না হয়। সংসারে থাকলে ঝামেলা আছেই সেই যে বলা হয় যে কাজলের ঘরে কালি তো লাগবেই। তা লাগুক, তবুও সেখানে থেকেই ঐ সব ঝুট ঝামেলাকে যুদ্ধং দেহি বলে রুখে দাঁড়াতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ এই বীরভাবের ওপর জোর দিয়েছেন। যে শুদ্ধ ভাব নিয়ে ঊর্ধ্ব চেতনায় উত্তান গতি হল, সেই শুদ্ধ ভাব নীচের এই সাধারণ চেতনায় নামিয়ে আনতে হবে। ঠাকুর ঘরে সদানন্দে বিভোর হয়ে থেকে যেই নীচে নামলাম অমনি বিক্ষুব্ধ হলাম—এই রকম হতে থাকলে পূর্ণ যোগ হল না। আলোর পর আঁধার তো আসবেই, তাই তখন চাই ধৈর্য। অসীম ধৈর্য নিয়ে থাকলে আঁধারের শক্তি পরাভূত হবে, ঠাকুর ঘরের শান্তি এই এখানেও বজায় থাকবে এই হল সর্বক্ষণের সাধনা। চব্বিশ ঘন্টায় নিয়ত কর্ম কিছুটা করি, আবার কিছু কর্ম যেন ঘাড়ে চেপে পড়ে, সে সবই কর্ম সব রকম কর্মের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে যোগ চাই, তাঁকে সবের মধ্যে পেতে হবে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন যে সংসারে থেকে তাঁকে ডাকার অর্থ হল বিশমন পাথর সরিয়ে তাঁকে দেখার মত শ্রমসাধ্য। তিনি যে আমার সব কর্মের অধ্যক্ষ, সব ছাপিয়ে তিনি সবের ওপরে; তবু সমস্ত জগতের কর্মবিলাসের স্রোত তো তাঁরই নির্দেশে বশীভূত হয়ে চলছে। এই কর্মাধ্যক্ষকে সাক্ষী চেতা কেবল নির্গুণ রূপে দেখে মনে হয়, বড় উঁচু সুরে বাঁধা এই ভাব কি শুধুই সিদ্ধের জীবন-বেদ? কিন্তু সাধকের অনুভূতি এই পথ ধরেই চলে। কর্মযোগের যজ্ঞেশ্বর প্রভু যিনি, বিশ্বোত্তীর্ণ বিশ্বগত হয়েও তিনি ব্যক্তিগত, আমার জীবন-যজ্ঞের প্রভু। গীতার ভাষায় ক্ষরপুরুষ ও অক্ষর-পুরুষ নিয়ে ও তাদের ছাপিয়ে রয়েছেন যে পুরুষোত্তম, সেই উত্তম পুরুষকে জীবনের প্রভু রূপে পাওয়া চাই। তখন ব্যষ্টি বিশ্ব ও লোকোত্তর এই তিন ভাবেই দৃষ্টি খুলে যাবে। শ্রীঅরবিন্দ লোকোত্তর প্রতিষ্ঠায়—গীতায় যেখানে নৈকর্মের সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে, সেখানে চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে রেখে দেখিয়েছেন যে সেখানেও কর্ম ত্যাগ করা নয়। কর্ম না করে সেখানে প্রতিষ্ঠা হয় না, আমরা এ বিষয়ে ভুল বুঝে থাকি। কর্মের প্রেরয়িতা তিনি, কর্মের পিছনে তাঁকে দেখতে হয়। প্রকৃতির বশে অবশের মত যে কর্ম হতে দেখা যায়, সে সব কর্মের ঊর্ধ্বে তিনি। তার অর্থ এ নয় যে কর্মের স্পন্দ সেখানে নেই। প্রকৃতিই সকল কর্মের কারয়িত্রী আর পুরুষ শান্ত নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা এই উপলব্ধিই নৈর্কর্ম্য। কিন্তু সে উপলব্ধি কর্ম ত্যাগ করে তবে পাওয়া যায় এই ধারণা ভ্রান্ত। এরপর বিশ্বময় বিশ্বগতভাবে যে তাঁর বিসৃষ্টি তাঁর উল্লাস উপলব্ধিতে ধরা পড়ে, সে তো ঐ নৈর্কর্ম্যেরই কর্ম। পুরুষের শক্তিতেই প্রকৃতির কর্ম, পুরুষের দৃষ্টির বাহিরে প্রকৃতির কোন অস্তিত্বই থাকতে পারে না। বিগ্রহে পুরুষকে দেখলে বোঝা যায় যে জড়ের আধারে প্রাণচৈতন্য নিয়ে তাঁর এক অপরূপ বিগ্রহ মানুষ দেহধারী মানুষের মতই। তাঁর ঐ মানুষ দেহধারী বিগ্রহকে সাক্ষিচৈতন্য-রূপে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে কর্ম করতে শিখতে হবে। জীবনের কর্মে এই ভাব আরোপ করতে পারলে কর্মযোগের পথ খোলে। জগদতীত সত্তায় থেকে তিনি যেন কিছুই নিজ হাতে করছেন না অথচ সব কর্মই হয়ে চলেছে। তিনিই চাতুর্বর্ণ্যের স্রষ্টা তবুও তিনি অকর্তা। 'আমার কোন কর্তব্য নেই, তবুও কর্ম করে যাই'—এই রকম এক ভাব। চেতনার এক

ভূমি আছে যেখানে কর্ম নেই, সেই প্রশম বা শান্তির অবস্থাই কর্ম ঠেলে দিচ্ছে। গভীর ঘুমের সেই প্রশম সুখের অবস্থাই অকর্ম। আর তাই অকর্তার কর্মের উৎস।

কর্মের গতি অতি গহন, কর্ম অকর্ম বিকর্ম এই তিনের রহস্যই বুঝতে হবে। বিকর্ম হল সেই ধরণের কর্ম যা ঠিকমত হয় না, এলোমেলো হয়; আর সেই কারণেই কর্ম ত্যাগ করে আমরা পালাতে চাই। অকর্মে কর্ম ও কর্মে অকর্ম দেখাই কৃৎস্নকর্মকৃৎএর কর্ম। গীতা যেমন বলেছেন, "কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ" এই হল বুদ্ধিমানের কর্ম। আমরাও কিন্তু সমগ্র দৃষ্টি দিতে পারিনা বলে এটা যেন ঠিক বুঝতে পারিনা যে নবদ্বার পুর এই দেহের মধ্যেই প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করে পরমানন্দে যিনি বাস করেন, সেই নৈর্ব্যক্তিক পুরুষই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ভাব প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা হলেই শুদ্ধি ও শান্তির দৃঢ়ভূমি অধিগত হয়। সাধারণ চেতনায় অকর্মে কর্ম ভুল হয়ে যায়, কিন্তু একটা ঘুমের ভাব রেখে যদি কর্ম করি, আবার কর্ম করে যদি বুঝি যে কিছু করিনা, তাহলে কর্মে বন্ধন হয় না। কর্ম যেন ঢেউএর মত চলে যায়, কিছুই আমাকে স্পর্শ করে না। তাই সাধারণ চেতনার দৃষ্টিকোণ দিয়ে অকর্মে কর্ম ও কর্মে অকর্ম বোঝা যাবে না, একটা সমগ্র দৃষ্টিকোণ (totality of vision) নিয়ে আমাদের দেখতে ও বুঝতে শিখতে হবে। কত চতুরানন মরি মরি যাওত নাহি তুয়া আদি অবসান!"। সেই তিনি, তাঁকে তো কিছুই টলাতে পারে না, তাঁর থেকেই বুদ্বুদের মত জলবিম্ব সৃষ্ট হচ্ছে, আবার তাতেই মিলিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের বুকে ঢেউএর মত। এই বোধে স্থিত থেকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হয়, উত্তেজিত হলেই মুস্কিল। আবার উত্তেজনা নেই বলে কাজে এক ম্যাদাটে ভাব কোন স্ফূর্তি নেই, তা হলেও চলবে না। কর্মে উদ্দীপনা থাকা দরকার, উদ্দীপ্ত কর্মে অন্তরে প্রশান্তি বজায় থাকবে। গুণাতীত উর্ধ্বে অবস্থিত বলে তা যেমন সৎ বস্তু, তেমনি তারই মধ্যে সেই প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে, যাকে আমরা বলেছি দিব্যসঙ্কল্প বা সত্যসঙ্কল্প। ঐ ইচ্ছাশক্তির প্রভু তিনি, তাঁকে সেই ভাবে ব্যক্তিরূপে যখন দেখতে ও বুঝতে পারব, তখনই আমার মধ্যে তাঁকে পাব বা আত্মার প্রতিষ্ঠা লাভ করব। কিন্তু সেই অতিষ্ঠায় বা লোকোত্তর চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা ও এক বিশ্বব্যাপী সমগ্র চৈতন্যে ব্যাপ্তিরূপে স্থিত হতে না পারলে তাঁর ব্যক্ত মানুষী তনুকে বোধে আনা সম্ভব হয় না। ভগবান বলেছেন "অবজানন্তি মাং মূঢ়া...সর্বভূতের ঈশ্বরস্বরূপ আমার পরম সত্তা না জেনে মনুষ্য দেহে অবস্থিত আমাকে অবজ্ঞা করে।" তাঁর গুণাতীত (transcendent) বিশ্বাত্মক ও বিগ্রহবান তিনটি ভাবই ভাল করে বুঝতে হবে। এর মধ্যে একটিকে ধরে থেকে অপর দুটি ভাব না ধরতে পারলে ভুল হয়ে যায়। তিনটি ভাবকে এক সঙ্গে জীবনগত করে ধরে না চলতে পারাই যোগের পথে মূঢ়তা।

আমার মধ্যে তার ভিত্তি কোথায় কি ভাবে? আমার দেহ রয়েছে, রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে আমার সংসার; তাতে আমি রস পাই, তাই আসক্তিতে আমার চিত্ত বাঁধা পড়ে আছে। বলতে পারি 'আমি' যতটা সত্য, আমার বাসনা কামনা এ সবই আমার কাছে নিরেট সত্য। কিন্তু সেখানে তো আমি একা নই, শুধু আমাকে নিয়ে তো

আমার সব কিছু চলে না। বাসনা কামনা নিয়ে সকলের সঙ্গে তো আমি মিলতে পারি না। তখন বিশ্বগত ভাবে এই বাসনা কামনার রাজ্যেও নিজের ব্যক্তিগত বাসনা কামনার সঙ্কীর্ণতা ছেঁটে ফেলতে হয়। জীবনে অপরের সঙ্গে নিজের ইচ্ছা সামাল দিয়ে না চলতে পারাটা নাবালকত্ব। সাবালকত্ব হল নিজেকে কেন্দ্র করে নিয়ে প্রথমে একটা পরিবার বৃত্ত হয়, তা থেকে হয় সমাজ, তারপর তা থেকে সারা বিশ্বে সবার মধ্যেই নিজের পরিবার ও সমাজবোধের ভাব জেগে উঠে সে বৃত্তের পরিধি ক্রমেই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে ওঠে। সে বৃত্তের কেন্দ্রে এই অহং বিন্দুটিই থাকে, কিন্তু পরিধি বাড়তে বাড়তে অনন্ত হয়ে যায়। অহংএর তাবরূপ বদলাতে থাকে। কখনও কিছুই ভাল লাগে না, সমাজ সংসার জীবনের কলরব সব কিছু থেকে ছুটি চাই, নির্জনতার শান্তি চাই। নিজের আত্মার মুখোমুখি হবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই আসে এক নির্বেদ, এক তুরীয় অবস্থা। যেমন ঘুমের মধ্যে আমি আর জাগ্রতের আমি থাকি না, সেই রকম ঐ তুরীয় অবস্থায় আমার বিষয়-রূপ যে জগৎসংসার তাও থাকে না, তার বিষয়ী আমিও থাকিনা। এই ভাবেই বুঝে নিতে পারি যে, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকে ছাপিয়ে গুণাতীত তুরীয় হয়ে যেমন আছেন, তেমনি জগৎ-প্রপঞ্চের উল্লাসও তো তাঁরই। সৃষ্টিতে তিনি ফুল ফুটিয়েই চলেছেন, একটা ঘাসের ফুল ফোটাতেও যেন তাঁর লক্ষ যুগের তপস্যা ; তাতে কোনও শ্রান্তি নেই ক্লান্তি নেই, অনন্ত সময় হাতে নিয়ে অসীম ধৈর্য সহকারে চলেছে তাঁর ফুল ফোটাবার তপস্যা। তাতে তার ক্ষুদ্রতম অংশেরও কলানৈপুণ্য যেমনই বিস্ময়কর তেমনই অন্তহীন এক সমদৃষ্টি ও সমান যত্নে বিধৃত। শ্রীঅরবিন্দ মহাসরস্বতীর শক্তিকে বলেছেন এই কর্মনৈপুণ্যের (perfection in details) দেবতা। ব্যক্তিগত ভাবে যোগকর্মের লক্ষণ হল এই একাগ্রীকরণতা দিয়ে কর্মকলায় নিপুণ হওয়া। একদিকে মহাশূন্য আকাশ হয়ে চেতনা ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হয়ে আছে, তার কোনও কূল কিনারা নেই, অপর দিকে ঘনীভূত কেন্দ্রীণ বিন্দুরূপী আত্মচৈতন্য—এই দুই দিকই মিলিয়ে নিতে হবে আমায়। এই বিন্দুতে সিন্ধু বা আকাশ নামিয়ে নিতে হয়। তাতে এমনও হয় যে এই ''আমি''র গণ্ডী ছাপিয়ে বিশ্বগত এক আমি হয়ে গেলাম, তিনি আমার মধ্যে তাই চাইলেন। এমনি করেই সমগ্র বিশ্বে একই রূপে তিনি সব কিছু গ্রহণ করতে পারেন। তাঁর লীলাবাদে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে সব কিছু করার পিছনে তাঁরই লীলার আনন্দ। কিন্তু যখন দেখি যা হওয়ার লক্ষ্য ছিল তা হল না, অন্যায় করে সত্যকে আবৃত করা হল, তখন আর লীলাবাদের ব্যাখ্যায় নীমাংসা করা চলে না ; সমস্যাকে যেন পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, যে জগৎকে আমরা তিন গুণের ভিতর দিয়ে দেখি তা হল অর্ধসমাপ্ত জগৎ। আর সেই কারণেই আমাদের জীবনে যখন আমরা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, তখন আমরা এই জগৎকে নিখুঁৎভাবে দেখতে ও রাখতে চাই এমন ভাবে যে সেখানে উত্তম রীতি ও নীতির পরিচালনায় কোনও ব্যাঘাত ঘটবে না। আদর্শকে নিপুণভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে। এক কথায় জগৎ ও জীবনের ছন্দ যাতে যথার্থ ভাবে সুরে ও তালে সমন্বিত হয়ে চলতে পারে, সেই সত্য কল্পনাই আমাদের

কর্মের প্রচোদনা। বাস্তব জগতে বেসুরো বেতাল বলে যেটাকে জানতে পারি, সেটাও যে অখণ্ড তালে দেখলে তাঁর লীলারই এক খণ্ড দৃশ্য, তা বুঝতে পারলে তিতিক্ষার শক্তিলাভ হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু তাকে তো সঙ্কল্পের শক্তি বলা চলে না। ঐ অসম্পূর্ণতাকে আমার সম্পূর্ণ করার এক দায় আছে, আর সেটাই তো আমার সঙ্কল্প। কেননা তিনি নিজে তো তাই করে চলেছেন। মহামানব যখন আসেন, তখন আমরা এই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি, কিন্তু এদিকটার পরে আমাদের দেশে যেন ততটা জোর দেওয়া হয়নি। লোকোত্তর ভূমি থেকে নেমে তিনি বলেন "উদ্দিবীর্ষু"—এই অপূর্ণ জগৎকে পূর্ণ চৈতন্যে তুলে ধরতে তাঁর তপস্যা। বুদ্ধের নির্বাণ লাভের পর তাঁর এই দায়িত্ব তাঁকে সাতদিন ধরে ঘুরিয়েছে। তিনি পদচারণা করেছেন আর চিন্তা করেছেন যে এ কি জগৎকে দিতে পারব না দেব না। মায়ের বাণী থেকেও আমরা তাঁর এই দায় সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে জগৎ-সংসারের চেহারা দেখে বলা চলে না যে সবই ঈশ্বরেচ্ছায় ঠিকভাবেই চলছে। এইখানে বসে তাই এক তপস্যা চাই—সিদ্ধজীবনের সেই দায় সত্যসঙ্কল্পেরই দায়। তাঁর নিজের জীবনে ব্যষ্টির সাধনা সিদ্ধ করে তিনি দেখিয়ে দিলেন সেই সত্যসঙ্কল্পই তাঁর ইচ্ছা। তাই আমাকে প্রাণ দিয়ে সেই তপস্যাই করতে হবে। তাতে জগৎকে পরিবর্তিত করার কথাও ওঠে, নচেৎ তাঁর ইচ্ছাশক্তির (Supreme will) কথা শুধু বললেই সিদ্ধ করা যায় না। তিনি যে সচ্চিদানন্দ এটা ফলিত করে দেখতে ও দেখাতে হয়। তাঁর শক্তি কর্ম তপঃ এসব তো তাঁর সচ্চিদানন্দ থেকে বাদ দেওয়া যায় না। আমরা দেখেছি তাঁর জ্ঞানময় তপঃ সৃষ্টিকর্মের মূলে, আর তাতে আমারও অংশ রয়েছে। তিনি সৎলক্ষণে যোগ-নিদ্রার প্রশান্তিতে যেমন থাকেন, তেমনি আবার তারই মধ্যে আলো ফুটল—আর তা বহু আলোর বিশ্ব (Perfect worlds), তাও জানতে হবে। তন্ত্রে তাকে বলা হয় সদাখ্য তত্ত্ব। আর ব্রহ্মসদ্ভাব, সেখানে তখন বহু নেই। চিৎ-এর স্ফুরণে অনন্ত ব্রহ্ম, তারই বিস্ফোরণে পরমাত্মা। এ দুইই লোকোত্তর চৈতন্যের অবস্থা—কালাতীত। তাতে যখন আনন্দের লক্ষণ দেখছি, দুদিকেই দেখতে পাই। একদিকে তিনি আত্মারাম একার্ণবীকৃত সমুদ্রে অনন্তশয়ান ভগবান বিষ্ণু—"যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।" তাঁরই হিরণ্যগর্ভ স্বপ্নে যেমন ফুটছে জগতে স্বপ্নরূপ লীলাকমল, তেমনি তারই প্রতিষেধ রূপে জড়ত্বের অভিঘাতে বেরিয়ে আসছে কর্ণমল। এই রহস্যের পোটিকাতেই বিষ্ণুর পার্শ্ব পরিবর্তন জাগরণ ও উত্থান। কিন্তু অপর দিকের বিপরীত কোটিতে যে চিরনিথর অপ্রকাশ সেই সব নিয়েই দেখা দেয় যে জড় বস্তু, তা হল সদ্‌ব্রহ্মেরই প্রকাশের বিপরীত দিক বা উল্টা পিঠ। এই জড়ের মধ্যে চিৎকে ফুটিয়ে তুলতে হবে—সেই তাঁর আনন্দলীলা আর সেই তাঁর ইচ্ছা। সপ্তশতীতে দেখেছি দেবী মধুপানের আনন্দে অসুররূপা জড়শক্তিকে আঘাত হানছেন। আমাদের জীবনে এই শক্তিকে চিনে নিতে পারলে, তাঁর আনন্দময়ী শক্তিতেই অন্ধকারের গলিঘুঁচি বক্রতা সব জয় করতে পারব। সৎ-শক্তির আধারে চিদানন্দ নিয়ে তাঁর কর্মই আমার করব, আর তাই হবে বিশ্বকর্ম, তাঁর আনন্দের কর্ম। বিশ্বাতীত

বিশ্বগত বিশ্বব্যাপী ও ব্যক্তি-বিশ্বের কর্মযোগের ঐ হল মূল কথা। ব্যক্তির কর্ম তখন তারই তপস্যার অগ্নিকণার বিচ্ছুরণ, এক কথায় সে কর্মে তাঁরই প্রকাশ।

কিন্তু এ ভাবে কর্ম করা তো আমাদের পক্ষে সহজ হয় না। ঐ পথ চলার নির্দেশ জানা নেই, আঁধারে পথ ঠাহর হয় না। তাঁর বাঁশীর ডাকে পথে বেরিয়ে পড়েছি। কোন পথে চলা ঠিক হবে, তা বুঝতে পারছি না, তখন কি করব? তখন বোঝা যায় যে আসল পুঁজি হল হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ধৈর্য। শ্রদ্ধা হল কিশোর চিত্তের সেই প্রত্যয়, যা সত্যের আভাস পেয়ে তাকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করে ধরে থাকে চিরজীবনের মত। শুধু বিশ্বাস বললে শ্রদ্ধাকে ধরা যায় না। বিশ্বাস থাকলেই যে শ্রদ্ধার আবির্ভাব ঘটবে, তা বলা যায় না, Life Divine গ্রন্থের গোড়াতেই শ্রীঅরবিন্দ শ্রদ্ধাকেই (Faith) মূল সম্পদ বলেছেন। কি করে ঐ পথসঙ্কটে তিনি পথ চলার নির্দেশ দিয়ে দেন, তা যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। তবুও কিছুতেই ভুলতে পারি না যে "আমার এ আঁধারে চালায় কে গো"। যতই বাধা বিপত্তি আসুক না কেন, তা হৃদয়ের সেই আলোকে, সত্যের সেই আত্মপ্রত্যয়কে কিছুতেই নষ্ট করতে পারে না। এর বিরুদ্ধে তর্কবুদ্ধিও মাথা তুলে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু কবির ভাষায় "যুক্তি তারে পরিহাসে, মন তারে সত্য বলে জানে।" মনের এই সত্য বলে জানাই হল হৃদয়ের আকূতি বা শ্রদ্ধা। তখন কিন্তু কিছুটা আয়াসের প্রয়োজন আছে। একবার যখন ওপরের আলো ডাক দিয়ে গেছে, তখন সেটা আর জীবনের পথ থেকে একেবারে চলে যেতে পারে না, তবে তার তীব্রতা ঠিক এক রকম থাকে না। মাঝে মাঝে সেটা দেখা দেয় জোরও ধরে, আবার যেন আকাশে মিলিয়ে যায়। বুলে থাকে শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধার হয় গোত্রান্তর। মেয়ের বিয়ে হলে তার গোত্রান্তর হয়ে যায়, কিন্তু সেই মেয়ে যখন মা হয় তখন তার রূপান্তর আসে। সেই রকম গোত্রান্তর থেকে চাই রূপান্তর, তবে না যোগের সার্থকতা।

সাধারণ দীর্ঘ কাল তাতে লেগে থাকতে হয়, তাই তখন চাই ধৈর্য। কিছুটা করে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। শ্রীঅরবিন্দের প্রিয় শ্লোক গীতার "নিশ্চয়েন হি যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিন্নেন চেতসা"—হতাশ মনমরা ভাব নিয়ে চলা যাবে না, দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে চলতে হবে। আমরা অধীর হয়ে পড়ি এবং তখন ঝাঁপ দিয়ে পড়ে কোনমতে কেল্লা ফতে করব, এ ভাবে আমাদের পেয়ে বসে। যোগের পক্ষে সেটা ক্ষতিকর। রাতের আকাশে তারার আলো যেমন নিঃশব্দে ফোটে আর পৃথিবীর বুকে ফুল ফোটার পালায় যেমন এক নীরব শান্ত ছন্দ আছে, সেই শান্ত স্বাভাবিক ছন্দ ঢাকা পড়ে যায় ঐ রাজসিক ব্যাকুলতার অস্থিরতায়। অহংই স্ফীত হয়ে ওঠে রজোগুণের ঐ বিপরীত পরিণামে, আর তাতেই তাঁর শান্ত দৃষ্টির আলোকে ঢেকে দিতে চায়। তবে কি সব ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে থাকতে হবে? না, শান্তরসের ক্রিয়া তা নয়। সবসময় সদাশুচি হয়ে থাকতে হবে, সেটা মনে রাখা চাই। ছট্‌-ফট করে সব কিছু পণ্ড করব না, সেটা ঠিক। কিন্তু এখনও যা হবার তা হয়নি, তাঁকে যে পাইনি, সে বেদনা বহন করতে হবে বৈ কি! কবি বলেছেন "তোমায় আমি পাইনি যেন সেই কথা রয় মনে, যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।" শয়নে স্বপনেও তাঁর বিরহের আকূতি আমার প্রত্যহের জীবনে বীর্যসঞ্চার করবে, তবেই আমার আকূতি তীব্র-

সন্বেগসম্পন্ন হয়ে সিদ্ধ হতে পারবে। তা না হলে প্রাণশক্তির জোর যেখানে বেশী, সেখানে উৎকট সাধনায় কিছু শক্তি লাভ হয় বটে, কিন্তু জড় উন্মত্ত পিশাচবৎ হয়ে আধারের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে লোকে পাগলও হয়ে যায়। আমরা বরাবর শুনে এসেছি পূর্ণ যোগের আদর্শ সেটা নয়। ঐ রকম উৎকট সাধনায় শক্তি লাভ করলে অপক্ক পাত্রে সোমরস ঢালার মত অবস্থা হয়। অশুদ্ধ আধারে শক্তির অবতরণে পাত্র বিদীর্ণ হয়ে যায়, অথচ অহমিকা স্ফীত হয়ে উঠে সব কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। তাই শক্তির অবতরণে আত্মনিবেদনের প্রশান্তিকে ধরে রাখার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কিন্তু তাই বলে তামসিক সমর্পণের জড়ত্বকে প্রশান্তি বলে ভুল না করি, সেটা দেখতে হবে। সেই রামকৃষ্ণদেবের কথা মনে পড়ে যে, ডাকাত পড়া ভক্তি চাই। তামসিক সমর্পণ হল ভ্যাদভ্যাদে চিড়ের ফলারের মত, সেটা পরিহার করতে হবে। আবার শক্তিরও তাণ্ডার লুটে নেব, এরকম রাজসিক উগ্রতা ও অস্থিরতা ছাড়তে হবে। তাঁরই স্বরূপে নিজের সব কিছু দিয়ে দিতে হবে তো। সেই ঐকান্তিক আত্মসমর্পণে তাঁর লোকোত্তর গুণাতীত পরম সত্তাটিকে জোর দিয়ে ধরতে হবে। তিনি যে সব ছাপিয়ে ঐ আকাশ হয়ে সবের উর্ধ্বে থেকে আমার দিকে চেয়ে আছেন, তিনি যে আমাকে বরণ করেছেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"! তিনিই যে আমার স্বামী, আমার গোত্রান্তর ঘটিয়েছেন, আমার সেই অভিমান। এবার আমার রূপান্তর ঘটাও, একেবারে তোমারই করে নাও; আমার সব কিছু আমি সঁপে দিই তোমাকে। কিন্তু তুমি কে, সেখানে আমার ও তোমার মধ্যে কোন আবরণ ঘুনায়িত হয়ে থাকলে তো চলে না। বিশ্বাতীত বিশ্বব্যাপ্ত হয়েও তুমি আমার একান্ত আপন জন। তুমি আমাকে স্বীকার করেছ বলেই না আমার চিত্তে শ্রদ্ধা জেগেছে, তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। এখন যা করবার তুমিই করো। তিনি তখন কি করবেন? যা আমার সত্যস্বভাবের অনুকূল, সেই স্বধর্মের পথ ধরেই তিনি চালিয়ে নেবেন।

কিন্তু আমাদের গোলমাল হয় যখন আমরা স্বকর্ম নিয়ে পরের মুখে ঝাল খেতে যাই। সাধুসঙ্গ করতে গিয়ে জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে কর্ম ভুলে গেলাম, আবার ভক্তিবাদীর প্রভাবে হয়তো স্বকর্ম ছেঁটে ফেলে অথথা হৈ চৈ করে মত্ত হয়ে উঠি; তাতে সব মাটি হয়ে যায়। গীতা তাই সাবধান করেছেন যে স্বধর্ম যখন পেয়েছ সেটাকে ধরে থাক, পরধর্মে লোভ করতে যেও না; সেটা হবে ভয়াবহ। সাধারণত অধ্যাত্মজীবনে রসবর্জনের পথ ধরতে গিয়ে এই দ্বন্দ্বেরই মধ্যে পড়তে হয়। চারিদিকে দেখি রসের ধারাই চলেছে, তবুও সেখানে রস বাদ দিতে গিয়ে একেবারে শুঁটকো হয়ে পড়ি। কিন্তু স্বধর্মের পথে যদি তাঁর হাতটি ধরা থাকে তবেই রসে বসে চলে স্বধর্ম ও স্বকর্মকে পুষ্ট করতে পারব। আর তখনই পরধর্ম ছাড়তে পারব।

কিন্তু অধ্যাত্মজীবনের পথে পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা—বাধা আসেই। শ্রদ্ধা হারিয়ে যেতে বসে, এমন অবস্থা বারবার হতে পারে। কিন্তু তিনি হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন সেটা বুঝতে হবে। আর তাহলে দেখতে পাব যে পতনের মধ্যে বা ভুল করার মধ্যেও সত্যেরই উপলব্ধি হচ্ছে। সিদ্ধচেতনায় সমগ্র পথ যখন উদ্ভাসিত হয় তখন দেখা যায় যে জীবনের

ভুল ভ্রান্তি বাঁকা-চোরা পথ, সে সব জিনিষেরই অর্থ আছে। তিনি সে সবের মধ্যে হাত ধরে নিয়ে গেছেন। আর ভুল করে পড়ে না গেলে এত বড় সত্যকে বোধকরি দর্শন করতে পারতাম না। এ সত্য ঋতের সত্য, এ বোধও অনেক পরের কথা। তিনি সত্য তিনি ঋত। মন দিয়ে আমরা সত্যাসত্যের বিচার করে থাকি, কিন্তু মন দিয়ে তো পূর্ণকে দেখতে পাওয়া যাবে না। তাই অসত্য ও অনৃতের যে তাৎপর্য আছে, সেটা প্রথমে বোঝা যায় না। জড় ও চৈতন্যকে শেষ পর্যন্ত আমাদের মিলিয়ে নিতে হবে, তা না হলে অধ্যাত্ম-জীবনে সত্তার পুষ্টি হবে না। তাই তিনি নিজেই এই ভাল ও মন্দের দ্বৈতের ভিতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমার কর্মাধ্যক্ষ। বিবেকানন্দের শেষ জীবনের উক্তিতে আমরা পেয়েছি, তিনি বলেছেন তিনি যেন প্রশান্তিতে শুয়ে আছেন, ভুলও যে করেছেন তাও সত্য, তা থেকে যা পেয়েছেন তাও সত্য। বৈদিক ঋষির কাছ থেকে শুনি তিনি উর্ধ্বে সবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলছেন যে পথের মধ্যেই তুমি আলো গুটিয়ে নিলে বাঁচি কি করে—"তৎ সূর্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্তোর্বিততং সং জভার।...?" তিনিই আলো গুটিয়ে নিলেন অর্ধপথে কর্ম অসমাপ্ত রইল, সেটা ঠিকমত বুঝতে পারলে সত্যদর্শন হয়। বিবেকানন্দের স্বল্প আয়ুর জীবন দেখে আমরা বলে থাকি যেন তাঁকে অর্ধেক পাওয়া গেল, পুরোটা যেন আর হয়ে উঠলো না। রামকৃষ্ণদেব বলতেন যে কুমোর কাঁচা হাঁড়ি পাকা হাঁড়ি সব এক সঙ্গে রোদে মেলে দেয়। সেখানে গরু এসে দাঁড়িয়ে দিলে কাঁচা হাঁড়ি কতগুলি ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু পাকা হাঁড়ি আর ভাঙে না। এই যে পরাভব—এ জীবনের সঙ্কল্প সিদ্ধ হল না, সেটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেরানা হলে বলতে পারব, না হক, এও তুমি। এই পরাভব গ্রহণ করে তোমাকেই জয় দিয়ে যাব। সিদ্ধি হল না, কাঁচা হাঁড়ি হয়ে যদি ভেঙেও যাই, হাঁড়িকার কুমোর তো তুমিই! "নরপশুরূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি বরিব হে!" তোমাতেই আছি, ফিরব তোমাতেই। এই হল বীর্যের পরিচয়, এ বড় গভীর প্রত্যয়ের কথা। এর মূলে হল শ্রদ্ধা, সেটা থাকলে আমার দাহ ক্ষতি পাপ স্খলন সব কিছু নিয়েও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারব।

"জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি! জয় তোমারি করুণা।
জয় তব ভীষণ সকল কলুষনাশন রুদ্রতা।..."

এ আত্মসমর্পণ কিন্তু গুণাতীত পুরুষের কাছে নয়, কেননা গুণসাম্যের সে অবস্থায় তিনি কি আর সমর্পণের ধার ধারেন? তাঁর মহাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, এ সমর্পণ প্রেমের ভক্তির ও শক্তির সমর্পণ। আত্মপ্রতিষ্ঠা হল পুরুষেরই রূপ, আর তিনি যে জননী, সেই চৈতন্য এবং মহাশক্তির যুগনদ্ধতা হতেই জগৎ বা জীবের জীবন। প্রত্যেকটি জগৎ বা জীবের পিছনে রয়েছেন ঐ মহাশক্তি। সবাইকে আবিষ্ট করে রয়েছে অন্তর্যামী পরম চৈতন্যের ঈশনা। তাই ভুবনেশ্বরী মহাশক্তিই আমাদের জীবনযন্ত্রে সর্বকর্মের ঈশানী মা।

তাহলে পেলাম যে কর্মে আত্মসমর্পণের ভাব নিয়ে আমাদের কর্মযোগ পথ চলা শুরু হয়। তারপর আমি করছি এই কর্তার ভাব ছেড়ে কর্ম করতে হবে। তখন হয় যন্ত্র হয়ে

বা নিমিত্ত হয়ে কর্ম করা। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে নিমিত্ত হতে বলেছিলেন তাঁর সংহার কর্মে। তিনি পূর্বেই যাদের নিহত করে রেখেছেন, তাঁর সেই সিদ্ধ সংকল্পশক্তি কালের গতি অনুযায়ী কার্যকর করে তুলে তাদের নিহত করা—সেই ভাবের ফলিত কর্মই হল নিমিত্ত কর্মের মূল কথা। কর্মের গতিতে আমরা পরপর চারটি অবস্থা দেখতে পেয়েছি। "অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে"—এই আমি কর্তাই প্রাকৃত কর্মের কর্তা। আমার কর্তৃত্ব নেই, তবুও মনে করি যে আমিই কর্তা। তা থেকে যখন বুঝতে পারি যে প্রকৃতিই কর্ম করিয়ে নিচ্ছে, তখন দেখতে শিখি প্রকৃতিতে কর্ম কি ভাবে হয়ে চলেছে। সেই কর্মে যোগ দিয়ে নিষ্কাম হয়ে কর্ম করতে হবে, ফলের আকাঙ্খা করা চলবে না। তখন কর্মে অকর্ম দেখা বা অকর্তার ভাব পোষণ করে কর্ম করা হবে। তা থেকে আসে নৈষ্কর্ম সিদ্ধি। কিন্তু সেই সিদ্ধিতে বা কর্মে আসক্তি থাকবে না। অকর্তার ভাব বা কর্মে অকর্ম দেখা কর্মযোগের প্রথম কথা; কেননা গুণের অধীন হয়ে চলা যোগের পথ নয়। প্রকৃতিতে তিন গুণের খেলায় কুরুক্ষেত্রের হানাহানি দেখে যাই। তাঁরই ইচ্ছায় দুই পক্ষ হয়ে কৌরব ও পাণ্ডব যেন পরস্পরকে আঘাত করে চলেছে—ঐ হল ঘোর যুদ্ধ কর্ম। তাঁর ইচ্ছা না হলে কিছুই হত না; তখন কিছুই নেই, কিছুই দেখিনা। তাই ঐ যুদ্ধকর্মেও প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে। কাজেই বিশ্বগত ভাবে দেবতাকে না দেখা পর্যন্ত যুদ্ধকর্মে নিমিত্ত হওয়া যায় না। বিশ্বচক্রের এক একটি অর যেন এক একটি জীবের জীবন বা জগৎ, কদম্বকেশরের মতই তারা বিধৃত রয়েছে ঈশাধিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরী মহাশক্তিতে। তাই ব্যক্তির জীবন বিশ্বজীবনেরই অঙ্গীভূত। মূলে তাঁর ঈশনা বা সত্যসঙ্কল্প তাঁর বিশ্বকর্মে আমাকে দিয়েও একটা কিছু কর্ম করিয়ে নেবে। তাঁর সেই সত্যসঙ্কল্পে তিনি অকর্তা থেকেও কর্মের প্রবর্তক ও প্রকৃত কর্তা। এই বোধে কাজ করতে থাকলে অনেক সময় তিনি ও আমি এক হয়ে যায়। সে অবস্থায় গীতা বলেছেন যে দিব্যকর্ম ও দিব্যজন্ম যে জানে সে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কেমন করে তা হয় সে কথা খুলে বলেননি। অর্জুনের কর্মও নিমিত্ত কর্ম, দিব্য কর্ম পর্যন্ত সে কর্মের গতি হয়নি।

শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগের শেষে ঐ কথাই বলেছেন যে দিব্যকর্মের রহস্যও জানতে হবে। নিমিত্ত কর্মেরও পর পর কয়েকটি অবস্থা আছে। প্রথম দিকের ভাব হল আমি তাঁর যন্ত্র হয়ে যাই, তাঁর হাতের বাঁশী। কিন্তু শুধু যন্ত্র হয়েই তো আমি থাকিনা। তাঁর হাতের বাঁশী যখন তিনি বাজান তখনতো বাঁশীই সুর হয়ে বয়ে চলে। বাঁশী থেকে সুর তখন আর ভিন্ন থাকে না। এই রূপান্তরের অবস্থা বিশ্বগত ভাবেরও অতীত, তাকে ছাপিয়ে চলে। অতিমানস রূপান্তরের কথা তখন আসে। তার পূর্বের অবস্থায় নিমিত্ত কর্মে সালোক্য মুক্তি পর্যন্ত লাভ হলেও সাযুজ্য আসেনি। সেই অবস্থা চলতে থাকলে তাঁর শক্তির অবতরণ হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তা নিয়ে যায় পরিপূর্ণ ভাবে রূপান্তরের পথে। তাই তাঁর হাতের যন্ত্র তাঁর রসনির্যাসের ফোয়ারা হলেও পুরোপুরি আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হয় না। যন্ত্রের অনেক গোলমাল দেখা দিতে পারে। এই 'আমি'টা বড় বেয়াড়া, যন্ত্রের অহঙ্কারের ভাব এসে

তখন আসক্তি দেখা দিতে পারে। তাঁর সালোক্যে পৌঁছেও "আমি তোমার হাতের বেণু হয়েছি, আর তো কেউ হতে পারেনি, এই রকমের এক সূক্ষ্ম দুর্ভেদ্য অহং-গ্রন্থিতে আটকে যেতে হল, এমনও হয়। রবির তাপে তপ্ত বালির মত অসহ্য উত্তপ্ত এক অহঙ্কারে খখ চলা বন্ধ হয়ে গেল, সে অবস্থাকে পেরিয়ে যেতেই হবে। এই রকম সব ফাঁক সব আড়ালই শেষ পর্যন্ত পেরিয়ে যেতে পারলে দিব্য কর্মে পৌঁছান যাবে। একেবারে তিনি হয়ে যেতে হবে। দিব্য কর্মের অবস্থায় অহংএর কোন চিহ্ন আর আলাদা হয়ে থাকতে পারে না। ঘটে-ঘটে বিরাজ করে শুধু তিনিই কর্ম করে চলেন। কর্মযোগের পরাগতি বা কাষ্ঠা হল এখানেই। *

(ক্রমশঃ)

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

চেরী ফুল*

শ্রীমা

একটা বিপুল একাগ্রতা আমাকে অধিকার করল,
আমি দেখতে পেলাম একটি চেরী ফুলের সঙ্গে
আমি একাত্ম হয়ে গিয়েছি।
তারপর ফুলটির ভিতর দিয়ে
যাবতীয় চেরী ফুলের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেলাম।
তারপর চেতনার আরো গভীরে নেমে গিয়ে,
একটা নীলাভ শক্তির স্রোতে চলে,
আমি হয়ে উঠলাম একেবারে চেরী গাছটিই,
আকাশের দিকে আমার বাহুরই মত
শাখা সব পুষ্পার্ঘ্যভার নিয়ে প্রসারিত।...

---

* 'ধ্যান ও প্রার্থনা'—এপ্রিল, ১৯১৭ থেকে

নীল বিহঙ্গ*

শ্রীঅরবিন্দ

দেবতার বিহঙ্গম আমি তাঁরই নীলিমায়;
দেবোপম উদাত্ত ও স্পষ্টকণ্ঠে
আমি গাই সত্য ও মাধুর্যের গান
দেবতা আর দেবদূতের শ্রবণরঞ্জনে।

মরণশীলের মর্ত থেকে অগ্নির মতো আমি উঠি
অশোক আকাশে
আর তার দুঃখার্ত জন্মভূমির 'পরে ঢালি
পরমোল্লাসের অগ্নিবীজ।

আমার পক্ষদ্বয় উড়িয়ে নেয় স্থানকালের ওপারে
অম্লান আলোকে;
শাশ্বতের আনন্দ-ঝরা আনন্দ আনি আমি
আর পরমাত্মার দৃষ্টির বরদান।

আমার পদ্মরাগ-নয়ন দিয়ে পরিব্যাপ্ত করি বিশ্বভবনের;
জ্ঞানতরুতে এসে বসেছি
নন্দনকাননের পারিজাতসম্ভারে তা ঢাকা
আনন্দের স্রোতস্বিনীদের পাশে।

আমার অনন্ত হৃদয়ের কাছে কিছুই গোপন নেই;
মন আমার অকূল নিস্তব্ধ;
আমার গান রভসের রহস্যময় শিল্প,
আমার নতচারণ অমর এষণা।

---

* Poems : Past and Present—"The Blue Bird."

প্রদীপ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রদীপ হয়নি জ্বালা অসীম অন্ধকারে—
তারে দাও তোমার প্রভাত-প্রেম ও প্রাণের আগুন,
জাগানো প্রদীপ জ্বলে দুলে উঠল।

প্রদীপশিখা এখনো ভীরু ম্লান—
তারে দাও তোমার গাঢ় আনুগত্য আর নির্মল প্রতিশ্রুতি,
দীপশিখা হল লেলিহান ভাস্বর।

অগ্নিশিখার ঊর্ধ্বগতি তবু দ্বিধাচ্ছন্ন মন্থর—
তারে দাও তোমার আকুল অভীপ্সা আর অটল বিশ্বাস,
দৃঢ় খরগতি হল এখন অনলশিখা।

অগ্নিশিখা অক্লান্ত ধেয়ে চলে নিরন্তর ঊর্ধ্বে—
তার ভিতরে ডেকে আনো ওপার থেকে ভগবৎ কৃপা,
প্রদীপ হয়ে উঠল স্বয়ং সূর্য।*

---

* To the Heights—XLII

মা

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

কাছে থাকো, দূরে যাও
অবিরত সে তোমার পাশে
অমল হাতে হৃদয় ছুঁয়ে
দুঃখ-রাত ভরে কী আশ্বাসে।

কাতর বুকে চরণ বাজে
অন্ধকারে ধুলো-কাদায় ঘরে
আকুল হলে তিনি কাঁদেন
দুঃখ তোলান সে কোন্ মন্তরে!

তার অনলিন ভালবাসায়
যেন অযুত আনন্দ ফুল ফোটে
স্বপ্ন পারের অমর্ত-লোক
নাটির ঘরে মূর্ত হয়ে ওঠে।

তখন যেন জলে স্থলে
গোপন বুকের কাছে
চিরকালের সুরেশ্বরী
মা যেন এই হৃদয় ভরে আছে।

শ্রীঅরবিন্দের সমাধিতে

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

সারাক্ষণ বুকে বাজে নাম
সে চলেছে জানাতে প্রণাম
সুগভীর হৃদয় অতল
ফোটে যদি অরূপ কমল!
যেখানে গহনে বহমান
এক মহা নীরবের গান।

মৌন-কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ
প্রার্থনার; হৃদয়ে তখন
সুরভিত নামেন ঈশ্বর
সেখানে যে দেবতার ঘর—
ছায়া দেয় পেল্‌টোফোরাম
খরতপ্ত প্রাণের আরাম।

দূরের ঘন্টার ধ্বনি বাজে
বলে মগ্ন হও তার কাজে,
পূর্ণ করো শূন্য রাত্রিদিন
এ দুর্লভ নরজন্মে
রেখো মনে ঈশ্বরের ঋণ

গান

অরুণা দেবী

অন্তর যদি জীবন-বীণাটি সঁপিতে কখনো চায়
ভালোবেসে তার সকল তন্ত্রী বাঁধো কি নিপুণতায়;
দিই না বাঁধিতে তোমারে যে তার
সেই তো বেসুরে তোলে ঝংকার;
তোমার পরশ-বঞ্চিত ক'রে সুরহীন করি তায়।

তোমার চাওয়ার অন্তর-শিখা নিশ্চল যদি হয়
তরঙ্গময় জীবন জলধি হলেও নাহি তো ভয়;
দুর্যোগে তার ছেঁড়ে যদি পাল
তবু জানে তুমি ধরে আছ হাল,
অশান্ত মন লভে প্রশান্তি বসিয়া চরণ-ছায়।

আমার সকল সত্তায় কবে হবে না সর্বেসর্বা
তোমার পরশে সকলি আমার হবে হিরণ্যগর্ভা;
শুধু তব নাম বিরাম-বিহীন
বাজাবে আমার এ-জীবনবীণ,
আকুল প্রণতি হ'য়ে প্রতি কণা লুটাবে তোমার পায়।

আলোক ও আঁধার

সুধীর চৌধুরী

এ-পারে আঁধার ও-পারে আলোক ; আলোক ডাকিছে আঁধারে—
এসো হে আঁধার মম বক্ষের অতল অসীম পাথারে ;
আমার পরশে ঘুচে যাবে তব অন্ধ বন্ধ কালিমা,
আমার অসীমে মিশে গিয়ে পাবে রূপান্তরের মহিমা।

আলোর আহ্বানে থরথর করি আঁধার উঠিল কাঁপিয়া—
কি সর্ব্বনাশ হবে যে তাহার, রোষে সে উঠিল ফাঁপিয়া,
রাজ্য তাহার হবে ছারখার জ্যোতির প্রলয়-পাবকে,
এপার ভরিবে সুষমা-ছন্দে আলোর ঝলকে ঝলকে !

ভাবিল আঁধার—রেখেছি যাদেরে এতদিন মম অঙ্কে,
এতকাল যারা ছিল শঙ্কিত আমার শাসনাতঙ্কে,
যাদেরে রেখেছি অচিতি-গর্ভে ভ্রান্ত বিকল করিয়া,
তারা যে এখন এ পারে তুলিবে জ্যোতির স্বর্গ গড়িয়া।

তাই ভয়ে ভয়ে আলোকেরে ডাকি কহিল আঁধার এ-পারে—
প্রয়োজন তব নাহি হেথা মম, এসে কিবা ফল এধারে ?
আমি আছি সুখে আপন সীমায়, যাচিনা তোমার স্পর্শ
তৃপ্তি আমার মলিনতা লয়ে, চাহিনা আলোর হর্ষ।

আমি রহি সদা রসাতলতলে, সাথী মম মহারাত্রি
আমার অন্তবাসীরা হেথায় মৃত্যুপথের যাত্রী ;
স্বভাব আমার তিয়াসাতাড়িত বঞ্চনা আর ছলনা,
আমার আঁচলে বেঁধে রাখি সবে এই মোর চির কামনা।

শৃঙ্খলাহারা রাজ্য আমার কদর্য্যতার মূল্য
সবচেয়ে বেশী, তোমার কীর্ত্তি হবে না আমার তুল্য।
মম ছায়াতলে মোহমায়াবলে করেছি রাজ্য রচনা ;
আমার প্রভাবে সুসঞ্জীবিত আসুরীশক্তিসাধনা।

মন রাজত্বে নিত্য চলেছে স্বৈরাচারীর নৃত্য,
স্বেচ্ছাচারীর রিপু-উৎসব ; প্রভু হয় হেথা ভৃত্য।
এই বুলবুকে যে পারে সে রাজা, যে পারে সে হয় নম্রী ;
যদি কেহ থাকে আলোর পিয়াসী সে হয় শ্রীঘরে বন্দী।

তিনিরবাসীরা মাথা দিয়ে হাঁটে, চরণ উপরে করিয়া
চরণে হাঁটার যে সে তো ধন্য নৃত্যদণ্ড বহিয়া।
যাহা করিবার কেহ নাহি করে, বোঝে বিপরীত সকলে :
মানুষের পূজা দাবী করে ষাঁড় বিভোলা শিবের বদলে।

আমি নির্মম সবারে হেথায় মন মায়াজালে বেঁধেছি,
যুগ যুগ ধরি কি জানি কেন গো কার লাগি আমি কেঁদেছি,
বুঝিল না কেহ বেদনা আমার, তাই কেটে মন মুণ্ড,
আপন রুধির করিতেছি পান সৃজিয়া নরককুণ্ড।

গ্রাসিব তোমারে রাহুগ্রাসেতে যে আলোক মন জঠরে ;
নিবে যাবে তব স্বর্ণ শিখা, রহিবে না হাসি অধরে,
থেমে যাবে তব বাঁশরীর সুর, ধ্বনিবে না তব শঙ্খ,
চির বিভাবরী মহারূপ ধরি বাজাবে বিজয় ডঙ্ক।

কহিল আলোক অন্ধকারেরে—এসো মোরে তবে গ্রাসিতে,
তোমার তিনির কান্তি মিলাও আমার স্নিগ্ধ হাসিতে।
তাই তো তোমারে ডাকিতেছি আমি মিলিতে আমারি সঙ্গে,
সোনার পরশ দিব মাখাইয়া তোমার কাজল অঙ্গে।

এ-পার ও-পার এক করে দিতে উঠিয়াছি আমি ফুটিয়া
ঘুনন্ত যারা জাগাবো তাদেরে তোমার কালিমা টুটিয়া
তব অঙ্গ তুলিব ভরায়ে অমৃত সুধার প্রসূনে,
জীর্ণতা তব দিব ঘালাইয়া আমার উদার আগুনে।

তুমি পাবে মন দীপ্ত উষার সোনার হাতের মালিকা,
হবে যে আমার পীযূষধারার মুক্ত মধুর বাহিকা,
আপন হইতে হইয়া মুক্ত মিশে যাবে মন কায়াতে,
চিরসুন্দর উঠিবে বিকাশি তোমার শ্যামল ছায়াতে।

চাহিনা আলোক-সম্পদ তব—কহিল আঁধার গর্বে,
আমি আছি বেশ আমারে লইয়া, জানে এ-পারের সর্বে।
শত জ্বালা লয়ে, শোক-উচ্ছ্বাসে মরি যদি আমি মরিব;
মহানিদ্রায় রাখিব সবারে, অন্তরে প্রাণে ধরিব।

তিমির-উক্তি শ্রবণে হাসিল হিরণ-আলোক নীরবে
কহিল—আঁধার ডাকিনা তোমারে তুচ্ছ মোহের আহবে,
দেরী নাই আর দম্ভ তোমার হয়ে যাবে এবে চূর্ণ
শূন্যতা তব মন বৈভবে করে দেব আমি পূর্ণ।

তোমা আমা মাঝে কালো যবনিকা যাইবে এবার ঝরিয়া;
এপারের ছায়া আলোর কায়ায় নীরবে উঠিবে ভরিয়া।
চাহ বা না চাহ, তোমার প্রভাব রহিবে না আর বিশ্বে
আলোকের ছবি উঠিবে ফুটিয়া নিখিলের সব দৃশ্যে।

স্বর্ণ-আলোক হাসিয়া হাসিয়া আপনারে দিল ধ্বসারি—
এ-পার ও-পার বক্ষ ভাঙিয়া আধারে ধরিল আবরি,—
আলোর পরশে ভেঙে গেল এবে অন্ধকারের সুপ্তি;
আধারের বুকে জ্যোতির বিভাসে আঁধার লভিল মুক্তি।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জনৈক যুক্তিবাদী সমালোচক

শ্রীঅরবিন্দ

আমাদের সামনে তাহলে প্রশ্ন আমাদের এই সাধারণ মনুষ্যজীবনকে দৃঢ় ও মহৎ করে তুলতে ভারতীয় সংস্কৃতির সামর্থ্য আছে কি না। লোকাতীত আদর্শের কথা বাদ দিয়ে, জীবনকে সম্প্রসারিত ও তার সঠিক নিয়ন্ত্রণের জন্য এর কোনো কার্যকরী অসন্ন্যাসী সক্রিয় মূল্য আছে কি? মূল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই। যদি এসব তার কিছুই দেবার না থাকে তাহলে এর অন্য যতই সাংস্কৃতিক মহত্ত্ব থাক, তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। এর অবস্থা নিম্নাল্প উপদ্বিপের কোলে হিমালয়ের এপারে তাপনিয়ন্ত্রিত কাঁচঘরের ডৌলুসের মতো, ক্রুরধার দুঃসহ বাতাসে ও আধুনিক জীবনদ্বন্দ্বে তার বিনাশ অনিবার্য। প্রবল প্রাণচ প্রেরণা কিম্বা উদ্দীপনাশূন্য একটা অতিশয় মানসাশ্রয়ী বা অতিসূক্ষ্ম সভ্যতা রসরক্তের অভাবে শুকিয়ে যাবেই। একটা সংস্কৃতিকে স্থায়ীভাবে ও পুরোপুরিভাবে মানুষের কাছে লাগাতে হলে এমন জিনিস তাকে দিতে হবে যা যাবতীয় পার্থিব জীবন-মূল্য ছাড়িয়ে বিশ্বাতীতের দিকে উঠে যাবার একটা বিরল প্ররোচনার চেয়ে বেশি কিছু। একটা জীর্ণ স্থবির দয়ালু সমাজের দীর্ঘায়ু বা সুনিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যটাকে জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন-ঔৎসুক্যের অনুসন্ধিৎসা কিম্বা কলা কাব্য স্থাপত্যের বর্ণালোক ও চকমকিতে সাজিয়ে দেবার চেয়েও বেশি কিছু তার কর্তব্য। এসব তো অতীতে ভারতীয় সংস্কৃতি বেশ চুটিয়েই করেছিল। প্রগতিশীল প্রাণশক্তির কাছে পরীক্ষায়ও তার পাশ হতে হবে। মানুষের পার্থিব প্রয়াসের পেছনে চাই একটা প্রেরণা, একটা লক্ষ্য, একটা উৎসাহ, একটা উন্নতির শক্তি ও ভিত্তীবিদ্যা। আমাদের লক্ষ্য যে একটা নীরবতা ও নির্বাণ, একটা আত্মিক পূর্ণ বিরতি বা স্থূল মৃত্যু, তা সত্য অথবা মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু একথা নিশ্চয় নির্ভুল যে এই বিশ্ব স্বয়ং এক বিরাট প্রাণাধার প্রয়াস এবং পৃথিবীতে মানুষ যে বর্তমানে সন্দেহজনক দীর্ঘস্থায়ীত্ব সে-ই তার প্রয়াস বা নাটকের আপাতত বিফল নায়ক বা মুখপাত্র। এক মহান মানব সংস্কৃতি এই সত্যকে কিছু সার্থক করে তুলবে; এই উর্ধ্বমুখী প্রয়াসে ফলবতী হবার কিছু চেতনা ও আদর্শ শক্তি সে সঞ্চারিত করবে। জীবনের একটা স্থির ভিত্তি প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, তার অলঙ্করণও যথেষ্ট নয়, তাকে ছাড়িয়ে দূরে কোনো চূড়ায় চমৎকার উড়ে যাওয়াটাই যথেষ্ট নয়; মর্তে জাতির মহত্ত্ব এবং উন্নতিও সমান চিন্তার বিষয়। এই অন্তর্বর্তী মহান বাস্তবতাকে না দেখতে পাওয়া একটা চরম ত্রুটি এবং ব্যর্থতারই চিহ্ন।

আমাদের সমালোচক অবশ্য বলবেন যে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বাঙ্গেই তো শুধু এই ব্যর্থতার ছাপ। পাশ্চাত্যের ধারণা হিসুর্মে নির্ভেজাল আত্মিক ও পারলৌকিক সমস্যা

নিয়ে স্বপ্নবিভোর, যাও এবং ঐহিক সম্পূর্ণ বিস্মৃত; জীবনের নশ্বরতাবোধজনিত হতাশা কিম্বা অনন্তের মাদকতায় বিভোল সে মানুষী অভীপ্সার এবং পার্থিব প্রয়াসের মহত্ত্ব বীর্য ও ঔদার্যের প্রতি বিমুখ। হয়ত তার দর্শন উচ্চাঙ্গ, তার ধর্মপ্রবণতা প্রখর, তার প্রাচীন সমাজব্যবস্থা দৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ ও স্থায়ী, তার সাহিত্য ও ললিতকলা স্বকীয়ভাবে সুন্দর, কিন্তু প্রাণের স্বাদ তাতে নেই, নেই ইচ্ছাশক্তির খরশ্বাস, জীবন্ত প্রয়াসের দাপট। এই সাংবাদিক ধূমকেতু আপোলো, আমাদের ধনুর্ধর আর্চার যিনি শরাঘাতে ভারতীয় বর্বরতার অন্ধকার-কুণ্ডলী ছিন্নভিন্ন করতে উদ্যত, এই ধরণের চীৎকারে মুখর। সত্যিই যদি তাই হয় তাহলে ভারত মহৎ কিছুই করেনি, মানব জীবনে আনেনি কোনো সঞ্জীবনী শক্তি, ধরেনি কোনো মহানতা ব্যক্তি, কোনো শক্তিমান ব্যক্তিত্ব, কোনো প্রবল উল্লেখযোগ্য জনস্রোত, কাব্যে ও চারুশিল্পে দেয়নি কোনো প্রাণবন্ত মানবমূর্তি, গড়েনি উল্লেখযোগ্য কিছু স্থাপত্য বা ভাস্কর্য। আর শয়তানের নিপুণ ভাষায় আমাদের উকিলটি ঠিক এই কথাই বলছেন। তিনি বলছেন যে এই ধর্ম ও দর্শনে জীবন ও প্রয়াসকে মোটামুটি একটা নেকনজরেই দেখা হয়েছে। জীবন সেখানে নাঝসমুদ্রে লক্ষ্যহীন অসহায় তরঙ্গমালার মতো বংশানুক্রমে ওঠা-পড়া নিয়ে অকূল বিস্তার; ব্যক্তি সর্বত্র ক্ষুণ্ন ও খর্বিত; বিশ্বের মহামেলায় ভারতের একমাত্র অবদান একটি বিরাট পুরুষ, গৌতম বুদ্ধ, যিনি হয়ত ছিলেনই না, আর বাকির মধ্যে নিষ্প্রভ নিরাকার অশোক। নাটক ও কাব্যের চরিত্রগুলি নিষ্প্রাণ অতিরঞ্জন কিম্বা অতিপ্রাকৃত শক্তির পুতুল, শিল্প বাস্তবতাশূন্য; সভ্যতার আদ্যোপান্ত ইতিহাসটিই নিরস নির্জীব বিবর্ষের প্রতিচ্ছবি। এই ধর্ম এই দর্শনে জীবনীশক্তি নেই, এই শিল্প এই কাব্যে কোনো প্রাণের রঙ নেই; ভারতীয় সংস্কৃতির এই হল শূন্য ফল। তবে যে কেউ স্বয়ং দেখেছে ও চিনেছে এই সাহিত্য, অনুসরণ করেছে ইতিহাসের ধারা, অনুসন্ধান করেছে ভারতীয় সভ্যতা, সেই বুঝতে পারে এ এক দারুণ মিথ্যাভাষণ, একটা দুর্দান্ত ক্যারিকেচার, নির্জলা অসত্য। কিন্তু এ হল প্রায়শ য়ুরোপীয় মনের ওপর ছাপ ফেলার নিরঙ্কুশ ও নির্বিবেক পন্থা এবং আগের মতো এখানেও আমাদের ধরতে হবে একই জিনিস কেন নানা চোখের কাছে নানা রঙ ধরে। গোড়ায় সেই একই প্রাথমিক ভুলবোঝাবুঝি। ভারতবর্ষ ঐশ্বর্যের জীবনও যাপন করেছে, জৌলুষের মহত্ত্বেরও, তবে য়ুরোপের চেয়ে ভিন্ন উদ্দেশ্যে। তার জীবন চিন্তা ও পরিকল্পনা তার বিশিষ্ট মতিগতির অনুযায়ী, মৌলিক এবং স্বকীয়। বিদেশীর পক্ষে তার মূল্য বোধ সহজ নয় এবং তার সমুচ্চতম সব জিনিস মূর্খের হাতে সহজেই বিকৃতরূপায়িত হতে পারে, বিশেষত সাধারণ অপরিশীলিত মনের নাগালের বহু উর্ধ্বে এ সব এবং তার আয়ত্তের বাইরেই থেকে যায়।

একটা সংস্কৃতির জীবনমূল্য যাচাই করতে গেলে তিনটি শক্তিকে চিনতে হবে। প্রথমে, তার প্রাণ সম্পর্কে মৌল ধারণার শক্তি; তারপর, প্রাণ যে দিয়েছে আকৃতি রূপ ছন্দ তাদের শক্তি; শেষে রয়েছে তারই প্রভাবে পুষ্ট মানুষের ও সমাজের বাস্তব জীবনে ধৃমর্ত যে এক প্রেরণা, বীর্য, তার উদ্দেশ্য-সাধনকারী প্রাণিক প্রয়োগের শক্তি। জীবন সম্বন্ধে

য়ুরোপীয় যে ধারণা তার সঙ্গে হালফিল আমরা বেশ পরিচিত, কারণ আমাদের চিন্তা ও প্রয়াসের মধ্যে যখন তার অস্তিত্ব নেই তখন তার ছায়াটা বেশ জাপটে ধরেছে। আমরা তো এরই কিছু পরিধঃকরণের চেষ্টায় পরদুষর্ন, এমন কি চেয়েছি নিজেদের ঢেলে সাজতে, বিশেষ করে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং স্থূল কর্মকাণ্ড রচনা করতে এরই রূপ ও ছন্দের আংশিক অনুকরণে। য়ুরোপীয় ভাবনায় বিধৃত জড়বিশ্বে প্রকট একটা শক্তি, এক প্রাণ যার অর্থ প্রস্ফুটিত শুধু মানুষের মধ্যে। অচেতন যান্ত্রিক প্রকৃতির বিপুল শূন্য নিরর্থকতার ওপর বিজ্ঞানের আধুনিক জোর এই মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কিছু অদল-বদল ঘটায়নি। আর মানুষের, প্রকৃতির এমন অসাড় ভাষায় যে অতুলনীয়, জীবনে সমস্ত প্রয়াসই হল একটা আলোয়, জ্ঞানের সামঞ্জস্যে এবং শৃঙ্খলাতৎপর যুক্তিতে পৌঁছান, কোনো সুদক্ষ যুক্তিসঙ্গত শক্তিতে, সুশোভন সৌন্দর্যে, সবল কার্যকারিতায়, জীবন-সম্ভোগে, অর্থনৈতিক কল্যাণে পৌঁছান। ব্যক্তিগত অহমের মুক্ত শক্তি, সমষ্টিগত অহমের সংঘবদ্ধ ইচ্ছাবল, এরাই হল প্রয়োজনীয় শক্তি। য়ুরোপীয় আদর্শে যে দুটি জিনিসের কদর তা হল একক ব্যক্তিত্বের পরিপুষ্ট এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ সপাটু জাতীয় জীবন। এই দুটি শক্তিই বড়ে উঠেছে, সক্রিয় হয়েছে, এক এক সময়ে প্রবল রূপ নিয়েছে—য়ুরোপের অস্থির এবং প্রায়শ উত্তাল ঐতিহাসিক আন্দোলনের প্রাণোচ্ছাস এবং সাহিত্যিক ও শৈল্পিক সজীবতার মূলে এই দুয়ের সংমেল বর্ণ। প্রাণশক্তির লীলাস্বাদ, অহংগত কামনার উদ্দামতা এবং প্রাণজ সম্ভোগ সেখানে অবিচ্ছিন্ন তীব্র সুর, চিরমুখর উদ্দেশ্য। তার বিপক্ষে আবার অন্য আর এক বিরুদ্ধ প্রয়াস—যুক্তি বিজ্ঞান সদাচার শিল্পকলা দিয়ে জীবন নিয়ন্ত্রণ; একটা রাশটানা সামঞ্জস্যের কার্যকারিতা এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। এক এক সময়ে এক এক ধারা প্রাধান্য পেয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্মাচারও এসে নতুন সুর জুড়ে দিয়েছে, বাড়িত করেছে কতকগুলি প্রবণতা, কতকগুলিকে দিয়েছে গভীরতা। প্রত্যেক যুগ প্রত্যেক কাল এই মিলনৈশ্বর্যের প্রতিটি ধারা ও বেগকে উপচিত করেছে, পূর্ণ ভাবমূর্তিটির জটিলতা ও বিশালতা এনে ধরেছে। বর্তমানে সমবেত জীবনের বোধটি প্রধান এবং তারই অনুষঙ্গ ভাব হল বুদ্ধিগত ও পার্থিব উন্নতি, বিজ্ঞান-চালিত একটা উন্নত রাজনীতিক ও সামাজিক অবস্থা। এক আদর্শ আছে বুদ্ধিদীপ্ত কার্যকারিতা, স্বাধীনতা এবং সাম্যের, আর এক আদর্শ আছে নিরন্ধ্র সংঘবদ্ধতা এবং পটুতার ও জনকল্যাণের দিকে পরিপূর্ণ উন্মুক্ত ও সতর্কভাবে চালিত শক্তির সব ধারা নিয়ন্ত্রণ টেনে মিলিয়ে ধরার। য়ুরোপে এই প্রয়াস স্পষ্টত দারুণ বহির্মুখী এবং যান্ত্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু অধিকতর মানবতার আদর্শের একটা পুনরুজ্জীবিত শক্তি আবার আসছে এবং অচিরেই হয়ত মানুষ তার উপর বিজয়ী নিজেরই যন্ত্রের চাকায় বাঁধা থাকতে ও হাতিয়ারের বশীভূত হতে অস্বীকৃতি জানাবে। যা হোক, সম্ভবত অন্তর্যান একটা ধারার ওপর অত জোর দেবার প্রয়োজন নেই। য়ুরোপের প্রশস্ত ও স্থায়ী জীবন-দর্শন থেকেই গেল এবং নিজের নানা অপূর্ণতা সত্ত্বেও তা একটা মহৎ ও তারুণ্যের দর্শন, চূড়ার দিকে অপূর্ণ ও সংকীর্ণ, তারা আবরণে ঢাকা, অপ্রসর দিগন্ত, বৃত্তিকাংশ বড় বেশি, অথচ তারই মধ্যে একটা প্রযত্নের একটা কিছু মহত্ত্বের বোধ।

ভারতীয় জীবন-ভাবনার উৎস আরো গভীরে, পথও অত স্থূল নয়, লক্ষ্যও সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতীয় ভাবদৃষ্টির বিশেষত্ব হল অবয়ব ছাড়িয়ে দেখা, শক্তিরও পিছনে দেখা, সর্বত্র আত্মার সন্ধান। জীবনে ভারতীয় এষণার বৈশিষ্ট্য হল নিজেকে অসার্থক বোধ করা, পূর্ণতার থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করা, আপাতিক কোনো তৃপ্তিতে চিরনশ্চল না থাকা, যদি না সেই আত্মার সত্যটি পাওয়া ও জীবনে ধরা যায়! বিশ্ব প্রকৃতি সৃষ্টি সম্বন্ধে ভারতীয় ধারণা যে এরা জড় নয়, মনলৌকিক ও আধ্যাত্মিক। চিৎ, আত্মা, চেতনা, অসাড় জড় এবং অচেতন শক্তির চেয়ে শুধু বড়ই নয়, এই ছোটদের আবার অগ্রজ ও উৎস। সব বল হল এক আত্মার শক্তি বা উপায়, ; বিশ্ববিধাত্রী শক্তি এক সচেতন এষণা, প্রকৃতি তার কর্মসাধন-শক্তির যন্ত্র ;জড় হল ভিতরে প্রচ্ছন্ন এক চেতনার আধার বা ক্ষেত্র, পার্থিব চরাচর একমের অবয়ব ও গতিবিভঙ্গ। মানুষ স্থূল প্রকৃতির চিরদাস জড়োদ্ভূত একটা প্রাণ-মন নয়, বরং প্রাণ ও দেহের কর্তা আত্মাটি। বিশ্ব ধারণায় এই গ্রহিষ্ণু বিশ্বাস, জীবনে একে ফলিয়ে তোলা, এই মহাপ্রয়াসের শিল্প ও বিজ্ঞান, প্রাণ ও জড়ের সঙ্গে বাঁধা শৃঙ্খল ছিঁড়ে পেয়ে মনের এক বৃহত্তর আধ্যাত্মিক চেতনায় প্রবেশের আস্পৃহা—ভারতীয় সংস্কৃতির এই-ই হল নিহিতার্থ। বহুকথিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার এই হল পরিচয়। স্পষ্টত অবরুদ্ধ য়ুরোপীয় ভাবনার থেকে এই জিনিস বহু দূরে ; য়ুরোপ যে খ্রীষ্টীয় জীবনদর্শনের রূপটি দিয়েছে এ-জিনিস তার চেয়েও ভিন্ন। তবে একথার অর্থ নয় ভারতীয় সংস্কৃতি জীবনকে বাস্তবতা দেয়নি, কোনো পার্থিব প্রাণিক উদ্দেশ্য ও তৃপ্তি চায়নি, প্রত্যক্ষ মানবজীবনের কিছু ধার ধারে না। এরকম ধারণা মানুষের বাস্তব প্রয়াসে কোনো প্রবল প্রদীপ্ত উদ্দীপনাই জোগাতে পারে না, তা বলা চলে না। এই দৃষ্টিতে জড় মন প্রাণ যুক্তি আকৃতি অবশ্যই আত্মার তেজ এবং তাদের স্বার্থে মূল্যবান নয়, কিন্তু মূল্যবান অন্তরস্থ আত্মার্থে আত্মার জন্যই তাদের অস্তিত্ব—বলেছে উপনিষদ, এসব ব্যাপারে ভারতীয় মনোভাব এই রকমই। তা-বলে তাদের দাম কমে বা উবে যায় না ; বরং তাদের তাৎপর্য সহস্রগুণ বেড়ে যায়। আকৃতি ও অবয়বের দর বহুগুণ বেড়ে যায় যদি জানি আত্মার স্বভাবে জারিত তারা, তারই কর্ম ছন্দের তারা অনুসরণ। আর প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় মানুষী জীবন তো কলমষের হতাদরের কিছু ছিল না ; আমাদের জাত শ্রেষ্ঠ জিনিস এটি, স্বর্গে দেবতাদেরও বাঞ্ছিত বস্তু—বলেছে দৃপ্তভাষী পুরাণ। আমাদের মন হৃদয় প্রাণ-বীর্যের গুপ্তশক্তিগুলি গভীরতর করা এবং জাগিয়ে তোলা সেই উপায় যার দ্বারা চিৎপুরুষ পায় তার আত্মপরিচয়, ফিরে যায় তার নিজস্ব মুক্তি ও শক্তির অসীম বিস্তারে। মন হৃদয় যুক্তি যখন তাদের শ্রেষ্ঠ জ্যোতি ও সামর্থ্যে পৌঁছায় তখন তারা দেহাশ্রিত জীবনটি এমন এক পর্যায়ে এনে ধরে যেখানে তাদের ছাড়িয়ে বৃহত্তর জ্যোতি ও সামর্থ্যের দিকে নিজেকে খুলে দিতে পারে ; ব্যষ্টিমন প্রসারিত হয় এক বিরাট বিশ্বচেতনায় এবং নিজে উঠে চলে এক সমুচ্চ আধ্যাত্মিক উত্তরণে। এসবকে অন্তত বন্ধ্যা ও মননরা ভাব বলা চলে না ; মানুষের জীবনকে এরা রসিয়ে তোলে এবং দেবত্বের মতো জিনিসটিকে যুক্তিযুক্ত পরিণাম হিসাবে এনে দেয়।

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈদান্তিক চিন্তা ও ক্লাসিকাল যুগের ভাবনা মানুষী জীবনকে যে

মহিমা দিয়েছে তা য়ুরোপের সব মানবতার ভাবনাকে ছাড়িয়ে যায়। পাশ্চাত্যে মানুষের চিরপরিচয় প্রকৃতির কোলে নশ্বর জীব মাত্র বলে কিম্বা খেয়ালী স্রষ্টার জন্মদানার্থে নিঃসৃত নিঃশ্বাস বলে, মুক্তির অনতিক্রম্য শর্তের বেড়ায় ঘেরা সে—তবে নরকের আবর্জনারূপে নিতান্ত ব্যর্থ হিসাবে সহজেই নিক্ষিপ্ত হবার এখন বেশ উপযুক্ত। বড়জোর ভগবান বা প্রকৃতির তৈরী বস্তুর চেয়ে মন ইচ্ছা প্রয়াসের কল্যাণে উন্নততর কিছু সে। এর চেয়ে অনেকটা বেশ মহত্বকর উদ্দীপনাময়, মহৎ আদর্শের প্রেরণাশক্তিভরা এই আমাদের সামনে উপস্থাপিত ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবটি। এই ভারতীয় ভাবনায় মানুষ হল শক্তির কর্মের আবরণে প্রচ্ছন্ন চিৎশক্তি, সে চলেছে আত্মাবিকাশে; দেবত্বলাভের সামর্থ্য আছে তার। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে আত্মা সে হয়ে উঠছে চেতনস্বরূপ; ভাগবত সে, অবিনশ্বর সে ঈশ্বর-সাগরের অব্যাহত তরঙ্গ সে, পরম অগ্নির অনির্বাণ স্ফুলিঙ্গ। অধিকন্তু নিজের অন্তরতম সত্যে যে অনির্বচনীয় তুরীয় থেকে সে এসেছে তার সঙ্গে অভিন্ন সে এবং পূজিত সকল দেবতাদের শ্রেষ্ঠ। এই মুহূর্তে তাকে মনে হয় যে প্রাকৃত অর্ধ-পাশব জীব তা-ই তার সত্তার সবখানি নয়, তার আসল সত্তা তো নয়ই। তার নিভৃততম সহস্র হল দিব্য পুরুষ কিম্বা অন্ততপক্ষে তার এক সক্রিয় শাশ্বত অংশ, তাকে পাওয়া এবং নিজের বাহ্য প্রকট প্রাকৃত সত্তার উর্ধ্বে উঠে যাওয়ার যে মহত্ব তা লাভ সকল পার্থিব জীবের মধ্যে একমাত্র তারই পক্ষে সম্ভব। মনুষ্যত্বের এক চরম ও অসাধারণ পর্যায়ে উঠে যাবার এক আধ্যাত্মিক সামর্থ্য তার আছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি একেই তুলে ধরেছে তার প্রথম লক্ষ্য বলে। অধিকাংশ মানুষ এখনো যে অপরিণত স্তরে সেই আদিম ক্রূর ধরণের জীবন আর নয়—ন যথা প্রাকৃতো জনঃ—সে হতে পারে মুক্ত সিদ্ধ পর্যন্ত। আরো আছে তার সম্ভাবনা; বিশ্বচেতনার মুক্তিতে উত্তীর্ণ হয়ে অন্তরে সে ঈশ্বরের সাযুজ্য পেতে পারে, বিশ্বাত্মার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে কিম্বা বিশ্বাতীত জ্যোতি ও বিরাটত্বে উঠে যেতে পারে: বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার প্রকৃতিও হতে পারে সেই একই সক্রিয় শক্তি, বিশ্বাতীত বিজ্ঞানময় পুরুষের সঙ্গে একত্বের জ্যোতি। তার চরম সার্থকতা তো চিরদিন অহমের মধ্যে বন্দী থাকাতেই নয়, সে হতে পারে বিশ্বাত্মা, পরম ঐক্যের সঙ্গে অভিন্ন, অন্যের সঙ্গে অভিন্ন, সকলের সঙ্গে এক। তার মানবতার মধ্যে এই মহৎ ভাব ও শক্তিই নিহিত যে এমন পরিপূর্ণ ও তুরীয়কেও সে চাইতে পারে। তার কামনা পূর্ণ হতে পারে স্বাভাবিক শক্তির কোনো একটির বা সকলের মধ্যে দিয়ে, অবশ্য তারা যদি মুক্তি চায়—তার মন, বিচার, চিন্তা এবং তাদের দীপনের মধ্যে দিয়ে, হৃদয় এবং সেখানে প্রেম ও সহানুভূতির অসীম শক্তির মধ্যে দিয়ে, তার ইচ্ছা এবং সেখানে পূর্ণ বিপত্য ও নির্ভুল কর্মের দিকে প্রবল প্রবেগের মধ্যে দিয়ে, তার ধর্মাচারী প্রকৃতি এবং সেখানে বিশ্বকল্যাণের দিকে তৃষ্ণার মধ্যে দিয়ে, তার রূপরসিক সংবেদ এবং সেখানে রস ও সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে কিম্বা তার অন্তরাত্মা এবং সেখানে আধ্যাত্মিক চরম প্রশান্তির শক্তি প্রসার, আনন্দ ও শান্তির মধ্যে দিয়ে।

প্রাচীনতম বৈদান্তিক যুগ থেকে ভারতীয় চিন্তা ও আন্তর তপস্যার আধ্যাত্মিক মুক্তি ও সিদ্ধির এই ছিল মূলার্থ। এই লক্ষ্য যতই দুর্লভ দুর্গম হোক, তা সর্বদা সম্ভাব্যের মধ্যেই

ধরা ছিল এবং এক-রকম কাছের ও স্বাভাবিক পর্যন্ত বলে ভাবা হত যখন একবারটি অধ্যাত্মসিদ্ধি পথটি আবিষ্কার করে ফেলেছে। প্রতীচ্যের জড়বাদী মন এই চিন্তাকে জীবন্ত প্রত্যক্ষ ভাব বলে মনে করতে অক্ষম। সিদ্ধ, ভাগবত, মুক্ত তার কাছে অলীক মায়া। তার খ্রীষ্টীয় স্মৃতির পাশে একে মনে হয় ঈশ্বরের সেই নিঃসঙ্গ মহত্ত্বের পরিপন্থী, যে-ঈশ্বরের সামনে মানুষ ভূমিলেহী ক্রিমি মাত্র, তার প্রাকৃত অহং-আসক্তির পাশে একে মনে হয় ব্যক্তিবিনাশ এবং মারাত্মক বিপদ, তার জড়বাদী যুক্তির কাছে এক স্বপ্ন, স্বয়ং-সম্মোহনের মায়া কিম্বা প্রবঞ্চনার পাগলামি। অথচ প্রাচীন য়ুরোপে স্তোরিকরা, প্লাতনিক পীথাগোরীয় এই অতীপ্সার পথে চলা শুরু করেছিল খানিকটা, এবং পরে কোনো কোনো মহাত্মাও এর দর্শন পেয়েছেন কিম্বা গহনপন্থায় একে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু আবার আজ এটিই পাশ্চাত্য কল্পনায় অলক্ষ্যে ঢুকছে, তবে সক্রিয় জীবনবেদ হিসাবে ততখানি নয় যতখানি ফুটেছে তার কাব্যে, সাধারণ চিন্তার কোনো অংশে কিম্বা প্রাচীন ও প্রাচ্যের রসধারায় পুষ্ট ধিয়সফির মতো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞান দর্শন ধর্ম এখনো একে বিভ্রম বলে অবজ্ঞার চোখে দেখে, স্বপ্ন বলে অনাসক্তি বোধ করে, কিম্বা পৌত্তলিক ঔদ্ধত্য বলে নাকচ করে। ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই হল এই মহৎ সক্রিয় আশাভরসার খুঁটি ধরা, একেই জাগ্রত এবং উপজীব্য করে রাখা, এই পূর্ণ সিদ্ধির আধ্যাত্মিক উপায়ের সকল সম্ভাব্য পথগুলি খুঁজে বের করা। ভারতীয় চিন্তা এই মহান বিষয়কে সকলেরই উচ্চতম লক্ষ্য এবং সকল মানবাত্মার একই আধ্যাত্মিক ভবিতব্য করে দিয়েছে।

জীবন সম্বন্ধে ভারতীয় ধারণার মূল্য অবশ্য নির্ভর করবে সেই সব সম্বন্ধ ও স্তরের ওপর যে-সূত্রে সে এমন দুরূহ ও সুদূর সিদ্ধির সঙ্গে বেঁধেছে এই আমাদের প্রাকৃত জীবন ও বর্তমান দৈনন্দিন স্বভাবকে। তার গন্তব্যে পৌঁছাবার ও তাকে প্রাপ্তির মধ্যে আনবার কোনো যোগসূত্র বা সোপানাবলি না রেখে শেষোক্তের উপরে একে চাপিয়ে দিলে এ হবে একটা অবলেহ্য অলভ্য আদর্শ যার নয়ত গুটিকয়েক মহাজনের নিরাসক্ত নিরালা বিলাস। শুধু তাই নয়, অধ্যাত্ম সত্তা এবং আমাদের নিজের দীনহীন অপূর্ণ প্রকৃতির মধ্যেকার প্রচণ্ড পার্থক্যটির দ্বারাই তা এই স্বাভাবিক জীবনের উৎসকে ব্যাহত করবে। পরবর্তীকালে খানিকটা এই ধরণের ব্যাপারই ঘটেছে; ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের অতিরঞ্জিত কৃচ্ছ্রসাধনা এবং ইহবিমুখিতা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের প্রচলিত মনোভাব পরবর্তীকালের চিন্তাসৃষ্ট মানুষের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা এবং তার পার্থিব পদবীর মধ্যে পার্থক্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমরা যেন অধঃপতনের যুগে যে-সব অত্যুগ্র প্রবণতা এসেছিল তাদের অথবা তাদের ওপর যে অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছিল তার দ্বারা বিভ্রান্ত না হই। জীবন সম্পর্কে ভারতীয় ধারণার সত্যতা ও তাৎপর্য যদি বুঝতে চাই তাহলে অতীতে তার সব সেরা যুগে যেতে হবে। এ-মতবাদের দর্শন বা ও-মতবাদের দর্শনের দিকে দেখলে চলবে না, কিম্বা এদের কারো এক অংশকে ভারতীয় ভাবনার সমস্ত বলে নিলে চলবে না; প্রাচীন দার্শনিক চিন্তার আদ্যন্ত, ধর্ম, সাহিত্য, চিত্রকলা, সমাজ সবই আমাদের বিচার্য বিষয় হবে। ভারতীয়

চিন্তা তার প্রাচীন সুস্থতায় এমন আদৌ ভুল ভাবেনি যে এমন একটা মহৎ জিনিস হঠাৎ অসহিষ্ণু একলাফে জীবনের এক নেরু থেকে অন্য নেরুতে পৌঁছে পাওয়া যাবে। চরমপন্থী দর্শনও অতটা যেতে রাজী নয়। ভারতীয় মনের এক শ্রেণীর কাছে জড়বিশ্বে চিন্ময়ের ক্রিয়াধারাই বাস্তব, আর একশ্রেণীর কাছে আধা-বাস্তব, স্বয়ম্প্রকাশ লীলা অথবা অলীক মায়া। এক মনের কাছে বিশ্ব হল অসীম তেজের—'শক্তির'—ক্রিয়া, আর এক মনের কাছে শাশ্বতের মধ্যে গৌণ দুর্বোধ্য একটা চেতনার স্বপ্নকল্পনা —মায়া। কিন্তু সব শ্রেণীর ভারতীয় ভাবুকই জীবনকে অন্তর্বর্তী বাস্তব সত্য বলে মেনে নিয়েছে। ভারতীয় চিন্তা মেনে নিয়েছে যে মানুষের সাধারণ জীবনের মধ্যে দিয়ে সযত্ন প্রয়াস করে যেতে হবে তার সার্থকতার জন্য জ্ঞানের সংযোগে তার শক্তি সব ফুটিয়ে তুলতে হবে, তার নানা রূপ নিরীক্ষণ করতে হবে, ব্যাখ্যা ও বোধগম্য করতে হবে; তার মূল্য নির্দিষ্ট, আয়ত্ত এবং জীবনে জাগ্রত করে ধরতে হবে; তার ভোগের পাত্র সেই স্তরেই আকণ্ঠ পান করতে হবে। কেবল তার পরেই সম্ভব আত্মস্থিতি তুরীয়-স্থিতি। যে অধ্যায় সিদ্ধি মানুষের সামনে দেখা দেয় তা আসে জীবনে ও প্রকৃতিতে একটা দীর্ঘ সহিষ্ণু যুগান্তব্যাপী আত্মবিকাশের পরিণাম হিসাবে। এই এখানে ক্রমিক অধ্যায় প্রগতি ও বিবর্তন বস্তুত প্রায় সকল ভারতীয়ের কাছে স্বীকৃত পুনর্জন্ম-সত্যের মূলরহস্য। নিম্নযোনিতে লক্ষ লক্ষ জন্মের পর বিশ্বে এই গহন আত্মা—অজ্ঞানের মধ্যে যে সজ্ঞান, 'চেতনঃ অচেতনেষু'—এসে পৌঁছেছে মানুষ পর্যায়ে আবার একমাত্র সহস্র কিম্বা বোধহয় লক্ষাধিক মানব জীবনের পরেই মানুষ এই তার ভাগবত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একটি জীবন এক পদক্ষেপ—তা সে ফেলতে পারে যেমন সামনে তেমনি পিছনে জীবনে তার কর্ম, জীবনে তার নৈষ্কর্ম্য, তার চিন্তা ও জ্ঞান, যাসব দিয়ে সে নিজের জীবন শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে তা-ই প্রথম আদিম অবস্থা থেকে অন্তিম সিদ্ধাবস্থা পর্যন্ত সে কী হবে সেটি নির্ধারণ করে—'যথা কর্ম যথা শ্রুতম্'।

শেষে নিয়ে যায় যে একটা পরিণাম সিদ্ধিতে বা ভাগবত উৎক্রমণে তাতে এবং মানব জীবন সেখানে প্রথম প্রত্যক্ষ সূত্রে ও বহুবার প্রদত্ত সুযোগ তাতে বিশ্বাসই ভারতীয় জীবন-দর্শনের মূলকথা। এর মধ্যে যাবতীয় পার্থিব আশা-আকাঙ্খা, লক্ষ্য ও কর্মের অবকাশ আছে; সেই উত্তরণে সব রকম মানব চরিত্রের ও স্বভাবের স্থান আছে। কারণ জড়ে চিন্ময় বহু রূপ ধরে, চলে বহু ধারায়, তার লাস্য বা লীলায় দেয় অজস্র বিন্যাস। এসবই আমাদের প্রয়োজনীয় মোট অভিজ্ঞতার অঙ্গ, প্রত্যেকটির আছে সার্থকতা, প্রত্যেকটির আছে স্বাভাবিক বা সত্যসঙ্গ নিয়ম ও অস্তিত্বের সদর্থ, এই লীলা ও পদ্ধতির মধ্যে প্রত্যেকটির রয়েছে প্রয়োজনীয়তা। ইন্দ্রিয়ভোগের দাবিকেও অবহেলা করা হয়নি, তার যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। অন্তরাত্মাটির প্রয়াস ও মহান ক্রিয়ার প্রয়োজনকে টুঁটি চেপে ধরা হয়নি, তার পরিপূর্ণ ক্রিয়া ও অবাধ স্ফূর্তিতে উৎসাহদানের অভাব ছিল না। জ্ঞান সংগ্রহের শত ধারা পেয়েছিল নিরঙ্কুশ চলার স্বাধীনতা আবেগের খেলাকে স্থান দিয়ে, তাকে শেষে মার্জিত পরিশীলিত করে তোলা হয়েছিল ঐ দিব্যের স্তরে; রূপরসবৃত্তির

কামনাকে তার শ্রেষ্ঠ দুর্লভ রূপের মধ্যে যেমন তেমনি জীবনের আটপৌরে তুচ্ছতার মধ্যেও মানব জীবনের অপরূপ লীলার ঐশ্বর্যকে ভারতীয় সংস্কৃতি মলিন বা ম্লান করেনি; আমাদের প্রকৃতির বিচিত্র কর্মধারা সে নিষ্প্রাণ বা অঙ্গহীন করেনি। বরং, সুসঙ্গত ও সুশাসনের নিয়মটি মেনে, সে তাদের পূর্ণ এবং প্রায়শ আত্যন্তিক মর্যাদা দিয়েছে। পথ চলতে চলতে মানুষকে দেওয়া হয়েছে সব অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে, তার চরিত্র ও কর্মকে উদার স্বাধীনতা ও বীরত্বব্যঞ্জক মহিমায় ফুটে উঠতে, বর্ণাঢ্য ভোগে জীবনকে কানায় কানায় ভরে তুলতে। জীবন সম্বন্ধে ভারতীয় ভাবনার উজ্জ্বল প্রকাশ তার মহাকাব্যে ও ক্লাসিকাল সাহিত্যে। বিস্ময় লাগে যে কেউ, যার চোখ আছে বুদ্ধি আছে সে, সংস্কৃতে তথা পরবর্তী ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, নাটকসমূহ, সাহিত্যগ্রন্থ, প্রেমোপাখ্যান, এবং প্রচুর নীতিগাথা ও গীতিকাব্যের (অন্য সাংস্কৃতিক প্রয়াস, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও চিন্তার বিপুল চিহ্নাবশেষের কথা আর তুললামই না) পড়েও তার প্রসারতা, ঐশ্বর্য ও মহত্ত্ব বুঝতে পারে না!

সংস্কৃতির উদার উদ্দেশ্য যেমন মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ, প্রশস্ত ও উৎসাহিত করা তেমনি আবার প্রাণশক্তির বহু ধারাকেও সুনিয়মে রাখা, নৈতিক ও যৌক্তিক শাসনের অধীন করা, আদিম অমার্জিত রূপটির উপরে তাদের তুলে ধরা—যতক্ষণ না আধ্যাত্মিক মুক্তি, সিদ্ধি ও মহত্ত্বের রহস্যটি অধিগত হয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সমুচ্চ মূল্য সেই শক্তির মধ্যেই নিহিত যা দিয়ে সে একাজ সম্পাদন করেছে, সেই গভীর জ্ঞান ও শিখরস্পর্শী ও সূক্ষ্ম দক্ষতা যা-দিয়ে সমাজের ভিত্তি পত্তন ও ব্যক্তিগত জীবন সুবিন্যস্ত করেছে, মানব প্রকৃতির প্রবৃত্তি-গুলি প্রবুদ্ধ ও প্রশিষ্ট করেছে এবং শেষে সে-সবকে চালিয়ে নিয়েছে তার মুখ্য ভাবটি জীবনে সার্থক করবার দিকে। মনের অনুশীলন কালেও—আপাতিক উদ্দেশ্যে ব্যাপৃতি থেকে সরিয়ে না নিয়েও—তাকে একথা তুলতে দেওয়া চলত না যে জীবনকে নিতে হবে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিতে ও অনন্তে পৌঁছাবার তপস্যাক্ষেত্র হিসাবে।

জীবন সংগঠনে অথবা অধ্যাত্ম সাধনায় ভারতীয় মন আমাদের অস্তিত্বের দুটি মৌলিক সত্য সর্বদা স্মরণে রেখেছে। প্রথম, কতকগুলি স্তর আছে আমাদের সত্তাকে যাদের মধ্যে দিয়েই পূর্ণতার দিকে যেতে হবে এগিয়ে যাবার পথে কয়েকটা লাফ থাকলেও তার অধিকাংশ সম্পূর্তিই একটা ক্রমসমৃদ্ধি; দ্রুততম গতিতেও আছে ধাবনের পর্বভেদ। আরো কথা, জীবন জটিল এবং মানুষেরও স্বভাব জটিল প্রত্যেকবারের জীবনে মানুষ এই জটিলতার একটা সমষ্টি এবং একে সাজিয়ে গুছিয়ে ধরা তার কাজ। কিন্তু প্রাণ সঞ্চালনের প্রথম রূপটি তা-ই যাতে মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে প্রাকৃত অহংয়ের শক্তি; স্বার্থ এবং ইন্দ্রিয়জ বাসনাই মানুষের আদি প্রবৃত্তি—কাম, অর্থ। আমাদের প্রকৃতির এই আদিম প্রবণতাকে ভারতীয় সংস্কৃতি অনেকটাই প্রশ্রয় দিয়েছে। এসব শক্তি গ্রহণ এবং সুবিন্যস্ত করতে হবে; কারণ প্রাকৃত অহংএর জীবন বরণ করতে হবে, যে-সব শক্তিকে তা জাগায় তাদের পূর্ণ বিকশিত করে তুলতে হবে। কিন্তু এ-বস্তুটির অসঙ্গত দাবি আমল দেওয়া যাবে না, কিম্বা তাকে ভোগের দিকে পাগলের মতো ছুটতে দিলে চলবে না; তাহলেই বিপর্যয় এড়িয়ে তার পূর্ণ সার্থকতা

অভাবে, তাহলেই শেষে নিজেকে ছাড়িয়ে এবং শেষে একটা মহত্তর আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও আনন্দের দিকে যেতে উদ্বুদ্ধ করা যাবে তাকে। একটা আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক অরাজকতা নিয়ন হতে পারে না ; স্বেচ্ছা, প্রতিপ্রবেগ, ইন্দ্রিয়রাগ, স্বার্থ কামনা দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিক-ভাবে চালিত জীবনটা মানব বা মানুষী অস্তিত্বের স্বাভাবিক সবটা হতে পারে না। আকর্ষণীয় কল্পনা যে তা হতে পারে এবং তা-ই সত্যকার নিয়ন তা নিয়ে পাশ্চাত্য মন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব বা গলাবাজি করেছে ; অন্যায়ভাবে পেগানিজম্ বলে ডাকা এই ধারা—কিন্তু গ্রীক বা পেগান বুদ্ধির কাছে নিয়ম শৃঙ্খলা আত্মশাসন বিষয়ে ছিল মহৎ ধারণা—ভারতীয় প্রতিভার অপরিচিত। ইন্দ্রিয়ের ডাক গ্রীস, রোম ও আধুনিক য়ুরোপের চেয়ে ভারত কম শোনেনি সে বেশ ভাবতে পেরেছিল একটা ছড়বাদী জীবনের সম্ভাবনা এবং তারই প্রভাব পড়েছিল কিছু সংখ্যক মনে এবং জন্ম হয়েছিল চার্বাক দর্শনের, কিন্তু এটিও পূর্ণ আধিপত্য কিম্বা ক্ষণকালের জন্য ছাড়া দুর্দান্ত রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। জীবনে এর একটা প্রবল বিস্তারের মধ্যে যদিও দেখি এক ধরণের বিকৃত মহত্ত্ব, তবু মন আর ইন্দ্রিয়কে ধরে প্রচণ্ড অহংয়ের চরিতার্থতা। সে জেনেছে অসুর আর রাক্ষসের রীতি। এ হল নিজস্ব স্তরে নতুন অন্তঃপুরুষের একটা রাক্ষসী অতিকায় আসুরিক বাঁচ, অবশ্য মানব জীবনের উপযোগী নিয়ন নয়। মানুষকে ডাকছে আর একটা শক্তি এবং তা ছাড়িয়ে যায় বাসনা স্বার্থ স্বেচ্ছা, তা ধর্মশক্তি।

ধর্ম—যুগপৎ যা কর্মের মঙ্গলময় নিয়ন এবং আমাদের প্রকৃতির গভীরতম নীতি—পাশ্চাত্য ধারণানুসারী একটা মতবাদ মতবিশ্বাস বা সদাচারী ও সামাজিক নীতির পোষক আদর্শ নয়, তা হল আমাদের জীবনে সর্বাঙ্গে সুনীতির ক্রিয়া। জীবনধারণের একটা সৎ ও নির্দোষ নিয়ন অনুসন্ধানে মানুষের প্রয়োজনটাই ধর্মের মধ্যে পায় তার আপন সত্য ও সার্থকতা। প্রত্যেক জিনিসের আছে ধর্ম, তার প্রকৃতিই তার উপর চাপিয়ে দিয়েছে তার জীবনধর্মটি, তবে মানুষের ধর্ম হল নিজের সর্বাঙ্গে আদর্শ জীবনধারণের নিয়মটির সজ্ঞান প্রতিষ্ঠা। সাধারণে ধর্ম একটা অনোঘ নিয়ন, কিন্তু আমাদের চেতনায় তার আছে সমৃদ্ধি এবং সম্পূর্তি, আছে নানা স্তর ; আমাদের প্রকৃতির উচ্চতম নিয়ন আবিষ্কারে আধ্যাত্মিক ও নীতিগত কর্মের উত্তরণে আছে নানা ধাপ। সব মানুষ সব ব্যাপারে এক সর্বগ্রাহ্য ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম পালন করতে পারে না। জীবন এত জটিল যে সেখানে নীতিবাগীশ তাত্ত্বিকের প্রিয় অযৌক্তিক আদর্শ সরলতার স্থান নেই। এক প্রকৃতি থেকে আর এক প্রকৃতি ভিন্ন ; স্থান, কর্তব্য, কর্ম প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব দাবি ও মান ; লক্ষ্য ও রুচি, জীবনের ডাক, আহ্বান সকলের পক্ষে এক রকম নয় ; প্রস্তুতির ধারা ও যোগ্যতার মাত্রা—অধিকার—সমান নয়। সমাজে সমাজের দ্বারা মানুষের জীবন এবং প্রত্যেক সমাজের আছে নিজস্ব মোটামুটি একটা ধর্ম, ব্যক্তির জীবনটিকে এই গতির বৃহত্তর নিয়মের মধ্যে শাপ খাওয়াতে হয়। সেখানেও সমাজের মধ্যে ব্যক্তির ভূমিকা, তার প্রকৃতি এবং তার যোগ্যতার দাবি ও বেআইনটি জনে জনে পৃথক, বিভিন্ন আদেশ রকম ও মাত্রা ; সামাজিক নিয়মের ভিতরে এই বৈচিত্র্যের স্থান থাকা চাই নতুবা

সকলের জন্য অনড় একাকার হলে সমূহ লোকসান। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, পুরোহিত পণ্ডিত কবি চিত্রকর শাসক যোদ্ধা বণিক কৃষক, কারিগর শ্রমিক, ভৃত্য সকলের এক শিক্ষা কার্যত চলে না, সকলকে এক ছাঁচে ঢালা যায় না, এক ধরণের জীবনধারায় সকলকে বাঁধা চলে না। এক নিয়মের ধারাপাতে সকলকে মেপে যায় না, সে হবে এমন অর্থহীন জ্যামিতিক আড়ষ্টতা যাতে মননীয় সত্যটি মারা পড়বে। প্রত্যেকের আছে নিজস্ব স্বভাব এবং নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত এই স্বভাবের সিদ্ধির জন্য; প্রত্যেকের আছে নিজস্ব কর্মধারা এবং এই স্বকর্ম সাধনের জন্য থাকা উচিত একটা বিধান ও আদর্শ। সব জিনিসে থাকা চাই জীবন্ত বিধি এবং পূর্ণতার একটা ধারণা এবং আচরণের একটা প্রাজ্ঞ নমনীয় আদর্শ,—ধর্মের জন্য একমাত্র তা-ই প্রয়োজন। একটা উচ্ছৃঙ্খল বাসনা আকর্ষণ প্রবৃত্তির প্রবেগকে মানব চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করতে দেওয়া চলে না এমন কি, বাসনা আকর্ষণ প্রবৃত্তির উদ্দাম বিলাসেও রাখতে হবে একটা শাসনের সংযমের নির্দেশের সূত্র, একটা দিশা। থাকা চাই কর্মনীতি বা একটা বিজ্ঞান, যে-সত্যের সন্ধান চলছে তারই থেকে উদিত একটা সংযম ও সুযোগ, সিদ্ধির একটা মূল্যমান, একটা শৃঙ্খলা। মানুষের বর্ণ এবং বৃত্তির শ্রেণী-বিভিন্নতা নিয়েও এই বিশেষ সব ধর্ম উত্তীর্ণ হবে বৃহত্তর এক সত্য ও বিধানে যা সকলকে ধারণ ক'রে আবার ছাড়িয়ে যায়, যা সর্বত্র ফলপ্রসূ। ধর্ম তাহলে ছিল এই রকম, ব্যক্তি বিশেষের জন্য বিশিষ্ট, উন্নতির স্তর একটা, জীবন অনুসরণ কিম্বা কর্মের ব্যক্তিগত ক্ষেত্র, অথচ সব মূল ধারায় বিশ্বজনীন্ এবং প্রত্যেকের পালনীয়।

সর্বগামী ভারতীয় ধারণায় ধর্ম হল বর্ধিষ্ণু মানব মন ও অন্তরাত্মার আদর্শ পরিপূরণ তার বিধানটি; তা মানুষকে তেমন কতগুলি সমুচ্চ বৃহৎ সাত্ত্বিক গুণে তেজ ও বীর্য নিয়ে গড়ে উঠতে বাধ্য করে যাদের সমন্বয়ে আবির্ভূত শ্রেষ্ঠ মানুষ। ভারতীয় চিন্তায় ও জীবনে এই ছিল শ্রেষ্ঠের আদর্শ সৎ বা মহৎ মানবের বিধান, এ তপশ্চর্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আত্মসিদ্ধির পথিকের—আর্য, শ্রেষ্ঠ, সজ্জন, সাধুর—জন্য। এ-আদর্শ শুধুই নৈতিকের বা সদাচারের ধারণা নয়, যদিও বেশ জোরদার ছিল সেটি; এ ছিল আবার বুদ্ধির ধর্মের সমাজের রূপরসবোধের, গোটা আদর্শ মানুষটির ফুটে ওঠার আদর্শ সমগ্র মানব প্রকৃতির পরিপূর্ণতা। ভারতীয় 'শ্রেষ্ঠ'র, সৎ ও মহৎ ব্যক্তির—'আর্য'র—ধারণায় পাই পরম বিচিত্র গুণাবলির সমাবেশ। হৃদয়ে কারুণ্য ঔদার্য প্রেম অনুগ্রহ পরিহিতব্রত দীর্ঘদহন অসংকীর্ণ তা স্নেহ ধৈর্য; চরিত্রে সাহস বীর্য আনুগত্য সংযম সত্য সম্মান ন্যায় সুবিচার বিশ্বাস, যেখানে যেমন প্রয়োজন বিনয় ও শ্রদ্ধা, শাসনে ও নিয়ন্ত্রণে বিক্রম, সুকুমার নম্রতা এবং সেই সঙ্গে দৃঢ় স্বাতন্ত্র্য রাজকীয় গর্ব; মানসলোকে প্রজ্ঞা বুদ্ধি জ্ঞানানুরাগ, সকল শ্রেষ্ঠ বিদ্যার অভিজ্ঞা, কাব্য শিল্প সৌন্দর্যে অনুরাগ, কর্মে সুপরিশীলিত যোগ্যতা ও দক্ষতা; আন্তর সত্তায় এক প্রবল ধর্মভাব ভক্তি ঈশ্বরপ্রেম, সর্বোত্তমকে পাবার তৃষ্ণা, একটা আধ্যাত্মিক প্রবণতা সামাজিক সম্বন্ধে ও আচরণে পিতা পুত্র স্বামী ভ্রাতা আত্মীয় বন্ধু শাসক বা প্রজা, প্রভু বা ভৃত্য, যাজক যোদ্ধা বা কর্মী, রাজা বা সাধু, শ্রেণী বা বর্ণভুক্ত হিসাবে প্রত্যেকের দ্বারা সমষ্টির সমাজধর্মের অকুণ্ঠ পালন: আর্যের, উন্নত শিক্ষা দীক্ষা এবং মহৎ প্রকৃতির মানুষের, এই

ছিল পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। প্রাচীন ভারতবর্ষের দু'হাজার বছরের লিপিবদ্ধ ইতিহাস এই আদর্শ স্পষ্ট চিত্রিত করেছে এবং এটি হিন্দু সদাচারের প্রাণ। এর সৃষ্টা যে মন তা যেমন যুক্তিবাদী তেমনি আদর্শ মন, যেমন ইহবাদী তেমনি অধ্যাত্মমুখী, গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ, মহানভাবে সদাচারী, দৃঢ় অথচ নমনীয়ভাবে বুদ্ধিদীপ্ত, বৈজ্ঞানিক এবং রূপরসিক, জীবনের বাধাবিপত্তি এবং মানুষী দুর্বলতার বিরুদ্ধে ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু, আবার আত্মানুশীলনে তপস্বী। ভারতীয় সভ্যতার মূলে এই মনটি, সমস্ত সংস্কৃতির গায়ে লেগেছে তার প্রতীয়মান ছাপ।

কিন্তু এও আর একটি বৃহত্তর জিনিসের ভিত্তি ও প্রস্তুতি মাত্র, যার উপস্থিতি মানব জীবনকে নিজের ওপারে একটা আধ্যাত্মিক ও ভাগবত কিছুতে তুলে ধরে। ভারতীয় সংস্কৃতি এই কামনা, স্বার্থ ও পরিতৃপ্ত প্রবৃত্তির রুক্ষ পাশব জীবনকে অধ্যাত্মচিত্তের আকাঙ্ক্ষা থেকে তুলে ধরেছিল তার মধ্যে ধর্মের শৃঙ্খলা ও উচ্চ লক্ষ্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এক মহৎ আত্ম-অতিক্রমণে। কিন্তু তার গভীরতর বিশেষ এই লক্ষ্য—এই বিষয়ে তুলনা নাই তার—ছিল আত্মসিদ্ধি-তৎপর মানব সত্তার এই মহৎ জীবনকেও নিজের অতীতের উর্ধ্বে প্রবলতর এক আত্ম-অতিক্রমণ এবং মুক্তিতে; তার প্রয়াস এর মধ্যে চুকিয়ে দেওয়া আধ্যাত্মিক মোচন এবং পূর্ণতার—'মুক্তি,' 'নোক্ষ'র,—মহান লক্ষ্যটি। ধর্ম এবং তা পালনই মানুষের প্রথম ও শেষ কথা নয়; ধর্মের ক্ষেত্র ছাড়িয়ে রয়েছে চেতনার বৃহত্তর রাজ্য, সেখানে উঠে সে পায় এক বিরাট আধ্যাত্মিক মুক্তি। মহীয়ান অথচ মরণসাধী মনুষ্যত্বই মানব সিদ্ধির চরম শিখর নয়; অমরত্ব, মুক্তি, দিব্যতা তার আয়ত্তের মধ্যে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য সর্বদা আত্মার দৃষ্টির সামনে ধরেছে এবং তার সম্ভাবনা ও আলোর নিত্য উদ্বুদ্ধ করেছে স্রষ্টার সমগ্র ধারণাটি। ব্যক্তির সমস্ত জীবন এই লক্ষ্যের গুণে মহৎ হতে পেরেছে, সমাজের সমস্ত শৃঙ্খলাবিন্যাস এই অনুপম সৌধকিরীটে ধাপে ধাপে উঠে যাওয়ার ছন্দে রচিত।

ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাটি সর্বদা গোড়াতেই হওয়া উচিত ভারতীয় চিন্তায় স্বীকৃত প্রথম ত্রিশক্তির সুবিন্যাস। সেখানে প্রাকৃত কর্মের দাবিদাওয়া সম্পূর্ণ মেনে নিতে হবে; ব্যক্তির ও সমষ্টির স্বার্থ-সাধনা এবং মানুষী বাসনা ও প্রয়োজনের তৃপ্তি স্বচ্ছন্দে স্থান দিতে হবে, এই উদ্দেশ্যে জ্ঞান ও প্রয়াসের মৈত্রীবদ্ধ যোগাযোগ থাকা চাই। তবে ধর্মের আদর্শ দিয়ে একটা মহত্তর লক্ষ্যের দিকে এ-সমস্ত-কিছুকে নিয়ন্ত্রিত উন্নীত সম্প্রসারিত করে ধরতে হবে। ভারতীয় বিশ্বাস অনুযায়ী উচ্চতর আধ্যাত্মিক চেতনা কোথাও যদি থাকে যার দিকে মানুষ উঠে যেতে পারে তাহলে সেই আরোহণ সদাসর্বদা জীবনের পরম লক্ষ্য বলে চোখের সামনে রাখতে হবে। ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যবস্থা মানব প্রকৃতিকে যুগপৎ প্রশ্রয় দিয়েছে এবং রাশে টেনে রেখেছে; সমাজকর্মে তাকে উপযোগী করে নিয়েছে; সুনাচিত সকল ক্ষমতায় সুসংগ্রথিত, সর্বাঙ্গে মহীয়ান সার্থক মানবত্বের উদার আদর্শকে মনে গেঁথে দিয়েছে; তেমনি তার সামনে ধরেছে মহত্তর রূপান্তরের তত্ত্ব ও অভ্যাসটি, তাকে পরিচিত করেছে অধ্যাত্ম জীবনের ধারণাটির সঙ্গে, তার অন্তরে উপ্ত করেছে দিব্য ও অনন্তের জন্য এক মহাকুধা। তার ধর্মীয় প্রতীকগুলি এদিকের ইঙ্গিতে পূর্ণ প্রতিপদে তার স্মরণে আনা অতীত ও আগামী জীবন এবং জড়জগতের উর্ধ্বে অন্য সব

জগৎ ; তাকে প্রাণকে জাগ্রত করে যে আরো বৃহৎ চিন্ময় তার সীমাপ্রান্ত, তার আহ্বান ও আলিঙ্গনের ও অন্তিম লক্ষ্যের, একটা একান্ত সম্ভাব্য অবরন্ধের, মুক্তির, ঈশ্বরচেতনার, ভগবতী প্রকৃতির, ঘনিষ্ঠতায় আনা হয়। মানুষকে ভুলতে দেওয়া চলত না যে অন্তরে তার ব্যক্তিগত অহমের ঊর্ধ্বে আছে কণিকাবৎ মহত্তম আত্মা এবং তারই স্থিতি নিত্য সর্বভূতে, বিশ্বার ব্যসন ঈশ্বরে, শাশ্বতে, চিন্ময় পুরুষে। সর্বদা তার সামনে অনেক রাস্তা ও সাধনধারা খোলা ছিল যা অবলম্বনে পাওয়া যেত মুক্তিপ্রদ সত্য, যোগ্যতা ও স্বভাব—'অধিকার'—অনুযায়ী অন্তত ফেরা যেত এই উচ্চতম লক্ষ্যের দিকে কিম্বা দূরে থেকে তাকে অনুসরণ করা যেত। নিজের চারদিক থেকে দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত এসব সাধনার প্রবল পথিক এবং মহাপুরুষরা। সেই প্রত্যুষের যুগে এঁরাই ছিলেন তরুণের গুরু, সমাজের শীর্ষ সভ্যতার প্রচেতা ও উৎস, সংস্কৃতির উজ্জ্বল জ্যোতি। আধ্যাত্মিক মুক্তি, আধ্যাত্মিক সিদ্ধি নিছক সুদূর বাস্পীয় আদর্শ বলে ভাবা হত না, ধরা হত শেষে সকলেরই অবশ্য লভ্য শ্রেষ্ঠ মানবাদর্শ, এসবই জীবনের একটা বাস্তবিক ভিত্তি এবং ধর্ম থেকে প্রয়াসের ফলেই অদূর ও সম্ভাব্য হতে পেরেছিল। অধ্যাত্ম ভাবই নিয়ন্ত্রণ, প্রবুদ্ধ এবং নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল এই মহান সভ্য জাতির অন্যান্য সকল প্রাণ-প্রবর্তনা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই সব মূল সূত্রের উপরই গড়া হয়েছিল ভারতীয় সভ্যতার বনিয়াদ, তার জীবন-ধারণার শক্তি এরই মধ্যে। আমি তো জানি না কী করে বলা চলে অন্য সংস্কৃতির তুলনায় কিম্বা ঐতিহাসিক কালে মানবমন-বিজয়ী অন্য যে-কোনো সুপ্রতিষ্ঠ জীবন-ধারণার সঙ্গে তুলনায় এখানে কিছু অপকৃষ্ট রয়েছে। এখানে এমন কিছুই নেই যা বলা চলে প্রাণ ও প্রাণের বিকাশক্ষম নিরুৎসাহ করে, তাকে প্রবেগ ও ঊর্ধ্বোন্নতি এবং মহান উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত করে। বরং এখানে রয়েছে সমস্ত বৈচিত্র্য বিস্তার শক্তি নিয়ে গোটা মানব জীবনটা অসঙ্কোচে পরিপূর্ণ স্বীকার ও পরীক্ষা, রয়েছে তার সঠিক পরিচালনার জন্য স্বচ্ছ প্রাজ্ঞ মহান ভাবটি, রয়েছে তাকে ঊর্ধ্বের দিকে তুলবার জন্য একটা আদর্শ প্রবণতা, রয়েছে সম্ভাব্য সর্বোত্তম সিদ্ধি ও মহত্ত্ব লাভের এক অপরূপ আহ্বান। সংস্কৃতির এবম্বিধ গভীর প্রয়োগ, এসব জিনিসই মানবজীবনকে অনার্জিত আদিম বর্বরতার উপরে তুলে ধরে। একটা সভ্যতার যদি বিচার করতে হয় তার ভাবধারার সামর্থ্য দিয়ে, এসব বৃহৎ প্রয়োগে তাদের শক্তি দিয়ে, তাহলে ভারতীয় সভ্যতা কারো নীচে ছিল না। তা বলে তা নিখুঁত, চরম বা শেষ নয়; একথা কোনো অতীত বা বর্তমান সাংস্কৃতিক ভাবনা বা ব্যবস্থার বেলাও খাটে না। অন্তরতম রূপে মানুষ এক অনন্ত সত্তা, মনে ও প্রাণে সে নিরন্তর বেড়েই চলেছে সব পতন-স্খলন সত্ত্বেও, তাকে চিরকালের জন্য কোনো একটি ভাবনাচক্রে বা জীবনরীতিতে বেঁধে রাখা যায় না। যে সব ব্যবস্থার মধ্যে তার বাস তা অসম্পূর্ণ ও সাময়িক, এমন কি, যাদের মনে হয় নিশ্ছিদ্র নিরেট তারাও দাঁড়াতে পারে না, অনুপযোগী বলে কালের হাতে দণ্ডিত হয়, তাদের বদলাতে হবে কিম্বা সরাতে হবে অন্যের স্থান দেবার জন্য। তবে ভারতীয় ভাবটির স্বপক্ষে এটুকু অন্তত বলা চলে যে একটা উল্লেখযোগ্য গভীরতা ও সমগ্রতা দিয়ে যে সত্তার প্রধান সত্য ও দাবিগুলি ধরেছিল, ধরেছিল তার মন প্রাণ দেহ, তার প্রকৃতির রূপ-রসের সদাচারণিক বৃত্তির অংশগুলি, তার অন্তরাত্মা ও চিৎপুরুষকে, সে-সবকে দিয়েছিল একটা সূক্ষ্ম ও উদার, একান্তভাবে বিশাল উন্নত ও প্রাজ্ঞ, একটা দরদী অথচ মহানভাবে শ্রমসাধ্য দিশার নির্দেশ। অতীত বা বর্তমান কোনো সংস্কৃতির স্বপক্ষে এর চেয়ে বেশি বলা যায় না।

পরিপূর্ণতা যার লক্ষ্য তেমন সংস্কৃতির মধ্যে শুধু বৃহৎ এবং মহৎ নিয়ামক ও প্রচালক ভাব কিছু থাকলেই চলবে না, থাকা চাই আধার নানা আকার ও ছন্দের সামঞ্জস্য, এমন এক ছাঁচ যার ভিতর ভাব ও প্রাণের প্রবাহ এসে জমাট হতে পারে। এক্ষেত্রে কম সংসিদ্ধি এবং বেশি অপরিপূর্ণতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ ঠিক ভাবের চেয়ে আত্মা যেমন বড় তেমনি আকার ছাঁচ ছন্দের চেয়ে ভাবও বড়। আকারের আছে একটা স্থাণুত্ব, তা-ই তাকে সীমিত করে; তাকে জন্ম দেয় যে-ভাব বা শক্তি তাকে সম্পূর্ণ ভাবে ধারণ বা তার সব সম্ভাবনাকে পূর্ণ প্রকাশ করতে কোনো আকারই পারে না। আধার, যত

বড়ই হোক, কোনো ভাব, কিম্বা কোনো আকার ও শক্তির সীমিত খেলা অসীম আত্মাকে নিগড়ে বাঁধতে পারেনা। মর্তের পরিবর্তন ও প্রগতির প্রয়োজনের গুপ্ত রহস্যটি এরই মধ্যে। এখানে ভাবটা হল অন্তঃপুরুষের একটা আংশিক প্রকাশ মাত্র। নিজের সীমার মধ্যে, নিজের নির্দিষ্ট পথেও একে সর্বদা ক্রমাধিক সুনম্য হতে হয়, নিজের মধ্যে অন্য সম্ভাবনা ভরে নিতে হয়, নূতন প্রয়োগানুযায়ী উঠে প্রশস্ত হতে হয়, প্রায়শ নিজেকে এক বৃহত্তর দ্যোতনার মধ্যে নিজের অর্থের একটা উন্নতিকর রূপান্তরে বিলিয়ে দিতে হয় কিম্বা নিজেকে মিশিয়ে বিলিয়ে দিতে হয় নব নব সমৃদ্ধ সমন্বয়ে। সকল মহান সংস্কৃতির ইতিহাসে তাই তো দেখি ত্রিপর্ব পরিক্রমা, এই বিষয়-সত্যের আবশ্যক পরিণাম বলেই এই পরিক্রমা। প্রথম পর্ব বৃহৎ অসংলগ্ন গঠনের; দ্বিতীয় পর্বে দেখি গঠন ছাঁচ ছন্দের স্থায়িত্ব শেষ বা সংকটপর্বে জরা ক্ষয় বিলয়। এই শেষ পর্ব একটা সভ্যতার জীবনে এক দারুণ সংকট নিজের রূপান্তর ঘটাতে না পারলে তার ভাগ্যে একটা ধীর মন্থর অবনতি কিম্বা আরো সবল আরো জীবন্ত —কিন্তু তাবলে মহত্তর ও সত্যতর নয় —শক্তি ও গঠনের সঙ্গে দ্রুত সংঘর্ষের ফলে মৃত্যু-যন্ত্রণায় মূর্ছা। অন্যথা সে যদি নিজেকে সীমার মধ্যে বাঁধে যেসব গঠন তাদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে, তার ভাবসম্পদ পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম হয়, অন্তরাত্মাকে নূতনতর সুযোগ দেয়, অভিনব আবির্ভাব ও দাবি সব বুঝতে এবং অধিগত ও আত্মস্থ করতে পারে তাহলে ঘটবে এক পুনর্জন্ম, আবার আয়ুবৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ, প্রকৃত একটা নবজন্ম।

ভারতীয় সভ্যতা তার আপন বিপুল ও মন্থর চালে এ সব পর্বের ভিতর দিয়েই চলে এসেছে। এর প্রথম পর্ব সেই বিরাট আধ্যাত্মিক বিকাশের যখন নানা গঠন ছিল নমনীয়, পরিবর্তনশীল এবং অন্তশ্চেতনার দিকে একান্ত উন্মুখ। পরে সেই প্রবহমান গতিভঙ্গিই এসে পড়ল এমন একটা প্রখর বুদ্ধির যুগের মধ্যে সব কিছু যেখানে নির্দিষ্ট রয়েছে পরিচ্ছন্ন, প্রভূত পরিমাণে জটিল, অথচ বিশদভাবে আলোচিত এবং তা সত্ত্বেও সুনম্য রূপ ও ছন্দের প্রাচুর্যে। ফলে এসেছিল নানা সংকটের নাড়া খাওয়া সমৃদ্ধভাবে জমাট একটা নিশ্চলতা, যে-সংকট কিছুটা রোধ করা গিয়েছিল ভাবের পরিবর্তন এবং গঠনের অদল-বদল দিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কঠিন অচলায়তনের জয় হল এবং এল প্রেরণাদায়ক অন্তঃপুরুষের অবক্ষয়, জীবন্ত শক্তির স্থাণুত্ব, বাহ্য আয়তনের ক্রমিক একটা অবনতি। বিদেশী সংস্কৃতির সংস্পর্শ এই অবনতির সঙ্গী হয়েই ছিল, প্রথমে কিছুকালের জন্য সামলে পরে এ-অবনতিকে ত্বরান্বিতই করেছিল। আজ আমরা পশ্চিম ও তার পরিচায়ক সবকিছুর প্লাবনে আনা এক উন্মাদ চূড়ান্ত সংকটের মধ্যে। পরিণামে এক খণ্ডপ্রলয় বার সূচনা এই সংস্কৃতির নিঃসংশয় মৃত্যু ও অনিবার্য ধ্বংসের আশঙ্কা দিয়ে; তবে এই গতিধারাই এখন আবার উল্টে উপরে তুলে ধরা হল এক বিপুল পুনর্জাগরণের রূপান্তরের নবজন্মের দুরন্ত আশা দিয়ে। সংস্কৃতি অনুধাবকদের কাছে এই তিনের প্রত্যেকটি পর্বের বিশেষ তাৎপর্য আছে। ভারতীয় সভ্যতার মূল ভাবটি যদি বুঝতে চাই তাহলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই তার শৈশবযুগে, বেদ উপনিষদের প্রভাত সমন্বয়, তার বীর্যবান সূত্রসক্ষম বীজকালে। যদি তার অন্তঃশ্চেতনার কর্কশ অচলায়তনটি পর্যবেক্ষণ

করতে চাই তাহলে চাই বুঝতে কোন জিনিষটিকে সে জীবনের মূল ছন্দ বলে ধরেছিল, তাহলে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি ফেলাতে হবে বহুবিধ শাস্ত্র ও ক্লাসিকাল রচনার সেই মধ্যপর্বের শেষ দিকে,—দর্শন ও বিজ্ঞানের, বিধিবিধানের এবং রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক তত্ত্বের, বহুধা তর্কচিন্তার, ধর্মান্ধতা শিল্প ভাস্কর্য চিত্রকলা ও স্থাপত্যের যুগে। যদি আবিষ্কার করতে চাই কী এর দোষত্রুটি, কী এখানে অভাব, কোথায় এ ব্যর্থ এর পূর্ণ বা যথার্থ অন্তঃপুরুষটির বিকাশে তাহলে এর অধঃপতনের যুগ যে অপ্রিয় তথ্য উদ্‌ঘাটিত করবে তা মনোযোগ দিয়ে দেখা চাই। পরিশেষে যদি এর ভবিষ্য রূপান্তরের দিক নির্ণয় করতে চাই তাহলে বোঝার চেষ্টা করতে হবে এই নবজন্ম-সংকটের অন্তরালে এখনো বিশৃঙ্খল আবর্ত্ত সব কী। এ সবের কোনো একটিকে অপরের থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া চলে না; এক পর্বে যা ঘটে পূর্ববর্তী পর্বেই তার সূচনা ও সূত্রপাত: তবু সাদাসিধে মোটামুটিভাবে এই পার্থক্য আমরা ধরতে পারি এবং তা পর্যবেক্ষক বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য প্রয়োজন। কিন্তু এখন আমাদের আলোচ্য তেমন সব পরিণত গঠন এবং মূল ছন্দ যারা তার নানা মহত্তর যুগের মধ্যে দিয়ে টিঁকে এসেছে।

যে সমস্যা ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমাধান করতে হয়েছিল তা হল এমন একটা স্থূল ভিত্তির প্রতিষ্ঠা যার উপর বাস্তবিক বিকাশ ঘটান যায় তার অন্তরাত্মার এবং জীবনাদর্শের। কী করে মানুষের প্রাকৃত জীবনটি গ্রহণ করা চলে, কী করে যথেষ্ট সুযোগ বৈচিত্র্য স্বাধীনতা দিয়েও তাকে বশে রাখা যায় একটা নিয়মের, বিধির, ধর্মের, একটা কর্মবিধির, একটা সমষ্টি-বিধির, উপস্থিত প্রত্যেক অনাদর্শ মানব প্রবৃত্তির একটা নিয়মের, আবার একটা উচ্চতর আদর্শ আকাঙ্খার নিয়মটির? কী করে তারপর সেই ধর্মকে জানান যাবে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে আধ্যাত্মিক জীবনের নির্বিঘ্ন স্বাধীনতায় তার শৃঙ্খলা-ব্যবস্থার সার্থকতা এবং অবসান দিয়ে? প্রারম্ভিক যুগ থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি নির্দেশ হিসাবে নিয়েছিল এই যুগ্মভাবটি, একেই সমাজ-কাঠামোয় ব্যক্তিগত জীবনের মূল ব্যবস্থার মধ্যে ঢেলে দিয়েছিল। এই চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের দ্বিবিধ ব্যবস্থা,—সমাজের চারটি শ্রেণী পর্যায়, বিকাশমান মানব জীবনের চারটি ক্রমিক অবস্থা।

পরবর্তী ধ্বংসাবিধ্বংস অবনতি এবং গ্রাম্য অর্থহীন বাজে—জাতিভেদ—দিয়ে প্রাচীন চতুর্বর্ণের বিচার চলতেই পারেনা। তবে অপরাপর সভ্যতার দেখি যে শ্রেণীবিন্যাস—যাজক সামন্ত, বণিক এবং দাস বা শ্রমিক—এটি তা-ও নয়। বাহ্যত এরও হয়ত একই স্থান থেকে শুরু, কিন্তু এ পেয়েছিল একটা সম্পূর্ণ আলাদা রকমের প্রস্ফুট তাৎপর্য। প্রাচীন ভারতীয় ভাব হল, প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষ চার শ্রেণীর। প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ—বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের মানুষটি; তারপরে কর্ম ও শক্তির মানুষ, রাজা, যোদ্ধা, নেতা, শাসক; তৃতীয় পদে—আর্থিক মানুষ, উৎপাদক এবং ধন উপার্জক, ব্যবসায়ী, কারিগর, কৃষক: এরা যথাক্রমে দ্বিজ দীক্ষা-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। সকলের শেষে অধিকতর অপরিণত মানবরূপ, এসব পদবীর এখনো উপযুক্ত হয় নি যে, অশিক্ষিত, নির্বীর্য, স্বজনে বা বুদ্ধিচালিত উৎপাদনে অক্ষম, অকুশলী শূদ্র এবং কায়িক সেবার উপযুক্তমাত্র—শূদ্র। সমাজের অর্থনৈতিক শৃঙ্খল

এই চার রকম মানুষের রূপ ও মাপে ঢালা ছিল। ব্রাহ্মণের কাছে সমাজ দাবি করত তার পুরোহিত, ভাবুক, সাহিত্যিক, আইন-নির্ধারক, পণ্ডিত, ধর্মনেতা এবং দিশারী। ক্ষত্রিয় দিয়েছিল রাজা, যোদ্ধা, প্রজাপালক, শাসক। বৈশ্য সম্প্রদায় দিয়েছিল উৎপাদক, কৃষক, যন্ত্রশিল্পী, কারিগর, বণিক এবং ব্যবসাদার। শূদ্র মিটিয়েছিল তার ভৃত্যের ও সেবার প্রয়োজন। এ পর্যন্ত এ-ব্যবস্থায় অসাধারণত্ব কিছুই নেই শুধু অস্বাভাবিক স্থায়িত্ব এবং বোধহয় ধর্মচিন্তা ও জ্ঞানকে কেবল শীর্ষস্থান দেওয়া—অবশ্য শেষোক্তটি অন্য দু'একটি সভ্যতায়ও দেখা যেতে পারে—অধিকন্তু, প্রধান শক্তি হিসাবে গ্রহণ ছাড়া। ভারতীয় ভাবনাটির নির্ভেজাল অবস্থায় মানুষের এই রকম শ্রেণীবিভাগ জন্মসূত্র ধরে নয়, তার যোগ্যতা এবং আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি অনুযায়ী, যার এ-নিয়মটি যদি কড়াকড়ি মেনে চলা হত তাহ'লে তো পাওয়া যেত একটা বৈশিষ্ট্যের অতি-প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, একটা অতুলনীয় রকমের শ্রেষ্ঠত্ব। তবে চরমোৎকৃষ্ট সমাজও চিরকাল একটা যন্ত্রেরই মতো, ঘুরে ফিরে আসে সেই ভৌতিক লক্ষ্যে ও মানে, তাই এই সূক্ষ্মতর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর সমাজ-ব্যবস্থার সত্যসত্যই প্রতিষ্ঠা করা সেযুগে দুরূহ এবং পণ্ডশ্রম হত। কার্যত দেখি জন্মই হয়ে দাঁড়াল বর্ণের ভিত্তি। তাহলে এই সমাজ-সৌধকে কোন বস্তু অনন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী করতে পেরেছে তার জলন্ত নির্দেশের জন্য অন্যত্র দৃষ্টি ফেরাতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক সূত্রটি কোথাও একান্ত করে মানা হয়নি। প্রথম দিকে দেখি যে প্রচুর নমনীয়তা তা জটিল জমাটবাঁধার পথে যেতে একটা নিরেট আকৃতির মধ্যে হারিয়ে গেল। বর্ণাশ্রমের শেষের দিকে অধিকতর গোঁড়ামির মধ্যেও কার্যত অর্থনৈতিক বৃত্তির মিশ্রণ এসে গিয়েছে। একটা সবল সমাজের প্রাণোদ্বেগ পদে পদে যান্ত্রিক মনের আঁটা ছাঁচ ও ঐতিহ্যটা মেনে চলতে পারে না। তাছাড়া বর্ণাশ্রমের আদর্শ তত্ত্ব ও তার অনাদর্শ সাদামাটা অনুশীলনের মধ্যে পার্থক্যটা তো বরাবরই ছিল। কারণ, একটা ভাব বা ব্যবস্থার পার্থিব দিকটায় তার উজ্জ্বল ক্ষণেও দুর্বলতা কিছু কিছু থেকেই যায়, যার এ-ধরণের সকল ব্যবস্থার চরম ত্রুটি হল যে তারা এমন একটা শ্রেণীপারম্পর্যে শিলীভূত হয়ে ওঠে বা বরাবর তার বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে অক্ষম বা অভীষ্ট কার্যকারিতা অটুট রাখতে অসমর্থ। যে উদ্দেশ্যে তার অস্তিত্ব তাই যখন নাস্তি তখন টিঁকে থাকা শুধু নিরাশ্রয় আধারে, ধুকতে ধুকতে চলা অনাচার, অধঃপতন ও পীড়াদায়ক অনুষ্ঠানপ্রিয়তার অবস্থার মধ্যে। যখন তার হালচালটি মানবজাতির ক্রমস্ফুট দাবি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে পারে না তখনই আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা জেদ ধরে বসে থাকে, জীবন-সত্য কলুষিত এবং প্রগতি ব্যাহত করে। ভারতীয় সমাজও এই সাধারণ নিয়ম থেকে রেহাই পায়নি: এসব ত্রুটিবিচ্যুতি তাকে চেপে ধরেছিল, বস্তুর যে যথার্থ সত্য প্রমূর্ত করতে হবে তা সে হারিয়ে বর্ণসঙ্করের এই নিত্যপ্রবল পাপ-পঙ্কের অতলে ডুবেছিল যা দূর করতে আমরা এখন হিমসিম খাচ্ছি। তবে সেকালের এটি বেশ সুচিন্তিত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তার সাংস্কৃতিক

সংস্কৃতির জন্য যে নিরাপত্তার প্রয়োজন এটি সমাজকে সেই দৃঢ় উদারগঠন স্থায়িত্ব দিয়েছিল,—অন্য কোনো সংস্কৃতিতে এই স্থায়িত্বের তুলনা মেলে না। যার, ভারতীয় প্রতিভা যেমন ব্যাখ্যা করে বলছে, এটি সমষ্টিগত জীবনের দাবি ও সুবিধা পূরণের জন্য একটা নিছক বাহ্যিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কলাকৌশলের চেয়েও বেশি কিছু হয়ে উঠেছিল।

ভারতীয় চাতুর্বর্ণ ব্যবস্থার আসল মহত্ত্ব তার অর্থনৈতিক দায়কর্মের পরিচ্ছিন্ন বিভাগ নয়; তার মৌলিকত্ব এবং শাশ্বত মূল্য সমাজের মনীষী ও নির্মাতারা এই আধারের মধ্যে যে ধর্মাচার ও আধ্যাত্মিকতার ভাবটি ভরে দিয়েছিলেন সেখানেই। এই অন্তঃসারটি এই ভাব নিয়ে শুরু যে ব্যক্তির ধর্মাচার এবং আধ্যাত্মিক ক্রমপূর্ণতাই জাতির প্রধান প্রয়োজন। এই ক্রমপূর্ণতার জন্য সমাজ শুধুই একটা আবশ্যকীয় কাঠামো; এ এক সম্বন্ধের তন্ত্র বা ব্যবস্থা যা দেয় দরকারী সাধান, ক্ষেত্র ও শর্ত সব, দেয় অনুকূল প্রভাবের সংযোগ। সমাজে ব্যক্তি-মানুষের জন্য নিরাপদ একটি স্থান হওয়া চাই যেখানে থেকে এসব সম্বন্ধের পুষ্টি সম্ভব, সমাজ-রক্ষায় আনুকূল্য এবং কর্তব্য ও সাহায্যের ঋণ পরিশোধ সম্ভব, সম্ভব সমষ্টিগত জীবন থেকে যথাসাধ্য সাহায্য নিয়ে নিজের আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর। কার্যত জন্মই ছিল প্রথম স্থূল ও স্বাভাবিক নির্ধারক কারণ, ভারতীয় মনে পুরুষানুক্রমের তত্ত্ব যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল পরবর্তী চিন্তায় একে ধরা হত প্রকৃতির ইঙ্গিত এবং ব্যক্তির অতীত জীবনের দ্বারা গঠিত এখানে আত্মোন্নতির জন্য পরিবেশের সূচক। তবু জন্মই বর্ণের একমাত্র কষ্টিপাথর নয়, হতে পারে না। মানুষের মানসিক যোগ্যতা, তার মতিগতির ধারা, তার আধ্যাত্মিক সামর্থ্য—এগুলিই মূল্যবান বিষয়। তাই রচিত হয়েছিল গার্হস্থ্য জীবনের নিয়ম, ব্যক্তিগতভাবে পালনের ও আত্ম-অনুশীলনের জন্য একটা ব্যবস্থা, শিক্ষা ও পাল-পালনের এমন একটা শক্তি যা আসল জিনিসগুলিকে ফুটিয়ে তোলে, স্পষ্ট আকার দেয়। সামর্থ্য অভ্যাসে গুণে ব্যক্তিমানুষকে সযত্নে তৈরি করা হত, জীবনে নির্ধারিত কর্ম উদ্‌যাপনের জন্য যে সম্মান রক্ষা ও কর্তব্য পালনের বোধ দরকার তা মজ্জাগত হয়ে যেত। করণীয় কর্ম সম্পাদনের বিজ্ঞানটি বুঝিয়ে শেখান হত—আগ্রহ বা অর্থ হিসাবে সাফল্যের যা শ্রেষ্ঠ উপায় শেখান হত তার বহুবিধ বৃত্তির পরম বিধান, নিয়ম এবং সর্বজনস্বীকৃত চরমোৎকর্ষ পেতে—হোক সে-সব বৃত্তি অর্থনীতিকের, রাজনীতিকের, পুরোহিতের সাহিত্যিকের, পণ্ডিতের বা অন্য কারো। অবজ্ঞাত বৃত্তিরও ছিল শিক্ষণধারা, তার নিয়ম-কানুন, তার সাফল্যের উচ্চাশা, হিতকর্ম পালনে নিষ্ঠা ও সম্মানবোধ, পূর্ণতার নির্দিষ্ট আদর্শ সম্বন্ধে মর্যাদাবোধ, যার এসব ছিল বলেই নিম্নতম এবং ন্যূনতম আকর্ষণীয় বৃত্তিও অনেকাংশে একটা আত্মবিকাশের ও সুব্যবস্থ আত্মন্যাসের উপায় হতে পেরেছিল। এই বিশেষ বৃত্তি এবং অনুশীলন ছাড়াও ছিল সাধারণ গুণাবলী, বিজ্ঞান, ললিতকলা, জীবনের মাধুর্য—যা মানব প্রকৃতির বুদ্ধিগত রূপকচিগত ইন্দ্রিয়মুখী শক্তিকে তৃপ্তি দেয়। প্রাচীন

ভারতে সংখ্যায় এরা বিচিত্র এবং বহুল, অধিগত করা হত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সর্বাঙ্গীণভাবে ও সূক্ষ্মতাসহকারে—সকল সংস্কৃতিবান লোকের সেখানে অবাধ অধিকার।

যদিও এসব জিনিসের চালাও ব্যবস্থা ছিল, এর মূলে ছিল প্রাণশক্তির একটা জীবন্ত ঔদার্য ও মহৎ শৃঙ্খলাবোধ, ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য সংস্কৃতিদের মতো এখানেই শেষ নয়। ব্যক্তিকে সে বলেছে "এটি ভিত্তি মাত্র একান্ত জরুরী এ, কিন্তু তাই বলে শেষ বা শ্রেষ্ঠ বস্তু নয়। সমাজের ঋণ যখন শোধ করেছ এবং জীবনে তোমার স্থানটি পরিপাটি নিখুঁত ভরে দিয়েছ, এর রক্ষণাবেক্ষণে ও স্থায়িত্বে সাহায্য করেছ এবং এর থেকে লাভ করেছ নিজের ন্যায়সঙ্গত ও বাঞ্ছিত তৃপ্তি, তারপরেও সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসটি বাকী থাকে। তখনো বাকী তোমার চিৎস্বরূপ, অন্তরের তুমি, তোমার সেই আত্মা যে অনন্তের চিদাংশ, মূলে শাশ্বতের সঙ্গে এক। এই স্বরূপ, তোমার মধ্যে এই আত্মাকে তোমার খুঁজে বের করতে হবে, এই জন্যই তুমি এখানে এসেছ, এই সন্ধানের আরম্ভ জীবনে যেখানে স্থান দিয়েছি সেখানে থেকে এবং এই যে-বৃত্তির শিক্ষা দিয়েছি তা দিয়েই। কারণ, প্রত্যেক বর্ণকে আমি দিয়েছি তার মনুষ্যত্বের আদর্শ, তোমার প্রকৃতির সাধন অনুযায়ী সর্বোত্তম আদর্শ পথটি। নিজের জীবন ও প্রকৃতিকে সেই পূর্ণতার দিকে তার স্বধর্ম অনুযায়ী চালিত করে তুমি শুধু আদর্শের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠো এবং বিশ্বপ্রকৃতির অভিন্ন সখা হও না, অধিকন্তু ভগবানের মহত্তর প্রকৃতির সমীপে ও সান্নিধ্যে চলে যাও, এগিয়ে যাও বিশ্বাতীতের অভিমুখে। এই আসল লক্ষ্য তোমার সম্মুখে। যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা তোমাকে দিলাম তার থেকে আধ্যাত্মিক মুক্তি—মোক্ষ—এনে দেয় যে বন্ধননাশা জ্ঞান তাতে উঠে যেতে পার। তারপরে এই যে সব বন্ধনের মধ্যে তোমার শিক্ষা তা ছাড়িয়ে যাবো বেড়ে উঠবে; ধর্ম পালনের ভিতর দিয়ে তোমার পরিপুষ্টি এবং তাকে অতিক্রম করে তোমার চিৎসত্তার শাশ্বতে পৌঁছাও, অমর আত্মার পূর্ণতা মুক্তি মহত্ত্ব ও আনন্দে উপনীত হও; কারণ প্রত্যেক মানুষ তার প্রকৃতির অন্তরালে ঠিক তাই। এটি যখন করতে পেরেছ তখনই তুমি মুক্ত। তখন সর্বগুণাতীত তুমি; তুমি তখন বিশ্বাত্মা, সর্ব ভূতের সঙ্গে এক, এবার এই ভাগবত মুক্তির মধ্যে সকল প্রাণীর হিতার্থে কর্মে রত হতে পার কিম্বা নির্জনে শাশ্বত এবং বিশ্বাতীতের আনন্দে মগ্ন থাকতে পার।" চতুর্বর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত এই গোটা সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রাকৃত স্বার্থ ও বাসনা চরিতার্থ করার স্তর থেকে আত্মা মন প্রাণের উন্নতি ও প্রগতির সুসমঞ্জস উপায়ে পরিণত করা হয়েছিল, প্রথমে আমাদের সত্তার ধর্মের পরিপূর্ণতায়, শেষে উচ্চতম আধ্যাত্মিক মুক্তিতে। কারণ, মানুষের জীবনে চিরকাল সত্তাকার লক্ষ্য হওয়া উচিত তার অন্তর আত্মাকে উপলব্ধি, তার অসীম ও শাশ্বত অস্তিত্বের রহস্যে এই প্রবেশ।

ভারতীয় ব্যবস্থা ব্যক্তিকে এই দুরূহ উন্নতির জন্য নিজের একক আন্তর প্রচেষ্টার উপর ছেড়ে দেয়নি। তাকে দিয়েছে একটা কাঠামো জীবনে একটা ক্রমপারম্পর্য ও ক্রমধারা যাকে ঐ রকম উঠে চলবার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এই সমূহ সুবিধাই ছিল চতুরাশ্রমের লক্ষ্য। জীবন ভাগ করা ছিল চারটি স্বাভাবিক অঙ্গে, প্রত্যেক

ভাগে এই সাংস্কৃতিক জীবন ধারণের ভাবটি প্রস্ফুটিত। এখানে ছিল ছাত্রের জীবন, গৃহস্থের জীবন, বনবাসী বা সন্ন্যাসীর জীবন, সমাজমুক্ত সর্ববন্ধনহীন পরিব্রাজকের জীবন। মানুষের ভবিষ্য জ্ঞান কর্ম ও সম্ভূতির গোড়াপত্তনের জন্য ছাত্রজীবনের ব্যবস্থা। তা আবশ্যকীয় শিল্প বিজ্ঞান ও জ্ঞানের বিবিধ শাখায় দিয়েছিল একটা সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা, তার চেয়েও অধিকতর জোর দিয়েছিল ধর্মানুগ স্বভাব সংযমের উপর, আর গোড়ার যুগে অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে জুড়ে ছিল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বৈদিক তত্ত্বে পারঙ্গমতা। সেযুগে এ শিক্ষা দেওয়া হত শহর থেকে দূরে উপযুক্ত পরিবেশে, শিক্ষক যিনি স্বয়ং এই জীবনবৃত্ত পরিক্রমা শেষ করেছেন এবং প্রায়শ এমন ব্যক্তিই যিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষ সিদ্ধিলাভ করেছেন। পরে শিক্ষা আরো বুদ্ধিগত ও পার্থিব হয়ে উঠল, তার পীঠ হল শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং লক্ষ্য বেশি হল বিদ্যা ও আন্তরীণ চরিত্র-প্রস্তুতির চেয়ে বুদ্ধির উৎকর্ষ ও অনুশীলন। প্রারম্ভে আর্য মানব সত্যই বহুলাংশে প্রস্তুত হয়েছিল জীবনে চারটি অভীষ্টের জন্য—অর্থ কাম ধর্ম মোক্ষ। অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের জন্য গার্হস্থ জীবনে এসে প্রথম তিনটি উদ্দেশ্য সার্থক হল তার : জীবনের পাত্র পূর্ণ পান করতে গিয়ে তৃপ্ত হল তার প্রাকৃত প্রকৃতি, তার দাবিদাওয়া ও বাসনা-কামনা, সমাজের ঋণ ও দাবিও সে শোধ করল, কর্তব্য সম্পাদনের রীতির মধ্যে দিয়ে জীবনের শেষ মহান অধ্যায়ের জন্যও প্রস্তুত হয়ে উঠল। শেষ পর্বে বনবাসী হয়ে কতকটা নির্জনে থেকে সে তার আত্মার সত্যটি প্রস্ফুটিত করতে পারল। সমাজের কঠিন শাসন থেকে এই উত্তীর্ণ হওয়া স্বাধীন জীবনে ; তবে ইচ্ছা করলে তরুণদের আকৃষ্ট করে কিম্বা জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষুকে আশ্রয় দিয়ে শিক্ষক বা গুরুর আসন নিয়ে তার এই জ্ঞান দিয়ে যেত নূতন যুগের উঠতি মানুষদের। জীবনের শেষ অঙ্ক শেষ বন্ধনটুকু ফেলে দেবার, সামাজিক জীবনের সকল সম্বন্ধ কাটিয়ে এক আত্যন্তিক আধ্যাত্মিক অনাসক্তিতে বিশ্বপরিভ্রমণের অধিকার ছিল তার, শুধু ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে, বিশ্বাত্মার নিত্যসঙ্গী হয়ে, শাশ্বতের জন্য আত্মাকে তৈরি করে। এই চক্র মানতে সকলেই যে বাধ্য ছিল তা নয়। বিপুল অধিকাংশ কখনো প্রথম দুই পর্ব ছাড়িয়ে যায়নি ; অনেকে বনপর্বে বা বানপ্রস্থেই অস্ত গিয়েছে। একান্তই দুর্লভ কতিপয় শেষ দুঃসাধ্য যাত্রা নিয়েছে, নিয়েছে প্রাণ্যবাণ নির্জনবাসীর জীবন। গভীর চিন্তায় নির্দিষ্ট এই জীবনবৃত্ত মানবাত্মার সম্পূর্ণ ধারাটি লক্ষ্যে রেখেছে ; প্রত্যেকে তার বাস্তবিক উন্নতি অনুযায়ী এর থেকে সুবিধাটুকু নিতে পারে, পুরোপুরি লাভ আদায় করতে পারে অবশ্য তারাই যারা এই জীবনেই এ-বৃত্ত সম্পূর্ণ পরিক্রমার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত হতে পেরেছে।

এই প্রথম লক্ষ্য ও মহান ভিত্তির উপরই ভারতীয় সভ্যতার জন্ম ও বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে, সে হতে পেরেছে সমৃদ্ধ, উজ্জ্বল, অতুলনীয়। অস্তিত্বের পরম আধ্যাত্মিক উচ্চতার শৈল সম্ভাবনাটি তার দৃষ্টি জুড়ে থাকলেও সমভূমির জীবন সে অবহেলা করেনি। জীবন তার শহরের ব্যস্তসমস্ত জীবন ও গ্রামের মধ্যে, অরণ্যের স্বাধীনতায় ও অলক্ষ্যে, সর্বশেষের বলয়িত অনন্ত অন্তরীক্ষে। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে দৃঢ়পদক্ষেপে চলে সে দু'টিরই ওপারে দৃষ্টি ফেলেছে এবং অমরত্বে পৌঁছাবার শতসহস্র রাজপথ বের করেছে। এতে বাহ্য

প্রকৃতির পূর্তি হয় এবং তা পুরুষের অন্তর্লোকে এসে পৌঁছায় ; প্রাণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠে চলে চিত্তের মধ্যে। এই রকমে প্রতিষ্ঠ হয়ে, পরিশীলিত হয়ে প্রাচীন ভারতীয় জনতা সংস্কৃতি ও সভ্যতার এক বিস্ময়কর শিখরে উঠেছিল ; তার জীবনে ছিল উদার সুপ্রতিষ্ঠ পর্যাপ্ত বলবান শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা ; গড়ে তুলেছিল এক বিরাট সাহিত্য, নানা বিজ্ঞান, ললিতকলা, কারিগরি ও যন্ত্রশিল্প ; উঠেছিল যথাসম্ভব সমুচ্চ এক আদর্শে, এবং সেই সঙ্গে জ্ঞান ও সংস্কৃতির, দুরূহ মহত্ত্ব ও বীরত্ব, দাক্ষিণ্য, পরহিতব্রত, মানুষী সহৃদয়তা এবং একতার বিপুল প্রয়োগ ; আশ্চর্যকর সব অধ্যাত্ম দর্শনেরও জীবন্ত ভিত্তি রচনা করেছিল ; স্থূল প্রকৃতির রহস্য সব পরীক্ষা করেছিল এবং আন্তর সত্তার অসীম ও অলৌকিক সত্যগুলি আবিষ্কার করে জীবনে ধরেছিল ; আত্মার স্বরূপ জেনে বিশ্বকে বুঝেছিল এবং পেয়েছিল। ক্রমে সভ্যতা যেমন জটিল ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল সে-ও হারিয়ে ফেলল আদি ব্যবস্থার প্রথম সুন্দর সরলতাটি। বুদ্ধি চূড়ায় উঠল যেমন তেমনি বিস্তার লাভ করল, কিন্তু বোধি ম্লান হল অথবা পিছনে সরে সাধুসন্ত ও কুশলী রহস্যবাদীদের হৃদয়ে আশ্রয় নিল। অধিকতর গুরুত্ব পড়ল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, নির্ভুলতা এবং শৃঙ্খলার উপর, শুধু মন প্রাণের সব জিনিসের ব্যাপারেই নয়, অধ্যাত্ম বস্তুর বিষয়েও ; বোধিগত জ্ঞানের অবাধ প্রবাহ জোর করে বাঁধা হল পাকা প্রণালীতে। সমাজ হল আরো কৃত্রিম ও জটিল, আরো কম মুক্ত ও মহান ব্যক্তির বন্ধন যত হয়ে দাঁড়াল তত কিন্তু অধ্যাত্মবৃত্তির বিকাশের ক্ষেত্র হতে পারল না। প্রাচীনের সুন্দর পূর্ণাঙ্গ সৌধীনের স্থানে প্রধান হয়ে বসল তারই দু'একটি উপাদান। ধর্ম বাদ দিয়ে অর্থ ও কামের কিছু পরিপুষ্টি ঘটল। ধর্মের সূত্রগুলি এত স্পষ্ট কঠিনভাবে বাঁধা হল যে আত্মার স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াল। আধ্যাত্মিক মুক্তি সন্ধান হল জীবন-বৈরিতা, তার পূর্ণবিয়ব পরিণতি বা পরমোৎকর্ষ তো নয়ই। তা সত্ত্বেও পুরাণী প্রজ্ঞার শক্ত ভিত্তি কিছু থাকল ভারতাত্মাকে জীইয়ে রাখতে, অনুপ্রেরণা দিতে, সমন্বয়ে আনতে। যখন অবনতি এবং নশ্বর চরণে পতনটি এল, যখন সমষ্টিগত জীবন বেশ কষ্টে ডুবল শিলীভূত অজ্ঞান ও বিশৃঙ্খলায়, তখনও কিন্তু সেই চরম দুর্দিনে প্রাচীন আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও ঐতিহ্য অটুট থেকে ভারতবাসীকে মাধুর্যে ও মানবতায় সিঞ্চিত করে বাঁচিয়েছে। কারণ, দেখতে পাই নব নব তরঙ্গে ও প্রাণসঞ্জীবনী শক্তির উত্তাল প্লাবনে সে নিরবচ্ছিন্ন ঝাঁপিয়ে পড়েছে জাতির বক্ষে, অথবা উদ্দীপ্ত শিখায় লাফিয়ে উঠেছে অধ্যাত্মের রসে রঞ্জিত মন ও হৃদয়ে, ঠিক যেমন সে এখন আবার তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে পুনরুত্থানে চলেছে—এক বিরাট নবজন্মের প্রবেগ জাগিয়ে।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা

পঞ্চম

সোমবার, ১৮ জানুয়ারি ১৯২৬

প্রশ্ন : মনকে আমি সম্পূর্ণ চিন্তাশূন্য করতে পেরেছি কেবল কয়েক মিনিটের জন্য। তখন চিন্তার সকল তরঙ্গই থেমে গেল। তবু চেতনা রয়ে গেল পার্থিব স্তরে, অর্থাৎ আমি সব কিছুই দেখছি ও শুনছি, যদিও তাতে চিন্তার কাজ হচ্ছে না। মাঝে মাঝে বোধ হয়েছে যেন আমি সব ছেড়ে চলে যাচ্ছি, সে সময়ে আমার শ্বাসকষ্ট হলো, সব কিছু ঘুরতে লাগল, কিন্তু চেতনা রইল স্থির ও একাগ্র। নিশ্বাস থামিয়ে দিতে পারলে চেতনা নিশ্চয় বদ্‌লে যেতো।

শ্রীঅরবিন্দের উত্তর : ওটা হলো দেহ ছেড়ে যাবার কথা। এখন সে চেষ্টা করতে যাওয়া ঠিক নয়। প্রথম চাই নিজেকে আরো বেশি আয়ত্তে আনা (যেমন প্রসারিত হওয়া), তা ছাড়া আরো কিছু চাই, কোনোমতে বিচলিত হবোনা এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হওয়া। সাধারণত যোগীরা এটাই বেশি চেষ্টা করে। সকলে তা পারেনা। আমি বলি এখন ও সব কোরো না, স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নেবে।

তুমি স্থির নীরবতার স্পর্শ পেয়েছ। ওটাই আরো ব্যাপক হোক, গভীরের দিকে নয়। আর চেষ্টা করো যাতে ঐ ভাব আরো অনেকক্ষণ থাকে আর তোমার পারিপার্শ্বিককে ঘিরে থাকে।

শুক্রবার, ২২ জানুয়ারি ১৯২৬

প্রশ্ন : এ কয়দিনে বিশেষ উন্নতি কিছু হয়নি, কারণ মন উচাটন ছিল নানা বিষয় নিয়ে। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু এবার কি করব জানিনা ; মন ভাগ হয়ে গেছে দুই অংশে। প্রথম অংশটি কথা বলে, যুক্তিবিচার করে, জল্পনা করে, সে অংশ এখন নীরব। তবু লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে কণ্ঠের মধ্যে অবান্তর চিন্তা গজিয়ে উঠে শান্তি নষ্ট না করে। আর অন্য অংশটি শুধু একাগ্র হয়ে দেখে আভ্যন্তরীণ প্রতিবিম্ব কি হচ্ছে যার কেন্দ্র হলো আজ্ঞাচক্র। প্রথম অংশটি নিষ্ক্রিয় হলেও একেবারে নীরব থাকেনা, এদিক ওদিক করতে থাকে, কি করবে তা ঠিক পায়না।

উত্তর : চিন্তার প্রথম উৎপত্তি হয় নাভিকেন্দ্রে (solar plexus), সেখান থেকে কণ্ঠ দিয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে সেখানে চেতন হয়। কিন্তু স্থির মনের কোনো কেন্দ্র নেই ;

ওটি অভ্যাসের ব্যাপার। এখন ওকে স্থান দিয়েছ মস্তিষ্কে, কিন্তু ওর আসল স্থান সহস্রারে যেখানে অতিমানস সত্যের স্থান। সেই চেতনাই আরো উপরে ছড়িয়ে গিয়ে হবে বিশ্ব-চেতনা।

এখন করতে হবে দুটি জিনিস। প্রথমত সক্রিয় মনকে চিন্তাশূন্য ক'রে নিশ্চল রাখা। এটা খুবই কাজের। আর দ্বিতীয়ত সক্রিয় মনে যে চিন্তাতরঙ্গ এসে পড়ে তার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা। তখন দেখতে পাবে ঐ সব তরঙ্গ নিচের থেকে আসছে না, আসছে আশপাশ থেকে। তখন ওর সত্যকে তুমি চিনবে। এ সব চিন্তাকে তখন বাইরের জিনিস বলেই জানবে, তার সঙ্গে নিজেকে আর জড়াবে না। আর এখন থেকে তুমি নিম্নতর মনকে নীরব রেখে চাইবে কেবল "উপর দিকে", ক্রমশ চেতনাকে সেই দিকেই কেন্দ্রীভূত করবে।

প্রশ্ন যখন সে চেষ্টা করি তখন আমার চেতনা দোলায়িত হতে থাকে উপরে আর নিচে, কারণ নিচের অংশের দিকেও আমাকে নজর রাখতে হয়। আর একটা লম্বা একটানা কিছু শব্দ হতে থাকলে তখন তাতে আমার চিন্তাকে জাগিয়ে তোলেনা বটে, কিন্তু মন সেই শব্দের দিকে লেগে থাকে।

উত্তর : সেটা ঠিক একাগ্রতা হলোনা! সেই শব্দকে একপাশে সরিয়ে দেবে। কেবল বিশ্বচেতনার ক্ষেত্রে তোমার মধ্যে এই ভাবটি আসবে যেন শব্দটা হচ্ছে তারই কোনো-খানে, কিন্তু তোমাকে তা স্পর্শ করছে না।

সোমবার, ২৫ জানুয়ারি ১৯২৬

প্রশ্ন সময় সময় আমি "উপরের" দিকে (সহস্রারে) মনকে একাগ্র রেখে শান্ত ও চিন্তাশূন্য করতে পারি, কিন্তু সেখানে দরজা ঠেলে দেখি সকল দরজা বন্ধ।

আজ সকালে এক কাণ্ড হলো। ঘুম ভেঙে উঠলাম মাথার তালুতে ও নাভিতে একরূপ প্রবল স্পন্দন বেগ নিয়ে। মাথার তালুতে সেটা স্থূলভাবে স্পষ্টই অনুভব করতে থাকলাম। তার সঙ্গে বেশ কষ্টও হচ্ছিল যদিও তাতে ভয় না পেয়ে আমি ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলাম।

উত্তর : এ সব জিনিসের জন্য তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। উচ্চশক্তিকে তুমি ডেকেছ, সে নেমে আসছে যন্ত্রগুলিকে আর দেহকে পর্যন্ত প্রস্তুত করে নিতে। মানুষের ভিতরকার সব কিছুই সেই শক্তির বিরোধী, কিন্তু তার রূপান্তর হওয়া দরকার। এমন কি কোষগুলিরও রূপান্তর হওয়া চাই।

ভয় জিনিসটা পুরোপুরি বর্জন করতে হবে। বিপজ্জনক কিছু হতে দেখলেও থাকতে হবে শান্ত ও সংহত হয়ে, নতুবা বিপদ জোর ক'রে চেপে ধরবে। নিজে স্থির হয়ে থাকলে তখন উপরের সাহায্যও মিলবে। এখানে তা সহজে হয়—ডাক দিলেই জবাব আসে যদিও সব সময়ে মেলেনা।

প্রশ্ন মানসিক অবস্থা আরো পরিষ্কার হচ্ছে—তার একটা দিকে কেবল আনন্দ, শান্তি ও উন্মুখ সাধনা—কিন্তু অন্য দিকে যখন কোনো বাহ্য কারণে সাধনাতে বাধা এসে পড়ে তখন ভিতরকার আলো হারিয়ে মন উচাটন হয় আর এসে পড়ে গভীর বিষাদ।

উত্তর ওটা স্বাভাবিক জিনিস, এবং তা চৈত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

(অতঃপর ফ্রান্স থেকে ভারতে এসে কাজ করতে ইচ্ছুক এক মহিলা Z-এর লিখিত পত্র সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা হলো।)

সোমবার, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬

প্রশ্ন : কয়দিন থেকে মনকে নিয়ে খুব গণ্ডগোল চলেছে। এক এক সময় যখন উপরে উঠে যাই তখন সবই ঠিক থাকে। কিন্তু অন্যান্য সময় সমস্ত বিগড়ে যায়। তখন ধ্যান করা বেশ কষ্টকর হয় আর তাতে ফলও কিছু হয় না। আবার কখনো বা মনে হয় যে আড়ালকরা পর্দাটা খুবই পাতলা। সব চেয়ে ভালো হয় অনেকটা উপরে উঠে গেলে—তাতে নিরাপত্তা ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। তিনটি চক্র—সহস্রার, আজ্ঞাচক্র ও নাভি, তখন মিলে যায়। ধ্যান যখন করিনা তখন মন থাকে অস্থির হয়ে, কোনোরূপ একাগ্র হওয়া, এমন কি কিছু পড়াও তখন কষ্টকর হয়। এই সব বিঘ্ন আসে কোথা থেকে? আমি কি ধ্যান ও সাধনাতে আরো বেশি ক'রে জোর দেবো?

উত্তর তোমার যা হচ্ছে এগুলো খুব সাধারণ। সক্রিয় মনে ততই বেশি জোর আসে (স্থূল যান্ত্রিক মনে নয়, যা কেবল জীবনের সাধারণ কাজ ও সাধারণ চিন্তা নিয়েই থাকে), যতই উচ্চতর অংশগুলি প্রশান্ত ও স্থির হয়ে নীরব হয়ে থাকে। আর "পূর্ব ভাব" ফিরে এলেই তখন ধ্যানের গভীরতা নষ্ট হয়ে গণ্ডগোল বাধে। এটা সাধারণ অভিজ্ঞতা। ওতে কোনো ভয় না পেয়ে তুমি উত্তরোত্তর বিমুক্ত থাকতে চেষ্টা করবে। সে চেষ্টা সফল হলে তখন ঐ সব তরঙ্গাঘাত করতে করতে ক্রমশ থেমে যাবে। এ অনুভূতিকে চেতন জীবনের সকল কাজেই লাগাবে, কেবল ধ্যানের সময় নয়।

যখন ক্লান্ত বোধ করবে তখন জোর করতে যেওনা। তাতে আরো দেরি হবে। তার চেয়ে ধীরে সুস্থে সুনিশ্চিত গতিতে অল্প অল্প এগোতে থাকাই ভালো।

তোমার সেই Z নামক ফরাসী মেয়েটির চিঠির সম্বন্ধে। আমার মনে হয় সে এখন এমন অবস্থায় আছে যাতে সত্যের সঙ্গে তার নিজের মনের তৈরি ধারণার কি পার্থক্য তা জানেনা। তার এই বইখানিতে সে লিখছে যে সে মনে করে খ্রীষ্টের নাম জগতে প্রচার করতে সে আদিষ্ট। আবার চিঠিতে লিখছে যে আপন বিচারশক্তি সম্বন্ধে সে সন্দিহান। তাহলে সন্দেহস্থলে সে ও কথার মূল্য দিচ্ছে কেন? সে লিখছে, "এ কাজের শক্তি কিছু আছেই, আর আমি জানি যে তা আমারই ভিতরকার শক্তি (তোমারও বলতে পারো), তা আমাকে, ঠকাবেনা।" এমনি করেই অনেকের পতন হয়। যেমনি তারা দেখে যে সাধারণের চেয়ে বেশি কিছু উচ্চতর অনুভূতি এলো, অমনি ভাবে যে তাই হলো আসল সত্য। আর যখন বিশ্বশক্তি তাদের মধ্যে প্রবেশ করে তখন তার সমগ্র সত্য তাকে নিয়ে আপন স্বার্থের কাজে লাগায়। মেয়েটির এ বইটিতে আগাগোড়াই ঐরূপ কথা, এতে কেবল তার আলোক-প্রাপ্ত উচ্চ মনের সঙ্গে সাধারণ মনের সংলাপ। যেন কোনো উচ্চ সত্তা বা দেবসত্তার সঙ্গে তার চেতন সত্তা কথা বলছে।

এমনি কত কিছুই যে নিচের দিক থেকে উপরে ঢুকে আসে। আমি সেটা জানি, কারণ আমার নিজের বেলাতেও দীর্ঘকাল তাই হয়েছিল। কিন্তু মনকে আমি বরাবরই সতর্ক ক'রে রেখেছিলাম। এমন ভাব আসা খুব সাধারণ, বিশেষ ক্ষমতা না থাকলে সত্যের থেকে একে পৃথক করা প্রথমে খুবই কঠিন হয়। ঐকান্তিকতা পুরোপুরি থাকা চাই—সাধারণ মনের চেয়ে যা আরো গভীরতর জিনিস, এমনই যা পূর্ণ সত্যে না পৌঁছে কিছুতেই থামতে চায়না, কেবল সোজা এগিয়ে চলে।

তুমি যখন প্রথম আমার কাছে এলে তখন অনায়াসে তোমার পূর্বধারণাগুলো ছেড়ে দিতে পারলে, কিন্তু ব্যক্তিগত অনুভূতি মিশে থাকলে তা ছাড়তে পারা কঠিন হতো।

আমাদের মধ্যে যদি কিছুমাত্র গর্বের লেশ থাকে—দীনতার আড়ালে অচেতনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তাহলে নিজের কাছে নিজেকে বড়ো ক'রে দেখতে থাকি, মনে করি আমি বিশেষ কিছু করবার জন্য আদিষ্ট। এ মেয়ে তাই করেছে, শিষ্য নিচ্ছে লিখেছে। এটা খুব সাধারণ ফাঁদে পড়া। আশা করা যাক যে ওর চিঠিতে উক্ত এই সন্দেহ ওকে এই সব মোহ থেকে মুক্ত করবে।

শুক্রবার, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬

প্রশ্ন: এই ক'টা দিন ভালোই গেছে—সহজেই একাগ্রতা এসেছে আর মনের নিস্পৃহ ভাবও বজায় থেকেছে। নিজেকে মন থেকে পৃথক রেখে আমি ওর ক্রিয়াগুলো লক্ষ্য করেছি। ওকে স্থির নীরব ক'রে রাখতে আমাকে দেহ থেকে নিজেকে সরিয়ে সহস্রারের দিকে একাগ্র হতে হয়েছে—তখন কিন্তু শ্বাসকষ্ট হয়েছে।

উত্তর উচ্চ জগৎ সম্বন্ধে জানবার জন্য দুটি ক্রিয়া আছে। একটি হলো, দেহ-চেতনার মধ্যে থেকেই সত্তার একটা অংশকে উপর দিকে পাঠানো। অপরটি হলো, দেহ-চেতনাকে লোপ ক'রে সমাধিপ্রাপ্তি, অনেকটা অজ্ঞান অবস্থার মতো। এটা তোমার পক্ষে চলবে না। সম্ভবত তুমি এই দুটি জিনিসকে মিশিয়ে ফেলছ, মনকে নীরব করা আর দেহ-চেতনাকে ছেড়ে যাওয়া।

প্রশ্ন তা হতে পারে। ধ্যানের সময় কতকগুলি ক্রিয়া দেখি আমার প্রাণময় দেহে, ঠিক স্থূলদেহে নয় যদিও দেহে তা বোধ করি, বিশেষত বুকে আর মাথায়।

উত্তর উচ্চ দেহের ক্রিয়াও স্থূলদেহে জানা যায়। কিন্তু তা হয় ওর ফল স্বরূপ (যেমন তোমার ঐ শ্বাসকষ্ট) যাতে দেহকে ছেড়ে যাবার প্রয়াস হতে থাকে। ওর কোনো দরকার নেই। কেবল চেতনার এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থাতে যাওয়ার কথা জানতে পারলেই হলো।

এখন তুমি মনের স্থিরতা এনে স্থূলমনের ক্রিয়া থেকে পৃথক হতে পারছ, এখন ঐ সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে কেবল প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষা নিয়ে থাকো, উপর থেকে নেমে আসা ক্রিয়ার জন্য,—উপরে উঠে যাবার চেষ্টা না ক'রে কেবল নিজেকে খুলে রাখো যাতে সেখান থেকে কিছু নেমে আসে। "দেখতে" কিংবা "বোধ করতে" চেষ্টা করোনা। শুধু শান্ত ও নীরব থেকে কেবল অপেক্ষা করো—যা হাতের কাছে আছে তেমন তার জন্য সহজ আগ্রহ নিয়ে।

বৃহস্পতিবার, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬

প্রশ্ন দুটি ক্রিয়া নিয়ে আমি গুলিয়ে ফেলেছি সক্রিয় মনকে নীরব করা আর দেহকে ছেড়ে যাওয়া। তাতেই মনকে নীরব করতে আমাকে বারে বারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়েছে। সেটা পারলেও তা সব সময়ে হয়না, কারণ ক্রিয়াধর্মী মন খুবই সক্রিয় হয়ে ওঠে, সর্বক্ষণই তাকে সামলাতে হয়। শান্তি আসে কতকটা আপেক্ষিকভাবে চারিপাশের স্বচ্ছ পরিবেশের মধ্যে অনড় ও নিবিষ্ট হয়ে থাকি, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। এর চেয়ে আরো গভীরতর শান্তি আমি চাই যাতে "আমিত্ব-বোধ" জিনিসটা থাকবে না।

মুশকিল হয় মনকে নীরব রেখে সেই সঙ্গেই উপরের দিকে নিবেদিত হতে।

এ কয়দিন একটু বেশি বেশি ধ্যান করতে গিয়ে খুব চাপ বোধ করেছি। এখন দৈনিক তিন ঘন্টাতে ফিরে এসেছি। দাঁত কন্‌কন্ শুরু হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এ রকম কষ্টদায়ক হয় কেন? জড়তা বা বিশ্রাম আমি চাই না, কিন্তু শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য চাই, কষ্ট যেন না হয়।

উত্তর গভীর শান্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আসেনা যতক্ষণ "পদ্মগুলি" উন্মীলিত হয়ে সেখানে দিব্যশক্তি নেমে এসে তাকে অধিকার না করে। তা ছাড়া তোমার আসল ব্যক্তিত্ব ও মোহগ্রস্ত আমিত্ব-বোধকে পৃথক ক'রে নেওয়া দরকার। প্রকৃত ব্যক্তিত্ব হলো বিশ্ব-চেতনারই একটা টুকরো, ওর মধ্যে বিলীন হলেও তার আপন পার্থক্যটুকু থাকবে। তাতেই সুশৃঙ্খলে কাজ হবে, নতুবা অসম্ভব।

উচ্চশক্তি এসে যতই ক্রমশ তোমাকে অধিকার করবে ততই কষ্টপ্রশ্বাস কমে যাবে; কিন্তু পুরোপুরি অধিকৃত হলে তখন আর স্বতন্ত্র রকমের চেষ্টার প্রয়োজন থাকবে না।

এ ছাড়া অন্যান্য রকমের বিপত্তিও আসতে পারে। তোমার মধ্যে যে কেন্দ্রগুলি এখন সক্রিয় তা নাভিকেন্দ্রের উপর দিকের, অন্যগুলি এখনও সুপ্ত। সেগুলি জেগে উঠলে তখন নীরব সংহত মনও আবার আক্রান্ত হয়ে নাকানিচুবানি খাবে। প্রকৃত বিপত্তি আসবে তখনই মনের দিকের একটা অংশ সহায়ক হয়েই থাকে। কিন্তু এখানে জীবন ও কর্মের সঙ্গে সব কিছু বাঁধা।

তুমি যখন নাভিকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ অনুভব করতে পারো তখন ওটা চালিয়ে যাও ধ্যানের সময় ছাড়া। আর তুমি বলছ যে ধ্যানের বাইরে যা কিছু করো তাতে মনকে আবার চঞ্চল করে। ওতে কোনো ক্ষতি নেই—এমন হয়না যে মন কোনো কিছু করবে না। সকল ডিসিপ্লিনেই সময় লাগে। তুমি হলে সেই দলের যারা মনের উপর দিয়েই সব কিছু গড়ে নেয়—তাতেই হয়েছে মুশকিল। অন্যেরা সহজে খুলতে পারে। অধৈর্য হয়ো না, তাতে চেষ্টা বিলম্বিত হয়।

সোমবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬

প্রশ্ন সাধনার ফল টের পাই ধ্যানের বাইরে। সাক্ষী হয়ে মনের ও দেহের ক্রিয়া লক্ষ্য করাও উত্তরোত্তর সহজ হয়ে আসছে। এতে অচাঞ্চল্য আসে, কিন্তু মন এখনও তেমন নীরব নয়। ওতে আমি মনের চঞ্চল ক্রিয়া বুঝতে পারি; আগে যাকে মনে করতাম আমারই চাঞ্চল্য, এখন তাকে মনের তরফের ক্রিয়া বলে দেখতে পাচ্ছি।

উত্তর: আসল কাজ হলো এই সাক্ষী বা পুরুষ চেতনাকে আরো গভীরভাবে বাড়িয়ে তোলা। অবশ্য মনের নীরবতা খুবই দামী, কিন্তু তা সময়মত আসবে। এই সাক্ষী চেতনা বেড়ে গিয়ে আসবে গভীরতর চেতনা। তা ছাড়া এও কি নীরবতা নয়?

প্রশ্ন এখানে আসার আগে আমি ধূমপান করতাম, পরে ছেড়ে দিই। এখন আবার প্রায়ই ইচ্ছা হয় ধূমপান করতে। কি করা উচিত?

উত্তর ওর এমন কোনো বাঁধা নিয়ম নেই, ওজনও কিছু নেই। ধূমপান আমিও করি। তবে ছেড়ে দিলে একটা বিশুদ্ধ ভাব আসে। যখন তুমি ছেড়েছ তখন আবার না ধরাই ভালো।

প্রশ্ন আর ঘুমের সময়টা তো বৃথা নষ্ট হয়। ঐ সময়টাও কাজে লাগানো যায়না?

উত্তর বৃথা নষ্ট হয়? সাধনার সবটাই যে সজ্ঞান প্রচেষ্টা তা নয়। শেষে যা হয় তা কঠিন জিনিস। দেহকে বিশ্রাম দাও, কিন্তু আভ্যন্তর সত্তার সুপ্তিকে বন্ধ করতে পারোনা। পরে এই ঘুম জিনিসটাও ক্রমে কাজের অন্তর্গত হবে।

সোমবার, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬

প্রশ্ন মন থেকে নিজেকে এখন পৃথক করতে পারি। নিষ্ক্রিয় সাক্ষী হয়ে সহজেই ব্যক্তিসত্তার ক্রিয়া দেখতে পাই। কিন্তু 'আমি' হয়ে এখানে থাকি যেন মনঃসত্তারূপে মস্তিষ্ক কেন্দ্রে। এই মনঃসত্তার অন্তরালে আর কিছুকে দেখি যা সকল ক্রিয়া থেকে মুক্ত। সেই আমার মূল সত্তা যা ঐ মনঃসত্তার জানলা দিয়ে সব কিছু দেখে। আমি তার আভাসমাত্র পাই। সে কোন জিনিস? বুঝি না, কেবল মনে হয় সব যেন ফাঁকি মেকি। কিন্তু একটা পর্দাও রয়েছে দেখি যার পিছনে কিছু উপস্থিতি হয়তো মিলবে!

উত্তর তুমি সাক্ষী হয়ে দেখ সক্রিয়ভাবে না নিষ্ক্রিয়ভাবে?

প্রশ্ন নিষ্ক্রিয়। তবে এমন নয় যে চলন্ত ছবির মতো ক্রিয়াগুলো দেখছি। বা প্রতিচ্ছবি দেখি তা অস্পষ্ট, টুকরো টুকরো, সমুদ্রতরঙ্গ থেমে থেমে আসার মতো। তবে সংবেদনযুক্ত স্পষ্ট ছবিতেই বিচলিত করে।

উত্তর: নিজেকে মনোময় সত্তা বলে বোধ করো কি?

প্রশ্ন যখন মনের স্তরে থাকি তখন তাই বটে। কিন্তু যখন উপরে উঠে যাই তখন আর তা নয়। মনোময় সত্তা যেন আসল সত্তার একটা মুখোস। স্পষ্ট রাস্তাটা এখন দেখতে পাচ্ছি। দিব্যশক্তির কাছে যদি নিজেকে সমর্পণ করতে পারি তাহলে সেই আমার যোগের সবস্ত ভার নেবে এটা বুঝেছি। আমার চৈত্য সমর্পিত হয়েছে, মনও তা মেনে নিয়েছে, কিন্তু প্রাণের কোনো কোনো অংশ বাধা দিয়ে পিছু টানছে। এ সব দেখতে পেয়ে দিব্যশক্তির কাছে ভালো মন্দ সমস্তই নিবেদন করছি। আগে ওতে ঘাবড়ে যেতাম, এখন শান্ত থাকি।

উত্তর: উত্তম কথা। এই চালিয়ে যাও। আর কিছু বলবে? সেই Z-এর চিঠির উত্তর দিলে?

প্রশ্ন সে আসবে, তার টেলিগ্রামের অপেক্ষা করছি। ষ্টেশনে তাকে আনতে যাবো, মাদ্রাজ বা ত্রিচিনোপল্লিতে যাবার দরকার নেই।

উত্তর সে আসছে আনুমানিক কাজ ছকে নিয়ে। কিন্তু সে যেমন মনে করে, ভারত তো তাই নয়, ভারত হলো ভারত। এখানে বিদেশী যা কিছু আসে তা হয়তো এখানকার সঙ্গে একেবারে মিশে যায় কিংবা একেবারে ছাঁটাই হয়ে যায়। আর এখানকার জীবনধারাও ইউরোপ থেকে ভিন্ন। এখানে কোনো কাজ করা সম্বন্ধে ধারণা আসে সাধারণত মনের প্রেরণা থেকে। মনের একটা অংশ উপরে উঠে গিয়ে যখন নিচে নামে তখন ভাবে সে আলোকপ্রেরণা পেয়েছে, এবং তাই নিয়ে মন তখন গুরুতর কিছু করতে চায়। কিন্তু যা সত্যই করা দরকার তা যদি খুব নগণ্য কাজও হয়, তবু তার গুরুত্ব সমানই থাকবে ; সে কাজের নির্দেশ থাকবে পশ্চাতে। তাই-ই দিব্য কর্ম—কিন্তু তার জন্য পুরো যোগ্যতা থাকা চাই। অনেকে আছে যাদের পুরো যোগ্যতা দরকার হয় না, তারা ইঙ্গিতে একটা কাজের জন্য তাগিদ পায়, আর তাদের মন আপন ইচ্ছায় সে কাজ করে। কিন্তু আমি বলছি আধ্যাত্মিক কাজ সম্বন্ধে—যাদের যন্ত্র সেই ভাবে তৈরি হবে তারাই তেমন কাজ পাবে।

অবশ্য সকল কাজই একটা প্রস্তুতি। তোমার বন্ধুরা X প্রভৃতি...এদের অবস্থাও ঐ Z-এর মতো।...তারা না জানলেও কেবল মনই তাদের প্রেরণা দিচ্ছে। সে মোহ ঘোচাতে হবে : তাহলে যোগের পক্ষে সব কাজই ভালো হবে।

কিন্তু এ সব কথা Zকে বলে কাজ নেই...জানিনা এখানে এলে আমার কথাগুলি শুনেই সে সত্য দেখতে পাবে কিনা। হয়তো তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই তা জানতে হবে ; কারণ জীবনের অভিজ্ঞতাই পরশপাথরের মতো কাজ করে। যতক্ষণ কেবল ভাবরাজ্যে থাকো ততক্ষণ সত্য কথাটি জানতে পারোনা, কিন্তু জানতে চাইলে অভিজ্ঞতাই তোমাকে শিখিয়ে দেয়। সত্যকে জানা চাই সমগ্র সত্তা দিয়ে। ঐ মেয়েটি যদি আপন মনের ধারণাকে জোর ক'রে চেপে রাখে, তবুও তার প্রবণতা থেকেই যাবে, আবার তা জোর করবে, এবং তার ফল খারাপও হতে পারে। তার চেয়ে বরং তার নিজের অনুভূতির ভিতর দিয়েই চেষ্টা আসুক ; অপরের অভিজ্ঞতায় কাজ হবে না।

তুমি তাকে লিখতে পারো যে তুমি কেবল সাধনা নিয়েই আছো, অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়েছ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে সে এখানে আসতে পারে।

একটা কিছু কাজের জন্য আমি আদিষ্ট, এমন ধারণা করা নারাত্মক। যারা কোনো কিছু করবার জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠে তাদের মধ্যেই অমন ভাব আসে। মনই তাদের মনের কাছে অমন কথা বলছে এটা তারা লক্ষ্য করে না। প্রকৃত কাজের প্রেরণা ঐভাবে আসে না, তার আসার প্রণালী সম্পূর্ণ অন্যরকম।

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

আগস্ট, ১৯৫৩

প্রশ্ন লোকের চোখ দেখে কেমন ক'রে আপনি তাদের চরিত্রের কথা জানেন?

উত্তর: কেবল চোখ দেখে নয়। চরিত্র জানা যায় তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে। তা ছাড়া বাহ্যত: বলতে গেলে চোখ হলো জানলা দরজার মতো। কেউ কেউ এমন খোলা থাকে যে তার ভিতর দিয়ে গভীরভাবে প্রবেশ ক'রে তুমি দেখতে পাবে যে সেখানে কি হচ্ছে। কেউ কেউ আবার কতকটা খোলা কতক বন্ধ; কেউ কেউ একরকম পর্দার আড়াল দেওয়া আর কেউ কেউ এমন এঁটে বন্ধ করা যে কিছুতে খোলা যাবে না। তাতেও খানিকটা বোঝা যায়—তাদের আভ্যন্তর জীবন কেমন, তাদের সত্তার কতটা স্বচ্ছতা ও কতটা ঐকান্তিকতা তা টের পাওয়া যায়। দরজা যাদের খোলা থাকে তাদের মধ্যে ঢুকে আমি তাদের সঙ্গে একাত্ম হই। তখন তারা যা দেখে আমিও তা দেখি, তারা কি বুঝছে তা বুঝতে পারি, যা ভাবছে তা জানতে পারি, যা করছে তাও করতে পারি (যদিও তা করি না!)—এমনি ক'রে তাদের সবই জানতে পারি। এতে একটুও সময় লাগে না, তখনই হয়ে যায়। এমন কি ফটোর দ্বারাও তা হয়, যদিও ততটা ভালো নয়। কারণ ফটো হলো সেই একটা মুহূর্তের ছবি, যদি অনেকগুলো ফটো পাই...না হলেও ভালো ক'রে দেখলে একটা ফটো থেকেও যথেষ্ট সঠিক ধারণা নেলে। কিন্তু প্রকৃত জানা হলো তাদাত্ম্যের দ্বারা, অর্থাৎ যা জানতে চাও তোমাকে তাই হতে হবে। নতুবা তুমি আন্দাজ করতে পারো, ধারণা করতে পারো, বিচারে সাব্যস্ত করতে পারো, কিন্তু সঠিক জানা হবেনা।

প্রশ্ন: তাহলে মানুষের পক্ষে তা করা কঠিন?

উত্তর: না, তা কেন? একাত্ম হতে শেখা যায়, তা শিখে নিতে হয়। আত্মাভিমান ছাড়তে হলে তা শেখা দরকার। নিজের অহং নিয়ে তাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকলে কোনো কিছু উন্নতি হয় না।

প্রশ্ন: কেমন ক'রে একাত্ম হওয়া যায়?

উত্তর: তার অনেক উপায় আছে। একটার কথা বলি।

প্যারিসে থাকতে আমি বহু জায়গাতে বহু রকমের মজলিশে যেতাম, বিশেষ যেখানে আধ্যাত্মিক (তথাকথিত) ও গুহ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা চলত। একবার এক তরুণী

মহিলাকে (সম্ভবত সুইডেন থেকে) আমন্ত্রণ করে আনা হলো, প্রকৃত জানবার কি উপায় তা শেখাবার জন্য। আমরা সেখানে তিন চার জন ছিলাম (মেয়েটি ভালো ফরাসী না জানলেও বেশ স্পষ্টভাবে তার বক্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছিল)। সে বললে "যা হোক একটা জিনিস বেছে নাও, একটা ছবি বা ফিগার বা অন্য কিছু—তাতে যায় আসেনা। মনে করো আমার আঁকা এই ছবিটা।" সে কতকটা জ্যামিতির মতো একটা রেখাচিত্র আঁকলে বোর্ডে। বললে "এখন এর সামনে বসে তোমার সমস্ত মনোযোগ দিয়ে এর মধ্যে একাগ্র হয়ে যাও। এমন হবে যাতে ঐটি ছাড়া অন্য কিছুই তোমার চেতনাতে না থাকে। দৃষ্টিকে ওরই মধ্যে নিমগ্ন করো, অন্যদিকে ফিরে চেও না। ঐ ছবিতেই যেন তন্ময় হয়ে গেছ। এইরকম ক'রে (নিজে দেখিয়ে দিলে) কেবল চেয়ে থাকো আর চেয়ে থাকো।...কতক্ষণ কার সময় লাগবে তা বলতে পারিনা, যার অভ্যাস আছে তার তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। চেয়ে থাকতে থাকতে তুমি নিজেই এক সময় হয়ে যাবে ঐ ছবি, তখন তোমার কাছে জগতে ও ছাড়া আর কিছুই নেই, হঠাৎ তখন তুমি ওর ওপারে চলে যাবে ; তখন তুমি নতুন এক চেতনা পাবে, যাতে তুমি ওকে জানবে।"

মজার কথা ভেবে আমরা তখন খুব হেসেছিলাম। কিন্তু জিনিসটা খুব খাঁটি, এ রীতিমত অভ্যাস করার মতো শিক্ষা। ছবির বদলে তুমি কোনো একটা ভাব কিংবা কথাকে নিয়েও তাই করতে পারো। হয়তো কোনো একটা সমস্যা যার জবাব তুমি জানোনা সেটিকে সুনির্দিষ্ট ভাষাতে স্পষ্টভাবে গড়ে নিয়ে তার দিকে একাগ্র হয়ে থাকো ঐ ছাড়া আর অন্য কিছুর কথা না ভেবে ওতেই এমন একাগ্র হয়ে যাও যাতে তোমার চেতনা ঐ জিনিসেই ভরে থাকে, ও ছাড়া অন্য কিছু চেতনাতে না থাকে। তখন নিশ্চয় দেখবে যে হঠাৎ কোথাও কিছু খুলে গিয়ে তুমি ওপারে চলে গেছ। কিসের ওপার ?...তার মানে তোমার চেতনার পিছনের একটা দরজা খুলে গিয়ে তুমি ওর সমাধানে পৌঁছে গেছ।

তাদাত্ম্য আনতে পারার এ এক সুন্দর উপায়।

মনে করো তুমি একজনের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছ। সে যা বলছে তুমি বলছ তার উল্টো কথা (এমন মতবিরোধ প্রায়ই হয়)। তর্ক করতে গিয়ে তোমার রাগ হচ্ছে, যদিও ঝগড়া হচ্ছেনা কিন্তু ফয়সালাও কিছু হচ্ছে না। তখন যদি অমন না ক'রে এটা ভাবো "আচ্ছা দেখিনা লোকটি কেন ঐ কথা বলছে ?" আর কেবলই ভাবতে থাকো, "কেন, কেন, কেন ?" তুমি এদিকে ঐ কেনটাই ভাবতে থাকলে আর সে নির্বিবাদে তার কথাগুলো বলতে থাকলো, মনে করলে যে তার কথা হয়তো তুমি মেনে নিলে। তুমি কিন্তু ঐভাবে একাগ্র হয়ে থাকলে ওরই ভিতর দিয়ে ওর মাথার মধ্যে ঢুকে যাবে। একবার ঢুকতে পারলে তখন তার চিন্তাধারাকে হঠাৎ তুমি আয়ত্ত ক'রে ফেলবে, আর আশ্চর্য এই যে তখন তুমি স্পষ্টই জানবে যে কেন লোকটি অমন কথা বলছে ! আর একটু তীক্ষ্ণবুদ্ধি হলে তুমি

আগে যা বুঝেছিলে আর এখন যা বুঝলে এই দুটি জিনিসকে সামনাসামনি ধরে দেখে সামঞ্জস্য এনে সত্যটি আবিষ্কার করবে। এইভাবে অভ্যাস করলে মনের প্রসার ও উন্নতি হয়।

কোনো তর্ক উঠলে তখনই তুমি নীরব হয়ে যাবে। কিছুই না বলে কেবল দেখবে যে অপরজন কোন দৃষ্টি নিয়ে তার কথা বলছে, যদিও নিজের দৃষ্টিভঙ্গী তোমার ঠিক থাকবে। তাহলে দুই জিনিসকে এক ক'রে তুমি মিলিয়ে দেখতে পারবে। এতে বাস্তবিকই অনেক উন্নতি হতে পারে।

সকল ব্যাপারেই এই কথা। অন্যের সঙ্গে যাই কেন করতে যাও, তার সঙ্গে যদি তোমার না মিল হয়, তখন সেটিকেও তোমার ঐরূপ উন্নতির জন্য ভগবৎ কৃপা বলে ধরে নেবে। এ বেশ সোজা জিনিস এখানকার বদলে ওখানে যাওয়া, নিজেরই মধ্যে থেকে না গিয়ে অন্যের মধ্যেও ঢুকে দেখছ। তবে কিছু কল্পনাশক্তি থাকা চাই, একটু চিন্তাসংযম শেখা চাই, নিজেকে সংযত করতে পারা চাই। খুব যে কঠিন কাজ তা নয়, একটু চেষ্টা করতে থাকলেই দেখবে ততটা কঠিন নয়।

তবে মনকে দিয়ে এমন চেষ্টা করতে যেওনা "তাই তো, জিনিসটা এমন হলো কেন? ঐ লোকটা কিসের যুক্তিতে এমন করছে, কেন অমন বলছে?" এই করতে গেলে কোথাও পৌঁছবে না। ঠিক কথা না ভেবে মনের দ্বারা যত বাজে কৈফিয়ৎ রচনা করবে, আশ্বাজে সাব্যস্ত করবে "লোকটা হয় বদমাশ না হয় বোকা, যা কোনো মীমাংসাই নয়। তার বদলে যদি ঐরূপভাবে সামান্য চেষ্টা করো, তাকে অস্বাভাবিক না ভেবে যদি তার ছোটো মস্তিষ্কের মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করো, তাতে দেখবে যে হঠাৎ তুমি তার ওপারে চলে গেছ, তখন সব কথাই বুঝতে পারছ—সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে, তার আচরণের পিছনে কি কার্যকারণ ও অনুভব প্রভৃতি রয়েছে কিছু জানতে বাকী নেই। এই ধরণের পরীক্ষা করার সুযোগ তোমার দিনে একশোবার মিলবে।

গোড়াতেই ভালোরকম সাফল্য মিলবে না, কিন্তু চেষ্টা করে যেতে থাকলে শেষে আশ্চর্য ফল পাবে। আর জীবনে একটা বৈচিত্র্য এসে যাবে। তা ছাড়া এতে কিছু উন্নতি ঘটবে, নিত্য অহংকারের বর্মে আবৃত হয়ে সকল কিছুতে ধাক্কা খাওয়ার পরিবর্তে। প্রজাপতি-গুলো আলোর কাছে যেতে গিয়ে বারেবারে কেমন ক'রে ধাক্কা খায় দেখেছ?...সকলের চেতনাও তেমনি নিত্য এখানে ওখানে ধাক্কা খায়, তা অচেতনা বলে। কিন্তু অচেনা না রেখে যদি ভিতর ঢুকে যাও তখন তা তোমারই অংশস্বরূপ হবে। এতে তোমার চেতনা বিস্তার পাবে, মুক্ত বায়ু পাবে, নড়বার চড়বার জায়গা পাবে, ধাক্কা না খেয়ে ভিতরে ঢুকে সব বুঝে নিতে পারবে। একই কালে বহুস্থানে আপনা হতেই যেতে পারবে।

মনে করো তুমি একটা চিত্তাকর্ষক বই পড়ছ, নানা আডভেঞ্চার থাকাতে নভেলটা বেশ জমাটি লাগছে, তার গল্পের মধ্যে এমন ঢুকে গেছ যে ঠিক সময়ে ক্লাসে যেতে বা খেতে

বা শুনতে পর্যন্ত ভুলে গেছ। বইটার মধ্যে এমনই তুমি মগ্ন হয়ে গেছ যে সব কিছুই ভুলে গেছ। একেই বলে তাদাত্ম্য হওয়া। এই জিনিস যদি পুরোপুরি হয় তাহলে তুমি আগের থেকেই জেনে যাবে যে ওর পরে কি হবে। এমন সময় আসবে যখন তুমি আপনা হতেই টের পাবে (শেষের দিক না দেখে) লেখক কোথায় তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে, গল্পটা কেমন ভাবে শেষ হচ্ছে! কারণ তুমি লেখকের সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে মিলে একাত্ম হয়ে গেছ। তোমার অজানিতে সেটা আপনিই হবে, কারণ একাত্ম হওয়ার তাই বিশেষত্ব।

প্যারিসে অনেক তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর থিয়েটার আছে শহরের উপকণ্ঠে, সেখানে যত উত্তেজক ঘটনাবহুল নাটকের অভিনয় হয়ে থাকে। সেগুলি নিম্ন সাধারণের জন্য, শিক্ষিত লোকদের জন্য নয়; তাতে সকল ঘটনাই দুর্দান্ত রকমের নাটকীয়। যারা সে অভিনয় দেখে তারা অধিকাংশই সরলপ্রাণ মানুষ, ভুলে যায় যে তারা থিয়েটার দেখছে, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তাতে একাত্ম হয়ে পড়ে। হয়তো একটা অবস্থা এসেছে নায়ককে হত্যা করবে বলে ষ্টেজের মধ্যে দরজার পাশে একজন বিশ্বাসঘাতক লুকিয়ে আছে, আর নায়ক তা না জেনেই ষ্টেজের মধ্যে ঢুকছে। তখন গ্যালারির পিছনে যারা ছিল তারা হঠাৎ দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল "হুঁশিয়ার হও! দরজার পিছনে দস্যু লুকিয়ে আছে!" (হাসা) এমন একবার নয়, একশো বার হয়ে থাকে। আমি একবার একটা নাটক দেখতে গিয়েছিলাম Le Bossu (কুব্জ)। অভিনয় হচ্ছিল Théâtre de la Porte Saint Martin নামক থিয়েটারে। গল্পটা সব মনে নেই, কিন্তু ষ্টেজে দেখা যাচ্ছিল একটা বড়ো ঘর, তার পাশে আছে একটা ছোটো ঘর। ছোটো ঘরে এমন একটা বোতাম কিছু করা আছে যেটা টিপলেই বড়ো ঘরের উপরকার ছাদটা নেমে এসে ভিতরের লোকগুলিকে চাপা দেবে।...অনেকে সে কথা জানে, তাই নিয়ে নাটকে আলোচনাও হয়েছে। এ কৌশলটা জানে এমন একজন দুষ্ট লোক লুকিয়ে আছে ছোটো ঘরে, ইতিমধ্যে নায়ক এসে বড়ো ঘরে ঢুকে কথা বলতে থাকল এবার হয়তো ছাদটা তার মাথায় ভেঙে পড়বে, সকলের তাই মনে হচ্ছে। আমি চুপ ক'রে দেখছি, লক্ষ্য করছি যে লেখক কেমন ক'রে নায়ককে ঐ বিপদ থেকে রক্ষা করে (নায়ক ওখানে মরতেই পারে না!) কিন্তু সকলে তা বুঝল না, কয়েকজন দর্শক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল "সাবধান। ছাদটা এখনই ভেঙে পড়বে!

এগুলো সবই একাত্ম হওয়ার দৃষ্টান্ত, কেবল তা অনৈচ্ছিক।

আর আজকাল এই উপায়ে অনেক স্নায়ুরোগের চিকিৎসা হচ্ছে। যখন কেউ অনিদ্রা-রোগে ভুগছে, অত্যধিক মানসিক উত্তেজনায় বিকারপ্রাপ্ত হয়ে শরীর বিশ্রাম পাচ্ছেনা, তখন তাকে একটা অ্যাকোয়েরিয়মের সামনে বসিয়ে দেওয়া হয়—তার জলের মধ্যে কত রাঙারকম সোনালি রুপালি মাছ ঘোরাফেরা করছে বা দেখতে বেশ মনোরম,—ওর সামনে তুমি একটা ইজিচেয়ারে বসলে হাত পা এলিয়ে দিয়ে ও সকল ভাবনা ছেড়ে দিয়ে (বিশেষত নিজের কথা): তুমি কেবল মাছের খেলাই দেখতে থাকলে, তারা কেমন ভেসে বেড়াচ্ছে, ঘুরে চলে যাচ্ছে, পরস্পর মুখোমুখি হচ্ছে আবার পাশ হয়ে যাচ্ছে, পরস্পরকে তাড়া করছে, বুদ্বুদ কেটে

জলে ঢেউ তুলছে—দেখতে দেখতে তুমি ওদের জীবনের মধ্যেই ঢুকে গিয়ে যেন ওদের মতোই খেলে বেড়াতে থাকলে। এর এক ঘন্টা পরে তখন তুমি দেখবে অতক্ষণ বিশ্রাম পেয়ে স্নায়ুগুলি ধাতস্থ হয়েছে। তবে নিজের ভাবনা ছেড়ে শুধুই তখন নাছ দেখতে হবে।

প্রশ্ন এ উপায়ে কি ভগবানকে মিলতে পারে?

উত্তর: দেখ, ভগবানকে জানার একমাত্র উপায় তাঁরই সঙ্গে একাত্ম হওয়া। তা-ছাড়া অন্য উপায় নেই। সুতরাং এই একাত্ম হবার প্রণালীতে রপ্ত হয়ে গেলে তখন তোমার ইচ্ছামত পাত্র বেছে নিতে পারবে। কিন্তু এই উপায়টি না জানলে একশো রকমের বিড়ম্বনা এসে বাধা দেবে, ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হতে দেবেনা। আর এটি যদি শিখে নাও তাহলে যাতে খুশি তাতেই তা প্রয়োগ করতে পারবে, যতক্ষণ ফল না পাও। একাত্ম হতে পারার শক্তি লাভ করলে সে ফল সহজেই মিলবে। রামকৃষ্ণ বলতেন যে তিন দিনেও মিলতে পারে, আবার তিন ঘন্টায় বা তিন মিনিটেও মিলতে পারে। অর্থাৎ যারা মন্থর গতি তাদের পক্ষে তিন দিন, যারা একটু দ্রুত তাদের পক্ষে তিন ঘন্টা, আর যারা খুব প্রত্যন্ত তাদের পক্ষে তিন মিনিট।

প্রশ্ন যারা মন্থর তাদের পক্ষে তিন দিন?

উত্তর হাঁ তাদের তাই লাগে। রামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "ভগবানের সঙ্গে মিলতে কত সময় লাগে?" তার জবাবেই তিনি ও কথা বলেছিলেন।

প্রশ্ন তিনটি দিন সারাক্ষণ অন্য কোনো কিছুই না করে?

উত্তর: না, সে কথা নয়। ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হতে কোনো কিছুই করবনা এমন দরকার হয়না। অবশ্য তিন দিন কোনো কিছু না ক'রে কেবল অনড় হয়ে বসে থাকা, এ তুমি পারবেও না; তাই যদি পারো তাহলে বুঝতে হবে তুমি এমন চরম সিদ্ধিলাভ করেছ যাতে তাও তোমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু অমন কথা তিনি বলেননি; শুধু বলেছেন মনকে ভগবানে একাগ্র করার কথা, যা তাঁর তিন মিনিটের মধ্যেই হতো। লোকের সামনেই তিনি দেখিয়ে দিতেন যে তাঁর কথা মিথ্যা নয়। তাঁর পক্ষে তিন মিনিটের বেশি সময় লাগতনা।

খুব ঠিক কথা, একাগ্র হবার অভ্যাস না থাকলে ওরূপ হয়না—ইংরেজিতে যাকে বলে "One-pointedness" (বিন্দুতে নিবিষ্টতা)—ইচ্ছাশক্তিকে এক বিন্দুতে সংহত করা। তুমি তাই "চাইবে" হয়তো দুই এক মিনিট, সিকি ঘন্টা, তার পরেই অনেক কিছু চাইবে। তুমি "চিন্তা করবে" হয়তো করেক মুহূর্ত, তার পরেই ভাববে হাজার রকম কথা। এতে তোমার লেগে যাবে অনন্তকাল। এতে টুকরো টুকরো জিনিসকে

একত্রে যোগ ক'রে নেওয়া যায়না ; তা যদি হতো, একটি একটি বালুকণাকে একত্রে জড়ো ক'রে স্তূপ করার মতো তোমার ভগবৎ চিন্তার টুকরোগুলিকে জড়ো ক'রে পাহাড় বানাতে পারতে, কিন্তু তা হয়না। চিন্তাগুলিকে একসঙ্গে জুড়ে অনেকখানি করা যায়না, তার ফলও কিছু হয়না ; উন্নতি হতে পারে গভীরতার দ্বারা, তীব্রতার দ্বারা। সমস্ত অন্তর দিয়ে তাই শিখে নিতে হয় ; তখন যা করবে তার মূল্য হবে। তা বালুকণার স্তূপের মতো নয়। তেমন হলে তুমি বলতে পারতে "রোজ এক ডজন বার আমি ভগবানকে ভেবে ভেবে অনেকখানি জড়ো করব।" ওতে একদিন হয়তো ওর পাহাড়ই গড়ে তুলবে...

যাক, শোনো এখন প্রায় ১০টা বাজে। তোমাদের কারো কিছু বিশেষ জরুরী প্রশ্ন আছে কি? তুমি? থাকে তো বলে ফেল।

প্রশ্ন আমার আছে একটি জিজ্ঞাস্য।

উত্তর খুবই জরুরী?

প্রশ্ন আমার পক্ষে জরুরী। লোকে বলে যে কেউ কেউ খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি হয় আর কেউ কেউ হয় একেবারে মাথামোটা। কেন এমন তফাৎ হয়?

উত্তর : কেন হয়? তা বাছা প্রকৃতির রাজ্যই এমনি হরেক রকম বৈচিত্র্যের ; এখানে দুটো জিনিস এক রকমের নয়। সব রকম সম্ভাবনাই রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে, তুমি যত রকমের ধারণা করতে পারো তার চেয়েও কোটি গুণ বেশি। তাই দেখতে পাও কেউ কেউ খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অন্যে তেমন নয়। আবার যারা এলোমেলো বুদ্ধি তারাও আছে। তুমি দেখতে পাও কেবল তোমার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে। কিন্তু তুমি যতটুকু দেখ তা ছাড়াও বিস্তর আছে, কোটি রকমের জিনিস রয়েছে যার মধ্যে দুটো একরকম নয়। তবে আমার মনে হয় এমন কিছু কল্পনাও করা যায়না যা জগতে কোনোখানেই নেই। এই নিয়েই প্রকৃতি তামাসার খেলা করে—সকল রকমই ক'রে দেখে, সকল কিছুই গড়ে তোলে, আবার সকলকিছুই ভেঙে ফেলে, সকল রকমেরই জোড়াতাড়া দেয়, সমস্তই বদলাতে থাকে, অনবরতই কেবল ভেঙে গড়তে থাকে ; নিত্যই কেবল তার সকল সম্ভাবনাকে রূপ দিচ্ছে, মিশোচ্ছে ঠোকাঠুকি লাগাচ্ছে, কেবল হচ্ছে আর যাচ্ছে। পার্থিব জীবনে দুটি মিনিট একরকম নয় ; আর এটা ভেবে দেখ যে এমনি ভাবে পৃথিবী কতকাল থেকে চলে আসছে?... বুদ্ধিমানের দল হয়তো এ সম্বন্ধে একটা কিছু আন্দাজ ক'রে বলবে। আরো কতকাল পৃথিবী এমনি ভাবে চলবে? তাও হয়তো তারা বলে দেবে অনেকগুলো শূন্যের পর শূন্য বসিয়ে, এতগুলো শূন্য জুড়ে দেবে যে তুমি গুণে উঠতেই পারবে না। কিন্তু এক রকমের জিনিস কখনো দুবার হবে না, দুটি মুহূর্ত এক রকমের হবেনা। যদিও দুটি জিনিস একরকম দেখতে পাও, তা কেবল আপাতদৃষ্টিতে। দুই জিনিস একরকম হয়না, দুই মুহূর্ত একরকম

হয়না। আর পিছনের দিকে কত কি হয়ে গেছে তাও গুণে ঠিক করতে পারবেনা, সামনের দিকে আরো কত কি হবে তাও গুণে ঠিক করতে পারবে না। অথচ কোনোটাই এক রকমের হবে না। সুতরাং এ প্রশ্ন তুমি করতেই পারোনা যে এটা কেন এমন আর ওটা কেন অমন হয়েছে। কেন এমনতরো হলো তাই জানতে চাও? তার কারণ প্রকৃতির কল্পনাশক্তি তোমার থেকে অনেক অনেক বেশি। সে নিত্য নূতন কল্পনা ক'রে চলেছে। সব কিছুই অনবরত বদলাচ্ছে, আবার নতুন কিছু গড়ছে। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দুটি মুহূর্তও একরকম হয়না। প্রকৃতির কল্পনার কথা কখনো কি ভেবেছ?...তোমার নিজেরই দুটি নিমিট কি একরকম হয়? না। তুমি ভালোই জানো যে কাল তুমি যেমন ছিলে আজ তেমন নেই, আবার আজ যেমন আছো কাল তেমন থাকবে না। আর যদি পিছনের দিকে ফিরে চাও...ধরো দশটা বছর পিছনে, তাহলে তখনকার নিজেকে এখন চিনতেই পারবে না! তখন কি ভেবেছিলে তাও জানবে না, যদি বিশেষ কিছু তখন ভেবে থাকো।

তাহলে এর মধ্যে কোনো হেঁয়ালি নেই। বরং তুমি এটা করতে পারো, নিজের অভিজ্ঞতার সীমার ভিতর দিয়ে সকল সম্ভাবনাকে দেখে নেওয়া; তা করলে এটুকুর মধ্যেও বিরাট গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে।

আর তুমি নিজেই বা কি?...অনন্তকালের মধ্যে একটি মুহূর্তকণা মাত্র।

১৯ অগস্ট ১৯৫৩

প্রশ্ন নায়ের "কথাবার্তা" থেকে—"প্রেমের ক্রিয়া কেবল মানুষেই সীমাবদ্ধ নয়, আর হয়তো অন্যান্য রাজ্যে যা আছে তা মানুষের রাজ্যের মতো এমন বিকৃতও নয়। ফুলের দিকে, গাছের দিকে চেয়ে দেখ। সূর্যাস্তের সময় যখন চারিদিক নীরব হয়ে আসে, সেই সময়ে কোনো গাছতলায় বসে প্রকৃতির মধ্যে নিমগ্ন হলেই দেখবে—পৃথিবীর বুক থেকে আর গাছের শিকড় থেকে তার শিরা উপশিরার ভিতর দিয়ে, তার শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়ে উপরের দিকে ঠেলে উঠছে এটা প্রেমের আকূতি ও আস্পৃহা—তা এমন কিছুর জন্য যা ফিরিয়ে আনবে আলো ও আনন্দ, যে আলো চলে যাচ্ছে তাকেই ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুলতা। সেই আকুল প্রার্থনার মধ্যে জড়িয়ে আছে একটা কৃতজ্ঞতার স্পন্দন। তার আকিঞ্চন এমন শুদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত যে গাছের ভিতরকার সেই ক্রিয়াকে তুমি নিজের সত্তার মধ্যে অনুভব করে তোমারও মধ্যে ইচ্ছা জাগবে অমনি ঐকান্তিক প্রার্থনা করতে, অনভিব্যক্ত দিব্য শান্তি ও আলো পাবার জন্য।"

প্রশ্ন: গাছেরা যে আলোর জন্যে আস্পৃহা করে তা কোন আলোর জন্যে?

উত্তর: সূর্যেরই আলো গো ছেলে। কখনো কি দেখনি রাত্রি আসন্ন হলে সূর্যের আলো যখন দিগন্তের পারে চলে যায় তখন গাছের পাতারা কেমন কুকড়ে গিয়ে নুয়ে পড়ে?

প্রশ্ন কিন্তু গাছেরা কি অন্য কিছুর জন্যও আস্পৃহা করতে পারেনা ?

উত্তর অন্য কিছুর জন্যে মানে কি ? গাছের পক্ষে আর কিসের সম্ভাবনা খোলা আছে ?

প্রশ্ন : যেমন মানুষ হবার জন্যে আস্পৃহা ?

উত্তর : মানুষ হবার জন্যে ? কিন্তু ওরা তো মানুষের কথা কোনো কিছুই জানে না ! যেমন মানুষে চায় দেবতা হতে তেমনি ?...কয়েকটি পশুদের বেলা মানুষ হতে ইচ্ছা হবার কথা আমি জানি, কিন্তু তারা মানুষদেরই মধ্যে বাস করতো। যেমন কুকুর বেড়াল, তারা মানুষের সাহচর্যে থেকে ঐরূপ আস্পৃহা করেছে। একটি বেড়ালের কথা জানি, বেড়াল হওয়াতে তার ভারি দুঃখ, সে মানুষ হতে চাইত। বেচারা অসময়ে মারা গেল। সে বসে বসে ধ্যান করতো, নিশ্চয়ই নিজের প্রণালীতে কিছু সাধনা করতো। যখন দেহ-ত্যাগ করলে, তার প্রাণসত্তা গিয়ে জন্ম নিলে মানুষের দেহে। তার চৈত্যের কেন্দ্র অংশটুকু সোজা মানুষের মধ্যে চলে গেল, চেতন অংশ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু এমন হওয়া নিতান্ত একটা ব্যতিক্রম।

প্রশ্ন আপনি বোধ হয় বলেন যে পাথরের মধ্যেও প্রেম থাকে ?

উত্তর সম্ভব।

প্রশ্ন তা কি বোঝা যায় ?

উত্তর অনুভব করা যায়। চেতনার এমন একটি অবস্থা আসে যখন কোথাও কিছুমাত্র দিব্যপ্রেম থাকলেই তা দেখতে পাবে, আর প্রাণীতে প্রাণীতে যে আপাতদৃষ্ট পার্থক্য দেখ তাও তেমন দেখবে না। যে সব জিনিসকে আমরা নিষ্প্রাণ জড় বলে থাকি তার মধ্যেই এমন প্রচণ্ড আস্পৃহা থাকে যা আমরা ভাবতেই পারিনা। পাথরের মধ্যেও আছে উচ্চ সত্তার চেতনা যদিও তা নিতান্ত অপ্রকাশ্য, কিন্তু তবুও তা কিছু অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত।

এমন কি জড়ের মধ্যে ও পাথরের মধ্যে একটা উপস্থিতি সম্বন্ধে একরূপ আশ্চর্য গ্রহিষ্ণুতা আছে। পাথরের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত হয় যদি তার তুমি হদিস জানো। সে শক্তি কাজ করতেও পারে। এমন সব পাথর আছে (যাকে তোমরা রত্ন বলো) যার মধ্যে সঞ্চিত শক্তি বিধৃত হয়ে থাকে আর খুব ধীরে ধীরে তা বিচ্ছুরিত হয়ে তার ক্রিয়া ক্রমশ প্রকাশ পায়। কেউ যদি তাতে শক্তির আরোপ করতে জানে তাহলে এতই শক্তি সেখানে জমা হতে পারে যা ফুরোবার নয়।

প্রশ্ন পাথরের ভিতরকার শক্তি প্রকাশ হয়ে তার দ্বারা কোনো কাজ হতে পারে কি ?

উত্তর : নিশ্চয়। পাথরের শক্তি প্রায় চিরদিন বজায় থাকে—কোনো পাথর কাজ করে বন্ধনীর, কোনো পাথর কাজ করে ব্যাটারির। কোনো পাথর রক্ষাকবচের মতো কাজ করে। খুবই আশ্চর্য। একরকম পাথরের মধ্যে (বিশেষত বৈদূর্যমণির, amethyst) এমন রক্ষাকারী শক্তি জন্মাতে পারে যে তার ধারক যে হয় সে বাস্তবিকই সকল বিপদ থেকে রক্ষা পায়। খুবই আশ্চর্য কথা, এটা আমি নিজে জানি। একজনকে জানতাম যার কাছে ছিল ঐরকম পাথর, সে যখন সেটি ধারণ করতো তখন বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটতো। কোনো কোনো পাথরে ঘটনার পূর্বাভাস দিতে পারে, কেউ কেউ সেই পাথরের দিকে চেয়ে আসন্ন ঘটনার কথা বলে দিতে পারে। পাথর তাই বার্তাবহও হতে পারে। তবে ওতে অবশ্য দুই দিকের ক্ষমতা থাকা চাই। একদিকে চাই একাগ্র হবার শক্তি, আর অন্য দিকে চাই পাথরের ভিতরকার নির্বাক ভাষা পড়তে পারার শক্তি। তাহলে এত সব জিনিস যখন পাথরের মধ্যে মেলে তখন নিশ্চয় কোনো শক্তির মূল তার মধ্যে রয়েছে' নতুবা তা এমন গ্রহিষ্ণু হতে পারেনা। তেমন কিছু শক্তির জোরেই পাথরের দানার ক্রিস্ট্যাল বা কেলাস তৈরি হয়, যাতে কত অপরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিজাইন তৈরি হয়, যা সম্ভব হতে পারে তার কেন্দ্রে কোনো উপস্থিতির দ্বারা। সেটা তোমরা দেখতে পাওনা যেহেতু তেমন অনুভূতি তোমাদের নেই কিন্তু সকল কিছুর পিছনে যে প্রেমের শক্তি কাজ করছে তা যখন প্রত্যক্ষ দেখবে তখন সবের মধ্যে সেই একই জিনিস দেখতে পাবে। এমন কি রচিত জিনিসের মধ্যেও তারও বক্তব্য বুঝে নেবে।

আর কিছু জানতে চাও ?

প্রশ্ন : মা, যখন আপনাকে কেউ ফুল এনে দেয়, তখন আপনি কেমন ক'রে তার মধ্যে একটা তাৎপর্য আরোপ করেন ?

উত্তর : ফুলের মধ্যে ঠিক অমনি করেই, ফুলের প্রকৃতির মধ্যে ঢুকে গিয়ে তার ভিতরের সত্যটিকে জেনে। তখন বোঝা যায় কোন তাৎপর্যকে সে জানাচ্ছে।

প্রশ্ন : মা, আপনি একদিন বলেছিলেন যে আপনি যাকে "ডিভাইন" বলেন আর আমরা যাকে "ভগবান" বলি তার মধ্যে কি পার্থক্য তা বুঝিয়ে দেবেন।

উত্তর : ও হাঁ। কিন্তু তখন বলেছিলাম যে কয়েক বছর পরে তা বলব। যখন তোমরা বয়সে আরো পরিণত হবে তখন। কত বয়সে তা হবে তাও বলেছিলাম, যদিও এখন সেটা মনে নেই, কিন্তু যখন তোমাদের মস্তিষ্ক আরো একটু তৈরি হয়ে বুঝতে পারবার মতো হবে।

প্রশ্ন : মায়ের "কথাবার্তা" থেকে—"দিব্যশক্তির যা বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব তা এখানে এমন বিকৃতিপ্রাপ্ত হলো কেবল এই সকল ক্ষুদ্র যন্ত্রবৎ আধারের অন্ধতা ও অজ্ঞানতা ও স্বার্থ-বুদ্ধির কারণে। শাশ্বত যে প্রেম সে কোনো কিছু কামনা করেনা, কোনো কিছুকে আঁক-ড়াতে চায়না, কোনো অধিকার চায়না, কিছু লাভ করতে চায়না ; শুদ্ধ নির্ভেজাল ক্রিয়াতে সে চায় ভগবানের সঙ্গে আত্মার মিল, নিতান্ত নির্বিশেষ অন্য সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়ে। দিব্য প্রেম নিজেকে শুধু দিতেই চায়, নিতে কিংবা পেতে কিছু নয়। সেই আসল জিনিসকে মানুষ যে কোন জিনিসে দাঁড় করিয়েছে সে কথা না বললেও চলে, সে অতি নোংরা ব্যাপার। তবুও তার প্রথম স্পর্শটি মানুষের মধ্যে এনে দেয় তার কিছু বিশুদ্ধতা, তাই অন্তত তখনকার মতো তারা নিজেদেরকে ভুলে যায়, তখনকার মতো ও দিব্য স্পর্শ লেগে মানুষের ভিতরকার যা কিছু নিগূঢ় ও সুন্দর তাকে উদ্দীপিত ক'রে তোলে। কিন্তু পরক্ষণেই তাদের প্রকৃতি বেরিয়ে পড়ে তার হীন দাবি নিয়ে, যা দেয় তার বদলি চায়, নিকৃষ্ট ধরনের আত্মসম্ভোগ খোঁজে, যা ছিল দিব্য তাকে কলঙ্কিত ও বিকৃত ক'রে ফেলে।

প্রশ্ন : মানুষ যখনই যা দেয় তার পরিবর্তে চায় কেন?

উত্তর : তাই চায় তারা নিজের মধ্যে নিজেকে নিয়েই আছে বলে।

মানুষ জানে তার সংকীর্ণ সীমাটিকে, সে ভাবে যে নিজেকে বাড়াতে ও বাঁচাতে হলে বাইরের থেকে কিছু জুটিয়ে নেওয়া দরকার, তার ব্যক্তিগত সীমাটুকুর সম্বন্ধে সে বিলক্ষণ সচেতন। তাই যখনই নিজের থেকে কিছু বের ক'রে দেয় তখনই সেখানে ফাঁক পড়ে যায়, সেই ফাঁককে ভরতে তার কিছু পাওয়াই চাই। অবশ্য এটা সে ভুল বোঝে। যা সত্য তা এই যে আপন ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের ঐ সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে সে বরং ইচ্ছা করলে তার চেতনাকে এতই বিস্তৃত করতে পারে যে তার দ্বারা অন্যের সঙ্গে কেবল একাত্ম হতে পারাই নয়, কিন্তু নিজেকেও সীমা ছাড়িয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারে, মূল চেতনার সঙ্গে একত্ব এনে তার সব কিছুই হতে পারে, আর তাতেই তার সঙ্কীর্ণতা কেটে যায়, নতুবা নয়। যতদিন তোমার ঐ সংকীর্ণতা বজায় থাকবে ততদিন তুমি পেতেই চাইবে, কারণ তোমার হারাবার ফুরোবার ভয় থাকবে। খরচ হলেই তার পূরণ চাইবে। কারণটি হলো তাই, বুঝলে ছেলে। আর নিজেকে যদি সবের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারো, সকলের স্পন্দন তোমার মধ্যে আনোগোনা ক'রে যদি তোমাকে গলিয়ে তরল ক'রে সবের মধ্যে মিলিয়ে দেয়, নিজ সীমাটুকুর মধ্যে আটক না থেকে তাকে ছাড়িয়ে তুমি বিস্তারলাভ করতে পারো, যদি শেষ পর্যন্ত সবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারো, তাহলে তোমার কিছুই আর হারাবার থাকবে না, সকল পাওয়াই তোমার এমনি আয়ত্ত হয়ে যাবে। কেবল তুমি জানোনা ওর হদিস, না জানলে তা পারা যায় না। আর তাইতে তুমি কেবল পেতে আর জমাতে চাও,

কেবল জমাতেই থাকো। কিন্তু সে অসম্ভব, জমানো কখনই হয়না। নিজেকে বাড়াতে চাও, যা আছে তার চেয়ে আরো পূরণ চাও। যে চিন্তাটি ব্যক্ত করলে, লোকে তা বুঝুক কিছু স্নেহ দিলে, লোকে তার প্রতিদান দিক।...নিজেই সেই চিন্তাটি হয়ে সবার মধ্যে ছড়াতে পারোনা, নিজেই স্নেহ হয়ে সবার মধ্যে ঢেলে দিতে পারোনা। তুমি মনে করো যে তুমি সব থেকে ছাঁটা হয়ে একজন আলাদা তুমি, তাই কেবল ভয় যে তোমার যা আছে তা পাছে হারায়, ফসে গিয়ে পাছে ছোটো হয়ে যাও। কিন্তু তার বদলে যদি ঐভাবে হতে জানো তাহলে আর জমাবার কিছুই দরকার নেই। যতই ছাড়বে ততই মিলবে। যতই একাত্মতা আসবে ততই তাই হবে। সুতরাং কেবল নিতে না থেকে দিতে থাকো। যত দেবে তত বাড়বে।

কিন্তু সেজন্য চাই আপন অহংএর গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে আসা। উচ্চশক্তির সঙ্গে, দিব্য স্পন্দনের সঙ্গে মিলে এক হতে হবে, অহং আঁকড়ে থাকা নয়। কঠিন বটে, কিন্তু চেষ্টা করলে ওতে পৌঁছে যাবে।

প্রশ্ন ভালো কাজ করার চেয়ে মন্দ কাজ করা সহজ, এ কথা বলা হয় কেন?

উত্তর : তাই বলা হয় বটে, কিন্তু সব সময়ে তা নয়, ওটা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। এমন লোকেদের আমি জানতাম (খুব বেশি নয়, তবু...) যাদের পক্ষে কোনো মন্দ কাজ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাদের প্রকৃতিই ছিল ওর বিরুদ্ধ, আপনা হতেই মন্দের বিপরীত কাজ করতো। কিন্তু এমন মানুষ অবশ্য খুব কম। তাহলেও আছে।

যেমন বললে তেমন হবার কারণ এই যে বর্তমান জগৎ এখনও চলেছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তিদের দখলে, বিশেষত সক্রিয় যত প্রাণস্তরের শক্তিরা, যাদের হুকুমে তোমাদের চলতেই হয়। ঐ শক্তিরা বিরোধী দলের অধীন, যাদের কাজই হলো কেবল খারাপ করা, নষ্ট করা, বিগড়ে দেওয়া,—তাদের তাই ইচ্ছা। কোনো কিছু সুন্দর দেখলেই খুশি হয়ে বাহবা দেবার পরিবর্তে তাদের রাগ হবে, অত্যন্ত জ্বালা ধরবে, ভেঙে তছনছ করে দিতে ইচ্ছা হবে। এই হলো বিরোধী শক্তিদের চরিত্র। দুঃখের বিষয় এমন ভাব অনেকের মধ্যেই আপনা হতে এসে পড়ে, এমন কি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের মধ্যেও... কেবল ভাঙা আর নষ্ট করার প্রবৃত্তি। এটা বিরোধী শক্তিদের কাজ, তারা প্রাণস্তর থেকে পৃথিবীতে সরাসরি হাজির হয়ে মানব চেতনার মধ্যে আর কখনো পশুচেতনার মধ্যেও ঢোকে। যা ভালো, যা সত্য, সুন্দর, নির্মল, তারই প্রতি একটা বিজাতীয় বিদ্বেষ। এ বিদ্বেষ ভগবানের উপস্থিতির উপর। তারই জন্য ইচ্ছা জাগে ভালোকে মন্দ ক'রে দিতে, ছোটো ক'রে দিতে, কালিমা লিপ্ত ক'রে দিতে, সুন্দরকে কুৎসিত ক'রে দিতে। আরো এক ধাপ এগিয়ে চায় দুঃখকষ্ট এনে দিতে। সমস্তই হয় ঐ বিরোধী শক্তিদের দাপটে যা আপনা হতে কাজ করে অচেতনের, অবচেতনের এবং অর্ধচেতনের মধ্যে। কেবল দীপ্ত ও বিশুদ্ধ

চেতনাই পারে তাকে প্রতিরোধ করতে। কিন্তু জগতের বর্তমান অবস্থাতে অনবরত তাকে লড়তে হয়। খুব কম লোকই ওদের দাসত্ব করা থেকে রেহাই পায়। প্রত্যেকেরই মধ্যে এমন একটা কোণ আছে—কারো বা খুব ছোটো কারো একটু বড়ো, কখনো বা পুরো অচেতন কখনো বা অল্পচেতন, কখনো পুরো চেতন—যেটা চাইবে এমনি নষ্ট করতে, খারাপ করতে। আর বর্তমান জগৎ এমন অবস্থায় রয়েছে যে তা করতে চাইলেই ঐ সব শক্তি যারা আপন কাজ দেখাবার জন্য তৈরি হয়ে আছে তারা এসে তোমার সহায়তা করবে। তারা ছুটে এসে পুরো তৎপরতার সঙ্গে তোমার ইচ্ছাতে যোগ দেবে। তাতেই যে মন্দ করতে চাইছে সে তখনই নিজের মধ্যে খুব জোর পাবে। আর কাজটা তার পক্ষে তখন খুব সহজ হবে। কিন্তু তার বদলে তুমি যদি চাও ওর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আনতে, যদি ওদের যন্ত্রস্বরূপ হতে তুমি নারাজ হও, তবে তোমাকে ঐকান্তিক ও বিশুদ্ধ থেকে দারুণ সংগ্রাম করতে হবে, বিশেষত অহংকারকে বর্জন ক'রে। ভয় পেলে চলবেনা, সংকুচিত হলে চলবেনা। তা খুব সহজ কাজ নয়। অর্থাৎ জগতের অবস্থা এমন যে তুমি যদি ঐ সব দুর্দম তামসিক, দুঃশীল, মারাত্মক বিদ্বেষপূর্ণ শক্তির হুকুমনত চলতে না চাও—তবে তোমাকে হতে হবে রীতিমত বীর, মার খাওয়াকে ভয় করবেনা, ভয় পেয়ে পিছু হটবেনা, হটিয়ে দিলেও আত্ম-ক্ষোভ আনতে দেবেনা, যাতে আরো বেশি হটিয়ে দেয়। সেই কারণেই তোমাকে প্রকৃত বীর হতে হবে, যদি মন্দ কাজ করতে, মন্দ চিন্তা করতে, এমন কি মন্দ ইচ্ছা জাগতে দিতেও কোনোমতে না চাও। বীর হওয়া সব সময়ে সহজ হয়না। যেদিন একটু ক্লান্ত হয়ে শিথিল হও, একটু বিশ্রাম চাও, প্রফুল্লতার হও, সেইদিনেই গড়িয়ে নিচে নেমে যাও। এপথ খুবই পিছল, ছেলেদের খেলার স্লিপ্-গড়ানোর চেয়েও বেশি গড়ানে, তাই পিছলে নেমে চলে যাও একেবারে আবর্তের মধ্যে। তলায় পৌঁছে তখন বুঝতে পারো কোথায় নেমে গেছ। আবার হামাগুড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়। তা সব সময়ে সহজ হয়না। তবে যার ভগবৎ কৃপার প্রতি অটুট আস্থা আছে তার পক্ষে আলোর মধ্যে ফেরা খুব কঠিন হয়না। (শেষের লাইনটি মা পরে যোগ করেছেন ছাপতে দেবার সময়।)

২৬ অগস্ট, ১৯৫৩

প্রশ্ন "কথাবার্তা" থেকে—"প্রেম হলো সেই পরমা শক্তি যাকে শাশ্বত চেতনা নিজের মধ্যে থেকে এখানে পাঠিয়েছেন এই অজ্ঞান অন্ধকারময় জগতে, যাতে জগৎ তার অন্ধ সন্তাদের নিয়ে আবার ফেরে ভগবানের দিকে। জড় জগৎ অজ্ঞান ও অন্ধ হয়ে থেকে ভুলে গেছে ভগবানকে। তাই তাঁর প্রেম এলো এখানে; ঘুমিয়ে যারা ছিল তাদের জাগিয়ে দিয়ে তাদের বন্ধ কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ ক'রে শুনিয়ে দিলে 'আছে আছে কিছু তোমাদের জাগার মতো, বাঁচার মতো, তা এই প্রেম।' এই প্রেমের কল্যাণে এসে দিয়েছে আবার এ জগতের ভগবানের দিকে ফিরে যাবার সম্ভাবনা। এই প্রেমের জোরে সৃষ্টি উপরে

হাত বাড়ায় ভগবানের দিকে, আর উপর থেকে তার ডাকে সাড়া দিতে নেমে আসে ভগবৎ-প্রেম ও কৃপা।"

এই প্রেম তাহলে এলো কোথা থেকে?

উত্তর : এলো কোথা থেকে? বিশ্বসৃষ্টির মূল উৎস থেকে। তাই তো ওখানে বলা হয়েছে যে তা শাশ্বত থেকে উৎসারিত এক পরমা শক্তি যা সেখান থেকেই জগতে প্রেরিত। এই শোনো তোমার প্রশ্নের জবাব (মা পূর্বেকার অগস্ট ১৯৫৩-এর 'বুলেটিন' থেকে পড়ে শোনালেন)

"প্রেম হলো আসলে একাত্ম হওয়ার আনন্দ—মিলনের আনন্দেই তার চরম সার্থকতা। আর এই দুইএর মধ্য দিয়েই বিশ্ব অভিব্যক্তির এতরকম ব্যঞ্জনা..."

প্রথম কথা, একাত্ম হবার আনন্দ। একটা কিছু থাকা চাই যা এই একাত্মতা বোধ করাতে পারবে। সেই জিনিস হলো প্রেম। তারপর ওর অভিব্যক্তি। শেষে ওর চরম অবস্থা এলে অর্থাৎ যখন সব কিছু ব্যাপারের ভিতর দিয়ে পৌঁছে গেছে তার মূলে, তখন হবে মিলনের বিপুলানন্দ। কারণ মধ্যবর্তী বিরহের বেদনার ফলেই মেলে এত বেশি আনন্দ। মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিরহের বেদনা জাগে বিশ্ব অভিব্যক্তির নানা অবস্থার মধ্যে ; মূলে ফিরে গিয়ে যখন হয় পুনর্মিলন তখনই মেলে মিলনানন্দ। তাও সেই প্রেমই অভিব্যক্তির ঘূর্ণীতে পাক খেয়ে আবার ফিরে গেলেই বিপুলানন্দ। (মা আরো পড়লেন) :

"এই অভিব্যক্তির গোড়ায় প্রেমের বিশুদ্ধ অবস্থাতে থাকে দুই দিকের ক্রিয়া, দুটি প্রান্তের পরস্পরের দিকে একটা টান। একদিকে থাকে এক চূড়ান্ত আকর্ষণের প্রবল শক্তি, আর অন্যদিকে থাকে চূড়ান্ত আত্মদানের দুর্নিবার ঝোঁক, যার ফলে হয় দুই মিলে এক হওয়া। যেখানে মূলের ও তার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তার চেতনাদুষ্ট নিশ্চেতনার মধ্যে বিরাট ব্যবধান, সেখানে ঐ ব্যবধান ঘুচিয়ে মিলনের সেতু রচনা করতে এর চেয়ে ভালো জিনিস আর কিছুই হতে পারেনা।

"যা ছুটে বেরিয়ে গেছে তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে বিশ্বসৃষ্টির বিনাশ না ক'রে। সেই কারণেই এখানে প্রস্ফুরিত হয়েছে অনিবার্য এই প্রেমরূপী মিলনশক্তি। এই দিব্য প্রেম চূর্ণ-চূর্ণ রূপে ছড়িয়ে গেছে অতল অন্ধকারময় অচেতনার আঁধার রাত্রির বুকে। আর তখন থেকেই শুরু হয়েছে জাগরণ ও উন্নয়ন, ধীরে ধীরে জড়ের ক্রমিক বিকাশ ও তার অনন্ত এগিয়ে চলা..."

এই তোমার প্রশ্নের জবাব। অর্থাৎ তুমি যতই কেন উপরে যাও, এমন কি মূল উৎসে গিয়ে পৌঁছও, সেখানেও দেখবে প্রেম। অবশ্য মানুষ যাকে প্রেম বলে সেই প্রেম নয়।

প্রশ্ন : হাঁ মা, "তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমিও তোমায় ভালোবাসব," এ কি রকম প্রেম?

উত্তর তুমি বাসো, তবে আমিও বাসবো ? এ তো মানুষের জিনিস। "তুমি চাও তো আমিও চাই, তুমি না চাইলে আমি চাইনা,"—মানুষের প্রেমের এই ধারা। এমন কি ভগবানের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কেও এই কথাই বলে তারা। ভগবানকে তারা বলে : "আমি যা চাই তাই যদি দাও তো জানবো যে তুমি আমায় সত্যি ভালোবাসো, তখন আমিও তোমায় ভালোবাসব। তা যদি না দাও তো জানবো যে তুমি ভালোবাসো না, তাহলে আমিও ভালোবাসব না।" এই তাদের কথা, রীতিমত ব্যবসাদারী হিসেব।

প্রশ্ন আর যদি বলি, "তুমি না বাসলেও আমি তোমায় ভালোবাসি ?"

উত্তর হাঁ, এ অনেকটা ভালো। এর চেয়েও বেশি ভালো হয় যদি তোমাকে সে ভালোবাসে কিনা তাই নিয়ে কোনো প্রশ্নই না থাকে, কারণ ওতে তোমার কিছুমাত্র যায় আসে না। প্রকৃত প্রেম এই ভাবেই প্রকাশ পায়। তোমার মধ্যে ভালোবাসা জেগেছে বলেই তুমি ভালোবাসছ, ওদিক থেকে ভালোবাসার সাড়া পাচ্ছ বলে নয়। তাহলে তোমার প্রকৃত প্রেম হলো না। ভালো না বেসে তুমি পারছ না বলেই ভালোবাসছ, প্রেমই প্রেমের একমাত্র কারণ। তার অন্য কোনো কারণ দরকার নেই, তার ফল কি হবে না হবে তা দেখার দরকার নেই। যেহেতু তুমি ভালোবাসো সেই হেতুই তুমি ভালোবাসো। এ ছাড়া অন্য কিছু হলে তা হিসেবী লেনদেনের জিনিস, ভালোবাসা নয়।

তা ছাড়া একটা খাঁটি কথা এই যে প্রকৃত প্রেম যেমনি জাগবে অমনি আর তুমি কোনো প্রশ্নই করবে না। তা করা নিতান্ত ছেলেমানুষী তুচ্ছ কথা বলে তোমার মনে হবে। তুমি তখন নিজেই সেই প্রেমে পরিণত এবং তারই আনন্দে নিমগ্ন, প্রতিদানের দরকার নেই। যতক্ষণ প্রতিদানের কথা অনুভবে কিংবা মনে মনেও হিসেব করবে, কিংবা তোমার প্রেম সেই প্রিয়জন অল্পবিস্তর গ্রহণ করলে কিনা তার বিচার করবে, ততক্ষণ তা হলো পাটোয়ারী ব্যাপার, আসল প্রেম নয়।

কথাটা বুঝলে না বুঝি ?...কিন্তু তোমারও একদিন ঐ এমন জিনিস হবে আশা করি।

ও ছাড়া আর যা কিছু তা মানুষের তৈরি। তা অমন সুন্দর জিনিস হয় না, এবং তার থেকে যে সব জিনিস চলে আসে তা আরো খারাপ, যেমন ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ, এমন কি ঘৃণা পর্যন্ত। গোড়াতে যেটুকু হয় তা এই যে, আমি যে ওকে ভালোবাসি ও যেন তা জানে : শুধু মানুষ নয়, ভগবানের বেলাতেও তাই। তুমি ভগবানকে ভালোবাসো তা যেন তিনি টের পান। এখানেই প্রেম ব্যর্থ হয়ে গেল ; আসল জিনিসটা ভাবতেই পারলে না, মনকে তা স্পর্শমাত্র করল না।

এখানে ভাববার কথাই নয় ; ভালোবাসো, তাই যথেষ্ট। তারই আনন্দে ডুবে রইলে, তাই যথেষ্ট।

মানুষ যাকে বলে ভালোবাসা, সেখান থেকে সত্যিকার ভালোবাসাতে পৌঁছতে হলে অনেক অনেকখানি পথ এগিয়ে যেতে হবে। সাধারণ নিচু ধরনের প্রেমের কথাই এখানে

বলছি না, আমি বলছি মানুষদের উৎকৃষ্ট প্রেমেরই কথা যা এমন কি নিঃস্বার্থও হয়। জানি না যে শতকরা এমন কয়জন আছে যারা ভালোবেসে তার প্রতিদান চায় না। যারা বলে, "তুমি ভালোবাসো তাহলে আমিও ভালোবাসব" তারা অনেক নিচু ধাপে রয়ে গেল আর তার চেয়েও নিচু ধাপের যারা বলে, "আগে দেখি তুমি আমায় ভালোবাসো কিনা তার পরে আমি ভালোবাসব", এর কথা বাদ দাও। আমি বলছিলাম প্রতিদান খোঁজার কথা তা চাইলেই তুমি নিচে নেমে গেলে।

কিন্তু এ সব কথা পরে বুঝবে। এখনও তোমরা ছোটো আছো।

প্রশ্ন পশুরা যে মানুষকে ভালোবাসে সে কেমন ভালোবাসা?

উত্তর তা অনেকটা সেই রকম যেমন ভাবে অশিক্ষিত অজ্ঞান লোকেরা ভগবানকে ভালোবাসে। তার মধ্যে থাকে একটা সবিস্ময় ভক্তি ও নির্ভরতার ভাব। তারই প্রতি বিস্ময় মিশ্রিত ভক্তি যা ওর কাছে খুবই অসাধারণ। এ বোধ আসে বুদ্ধি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে, এবং তা স্বতঃস্ফূর্ত। কুকুরের মধ্যে এই ভাবটি খুব উচ্চ মাত্রায় থাকে। আর ওর সঙ্গে স্বভাবতই থাকে আস্থা ও শ্রদ্ধা, তার সঙ্গে আরো কিছু মিশে থাকে: অভাব পূরণ ও নির্ভরতা—এই লোকটি আমাকে খিদে পেলে খেতে দেবে, কষ্ট দুর্যোগ থেকে আশ্রয় দেবে, আমার নিরাপত্তার দিকে নজর রাখবে। তা ছাড়া একটা দুঃখের কথা যে ওর সঙ্গে একরকম ভয়ও মিশে থাকে (যা আসে মানুষেরই দোষে)। পদানত হয়ে থাকার সঙ্গে একটা ভয়—আমার চেয়ে ওর অনেক বেশি ক্ষমতা, অনেক বেশি কিছু জানা—ইচ্ছে করলে ও আমার সর্বনাশ করতে পারে, তার থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারব না। এ ভাবটা আসে মানুষেরই দোষে। কিন্তু মানুষ পশুদের কাছে যে খাঁটি ভালোবাসা পেতে পারে তার মধ্যে থাকে বিস্ময় ও নির্ভরতা। ওরা কিছু একটু দয়া পেলে তখনই আপনা হতে কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে, যে স্থলে মানুষ শতকরা ৮৮ ক্ষেত্রেই তর্ক বিচার করবে ও প্রশ্ন করবে যে তাতে কি লাভ হবে। মনের হিসেব ক্রিয়াবিধির এই বড় দোষ। পশুরা তার থেকে মুক্ত, একটু কিছু উপকার পেলেই তারা কৃতজ্ঞ হয়ে যায়। তারা সহজে বিশ্বাস করে, এবং তার ফলে তোমাকে ভালোবেসে এমন অনুরক্ত হয়ে ওঠে যে তোমার কাছছাড়া হতে চায়না।

আরো একটা কথা। প্রভু যদি উদার হয় আর পালিত পশু বিশ্বস্ত হয়, তাতে উভয়ের মধ্যে চৈত্য ও প্রাণসত্তার এমন এক আশ্চর্য আদান প্রদান হতে থাকে যাতে সেই পশুটি পরমানন্দ লাভ করে। তাই সে তোমার নিবিড় সান্নিধ্যে থাকতে চায়, আর তুমি যদি তার গায়ে একবার হাত দাও তাতেই সে ভিতরে ভিতরে আনন্দের শিহরণ অনুভব করে। যেমন শক্তির স্পন্দন সে তোমার কাছে পায়—স্নেহের, প্রেমের, আশ্রয়ের—তা তারা স্পষ্ট অনুভব করে, তাতে ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ে। কুকুর, হাতি এবং ঘোড়া, এই সব উচ্চশ্রেণীর পশুদের মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের শ্রদ্ধানুগত্যের সহজাত প্রেরণা আসে (যার মধ্যে বুদ্ধি যুক্তির কোনো স্থান নেই) যা স্বতঃস্ফূর্ত, অতি নির্মল ও অতি সুন্দর।

মানুষের বেলা তারা এই প্রেমের যন্ত্রের অবস্থাতেই বিকৃত অভিব্যক্তির ফলে যা প্রথমে সুন্দর ছিল তাকে নষ্ট ক'রে ফেলেছে। অবশ্য উচ্চ স্তরে উঠে গিয়ে মানুষ যদি তার সমৃদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে অনেক কিছুরই দাম বাড়ে। কিন্তু উন্নতির এই মাঝামাঝি অবস্থাতে মানুষ তার বুদ্ধির সুযোগ নিচ্ছে অতি বিকৃত ও হীন ভাবে; বুদ্ধিকে সে ক'রে তুলেছে লোভ ও দুর্নীতি ও ঠকানির হেয় যন্ত্রস্বরূপ। আমার জীবনে আমি এমন অনেক পশুদের দেখেছি যারা অনেক মানুষের চেয়ে অনেক ভালো, তাদের মধ্যে মানুষের মতো ঠকিয়ে নেওয়ার ভাব একেবারেই নেই। কোনো কোনো পশু মানুষদের সংস্রবে থেকে তাদের ছোঁয়াচ পায় বটে—কিন্তু আবার অনেক পশুই কাছে থেকেও পায়না।

লেনদেনের মনোভাব বর্জিত নিঃস্বার্থ ক্রিয়া জগতে এক অতি সুন্দর চৈত্য চেতনার কাজ। কিন্তু মন বুদ্ধির তৎপরতা যত বাড়ে ততই এ জিনিস বিরল হয়ে আসে। কারণ বুদ্ধির আনুষঙ্গিক রূপে আসে যত চতুরতা ও দুর্নীতি ও কুমতলব। গোলাপের বেলা দেখ, সে ফোটে বিনা লাভে বিনা হিসেবে, কেবল সৌন্দর্য ও সৌরভ প্রকাশেরই আনন্দে। আর মানুষের বেলা দেখ, নিতান্ত বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া তার সৌন্দর্য ও ক্রিয়াপটুত্বকে খাটিয়ে তার বুদ্ধি কেবল চেষ্টা করবে কিছু মুনাফা আদায় করতে; কিছু একটু আদায় হোক, হয় অর্থ, নয় প্রশংসা, নয়তো আরো নিকৃষ্ট কিছু। চৈত্যের হিসাবে গোলাপ মানুষের চেয়ে উচ্চ।

কেবল তুমি যদি চেতনার আরো এক ধাপ উপরে গিয়ে অচেতন গোলাপের মতো কাজ চেতনভাবে করতে পারো, তাহলেই তা খুব সুন্দর হবে। কিন্তু তাইই চাই, বিনা উদ্দেশ্যে কেবল অস্তিত্বের আনন্দে আপন সুন্দরগুণের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। ছোটোদের মধ্যে এটা থাকে (সব সময়ে নয়), কিন্তু দুঃখের বিষয় তারাও তাদের বাপমায়ের থেকে ও পারিপার্শ্বিক থেকে দেখে দেখে অল্প বয়স থেকেই মতলবী হয়ে ওঠে। সকল ব্যাপারেই কিছু লাভ করে নেবার চেষ্টা সবচেয়ে হেয় জিনিস, কিন্তু এ ভাব এতই ব্যাপ্ত হয়েছে যে মানুষের পক্ষে তাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সর্বদা এই লাভ করার চেষ্টা, এতেই মানুষকে দিব্য-প্রেমের দিকে বিমুখ করেছে।

প্রশ্ন ফুলেদের কি ভালোবাসা থাকে?

উত্তর ঐ যে ফুটে ওঠা, ওটাই তাদের ভালোবাসার বিকাশ। সূর্যের দিকে চেয়ে ফুল ফুটছে, তা দেখলেই মনে হবে যে তার সৌন্দর্যকে ঐ ভাবে নিবেদন করছে। কিন্তু মানুষ বুঝিনা, কারণ ওরা তো ভেবেচিন্তে কিছু করছেনা। মানুষ যা কিছুই করে তা নিজের দিকে চেয়ে এবং ভেবে নিয়ে যে একটা কিছু সে করছে। পশুরা তেমন ভাবেনা। তাদের ভালোবাসা অমন নয়। আর ফুল তো আদৌ সচেতন নয়, যা করে তা স্বতঃই করে। কিন্তু সেখানে বিরাট বিশ্বশক্তি কাজ করছে তার ভিতর দিয়ে, সেই বিশ্বপ্রেমের শক্তিই ফুলের সৌন্দর্যকে ঐ ভাবে ফুটিয়ে দিচ্ছে।

সেই কথাই আমি এখানে লিখেছি (মা পড়লেন "Four Austerities" থেকে):

"জড়প্রকৃতি ও প্রাণ প্রকৃতির রাজ্যে সব কিছুর মধ্যে যে জিনিসের কারণে সেখানকার প্রত্যেকটি ক্রিয়া নিপুণ সামঞ্জস্যের সঙ্গে সাজানো হয়েছে, আর উদ্ভিদের রাজ্যে যার ক্রিয়াতে সৌন্দর্যের বিকাশ স্পষ্টই দেখা যায়—তা কি প্রেম নয়...?"

এটা তোমরা লক্ষ্য করলেই দেখবে, জড়বস্তুর মধ্যে যেমন ভাবে রকমারি কত ক্রিস্ট্যাল বা কেলাসের প্যাটার্ণ গড়ে ওঠে তার মধ্যে রয়েছে প্রেমেরই প্রেরণা ; আর এটা আরো স্পষ্ট ক'রে দেখবে গাছপালাদের মধ্যে, দেখবে তারা আলোর দিকে কেমন উন্মুখ হয়ে বেড়ে উঠছে। বড়ো গাছেরা চলেছে নিত্য উপরের দিকে এগিয়ে, ছোটোরা যখন তাদের নাগাল পাচ্ছে তখন তারা আরো উপরে এগোচ্ছে। দুটি গাছকে একসঙ্গে রেখে দেখ, দুটিতে এমন আপোষ ব্যবস্থা ক'রে নেবে যাতে দুজনেই সব চেয়ে ভালো ক'রে আলো পেতে পারে ; তাদের দুজনেরই মধ্যে আরো আলো, আরো বাতাস, আরো স্থান পাবার চেষ্টা। (মা আবার পড়লেন) :

"ফুলের যে সৌন্দর্য ও সৌরভের বিকাশ সে হলো তার প্রেমাতিব্যক্তির দান। আর পশুদের মধ্যে রয়েছে যে তাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা, স্বার্থ প্রবৃত্তি, বংশোৎপাদন প্রভৃতি, তা চেতন হোক কিংবা নাই হোক, তারও পশ্চাতে কি প্রেমের কোনো অস্তিত্ব নেই ? উচ্চ-জাতীয় পশুদের মধ্যে তো দেখাই যায় সন্তানের জন্য মায়ের কতখানি আত্মত্যাগ..."

ঐ জিনিসই মানুষদের মধ্যে দেখা যায় মাতৃস্নেহ রূপে। কেবল তফাৎ এই যে এখানে তা আত্মচেতন। কিন্তু পশুদের মধ্যে কখনো কখনো তা মানুষের চেয়েও খাঁটি হয়। এমন দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে যেখানে শাবকের জন্য মায়ের বহুযত্নে লালনপালন প্রচেষ্টা ও একান্ত আত্মনিবেশ অতি চমকপ্রদ। কিন্তু সেখানে তা হয় আপনা হতেই, কোনোটাই ভেবেচিন্তে করা নয় ; পশুরা যা করে তা কখনো ভাবেনা, কেবল মানুষরাই ভাবে। আর তাতেই অনেক সময় কাজের দাম কমে যায় (প্রায়ই তাই), ক্বচিৎ কখনো তা যথেষ্ট দামী হয়। পশুদের যে কাজ স্বতঃস্ফূর্ত, মানুষের সে কাজ ঠিক তাই নয়।

আমার ছিল একটি বিড়াল। প্রথম বার সে যখন বাচ্চা দিলে তখন সে ঐ স্থান থেকে আর নোটে নড়ল না। এমন কি প্রাকৃতিক তাগিদেও বাচ্চা ছেড়ে কোথাও গেল না, কিছু খেতে পর্যন্ত চাইল না। তার কেবল ভয় পাছে বাচ্চাদের কিছু হয়, আপনা হতেই ঐ ভয়। আপন প্রবৃত্তি হতেই সে জানে যে সরে গেলেই বাচ্চাদের অনিষ্ট হবে। পরে তারা যখন একটু বড়ো হলো তখন তাদের শিক্ষা দেবার জন্যে যেমন চেষ্টা সে করতে লাগল তা আশ্চর্য। আর কি যে তার ধৈর্য। বার বার ক'রে অনেক কষ্টে শেখাতে থাকল কেমন ক'রে এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে লাফিয়ে যেতে হয়, কেমন ক'রে খাদ্য খুঁজে নিতে হয় ; একই শিক্ষা সে শেখাতে থাকল দুবার, দশবার, একশো বার ক'রে, বাচ্চা যতক্ষণ না শিখতে পারছে ততক্ষণ তার ক্লান্তি নেই। আশ্চর্য তার শেখাবার পদ্ধতি। কেমন ক'রে বাড়ির দেয়ালের সংকীর্ণ কার্নিস বেয়ে চলতে হয় পাশ থেকে পড়ে না গিয়ে ; যেখানে

দুই দেয়ালের মধ্যে খানিকটা ব্যবধান আছে সেখানে কেমন ক'রে তা ডিঙিয়ে যেতে হয়। এতে বাচ্চারা ভয় পেতো, সহজে লাফ দিতে চাইত না (ব্যবধান খুব বেশি না হলেও)। ওদের মা তখন বারে বারে লাফ দিয়ে অপর পারে গিয়ে ওদের ডাকত : চলে আয়, চলে আয়। তবু তারা নড়ত না, ভয়ে কাঁপত। মা তখন ফিরে গিয়ে যেন তাদের ধমক দিত, থাবা দিয়ে মারতো, গা চেটে দিত, তবু তারা নড়তে চাইত না। সে আবারও একবার লাফিয়ে পার হয়ে যেতো। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখলাম সে আধ ঘন্টা ধরে এই কাজই ক'রে চলেছে। তার পরে তার মনে হয়েছে যে এবার ওরা শিখে নিয়েছে ; তখন যে বাচ্চাটাকে তৈরি বলে বোধ হয়েছে তার পিছন থেকে তাকে বাধা দিয়ে ঠেলে দিয়েছে, আর ঠেলা খেয়ে যেন প্রবৃত্তির বশে সে লাফিয়ে পার হয়ে গেছে। অতঃপর একবার যখন পারলে তখন সে বারে বারে তাই করতে লাগল।

এতখানি ধৈর্য মানুষদের খুব কম মায়েরই থাকে।

এখন তাহলে শেষ হলো। আর কিছু নেই তো ? শুভ রাত্রি।

—শ্রীমা

---

* BULLETIN OF S.A.I.C.E থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

পথের কথা

১৬ অগস্ট ১৯৬৯

ভক্ত : মন থেকে সব কিছুকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ফাঁকা হওয়া, এ কি ভুল কাজ ?

মা : ও! না, না, না!

প্রশ্ন : তাই ভাবছিলাম যে আমি ভুল করছি কিনা সব কিছুকে সরিয়ে ফেলে নিজেকে একেবারে শূন্য ক'রে নীরব নিথর অবস্থায় উপরের দিকে ফিরে থাকা।

মা : হাঁ, করতে পারলে এর চেয়ে ভালো আর কিছু নয়, প্রতি মুহূর্তে তাই আমি করি। তা যদি পারো করতে! চারদিক থেকে কত কিছু ঢেউ আসে (তরঙ্গাঘাতের ভঙ্গী)!

(কিছু পরে মা বললেন জগৎ পরিস্থিতি সম্বন্ধে)

শেষ পর্যন্ত আমি এই বুঝি যে জগতের এত সব বিপর্যয় আমাদের এই কথাই শেখাচ্ছে কেমন ভাবে আমাদের দৈনিক জীবন যাপন করতে হবে, কাল কি করা যাবে সে কথা আগে না ভেবে আজ যা করবার তাই প্রত্যহ ক'রে যাওয়া (যতই ভাবতে যাবে, পূর্ব পরিকল্পনা করবে, তাড়াতাড়ি দেবার জন্যে মতলব করবে, ততই বিশৃঙ্খলা আরো বেশি বাড়বে।

প্রতি মিনিটে এই ভাবে উপরে চাইবে (উপর দিকে চাইলেন) যখনকার যা করণীয় সেইটুকু ক'রে সমস্ত ভার ছেড়ে দেবে সর্বচেতনাময়ের হাতে। দৃষ্টি আমাদের যতই ব্যাপক হোক, কোনো কিছুই আমরা সঠিক জানতে পারিনা যেটুকু জানি তা আংশিক মাত্র—নিতান্ত আংশিক। আমাদের মনযোগ যত রকম দিকেই যাক, তা ছাড়াও আরো দিক থাকে। যা বিপজ্জনক ও হানিকারক তাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া মানে তাকেই আরো বেশি প্রবল ক'রে তোলা।

(ধ্যাননগ্ন হলেন)

যখনই কোনো বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ধারণা জন্মাবে, তখনই প্রবেশ করবে সেই চেতনাতে যার দ্বারা দেখা যেতে অনন্য সত্তায়, অনন্য চেতনা ও অনন্য শক্তির যেখানে আছে কেবল ঐক্য—সব কিছুই তো হচ্ছে সেই ঐক্যেরই মধ্যে। আর আমাদের এই সব তুচ্ছ যত কিছু ভাবনা ও ধারণা ও বিচার বিবেচনা...সেই সর্বনিয়ন্তা মহাচেতনার কাছে তা কতই ক্ষুদ্র ও কতই অকিঞ্চিৎকর! যদি তোমার একটুও বিচারবোধ জাগে যে এত রকমের পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বগুলো কেন হলো, তাহলে দেখবে যে তা হয়েছে আত্মাকে সুযোগ দিতে, আত্মদান ও আত্মবিলোপ ও আস্থা ও নির্ভরতাকে সুযোগ দেবার জন্য বস্তুত বিভিন্ন ব্যক্তির সেইজন্যই গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ নানাদিক নিয়ে যেন শেষ পর্যন্ত ঐকান্তিক ভাবে তাই হতে পারো...আসলে সেটাই দরকার।

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে ডঃ করণ সিং

সেটাই করতে হবে, সেই জিনিসই টিঁকবে, বাকী যা কিছু...সব ছায়াবাজী। সকল অবস্থাতে ঐ জিনিসই টিঁকে থাকে যখন কিছু করতে গিয়ে তা পারোনা, যখন চলতে গিয়ে দেহ চলে না....প্রতি অবস্থাতেই কেবল ঐ কাজ করা মহাচেতনার সঙ্গে চেতন সংস্পর্শে যাওয়া, তার সঙ্গে মিলে যাওয়া ; আর অপেক্ষা করা।

এতেই সঠিক হদিস পাবে যে প্রতি মিনিটে কি করতে হবে—কিংবা না করতে হবে, সক্রিয় হতে হবে অথবা পাথরের মতো অনড় থাকতে হবে। এই হলো একমাত্র সমাধান। কেবল উত্তরোত্তর এই করা, এতেই সমুচিত নিরাকরণ। আর সব কিছু নিতান্ত ছেলেমানুষি।

যত কিছু তৎপরতা ও সম্ভাবাতার ফয়সালা মিলবে এইভাবে—ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাকৃত বাছাই করাকে বাদ দিয়ে। ঐখানে তো আছে সকল রকমেরই সম্ভাবনা। সব কিছুই আছে ওখানে। সকল জ্ঞান ও সকল বোধ ওখানেই—ব্যক্তিগত স্বেচ্ছানিরূপণ যে কতখানি ছেলেমানুষি—একেবারে বোকামি, অজ্ঞানতা শুধু। আর আমি তো এই অনুভব করি, (বাতাস অনুভবের ভঙ্গী), আবহাওয়াতে এত আন্দোলন ! বেচারা মানুষরা !

(নীরব থেকে)

জগৎকে এইভাবে শেখানো, সচেতন হয়ে ভগবানের দিকে ফিরতে।...কেন ? কারণ সেইজন্যই তো জগতের সৃষ্টি হয়েছে !...

(নীরব হলেন)

ভক্ত : কিন্তু আমার একটা কাজের প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যখনই আমি নিজেকে ফাঁকা অবস্থায় এনে উপরের দিকে চাই...তার সঙ্গে মিলে যেতে চাই, তখন কিন্তু দেখি যে সে-দিক থেকে কোনো সঠিক সাড়া আসছে না। কতই বিরাট ও নিরেট তার শক্তি, তবু কিন্তু...

মা ও ! তুমি সাড়া পাওনি ?

ভক্ত বরাবর সেই একই ভাব, বিরাট শক্তি, নিতান্ত দুর্ভেদ্য...

মা তার পরে ?

ভক্ত এই গত কালও ধ্যানের সময় ঠিক তাই হলো—একই জিনিস—সেই বিরাট ও দুর্ভেদ্য শক্তি, অথচ একেবারে নিশ্চুপ, কোনো কথাই বলেনা।

মা কিন্তু এটা তুমি বোধ করোনি...স্বাচ্ছন্দ্য বলা হয়তো ঠিক হবেনা, জানিনা কি বলে বোঝানো যায়, ভাষায় বলা যায়না, কিন্তু এমন একটা খুশি খুশি ভাব যা বেশ তৃপ্তিতে ভরাট করে দেয় ?

ভক্ত হাঁ, স্বাচ্ছন্দ্য একরকম পাই বটে।

মা ও !

ভক্ত হাঁ, সেটা মেলে ঠিকই।

মা : তবেই তো হলো, যা আসল জিনিস। আর যা কিছু তার কোনো দাম নেই।

ভক্ত কিন্তু বাস্তব রকমের সঠিক সাড়া পাবার কি উপায় ?

মা তা ঐরূপ অবস্থার নিচেই রয়েছে।

ভক্ত : ওরই নিচে ?

মা এর পরেই। সে এমন অবস্থা...অনুভূতি থেকে জানি, যাতে জগতে রূপান্তর আনা যেতে পারে। যন্ত্রস্বরূপ হয়ে—এমন কি অজ্ঞাত ভাবে—অথচ তা কাজ করে শক্তিগুলির বহিঃপ্রকাশ চতুর্দিকে এনে (কেন্দ্র থেকে চারিদিকে শক্তি বিকাশের ইঙ্গিত)। মস্তিষ্ক তো নেহাৎ ছোটো জিনিস, তাই নয় কি ?—যত বড়োই হোক, তবু সমগ্র বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাই মনকে ফাঁক দিয়ে কাজটা হয়ে যায়। তাই তুমি দেখ যে তোমার ক্ষুদ্র জীবনটির তাৎপর্য অনুযায়ী প্রতি মিনিটে তুমি আপনা হতে ক'রে যাচ্ছ যা তোমাকে করতে হবে—তাতে কোনো হিসাবনিকাশ নেই, জল্পনা কল্পনা নেই, পূর্বনির্ধারণ নেই, এমনি আপনি প্রবাহিত হতে থাকার মতো (যন্ত্রবৎ প্রবাহিত হবার ইঙ্গিত)।

ব্যক্তিগত অনুভূতি হতে জানি যে তখন যদি দেহেতে কিছু বিঘ্ন আসে (যেমন কোনো ব্যথা ধরল কিংবা দেহের কিছু কল বিগড়ালো), সেই কাজটির বেলাতে তা তখন কিন্তু কোথায় চলে যায়,—বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়। দারুণ যন্ত্রণাও সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়, বোঝা যায়না কেমন ক'রে গেল ! হঠাৎ দেখলে যে আর তা নেই।

আর দৈনিক জীবনে লোকের সংস্পর্শে যখন এলে তখন কিন্তু শিশুর মতো সরল। অর্থাৎ তুমি যা ক'রে যাচ্ছ তার কোনো পরিচয় নেই। এই রকমই হয়। আমি সর্বদা ঐ অবস্থাতেই থাকতে চেষ্টা করি যেমন তুমি বললে। যাই কেন ঘটুক—এটার যা করবার তা সব সময়েই, বরাবরই ক'রে যাবে। তা ছাড়া কিছু আর বলতে পারব না। যেহেতু এটা এই রকমই।

এটা আমি লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে বিভিন্ন রকম করতে হয়, আর অনুভূতিও বিভিন্ন—কিন্তু সব একই অবস্থাতে (মনঃ হয়ে উপরে ইঙ্গিত)।

তবে এমন অবস্থায় পৌঁছানো চাই যাতে কিছুমাত্র কামনা থাকবে না, বাছাবাছি থাকবে না, টান অটান থাকবে না, সমস্তই ঘুচে যাবে।

আর বিশেষ কথা, সব চেয়ে বড়ো কথা—ভয় থাকবে না। এটাই সব চেয়ে দরকারী।

১ অক্টোবর, ১৯৬৯

(প্রেমের প্রসঙ্গে গত অগস্টে মায়ের উক্তি সম্পর্কে)

ভক্ত মা, ঐ যে প্রেমের শক্তি—যা এলেই টের পাওয়া যায়, তখন প্রকৃতই আমরা খুবই ভালোবাসি, কিন্তু সেটা সর্বদাই রাখা যায়না কেন ?

মা তাকে ধরে রাখাই তো চাই।

ভক্ত : ধরে রাখা চাই তো নিশ্চয়, কিন্তু তা যে হয়না।

মা শোনো ছেলে...সব সময়েই তা রয়েছে এখানে—দেহটা যাই কেন করুক, যত লোকের সঙ্গেই কথা বলুক বা যতই কর্মব্যস্ত থাক বা ঘুমিয়েই থাক, তা কিন্তু চেতন

ভাবেই আছে, সর্বদা স্পন্দিত। আমি বলি, "সম্ভব তা" কিন্তু বাস্তবেই তাই। কেবল যা তাকে বাধা দেয় তা হলো অধিকাংশ লোকের তমসাচ্ছন্ন স্থূল চেতনা—যা তৈরি হয়েছে যত পার্থিব প্রয়োজন আর বাসনা কামনা ও বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া নিয়ে, কিন্তু তার বদলে যা দরকার তা হলো দেহকোষগুলির মধ্যে ভগবৎ-প্রেম জাগিয়ে তোলা। আর ভগবানকে একবার ভালোবাসতে পারলে তখন কোষগুলি বরাবর সেই ভাব নিয়েই থেকে যাবে অপরিবর্তনীয় রূপে। মন বা প্রাণের তরফের ক্রিয়ার চেয়ে তা এমনি ভাবে আরো নিত্যস্থায়ী রূপে আঁকড়ে থাকে (মুষ্টিবদ্ধ ক'রে দেখালেন)। কোষগুলি অটল ভগবৎপ্রেমে নিমগ্ন থেকে যায়। দেহবস্তুর সম্পর্কে এই কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তা একবার যা শিখবে তা আর ভুলবে না। তাই তার কোষগুলি যদি একবার শেখে আত্মদান ও আত্মনিবেদন করতে, সে শিক্ষা স্থায়ী থেকে যায়, তার নড়চড় হয়না। চব্বিশ ঘন্টাই তাই নিয়ে লেগে আছে। যদি এদের মধ্যে কিছু কল বিগড়োয় (ব্যথা পীড়া প্রভৃতির আক্রমণে), তখন ওদের প্রথম কাজই হয় নিঃশেষে আপনা হতে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দেওয়া। কোষগুলির এই স্বতঃপ্রণোদিত আত্মদানে উচ্চচেতনা বাধা দেয় না। কেবল মন এবং প্রাণই ছট্‌ফট ক'রে অস্থির হয় (অনুরূপ ভঙ্গী)। প্রাণই হয় বেশি চঞ্চল।

অবশ্য এগুলি পরস্পরনির্ভর : এ ক্ষেত্রে বর্জন করতে হবে অহংকে, 'আমির কর্তৃত্বকে। লোকে সাধারণত ভাবে যে দৈহিক অহংকে বর্জন করা সম্ভব নয় কিন্তু তা কেবল সম্ভবই নয়, প্রকৃতই তা করা হয়েছে, আর তৎসত্ত্বেও দেহ দিব্যি চলেফিরে বেড়াচ্ছে ভেঙে না গিয়ে (যদিও তার জন্য সামান্য কিছু কষ্ট করতে হয়েছিল)। এখন দেহকোষরা আশ্চর্য হয়ে ভাবে যে আত্মপরায়ণ না হয়েও কেমন করে টিঁকে থাকা সম্ভব হলো। সমগ্রটাই এমনি (আশ্রমের ইঙ্গিত)। আশ্চর্যের কথা বটে।

আভ্যন্তরীণ বিকাশের কালে মনকে ও প্রাণকে নিয়ে অনেক বিঘ্নবিপত্তি ঘটেছে, পুরোনো জিনিসগুলো চাগাড় দিয়ে উঠেছে, কিন্তু এর বেলাতে (দেহের দিকে) সে কথা নয়, এর সে সব জিনিস একেবারেই গেছে।

—শ্রীমা

কঠিন ডানায় ওড়া

বীরবাহু

সুখে-দুঃখে উদয়বন্ধ কুন্তিগ্রামে দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। কখন কখন মনে হইত দিনগুলি এমন সুখে-দুঃখেই কাটিয়া যাইবে।

অসুবিধার কারণ বিস্তর ছিল কিন্তু নিত্যই নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াতে বিরক্তি বা অবসাদ কখনও আসে নাই। প্রত্যহই হয় উড়িতে যাওয়া, নয় ত সার্ভিসিং সেক্‌শনে থাকিয়া বিমান মেরামতের কাজ অনেক সময়ই নিজে কাজ না করিয়া অন্য বৈমানিকদের কাজ পর্যবেক্ষণ করা বা তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের নির্দ্দেশ দেওয়া। কাজ সুরু হইল সূর্য্যদেব গগনে আরোহণ করার পূর্ব্বে আর শেষ হইল দিনান্তে যখন অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া গিয়াছে, সমস্ত পৃথিবী নীরব নিস্তব্ধ, শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার আনন্দ কীর্ত্তণ আর শৃগালের "কেয়া হুয়া, হুক্কা হুয়া" কার্য্য অবসানে বিমান বন্দর হইতে ছাউনিতে ফিরিয়া আসার পর আহারের জন্য মেসে যাওয়া। সেখানে অন্ততঃ একঘন্টা আনন্দে কাটান। গল্পগুজব নানা ধরণের আর স্তরের। গল্প বলায় না মাতিয়া গিয়া যে গল্প শোনে সে আনন্দ পায় অনেক বেশী। গল্প মারফৎ অনেক কথা জানিবার অবকাশ সে পায়। আর তার স্বভাব যদি অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, তবে সে শুধু আনন্দই উপভোগ করে না, সে দেখে বৈচিত্র্য জনে জনে বৈচিত্র্য শুধু নয়, প্রত্যেক জনের মধ্যেই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনের বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্য অন্বেষণে তাহার দেশবিদেশে গমনের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায়। এক মেসে বসিয়াই সে সমস্ত দুনিয়ার রং-বাহার দেখিতে সক্ষম হয়।

শৃগালের 'কেয়া হুয়া হুক্কা হুয়া' হইতে অধিক হিংস্র কোন ডাক বা গর্জ্জন আমরা উদয়বন্ধ বা কুন্তিগ্রামের ছাউনিতে কখনও শুনি নাই। তবে প্রায়ই গল্প শোনা যাইত যে দশ-পনর মাইল দূরবর্ত্তী চা-বাগানের বাসিন্দার উপর হিংস্র কোন বন্যজন্তু হামলা করিয়াছে। বিমানবন্দরের এত আওয়াজের মধ্যে আগমন হয়ত তাহাদের মনঃপুত ছিল না। সেই এলাকার হিংস্র বন্য-জন্তুরা হয়ত ভাবিয়াছিল বিমান-বন্দরে তাহাদের চাইতেও অধিক হিংস্র কোন বন্যজন্তুর অধিষ্ঠান হইয়াছে। যাহারা দিনের বেলায় এমন বিকট আওয়াজ করিয়া চড়া বড়া করে, গমনাগমন করে আকাশ-মার্গে তাহারা নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু হইবে, এই রকমই বোধ হয় ঐ এলাকার বন্যজন্তুদের ধারণা হইয়াছিল। সেই জন্যই সম্ভবত তাহারা বিমানবন্দরের এলাকার মধ্যে ছাউনিতে কখনও পদার্পণ করিত না।

দুঃখের কারণ অনেকগুলি ছিল। বিমান বাহিনীর অন্যান্য ছাউনিগুলির মত সপ্তাহান্তে একবার করিয়া দেশী বা বিলাতি ছায়াছবি দেখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ছায়াছবি দেখিতে হইলে শিলচর পর্য্যন্ত যাইতে হইত। আর সেখানে প্রেক্ষাগৃহ ছিল বটে, কিন্তু সেই

প্রেক্ষাগৃহে একবার ঢুকিলেই ছায়াছবি দেখার বাসনা ফুরাইয়া যাইত। শিলচর শহরে আনন্দ করিতে যাওয়ার অনিচ্ছা হওয়ার আরও একটা বৃহৎ কারণ ছিল। শিলচরে গেলে মনের মত আহার মিলিত না। যে কয়েকটা হোটেলে বৈমানিকদের যাওয়ার অধিকার ছিল সব কয়টাতেই আহার্য্যের বদলে মূল্য ছিল দ্বিগুণ, কিন্তু আহার্য্য বস্তু ছিল অখাদ্য। অধিকন্তু নিজেদের ছাউনিতে যখন রসগোল্লা খাওয়ার সুবিধা হইল, তখন অত্যন্ত সাধুর সাধুতায় রসগোল্লা হেন চিনির সহিত লবন যুক্ত হইল। মিষ্টত্বের পরিবর্তে উৎকট স্বাদ গ্রহণ করিতে হইল। বিজ্ঞজন বলিতে পারেন উৎকট স্বাদের রসগোল্লা গ্রহণ না করিয়া ফেলিয়া দিলেই ত চুকিয়া যায়! কিন্তু রসগোল্লার মত বস্তু ফেলিয়া দেওয়ার মত বুকের পাটা কয় জনের আছে।

অসুবিধাগুলির তালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে বিরাট আকার পুস্তকের আয়োজন করিতে হইবে।

বিমান বাহিনীর খানাঘরে যখন বৈমানিকরা সকলে আহারে বসে, তখন সেই দিনকার জন্য কর্ত্তব্যরত (Duty officer) উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর প্রধান কর্ম্মই হইল বৈমানিকদিগকে একজন একজন করিয়া প্রশ্ন করা, "তোমার কোন নালিশ আছে কি?" প্রশ্নটা করা হয় এমন ভঙ্গিতে আর স্বরে যাহাতে কাহারও কোন প্রকার নালিশ করার কারণ না থাকিলেও, প্রশ্নের তাগিদে নালিশ করার মত নূতন কোন অসুবিধার কথা মনে জাগিয়া উঠিবে। প্রশ্নটা করার ধরণই এমন যে বাস্তব অসুবিধা কোন প্রকার না থাকিলেও মনগড়া কল্পিত অসুবিধার কথা মনে জাগিয়া উঠিবে।

একটা নালিশ সবাইকার মনেই ছিল। কিন্তু সে নালিশ আনাদের সময় কেহ কোন-দিনই উত্থাপন করে নাই। সে নালিশ প্রকাশ করার মত সময়, অজুহাত বা অবকাশ হয়ত তখনও আসে নাই। ফ্লাইং অফিসার লতিফ খান, ফ্লাইং অফিসার দাস, পাইলট অফিসার সাকুলতওয়ালা, সার্জেন্ট কুমার কাহাদের ভালর জন্য তাহাদের নিজেদের গল্প শেষ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল? তাহাদের চলিয়া যাওয়াতে আমরা কয়জন যে উদ্দেশ্যে বিমান বাহিনীতে যোগ দিয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় কোন সুবিধা হইবে কি? বা সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়ার দিকে কতটা অগ্রসর হইল?

পাইলট অফিসার দর্দির, বিমান হইতে পতিত হইয়া, জঙ্গলের মধ্যে দিয়া হাঁটিয়া ছাউনিতে ফিরিয়া আসার কিছুদিন পরের একটা ঘটনা বলা আবশ্যক। তিনজন ভারতীয় বর্ম্মা মলুক হইতে টিডিম টানুর রাস্তার পাশে জঙ্গলের মধ্য দিয়া সরাসরি আমাদের ছাউনিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কবে আসিয়াছিলেন বা কতদিন পর্য্যন্ত আমাদের ছাউনিতে লুকাইয়া ছিলেন বলিতে পারিব না। কিন্তু একদিন তাঁহাদের সাথে কথা হইয়াছিল। তাহাদের অবস্থা পাইলট অফিসার দর্দির বিমান হইতে বর্ম্মার এলাকায় পতনের পরে ফিরিয়া আসার পর যে অবস্থা ছিল, তাহার তুলনায় অনেক খারাপ ছিল। কিন্তু তাঁহাদের মন ছিল আশায় ভরা। উৎসাহ ছিল তাঁহাদের প্রচুর। কোথায় আহার মিলিত, রাত্রিতে

কোথায় বাস, এ সব কথা বা প্রশ্ন অসঙ্গত বিবেচনায়, কখনও তুলি নাই। আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ দিয়া তাঁহাদিকে যতটা সাহায্য করা যায়, তাহা করা হইয়াছিল। মেসের খাদ্য-ভাণ্ডার হইতে কিছু খাদ্য দিয়াও তাঁহাদেকে সাহায্য করা হইয়াছিল এবং তাঁহারা সেই আহার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা কয়েকজন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছিলাম।

কিন্তু তাঁহারা কবে ছাউনিতে আসিলেন, কতদিন থাকিলেন এবং কবে সরিয়া পড়িলেন, সে সব তথ্য তখন জানিবার ইচ্ছা থাকিলেও, ইচ্ছা দমন করিয়া সে সব প্রশ্ন কখন উত্থাপন করি নাই। ইচ্ছা দমন করার একটা বিশেষ কারণ ছিল। ইংরেজ হইতেও ইংরেজদের বিশ্বাসভাজন ভারতীয়দেকে আমরা অবিশ্বাস করিতাম অনেক বেশী। তখনকার সময়, সমস্ত প্রকার ভারতীয় কৌজেই একটা অশান্তির ভাব, ইংরেজের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব ক্রমে ক্রমে জাগিয়া উঠিতেছিল। ইংরেজ কর্তারা সেইজন্য নানা প্রকারে প্রথমে অশান্তদের ও বিদ্রোহীদের নামের তালিকা সংগ্রহের চেষ্টায় ছিলেন। নামের তালিকা সংগ্রহের জন্য তাঁহারা নানা পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ পন্থাগুলির মধ্যে বর্ম্মায় নেতাজীর ছাউনি হইতে লুকাইয়া আগত কৌজীর বেশ ও ভড়ংও ছিল। সে সংবাদ আমাদের নিকট সময়মতই পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু সেই তিনজনকে দেখিয়া বা আলাপ করিয়া কখনও মনে আসে নাই যে তাহারা ইংরেজের বিশ্বাসী এবং ইংরেজের গোয়েন্দা।

সেই তিন জন কি ভাবে যে আমাদের ছাউনিতে ঢুকিতে পারিয়াছিলেন বা কেমন করিয়া যে আবার বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন বলিতে পারা যাইবে না। যখন দিন করেক ধরিয়া আর তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না, তখন বুঝা গেল যে তাঁহারা আমাদের ছাউনি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেছেন। কিছুদিন পরে ইমফল হইতে বেতার-বার্ত্তায় সংকেতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে এক ব্যক্তি কৌজীদের কাছে ধরা পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সব সময়ই প্রথমে প্রাণ হরণ করিয়া, পরে প্রশ্ন করা হয়। First shoot, ask questions later, এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা। যে প্রাণ হরণ করিল, তাহাকে আর কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় না। প্রবল সন্দেহ হইয়াছে, কি প্রকারে আর সময় নষ্ট করা যায়? সন্দেহ যাহাকে করা হইয়াছে সে হয়ত একাকী নয়। আরও অনেক সাথী তাহার পশ্চাতে লুকাইয়া রহিয়া অগ্রসর হইতেছে। তাহাকে একবার নিকটে আসিতে দিলে, প্রশ্ন করার বহু পূর্ব্বেই তাহার সাথীরা যে আমাকে প্রশ্ন করার সকল সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া ফেলিবে। সেই জন্যই প্রশ্ন করার পূর্ব্বে প্রাণহরণ করাই শ্রেয়। হয় সে নয়ত আমি, দুইজনের এক সাথে বর্ত্তমান থাকার নানা অসুবিধা রহিয়াছে। সেই জন্য আমিই সশরীরে বর্ত্তমান রহি আর তাহাকে ধরাধাম হইতে সরাইয়া দেওয়া হউক, এই ব্যবস্থাই কি জাগতিক নিয়মে শ্রেষ্ঠ নয়? জাগতিক নিয়মে এই ব্যবস্থা হইতে আরও উচ্চতর ব্যবস্থা হয়ত থাকিতে পারে, এই ব্যবস্থা হয়ত শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা না হইতেও পারে। কিন্তু কৌজী নিয়মে এর চেয়ে আর কোন উত্তম ব্যবস্থা নাই। নীতিবোধ বা মানবতার দিক হইতে নানা প্রশ্ন তোলা সম্ভব। কিন্তু সে সব প্রশ্নের সমাধান কৌজী নিয়মে হওয়া সম্ভব

নয় বলিয়া সেগুলি সব সময় এড়াইয়া যাওয়া হয়। আর ইতিহাস হইতে বহু নজীর মিলিবে যখন ফৌজী নিয়মকে নীতিবোধ বা মানবতার অজুহাত দিয়া সংস্কৃত করা হইয়াছে, তখনই সেই ফৌজের প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে—অর্থাৎ তাহার অস্তিত্বও সেই সঙ্গে লোপ পাইয়াছে। না হইলে দিল্লীর পৃথ্বীরাজ কখনও সুলতান মামুদের ফৌজের নিকট প্রাণ বিসর্জন দিতেন না অথবা শিবাজী মহারাজ গুপ্ত ছুরিকাঘাতে আফজল খানের হস্তে নিহত হইতেন আর মারাঠাদের তথা সমগ্র ভারতের ইতিহাস অন্য প্রকার হইয়া যাইত।

সবাই বলে, "ভগবান কখনও কাহাকে নিশ্চিন্ত আরামে সুখ-শান্তি ভোগ করিতে দেন না"। যখনই প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে একটা সুশৃঙ্খলা আসিল, ঘুম হইতে সকালে উঠিলাম, দিনে কাজ করিলাম, আবার রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলাম,—কোন উদ্বেগ নাই, চিন্তা নাই, সব কাজেই নিশ্চিন্তবোধ আর আরাম বোধ, তখনই দেখিয়াছি এমন সব নূতন পরিস্থিতির উদয় হয়, যখন সমস্ত শৃঙ্খলাকে একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়া, নিশ্চিন্তবোধে সন্দেহ জাগাইয়া, অবসাদগ্রস্ত মন-প্রাণ-দেহকে পুনরায় জাগাইয়া তোলে। আমাদের অবস্থা সেই প্রকার নিশ্চিন্ত-বোধের দিকেই ঝুঁকিয়া চলিয়াছিল। প্রায় বৎসর কাল হইতে চলিল, প্রত্যহই প্রায় তিনবার করিয়া বারখানা বিমান উড়িয়া গিয়া শত্রু শিবিরে সমস্ত বোমা ফেলিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। সবাইকার নিকটই সুনাম। যেখানে যাওয়া যাউক, সাত নম্বর ভারতীয় স্কোয়াড্রনের বৈমানিক শুনিলেই সবাই নিজের কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাদেরকে সেখানে বসিবার জন্য অনুরোধ করিত। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই ব্যবহার আমাদের উচিত প্রাপ্য মনে করিতে আরম্ভ করিল। ঠিক এই সময় দিল্লীস্থিত বিমান-বাহিনীর কেন্দ্রীয় দপ্তর হইতে একদিন স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরীর সাত নম্বর স্কোয়াড্রন হইতে বদলি হওয়ার হুকুম আসিল। আমরা একটা সুন্দর সংসার সাজাইয়া দিনাতিপাত করিতেছিলাম। সেই সংসারের যে প্রধান, তাঁহারই বদলির হুকুম আসিয়া উপস্থিত। হুকুমে ছিল যে তাঁহাকে স্কোয়াড্রন লীডার হইতে একধাপ উন্নত করিয়া উইং-কমাণ্ডার করা হইয়াছে এবং বদলি করা হইয়াছে একেবারে নয়া দিল্লীতে, বিমান-বাহিনীর একটা দপ্তরের প্রধান করিয়া। যে জন এতদিন ধরিয়া এত সুচারুরূপে শুধু বিমান চালনা নয়, তাঁহার অধীনস্থ এতগুলি বৈমানিকদের দিয়া শৃঙ্খলার সহিত বিপদের এতগুলি কাজ সুসম্পন্ন করাইলেন তাহার পদের উন্নতি হইবে এ খুব ভাল কথা; কিন্তু পদের উন্নতির সাথে সাথেই তাঁহাকে বিমান চালনার কাজ হইতে একেবারে সরাইয়া দিয়া শুধু দপ্তরের কাজে বহাল করা হইল, এ কেমন বিধি? তাঁহার পদোন্নতিতে স্কোয়াড্রনের সকলেই আনন্দিত হইল, কিন্তু তাঁহার ন্যায় স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার হারানতে সকলেই মনঃক্ষুণ্ণ হইল।

দুঃখের সীমা ছাপাইয়া উঠিল যখন জানা গেল যে স্কোয়াড্রনের নূতন কমাণ্ডার হইয়া কে আসিতেছেন।

বহুদিন পূর্বে একটা প্রশ্ন উঠিয়া তখনই শেষ হইয়া গিয়াছিল। প্রশ্নটা ছিল ভারতীয় বিমান-বাহিনীতে প্রথম নম্বর কে? মুখার্জী না আওয়ান? প্রশ্নের মীমাংসা প্রশ্ন ওঠার

সাথে সাথে হইয়া গিয়াছিল। স্কোয়াড্রন লীডার আওয়ান বিমানে উড়িতে মোটেই ভাল-বাসিতেন না। যদিও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে তিনি আগত কিন্তু সেই দেশের ছাপের অভাব ছিল তাঁহার মধ্যে। বিমানে উড়া ব্যতীত অন্য কাজই তাঁহার বেশী মনঃপুত ছিল। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি দিল্লীতে কোন মন্ত্রী-মহোদয়ের সামরিক সচিব (military secretary) ছিলেন। বিমান-বাহিনীতে সত্যিকার কাজ হইল বিমানে, হয় বিমানে আকাশে ওড়ায় নয়ত বিমান মেরামত করিয়া উড়িবার জন্য উপযুক্ত করায়। এতদিন পর্য্যন্ত এই দুই প্রকার কাজের কোনটাতেই তিনি ছিলেন না। সেইজন্য তাঁহার তুলনায় যাঁহারা নবাগত, তাঁহাদের পদোন্নতি হইয়া উইং কমাণ্ডার বা গ্রুপ ক্যাপ্টেন পদ মিলিতেছিল, কিন্তু তিনি যে স্কোয়াড্রন লীডার ছিলেন, সেই স্কোয়াড্রন লীডার অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহার পদোন্নতির কাজে সাহায্য করার জন্য দিল্লী কেন্দ্রীয় দপ্তর হইতে তাঁহার হাতে ভারতীয় স্কোয়াড্রনগুলির মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ, সেই স্কোয়াড্রন তুলিয়া দেওয়া হইল। অল্প কয়েকদিন স্কোয়াড্রনের অধিনায়কত্ব করিলেই পদোন্নতির ফলে উইং কমাণ্ডার পদে উন্নীত হইবেন। শুধু আসল যুদ্ধের কিছু অভিজ্ঞতা তাঁহার সঞ্চয় করা প্রয়োজন।

স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী স্কোয়াড্রন ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সাথে সাথেই নূতন স্কোয়া-ড্রন কমাণ্ডার তাঁহার প্রকৃত রূপ জাহির করিলেন। গ্রুপ হেড্‌কোয়ার্টারে সংবাদ পাঠাইলেন যে বৎসরকাল ধরিয়া প্রত্যহ দুষমনদের এলাকায় বোমা বর্ষণে যাইয়া স্কোয়াড্রনের সকল বৈমানিকরাই বিশেষ পরিশ্রান্ত; সেইজন্য বিশ্রাম করা তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এখন বিশ্রাম না লইলে স্কোয়াড্রনের কার্য্যতৎপরতা ক্রমেই হ্রাস হইয়া পড়িবে এবং এ পর্য্যন্ত অন্য দেশী ও বিলাতি স্কোয়াড্রনগুলির তুলনায় এই স্কোয়াড্রনে বৈমানিক ও বিমানের অপচয় যে এত কম হইয়াছে, স্কোয়াড্রন শ্রান্ত হইয়া পড়া সত্ত্বেও যদি তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া না হয়, তবে স্কোয়াড্রনের কার্য্যে গাফিলতি দেখা দিবে এবং হয়ত সেই সঙ্গে কতকগুলি বৈমানিক ও বিমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বর্ত্তাইবে।

এই সময় কয়েকজন গোরা বৈমানিক গ্রুপ-হেড্‌কোয়ার্টার্স হইতে বদলি হইয়া আমা-দের স্কোয়াড্রনে আসিল। এত দিন পর্য্যন্ত স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন-লীডার চৌধুরীর অমতের জন্য গ্রুপ-হেড্‌-কোয়ার্টার্স হইতে কোন গোরা বৈমানিককে আমাদের স্কোয়াড্রনে পাঠায় নাই। নূতন স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার আসার সাথে সাথেই তাহারা কয়েকজন গোরা বৈমানিক আমাদের স্কোয়াড্রনে পাঠাইল।

আমাদের স্কোয়াড্রনে শৃঙ্খলা বজায় রাখার কর্ত্তা ছিলেন ওয়ারাণ্ট অফিসার কস্তুরী লাল—পাঞ্জাবের অধিবাসী। তিনি এ পর্য্যন্ত সুচারুরূপেই স্কোয়াড্রনে শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়াছিলেন। সবাইকে তিনি কড়া শাসনে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু যেখানে নরম হওয়া প্রয়োজন, সেখানে কড়া শাসনের পরিবর্ত্তে যেন দেখিয়াও দেখেন নাই এইরূপ ভাব দেখাইতেন। সবাইকার প্রিয়পাত্র তিনি ছিলেন।

নবাগত গোরাদের মধ্য হইতে সার্জেন্ট কিং-কে ওয়ারান্ট অফিসার কস্তুরী লালের সাহায্যকারী করিয়া আমাদের নূতন স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার বহাল করিলেন।

নবাগত গোরারা সকলেই ছিলেন এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের।

যে কোন স্কোয়াড্রনে কোন বৈমানিক বদলি হইয়া যখন প্রথম আসে, তখন তাহার প্রথম কর্ত্তব্য হইল, স্কোয়াড্রন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যে ওয়ারান্ট অফিসার আছেন, তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া। ওয়ারান্ট অফিসার বৈমানিকের শিক্ষা এবং স্কোয়াড্রনের প্রয়োজন অনুযায়ী, তাহাকে নানা বিভাগে প্রেরণ করেন এবং নূতন বৈমানিককে স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের সম্মুখে হাজির করিয়া তাহার পরিচয় প্রদান করেন। স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার সাধারণতঃ ওয়ারান্ট অফিসারের কার্য্যই সমর্থন করেন। কখন যদি কোন বিশেষ কারণ থাকে, তখন নূতন বৈমানিকের বিভাগে বদল করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু সে কাজ স্কোয়াড্রনের শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওয়ারান্ট অফিসারের মারফৎই করিয়া থাকেন। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে স্কোয়াড্রনে শৃঙ্খলা বজায় রাখা অসম্ভব।

আমাদের স্কোয়াড্রনে এইবার এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। নবাগত গোরা বৈমানিকদিকে নানা বিভাগে বন্টন আমাদের নূতন স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার নিজেই করিলেন। এ-ব্যবস্থায় কাহারও কোন কথা বলার বা প্রশ্ন উত্থাপন করা সম্পূর্ণ রহিত হইয়া গেল।

স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের এই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করার যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি জানিতেন আমাদের স্কোয়াড্রনের বৈমানিকরা কেহই গোরাদের পছন্দ ত করেইনা, উপরন্তু সব সময় সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। সন্দেহের দৃষ্টিতে তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখা একদিনে হয় নাই। বহুবার বহু কাজে তাহাদের কার্য এবং মনোবৃত্তি পর্য্যবেক্ষণ করার অবসর আমাদের স্কোয়াড্রনে যথেষ্ট মিলিয়াছিল। কার্য্যে তাহদের পটুত্বের বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না—কিন্তু বহুবার আমাদের নজরে আসিয়াছে, যে মুহূর্ত্তে তাহাদের একজন কোন ভারতীয় স্কোয়াড্রনে আসিল, তখনই তাহার কার্য্যে শৈথিল্য আসিল এবং সেই সঙ্গে ইচ্ছাকৃত, অবজ্ঞাকৃত অবহেলা দেখা দিল। ভারতীয় স্কোয়াড্রনে আসা মাত্র তাহারা প্রত্যেকেই এক একজন বস্তু বিজ্ঞ বিশারদ রূপে প্রকট হইতেন। আর ভারতীয়রা কিছুই জানেনা, সেইজন্য নিজেদের অসম্ভব ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকার করিয়া যাহাতে ভারতীয়দের মঙ্গল হয়, যাহাতে সব ভারতীয়রা সব কার্য্য শিখিয়া পড়িয়া লইতে পারে, যাহাতে ভারতীয়রা তাহাদের নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে, আর বিদেশী ইংরেজদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে না হয়, এই হইল তাহাদের একমাত্র ধ্যান, এইরূপ ভান তাহারা লইত। এতে ভারতীয় বৈমানিদেকে শুধু অবজ্ঞা নয়, সব সময় প্রচেষ্টা ছিল হেয় করা। গোরা বৈমানিকদের এই ভণ্ডামি আমরা জ্ঞাত ছিলাম এবং সেই সঙ্গে এ কথাও জানিতাম যে বিমান উড়াইবার কৌশলে এবং বিমান সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন রাখার বিদ্যায় এবং কার্য্যে আমরা কখনই তাহাদের সঙ্গে তুলনায় হীন ছিলাম না। বরঞ্চ তাহাদের তুলনায় অনেক বেশী বস্তুবান ছিলাম। এই সমস্ত কারণে নবাগত গোরা বৈমানিকদিকে তাহাদের বিভাগে লইতে

ভারতীয় বৈমানিকরা মোটেই ইচ্ছুক ছিলনা। নূতন স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার এই সব কথা জানিতেন, সেইজন্য ভারতীয় বৈমানিকদের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, তিনি নিজে গোরা বৈমানিকদেকে প্রত্যেক বিভাগে ঢুকাইলেন। প্রত্যেক বিভাগে ঢুকাইবার প্রকৃত কারণ আমরা অনুমানে বুঝিয়াছিলাম। প্রকৃত কারণ ছিল ভারতীয়দেকে অবজ্ঞা করা এবং তাহাদের কাজে অবিশ্বাস করা।

নূতন স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার নিজে ভারতীয় হইয়াও বিশেষত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হইয়াও, কোন মনস্তাত্ত্বিক কারণে নিজের দেশীয় লোকদেকে অবিশ্বাস করিতেন এবং বিদেশী দের উপর এত আস্থা রাখিতেন জানি না। বুঝিবা এও কোন প্রকার মানসিক রোগ। যে দুইজন গোরা ছিল, তাহাদেকে শুধু দপ্তরের নথো থাকিয়া, খাতাপত্র লেখা ও গুছাইয়া রাখার কাজে বহাল করা হইল। বিমানের কাজ কিছুতেই দেওয়া হইত না। অন্যান্য বিভাগেও ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা হইল। নূতন স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের হুকুম অমান্য করা হইল না কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাও পূরণ করা হইল না।

সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে বিমান বাহিনীর দিল্লীস্থিত কেন্দ্রিয় অফিস হইতে আমাদের পরিশ্রান্ত স্কোয়াড্রনের বিশ্রামে যাওয়ার হুকুম আসিল। হুকুম অনুযায়ী স্কোয়াড্রন রাঁচী বিমানবন্দরে গিয়া মাসাধিক কাল বিশ্রামের পর পুনরায় বর্ম্মা উদ্ধারে আসিবে এইরূপ ব্যবস্থার কথা স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের নিকট জানা গেল।

নূতন স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের আগমন এবং স্কোয়াড্রনকে বিশ্রামের জন্য রাঁচীতে যাওয়ার হুকুম, এই দুই ঘটনার ব্যবধান বিশ দিনের বেশী হইবে না। এই পক্ষকালের মধ্যে নূতন স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার একদিনও ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্‌স্ বোমারু বিমানে সাধারণভাবেও উড়িতে গেলেন না। শত্রু এলাকার উপর বোমা বর্ষণের কথা ত অনেক দূরের ব্যাপার। কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যে স্কোয়াড্রন কম পক্ষেও প্রায় ত্রিশ বার শত্রু এলাকার উপর হানা দিতে গিয়াছে। স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরীর সহিত তুলনা করিতে গিয়া নূতনের প্রতি আমাদের আস্থা হারাইয়া গেল। কোন দল যদি তাহাদের নেতার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সে দলের কার্য্যকারিতা নষ্ট হইয়া যায়; দলের প্রত্যেকের যতই অসাধারণ কৃতিত্ব থাকুক না কেন, দল হিসাবে তাহাদের আর কোন দাম থাকে না। সেই দল উপযুক্ত নেতার অভাবে ক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। দল যত ভালই হউক নেতার অভাবে দলের পতন অনিবার্য্য। কিন্তু স্কোয়াড্রন লীডার চৌধুরী সাত নম্বর স্কোয়াড্রনের প্রত্যেককে এমন ভাল শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে উপস্থিত না থাকিলেও স্কোয়াড্রনের কাজে কোন শৈথিল্য উপস্থিত হইল না।

এইবার রাঁচীতে বিশ্রাম করিতে যাওয়ার পালা। প্রথম দিন নূতন স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার আর তিনজন বৈমানিক লইয়া রাঁচী অভিমুখে রওনা হইলেন। তাঁহারা ভল্টি ভেনজিয়ান্স বিমানে উড়িয়া গেলেন না। স্কোয়াড্রনে দুইটি ছোট বিমান ছিল। হার্ভার্ড বিমান। দুইজন বৈমানিকের জন্য সম্মুখে এবং পশ্চাতে একটি করিয়া ছোট ককপিট। এ বিমানগুলি

শুধু শিকা এবং গ্রুপের কেন্দ্রীয় অফিসে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইত। নূতন স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন লীডার আওয়ান এই দুইখানা বিমান লইয়া রাঁচী অভিমুখে উড়িয়া গেলেন। তিনি যে বিমানে উঠিলেন, সেই বিমানের চালকের কাজও তিনি নিজে লইলেন না ; তাঁহার সাথীকে দিলেন। পরদিন প্রথমে 'এ' ফ্লাইটের রওনা হওয়ার কথা। এ ফ্লাইটের একটি বিমানে অগ্রগামী দল হইয়া পরদিন প্রত্যুষে রওনা হওয়া গেল।

দিন কয়েক পূর্বে সার্জেন্ট কিংকে ট্রেনযোগে রাঁচীতে পাঠান হইয়াছিল। তাহার সাথে সাত আটজন গোরা ও দুইজন ভারতীয় বৈমানিককেও পাঠান হইয়াছিল। সার্জেন্ট কিংকে দিন কয়েক পূর্বে পাঠান হইয়াছিল যাহাতে আমাদের বিমানগুলি পৌঁছাইবার পূর্বেই তিনি রাঁচীতে পৌঁছাইয়া বৈমানিকদের থাকিবার ও আহারের ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে বিমানগুলি রাখার জন্য হ্যাঙ্গারের ব্যবস্থাও করিয়া রাখিতে পারেন। পরে স্পেশাল ট্রেনে স্কোয়াড্রনের সমস্ত বৈমানিকরা পৌঁছাইবে, তখন তাহাদের যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তাহার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখার ভারও দেওয়া হইয়াছিল। ব্যবস্থা মত, স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার দুইখানা বিমানে তিনজন বৈমানিক সহ প্রথম দিন পৌঁছাইবার কথা এবং তাহার পরদিন এ ফ্লাইটের তিনখানা ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স বিমানে ছয়জন বৈমানিক পৌঁছাইবার কথা। এদের সকলের অভ্যর্থনা সার্জেন্ট কিংয়ের করার কথা।

এ ফ্লাইটের তিনখানা বিমানে আমরা রওনা হইলাম। এবার এ ফ্লাইটের কমাণ্ডার ফ্লাইট লেফটেনান্ট পিন্টোর বিমানের পশ্চাতের ককপিটে আমার স্থান হইল। দ্বিতীয় বিমানে ফ্লাইং অফিসার রহমান ও তাহার সাথী এবং তৃতীয় বিমানে ফ্লাইং অফিসার এঞ্জেকিয়েল ও তাঁহার সাথী। পথে দমদম বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করিয়া সময় নষ্ট না করার জন্য আমরা বিমান লইয়া কুন্তিগ্রাম হইতে সরাসরি রাঁচী অভিমুখে উড়িয়া চলিলাম। দুপ্রহরের পূর্বেই আমরা রাঁচী বিমানবন্দরে পৌঁছাইলাম। পৌঁছাইবার পর সংবাদ পাওয়া গেল যে স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের বা তাঁহার সাথী অন্য বিমানের একটিও রাঁচী বিমান বন্দরে তখনও পৌঁছায় নাই। একদিন পূর্বে রওনা হইয়া দুইটি হার্ভার্ড বিমান কোথায় গেল, দমদম বিমানঘাটিও কোন সংবাদ দিতে পারিল না। এরিয়া কন্ট্রোলকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহারাও কিছু বলিতে পারিল না। স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার সহ দুইটি বিমান একেবারে নিখোঁজ। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, দুইটি বিমানের কোনটিই বিপদের চিহ্নস্বরূপ কোন বেতার বার্তাও পাঠায় নাই। কোন বেতার কেন্দ্র বা বিমান বন্দর হইতেও তাহাদের কোনরূপ সংবাদ পাওয়া গেল না।

দিব্য আরামে ছিলাম কুন্তিগ্রাম উদরবন্ধে। এ আবার কি দুশ্চিন্তায় পড়া গেল। সাত নম্বর ভারতীয় স্কোয়াড্রনের স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিবার পথে নিখোঁজ, আবার দুইখানা বিমান সহ। স্কোয়াড্রনের এত সুনাম। তবে ভারতীয়রা কি এমনই হইয়া থাকে ; আজ কাজে বেশ দড় কিন্তু কাল ছত্রভঙ্গ। আশ্চর্য্য হওয়ার কথা।

সেইদিন রাত্রে পুলিশের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে রাঁচী বিমান-বন্দর

হইতে মাইল ত্রিশেক দূরে এক নদীর শুষ্ক চড়ায় অবতরণ করিতে গিয়া একটি বিমান ভূপতিত হইয়াছে এবং সেখান হইতে আরও কয়েক মাইল দূরে সেই নদীর অন্য শাখার শুষ্ক বালুর চড়ায় অন্য আর একটি বিমান পতিত হইয়াছে। দুইখানা বিমান। বৈমানিকরা চারজনই অক্ষতদেহ কিন্তু বিশেষ ক্ষুধার্ত। পতিত বিমান হইতে উদ্ধার পাওয়ার পর ঐ এলাকার আদিম অধিবাসীরা তাঁহাদের রাত্রিবাসের জন্য আদিম অধিবাসীদের গ্রামে লইয়া যায় এবং ক্ষুধা নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত তিন্তিড়ী পত্রের ব্যঞ্জন সহ পান্তাভাত খাইতে দেয়, কিন্তু সেই দুর্মূল্য দ্রব্য স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার বা তাঁহার সাথীরা কেহই গলধঃকরণ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য কি ক্ষুধায় এত পীড়িত?

আমাদের স্কোয়াড্রনের ব্যবহারের জন্য নিজস্ব যান-বাহনের ব্যবস্থা সার্জেন্ট কিং তখনও করিয়া উঠিতে সক্ষম হন নাই। রাঁচী বিমান-বন্দরের কর্তাদের নিকট একটি ডজ ওয়েপন ক্যারীয়ার গাড়ী চাওয়াও পাওয়া গেল। পরদিন প্রত্যুষে সূর্যদেব উদয় হওয়ার পূর্বেই আমরা অর্থাৎ ফ্লাইট লেফ্‌টেনান্ট পিন্টো, ফ্লাইং অফিসার রহমন সহ আমি, এই তিনজন ডজ ওয়েপন ক্যারীয়ারে রওনা হইলাম। পুলিশের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের ম্যাপে স্কোয়াড্রন লীডার আওয়ানের বিমান পতিত হওয়ার স্থান আমরা চিহ্নিত করিয়া লইয়াছিলাম। এইবার রাঁচীর পাহাড়ী এলাকা এবং বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া সেই নির্দেশ অনুযায়ী দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। বেলা প্রায় নয়টার সময় আমাদের ম্যাপে চিহ্নিত এলাকায় পৌঁছান গেল। কিন্তু নিকটস্থ গ্রামবাসীদের নিকট খোঁজ লইতে জানা গেল যে ঐ এলাকায় কোন নদী নাই। তবে গ্রামবাসীদের কেহ কেহ বলিল যে কয়েকদিন পূর্বে দুই "পিলা" রংএর বিমান তাহাদের গ্রামের উপর দিয়া উড়িয়া গিয়াছে। উড়িয়া যাওয়ার সময় তাহারা খুব নীচুতে ছিল, প্রায় জঙ্গলের গাছের "শির বরাবর" উঁচু দিয়া বিমানগুলি উড়িয়া গেছে। পিলা রংয়ের বিমান। আমাদের হার্ভার্ড দুইটি ট্রেইনার বিমান ছিল। সেইজন্য সেই দুইটির বর্ণ ছিল হলুদ। কোন দিকে গিয়াছে জিজ্ঞাসা করিতে যে দিক তাহারা দেখাইল সে দিকে কোন প্রকার যান যাওয়ার উপায় নাই। উঁচু-নীচু, অসমতল দেশ। বড় বড় পাথরের চাঙড় কাঁকড় মাটির উপর দাঁড়াইয়া আছে, আর কেঁদ, কুদি জাম, আর নানা প্রকার জঙ্গলা গাছের বন।

এইবার আমরা দুই ভাগ হইলাম। এক ভাগে ফ্লাইং অফিসার রহমান আর আমি আর অন্য ভাগে ফ্লাইট লেফ্‌টেনান্ট পিন্টো। ফ্লাইট লেফ্‌টেনান্ট পিন্টো ডজ ওয়েপন ক্যারীয়ার গাড়ী লইয়া আরও অগ্রসর হইয়া গেলেন আর আমরা দুইজন অজানা অচেনা দেশে প্রবেশ করিলাম। এতক্ষণ গাড়ীতে বসিয়া আসিতেছিলাম। পথ খুব ভাল না হইলেও গাড়ী চলার মত। এখন পথ আর নাই, আর সেই অচেনা দেশে কোথায় খোঁজ করিব, তাহারও কোন ঠিক ঠিকানা নাই। যেন চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া অনির্দেশ যাত্রা। গ্রাম পার হওয়া গেল। গোটা দুই ছোট ছোট টিলার মত উঁচু যায়গাও পার হওয়া গেল। লোকজন বিরল। কতটা পথ হাঁটিয়া আসা গিয়াছে শুধু অনুমানই করা যাইতে পারে।

মনে হইতেছে যেন ইতিমধ্যেই দশ পনর মাইল দূর পর্যন্ত হাঁটাপথে আসা গিয়াছে। তৃষ্ণা পাইয়াছে। জঙ্গলে এখন চারিদিকেই তিন্তিড়ী বৃক্ষ। কেহ যেন জঙ্গলে শুধু তিন্তিড়ী বৃক্ষেরই বাগান করিয়াছে। ফ্লাইং অফিসার রহমানই প্রথমে তিন্তিড়ী বৃক্ষের কচিপত্র তৃষ্ণার জ্বালায় মুখে পুরিলেন। তাহাতে তাঁহার তৃষ্ণার কিছুটা উপশম হইল। এইবার কিছু কচিপত্র আমিও আস্বাদন করিলাম। তিন্তিড়ী বৃক্ষের কচিপত্র সত্যই তৃষ্ণার উপশম করে। এইভাবে আরও কিছুদূর অর্থাৎ আমাদের অনুমানে আরও তিন চার মাইল যাওয়ার পর নীচু পাহাড়ের মত স্থানের মধ্য দিয়া নালার মত কিছু পাওয়া গেল। বর্ষার সময় ঐ পথে বৃষ্টির জল বাহির হইয়া যায়। গৌরবেও তাহাকে নদী বলা চলে না। জল নাই। মধ্যখানে বালু রহিয়াছে। এবার কোনদিকে অন্বেষণ করিতে যাওয়া হইবে? দক্ষিণে না বামে? ফ্লাইং অফিসার রহমানের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করার সময় মীমাংসা আপনা হইতেই আসিয়া গেল। একজন আদিম অধিবাসী হঠাৎ কোথা হইতে উদয় হইয়া বিমান নদীর যেখানে পড়িয়াছে সেখানে লইয়া যাওয়ার জন্য আহ্বান করিল। নদীর উপর দিয়া আরও মাইলখানেক যাওয়ার পর আমরা প্রথম বিমানের সাক্ষাৎ পাইলাম। বিমান চালক নদীর বালুর চরের উপরেই বিমান অবতরণ করাইয়াছেন। নিশ্চয়ই পথ হারাইয়া এই দিকে আসিয়াছিলেন, এবং পেট্রল সবটুকু ফুরাইয়া গেলে, আর কোন উপায় না পাইয়া নদীর বালুচরের উপর বিমান অবতরণ করাইয়াছেন। এই নদীর মধ্যে বালুচরের উপর বিমান অবতরণ করা ছাড়া আর কোন সমতল ক্ষেত্র দুই দশ মাইলের মধ্যে ছিল না।

বিমানটিকে আরও কয়েক জন আদিম অধিবাসী তখন পাহারা দিতেছিল। বৈমানিকদের কথা জিজ্ঞাসা করিতে জানা গেল, যে তাঁহারা অক্ষত দেহে, আমরা ডক ওয়েপন ক্যারীয়ারে যে পথ দিয়া আসিয়াছি সেই পথের উপর আরও তাঁচিতে অন্য গ্রামে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

অন্য বিমানের কথাও জানা গেল। অন্ততঃ আরও মাইল দশেক দূরে, আর একটি অনুরূপ নদীর শুষ্ক বালু চরে সেই বিমান পতিত হইয়াছে। সেই বিমানের বৈমানিকরাও অক্ষত দেহ, কিন্তু বিমান দুই তিন খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

এদিকে বেলা অনেক গড়াইয়া গিয়াছে। সূর্য্যদেব ঢলিয়া পড়িয়াছেন। তৃষ্ণায় ক্ষুধায় এবং পথশ্রমে দেহে অবসন্নতা আসিয়াছে। আদিম অধিবাসীদের নিকট পানীয় জলের কথা বলিতে খুব মিষ্টস্বাদের জল পাওয়া গেল। তারপর বিমান হইতে তেরী পিস্তল বাহির করিয়া লইয়া আমরা রাজপথের উপর যে গ্রাম হইতে আসিয়াছিলাম, সেই দিকে চলিলাম, এবার সাথে একজন পথ-প্রদর্শক রহিল। প্রায় বেলা শেষে পথের উপর গ্রামে আসিয়া পৌঁছান গেল। তখন জানা গেল ফ্লাইং অফিসার পিন্টোর সাথে চারজন বৈমানিকের সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং তাঁহাদেকে লইয়া তিনি বিমান বন্দরে ফিরিয়া গেছেন।

Despite the fact that we're an efficient, progressive pharmaceutical manufacturing and marketing complex, we're human enough to believe, implicitly, in that old saying "A Healthy Home Is A Happy Home". And we like to think that we've been contributing in our own small way – to health and happiness for the last 34 years. For example, we manufacture 125 items such as pharmaceutical drugs and injections, specialities and chemicals each one of which helps to keep people healthy. Many drugs, essential for the treatment of common diseases in the tropics are manufactured by us from basic-chemicals. And, in addition, we have an effective Research Division that is constantly developing new ways to fight old problems.

Happiness

We've been marketing it for 34 years

East India Pharmaceutical Works Limited

6, Little Russell Street, Calcutta-16

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্তিকা

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭০

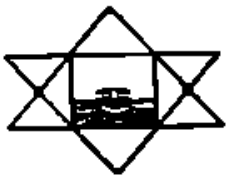

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭০

সত্যকার সত্তার জন্য প্রয়োজন পরমসত্যের জ্ঞান এবং তার সঙ্গে সুসঙ্গতি, আর সত্যকার জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজন আমরা যা কিছু হয়েছি, যা কিছু অনুভব করি, যা কিছু কর্ম্ম করি, তার মধ্যে সেই সত্যকে প্রকাশ করা।

—শ্রীঅরবিন্দ

মাতৃবাণী

প্রশ্ন : জীবনের লক্ষ্য কি সুখলাভ ?

উত্তর : কথাটা উল্টো করে ধরা হ'ল।

মানব জীবনের লক্ষ্য হ'ল ভগবানকে আবিষ্কার করা আর তাঁকে প্রকাশ করা ; অবশ্যই এই আবিষ্কার নিয়ে চলে সুখের দিকে, তবে সুখ হ'ল পরিণাম, নিজেই কিছু লক্ষ্য নয়। এই যে ভুল কেবল একটা পরিণামকে জীবনের লক্ষ্য করে ধরা, এই হ'ল মানবজীবনকে যত দুঃখ জর্জরিত করেছে তার বেশির ভাগেরই হেতু। ২৮-৩-৭০

*

জীবনের সত্যকার লক্ষ্য হ'ল ভগবানকে দেখা, তিনি রয়েছেন গভীরে অন্তরে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা, তিনি যেন জীবনকে, সকল অনুভবকে, সকল শারীর কর্মকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন, এই ভাবেই জীবন পায় একটা সত্যকার জ্যোতির্ময় লক্ষ্য।

*

আমাদের বর্ধিষ্ণু শরীরের নৈপুণ্য ভগবানকে সমর্পণ করার চেয়ে মহত্তর সমর্পণ আর কি আমরা করতে পারি ?

সর্বাঙ্গসিদ্ধি লক্ষ্য করে আমাদের সকল প্রয়াস আমরা সমর্পণ করব শারীর শিক্ষা আমাদের কাছে একটা নূতন অর্থ বৃহত্তর মূল্য নিয়ে দেখা দেবে।

জগৎ তৈরী হয়ে চলেছে একটা নবসৃষ্টির জন্য : এস আমরা সহায় হই শারীর শিক্ষার ভিতর দিয়ে, আমাদের শরীরকে আরও শক্তিমান করে আরও গ্রহণসমর্থ আরও সুন্দর করে, শারীর রূপান্তরের পথে চলে।

(শারীর শিক্ষা বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে) ১-৪-৭০

*

শিক্ষকের শিক্ষা

শিক্ষকের প্রশ্ন—মায়ের উত্তর

প্রশ্ন ছোটরা অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে ছুটি কাটাবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি?

উত্তর: এই ত' চমৎকার সুযোগ যখন মনোমত কোন কাজ করা যায়, নূতন কিছু শিক্ষা করা যায় কিংবা তাদের স্বভাবে বা পড়াশুনায় যদি কিছু অসম্পূর্ণ থাকে অথবা অনুশীলিত না হয়ে থাকে তা শুধরে নেওয়া যায়।

আর এই ত' চমৎকার সুযোগ যখন স্বাধীনভাবে কোন কাজ বেছে নেওয়া যায়, আবিষ্কার করা যায় তাদের অন্তরের সত্যকার সামর্থ্য কি!

প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীরা তাদের ছুটির মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের কাছে যায় বা বাইরে বেড়াতে বের হয়, তা কি তুমি অনুমোদন কর?

উত্তর ঘুরিয়ে বরং বলা যেতে পারে ছুটিতে ছোটরা যা করে তাতে প্রমাণ হয় তারা কি ধরণের এবং কতখানি তারা তৈরী হয়েছে এখানকার জীবনে লাভবান হয়ে উঠতে। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন রকমের এবং প্রত্যেকের প্রেরণার ধারা নির্দেশ করে তার স্বভাবের ধারা।

সত্যকথা বলতে, যারা এখানে থেকে যেতে চায়, যা হোক না, অন্যরকমের কিছু না করে, তারাই শুধু এখানকার শিক্ষায় লাভবান হতে পারে, তারাই পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে যে আদর্শ এখানে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রশ্ন: এর অর্থ কি, যারা বাইরে চলে যায়, তারা যে আদর্শ তাদের এখানে ধরে দেওয়া হয় তা পুরোপুরি বুঝতে অক্ষম, না আমাদেরই অক্ষমতা এ আদর্শ তাদের বোঝাতে গিয়ে?

উত্তর: আমি বলি না আমাদের এখানকার শিক্ষা একেবারে নির্দোষ আর যে রকমটি হওয়া উচিত তাই হয়। তা হ'লেও অনেক ছাত্রছাত্রীই আছে যারা এতে আকৃষ্ট আর ভাল করেই বোঝে যে এখানে এমন কিছু আছে অন্যত্র যা পাওয়া যায় না।

সুতরাং এদেরই এখানে থাকা উচিত। আর যখন সকল প্রার্থীদের জন্য স্থান করে দেওয়া আমাদের সম্ভব নয়, তাই এখানকার পক্ষে বাছাই করে নেওয়া সহজ হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন যারা বুঝতে পারে না, আদর্শ শিক্ষা তাদের দেওয়া কি সম্ভব? কি উপায়ে সম্ভব? আমরা যারা শিক্ষক ও গুরুমশাই আমরা কি এই বিপুল কর্মের উপযুক্ত?

উত্তর আমরা যে শিক্ষা দিতে চাই তা শুধু মনের একটা আদর্শ নয়, তা হ'ল জীবনের এক নূতন পরিকল্পনা, চেতনার একটা সিদ্ধি। সকলের পক্ষেই এই সিদ্ধি অভিনব এবং অপরকে শিক্ষা দিতে হ'লে একমাত্র সত্যকার পথ হ'ল নিজে সে জীবন যাপন করা এই অভিনব চেতনার অনুসারে, রূপান্তরের জন্য নিজেকে তার হাতে ছেড়ে দেওয়া। নিজের উদাহরণ ছাড়া শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠ আর উপায় নেই। "অহংকারী হবে না", অপরকে এ কথা

বলে কোন ফল হয় না। কিন্তু নিজে যদি অহংমুক্ত হওয়া যায়, তবেই অপরের জন্য শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হওয়া যায়। যার ঐকান্তিক আস্পৃহা হ'ল পরম সত্যকে অনুসরণ করে চলা সে একটা প্রভাব ছড়িয়ে দেয় যারা তার চারদিকে তাদের উপরে। সুতরাং যারা শিক্ষক তাদের প্রথম কর্ত্তব্য হ'ল যে সব গুণ তারা শিখা দেয় অপরকে, নিজের আচরণে তা দেখান এবং এইসব শিক্ষকদের মধ্যে এমন কেউ যদি থাকে যারা তাদের পদের উপযুক্ত নয়, কারণ তারা তাদের স্বভাব দিয়ে দেখায় অসৎ উদাহরণ, তাদের প্রথম কর্ত্তব্যই হবে নিজেদের স্বভাব পরিবর্ত্তন করে কর্ম্মের ধারা পরিবর্ত্তন করে উপযুক্ত হওয়া, অন্য উপায় নেই।

প্রশ্ন আশ্রমের একজন শিক্ষকের কি কি গুণ একান্ত প্রয়োজন তুমি বলতে চাও? কেউ যদি মনে করে সে উপযুক্ত নয়, একাজ ভাল করতে পারবে না, তবে কি তার পক্ষে সরে দাঁড়ানই উচিত নয়? কারণ অন্যথা আমাদের দোষে ছোটরাই ভুক্তভোগী হয়, তাই নয়?

উত্তর এখানকার শিক্ষকদের মাষ্টারদের যত ত্রুটিই থাক না তারা অনেক ভাল বাইরেদের চেয়ে। কারণ এখানে যারা কাজ করে তা করে বিনা পারিশ্রমিকে, একটা উচ্চতর আদর্শের সেবাকল্পে। তবে বলা বাহুল্য যারই যে গুণ বা ত্রুটি থাকুক না প্রত্যেকেরই একটা আদর্শের দিকে এগিয়ে চলা উচিত সদাসর্ব্বদা আর তা পারা যায়—সে আদর্শ এখনও বর্ত্তমান মানবীয় সিদ্ধির অনেক উর্দ্ধে।

যতখানি ভাল সম্ভব তা করবার জন্য যদি সত্যকার আগ্রহ থাকে তবে কাজটি করতে করতেই এগিয়ে চলা যায় এবং ক্রমে আরও ভাল করে করবার শিক্ষা লাভ হয়।

সমালোচনা প্রায়ই সহায় হয় না। সাহায্য করার চেয়ে তা বেশি নিরাশ করে দেয়, উচিত বরং সদিচ্ছা যার রয়েছে তাকে ভরসা দেওয়া। কারণ সদ্ভাগুণ থাকলে, ধৈর্য্য থাকলে এমন কোন সাধ্যবস্তু নাই যা লাভ হয় না।

প্রয়োজন হ'ল নিশ্চিত থাকা যে কোন সিদ্ধিই লাভ হোক না আরও সুদুর্লভ লাভ সর্ব্বদাই সম্ভব যদি সংকল্প রাখা যায়।

যে আদর্শ লাভ করতে হবে তা হ'ল অন্তরাত্মায় ও বাহ্যকর্ম্মে একটা অটুট সমত্ব, অটল ধৈর্য্য এবং বলা বাহুল্য বাসনার ও প্রেয়ের অবসান। শিক্ষাদান করে যে তার পক্ষে তার কর্ত্তব্য উদ্‌যাপনের জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন হ'ল অহংকার মাত্রেরই বিসর্জ্জন আর এমন কোন মানুষ নেই যে এই প্রয়াসের প্রয়োজন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে।

তবে আমি আবার বলি এ প্রয়াস এখানে যত সহজ বাইরে অন্য কোথাও তা নয়।

প্রশ্ন সাধারণ জীবনের আমোদে যারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট—যেমন সিনেমা, হোটেল, সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি—তাদের কি এখানে আমাদের বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষা করা উচিত? কারণ সাধারণতঃ মনে হয় যেন এইসবের জন্যেই বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীরা বাইরে যায় তাদের ছুটি কাটানর জন্যে আর প্রত্যেকবারই যখন তারা ফিরে আসে তাদের বেশ কিছু সময় দরকার হয় এখানকার সঙ্গে আবার নিজেকে মিলিয়ে ধরবার জন্যে।

উত্তর : যারা সাধারণ জীবনে এবং তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অতিরিক্ত আসক্ত তাদের এখানে আসা উচিত নয় ; কারণ তারা এখানে প্রবাসী হয়ে পড়ে আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

তবে এখানে আসবার আগে তাদের সম্বন্ধে একথা জানা কঠিন ; কারণ তারা অধিকাংশই একান্ত তরুণ এবং তাদের স্বভাব তখনও তৈরী হয়ে ওঠেনি।

তবে যে মুহূর্তে বাইরের জগতের উন্মত্ততা তাদের পেয়ে বসে তখনই তাদের ফিরে যাওয়া উচিত তাদের পিতামাতাদের কাছে এবং তাদের অভ্যস্ত আচরণের মধ্যে—এতে তাদের নিজেদেরও মঙ্গল, অপরেরও মঙ্গল।

প্রশ্ন : এখানে অনেক ছেলেমেয়েদেরই তাদের পিতামাতা পাঠিয়েছে কেবলমাত্র শিক্ষার জন্য ; এই ধারণা যে তারা হ'ল কেবল ছাত্র আর শিক্ষা শেষ হ'লে এখান থেকে চলে যাবে, এটি তাদের চেতনায় দৃঢ়মূল।

এইসব ছেলেমেয়েরা একবার যখন স্পষ্ট ধারণা ঠিক করে নিয়েছে কি তারা করতে চায়, তখন কি তাদের যথানিয়মে নির্দেশ দেওয়া উচিত নয় যে তাদের পক্ষে বাইরে গিয়ে শিক্ষালাভই ভাল হবে। অথবা একবার যখন তাদের গ্রহণ করা হয়েছে তখন উচিত হবে এখানকার শিক্ষাই তাদের শেষ পর্য্যন্ত করতে দেওয়া।

উত্তর দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক পিতামাতাই তাঁদের সন্তানদের এখানে পাঠিয়ে থাকেন, তারা এখানে একটা বিশেষ রকমের শিক্ষালাভ করবে এ জন্য নয়, কিন্তু শুধু এইজন্যে যে শিক্ষার জন্য আশ্রম থেকে কোন অর্থ দাবী করা হয় না। পিতামাতাদের এখানে তাই বাইরের চেয়ে অনেক কম ব্যয় করতে হয়।

কিন্তু বেচারা ছোটরা তা এই দোকানদারীর জন্য দায়ী নয় ; আমাদের উচিত তাদের একটা সুযোগ দেওয়া যাতে তারা পূর্ণভাবে গড়ে উঠতে পারে, যতটা তাদের পক্ষে সম্ভব। সুতরাং তাদের আমরা গ্রহণ করি যদি দেখি তাদের মধ্যে ভবিষ্য সম্ভাবনা একটা রয়েছে। শুধু যখন তারা কিছু সাক্ষাৎ প্রমাণ দেয় যে এখানকার শিক্ষায় কোন লাভই গ্রহণ করতে অক্ষম তখনই তারা যদি ফিরে যেতে চায় তবে তাতে আমরা রাজী হই।

প্রশ্ন : যে সব ছাত্রছাত্রীরা জানে যে শিক্ষার শেষে তারা এখান থেকে চলে যাবে তাদের পক্ষে মাঝে মাঝে বাইরে যাওয়া কি প্রয়োজন নয় যাতে পরে বাইরের জীবনের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে চলতে পারে ?

উত্তর বাইরের জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে ধরা কিছু কঠিন নয়, এ হ'ল সেই দাসত্ব জন্ম থেকেই মানুষ যার অধীন। কারণ সকলেই নিজের নিজের মধ্যে সে জিনিষটি বহন করে বংশানুক্রমে, এমন কি যারা জন্মগ্রহণ করেছে স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে বলে তাদেরও প্রয়োজন হয় ঐকান্তিকভাবে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলতে, এই বংশানুক্রমিক ধারা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে, পরিশেষে সত্যিকার মুক্তি যাতে লাভ হয়।

প্রশ্ন : এখানকার শিক্ষার পরে এখান থেকে যারা চলে যায় সে সব শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তুমি কি আশা কর? তাদের এবং সাধারণ লোকদের মধ্যে নিশ্চয়ই খুব একটা বড় রকমের পার্থক্য থাকবে। পার্থক্যটা কি হবে?

উত্তর প্রায়ই তাদের অনেকে যখনই সাধারণ জীবনের মধ্যে পড়ে যায় বোধ করে পার্থক্যটি, আর যে জিনিষ হারিয়েছে তার জন্য দুঃখ করে; তবে খুব অল্প সংখ্যকেরই সাহস আছে, সাধারণ পারিপার্শ্বিকে যে সব সুযোগ সুবিধা নিলে যায় তা বর্জন করতে। কিন্তু যারা কখনও আশ্রমের সংস্পর্শে আসেনি তাদের মতন অজ্ঞান অচেতনা নিয়ে ওরা জীবনের সম্মুখীন হয় না।

যে কাজ এখানে আমরা করি, তা আমরা করি না, ফিরে কিছু পাব এই আশায়, আমরা করি কেবল মানুষের ক্রমোন্নতির সাহায্য করবার জন্যে।

প্রশ্ন : শিক্ষার্থীদের উপর শিক্ষকের শাসন কতখানি মাত্রায় অনুমোদন করা যায় তোমার মতে?

উত্তর শিক্ষার্থীরা নিয়মিত উপস্থিত থাকবে, ব্যবহারে অসভ্য হবে না, পাঠে অমনোযোগী হবে না—এ ত' অপরিহার্য্য। কোন রকম কু-মতলবী হানিকর দুষ্কর্ম প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না।

তবে সাধারণ এবং অকাট্য নিয়ম হিসাবে, শিক্ষকদের বিশেষতঃ শারীর শিক্ষার পরিচালকদের জীবন্ত এবং নিরন্তর উদাহরণ হতে হবে সেই সব গুণের যা শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে দাবী করা হয়—নিয়মানুগতা, সময়জ্ঞান, শালীনতা, সাহস, সহ্যগুণ, চেষ্টায় ধৈর্য্য। উদাহরণে যেমন শিক্ষা করা যায় শুধু কথায় তেমন নয়, তাই সর্ব্বদার জন্য নিয়ম হ'ল—ছোটদের সম্মুখে এমন কিছু করবে না যা করতে তাদের বারণ করা হয়।

অন্যসব বিষয়ে প্রত্যেকের জন্য তার নিজস্ব সমস্যা ও নিজস্ব মীমাংসা। অনেকখানি নৈপুণ্য নিয়ে ও স্থিরবুদ্ধি নিয়ে শিক্ষকদের কাজ করতে হবে।

সুতরাং শিক্ষক হওয়া, পরিচালক হওয়া হ'ল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মসংযমের সাধনা যদি তা করতে পারা যায়।

ছোটদের খারাপ কাজ করা বন্ধ করা উচিত হবে যখন তা করতে সে লজ্জা পায়, তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে এই ভয়ে নয়।*

প্রথম ক্ষেত্রে তার সত্যকার উন্নতি হয়েছে, দ্বিতীয়ক্ষেত্রে সে মানুষী চেতনার এক ধাপ নিচে নেমে যায় কারণ ভয় হল চেতনার অধোগতি।

---

* মা পরে বলেছেন, এ হ'ল প্রথম পা। এখানে উঠে এসে পরে আর এক পা এগিয়ে যাওয়া যায়—ভাল হবার আনন্দ লাভ করা।

প্রশ্ন শিক্ষকের দায়িত্ব স্কুলে পড়াশুনার ঘণ্টার মধ্যেই আবদ্ধ না খেলার মাঠ পর্যন্ত যায়?

একথা আমি জিজ্ঞাসা করছি এইজন্যে যে আমাদের ছেলেরা রাস্তাঘাটে অসভ্যের মত ব্যবহার করে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যায়, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গল্প করে আর সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল সাইকেল—যখন তারা চলে বিনা আলোকে, বিনা ব্রেকে অথবা একই সাইকেলে দুজনে চড়ে বসে। কেউ এসব গায়ে নেয় না কারণ সকলেই মনে করে এ সব হল ইস্কুলের কাজকর্মের বাইরে।

এ সব বন্ধ করবার জন্যে যখন কেউ কিছু করে না, নিয়মকানুনকে উপেক্ষা করা এমন চলিত হয়ে গিয়েছে যে দায়িত্বপূর্ণ লোকেরাও এসব নিয়মকানুন সম্বন্ধে সজাগ নয়।

উত্তর এই দুরবস্থার একমাত্র প্রতিকার হ'ল ছোটরা যখন একসঙ্গে মিলিত হয় (সম্ভবতঃ খেলার মাঠে) তখন তাদের কাছে একটা ছোট্ট শিক্ষার পাঠ দেওয়া—রাস্তাঘাটে ভদ্রভাবে কি রকমে চলতে হয়, কি করা উচিত, কি করা উচিত নয় এই সম্বন্ধে। কেউ যদি এসব কথা ছোটদের বলতে পারে চিত্তাকর্ষক করে, এমন কি যদি সম্ভব হয় একটু হাস্যরস মিশিয়ে নিশ্চয় সুফল কিছু মিলবে।

প্রশ্ন এ কথার অর্থ কি, ছাত্রদের যখন একবার বুঝিয়ে দিয়েছি রাস্তাঘাটে তাদের কি রকম আচার-ব্যবহার উচিত, তারপরে আমাদের আর দায়িত্ব নেই স্কুলের ঘটনার বাইরে তারা যা করে সে সম্বন্ধে?

উত্তর চাক্ষুষ যে ঘটনা দেখা হয়নি তাতে হস্তক্ষেপ করা কঠিন। গুজব-গল্প সর্ব্বদাই সন্দেহজনক। কিন্তু শিক্ষক কেউ যদি স্বচক্ষে দেখে তার ছাত্র একজনের অশালীন ব্যবহার তবে তার হস্তক্ষেপ যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু যদি শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সদ্‌ভাব ও ভালবাসা থাকে তবেই।

প্রশ্ন তুমি মনে কর না কি আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছোটদের পক্ষে আশ্রমের জন্য কিছু নিঃস্বার্থ কর্ম্ম করা শিক্ষা দেওয়া উচিত—অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন করে?

উত্তর: নিঃস্বার্থ কর্ম্ম করা সবসময়েই ভাল তবে আরও অনেক ভাল হতে পারে যদি কর্ম্মটি হয় আনন্দের জিনিষ, দায়ে পড়া কর্ত্তব্য নয়।

প্রশ্ন: প্রতিবৎসর আমরা একটা বিশেষ পুরস্কার দিয়ে থাকি ছোটদের দুটি দলে (A_1 A_2) যারা শ্রেষ্ঠ তাদের মনো। এ বৎসরে একটি ছেলে সারা বৎসর খুব ভালভাবে খেটেছে কিন্তু এখন সে ছুটিতে তার বাড়িতে চলে গিয়েছে, ২রা ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানেও যোগ দেয় নি। তুমি কি বল এ বৎসরের পুরস্কার তাকেই দেওয়া উচিত?

উত্তর সব নির্ভর করে সে চলে গিয়েছে কি ভাবে তার উপর। পিতামাতার কথা মেনে নেবার জন্যে না নিজের ইচ্ছায়? নিজের ইচ্ছায় যদি হয় তবে যাহাতঃ যে গুণই তার থাকুক না তাকে পুরস্কার দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না কারণ তার অর্থ হবে শিক্ষার্থীর অন্তরের ভাবটি কি, যে আদর্শ আমরা অনুসরণ করি তার বোধ কতখানি অর্থাৎ নূতন সৃষ্টির জন্য আগামীকালের মানুষকে তৈরী করা, এ সবের উপর কোন প্রাধান্যই আমরা দেই না।

প্রশ্ন ছোটরা যাতে কাজ করে, যাতে তারা কোন বিষয় বিশেষে আকৃষ্ট হয় সেজন্যে কি পুরস্কার ও প্রশংসা যুক্তিযুক্ত হবে?

উত্তর বলাবাহুল্য ছোটরা যাতে পড়াশুনা করে, তাদের চেতনার পুষ্টির জন্যে, যে সব জিনিষ তারা জানে না, তার কিছু একটু শিক্ষা করবার জন্যে—এ নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু যারা পরিশ্রমী, যারা সুনিয়মিত, সুমনোযোগী হয়েছে তাদের পুরস্কৃত করাও মন্দ নয়।

প্রশ্ন তুমি মনে কর না কি এখানে যারা শিক্ষক বা পরিচালক হয়ে আসে বিশেষতঃ ছোটদের জন্যে তাদের পক্ষে উচিত নয় কি কিছুকাল আশ্রমবাসী হয়ে থাকা?

উত্তর প্রয়োজন হ'ল বিশেষ মনোভাবটি, কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু বৎসর আশ্রমবাসী হ'লেও সর্বদা নির্দোষ কর্মধারা এসে যায় না।

আসল কথা, শিক্ষকদের গ্রহণ করা উচিত সাময়িকভাবে, দেখবার জন্যে যে তারা সত্যকার মনোভাবটি অর্জন করতে পারে কি না, তাদের কর্তব্যের প্রয়োজন অনুসারে নিজেদের ঢেলে গড়তে পারে কিনা।

প্রশ্ন না একটা বিশেষ মনোভাব এ কথায় তুমি কি বোঝাতে চাও?

উত্তর যে মনোভাবটি প্রয়োজন তা হ'ল অন্তরের এক নিশ্চয়বোধ যে, যা কিছু জ্ঞান প্রয়োজন তার তুলনায় কিছুই জানা হয়নি, আর প্রতি মুহূর্তে অপরকে যাতে শেখাতে পার সেজন্যে নিজেকে প্রস্তুত থাকতে হবে শিখবার জন্যে। এই হ'ল সর্বপ্রথম প্রয়োজন।

দ্বিতীয়টি হ'ল এই, বাহ্যজীবন, যেমনটির সঙ্গে আমার পরিচয়, তা হ'ল ন্যূনাধিক মিথ্যা, স্থূলরূপে মাত্র। আর আমাদের সদাসর্বদা অন্তরে জীবন্ত রাখতে হবে সত্যের জন্য আস্পৃহা!

*

শরীরের অন্তর্গত কোষের মধ্যে যে চেতনা তা যখন কেন্দ্রবিমুখী হয় তারই নাম মৃত্যু।

অমৃতত্বের অভিমুখে প্রথম পা হ'ল, যখন আমরা প্রকৃতির বশে যন্ত্রের মত কেন্দ্রমুখী না হয়ে হই স্বেচ্ছায় কেন্দ্রমুখী।

সাবিত্রী

দ্বিতীয় পর্ব—সপ্তম সর্গ

রাত্রিগর্ভে অবতরণ

আঁধার এক জঠর হতে যেন দেখল সে নির্গত হ'ল
ঘন কৃষ্ণ অলক্ষিতের কলেবর আর যে মুখমণ্ডল
লুকিয়ে রয় জীবনের সোনা বাহ্যরূপের অন্তরালে ;
তার সংস্পর্শ আনাদের বিপদ, আনাদের দুঃখ-বেদনার হেতু,
তার নিঃশ্বাস মানুষের হৃদয়ে ঢালে সূক্ষ্ম হলাহল :
সকল পাপ নিঃসৃত সেই বিধা মুখ হতে।
এক সংকট এখন নিত্যকার আকাশে বাতাসে ভর করেছে ;
জগৎ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে ভীতিকর শক্তিসমূহে।
আর যেদিকেই সে দৃষ্টি দিল সাহায্যের জন্যে তরসার জন্যে
গৃহে হোক, গোষ্ঠে হোক, হাটে বাটে মাঠে হোক
সাক্ষাৎ দেখল সে, লুকিয়ে সদা-উদ্যত চলছে ফিরছে
সশস্ত্র কুক্কর প্রবৃত্ত প্রভাব সব।
কৃষ্ণকায় দেবীমূর্তি চলেছে সান্নি বেঁধে,
বাতাসকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে বিরাট এক অস্বস্তি দিয়ে।
ভয়াবহ পদক্ষেপ আসে অগোচরে নিকটতর হয়ে,
মূর্তি যত ত্রাসকর করে অধিকার স্বপ্নময় আলো,
করাল সত্তা যত চলে যায় পাশ দিয়ে তার পথের পরে,
দৃষ্টিমাত্র তাদের ডেকে আনে মহাদুর্যোগ।
অকস্মাৎ নিদারুণ দেখা দেয় মোহ এক, মধুরিমা এক
আননে কত ভেসে ওঠে মুগ্ধকর ওষ্ঠাধর আর নয়নযুগল,
আসে সান্নিধ্যে তার ছড়ায়ে সৌন্দর্য জাল যেন ব্যাধের,
লুকায়ে নিদারুণ মর্ম এক প্রতিটি রেখায়,
মুহূর্তে হতে পারে তার রূপান্তর বিপদ-আকর।
কিন্তু তারই দৃষ্টি শুধু করে আবিষ্কার সেই নেপথ্য আক্রমণ ;
আন্তর দৃষ্টির পরে সেখানে রয় যবনিকা,
শক্তি এক লুকায়ে রেখেছে আপন ভীতিময় পদক্ষেপ,

সবই ভ্রান্ত সেখানে তবু আপনাকে সত্য বলে জানে,
অবরোধ চারিদিকে; কেউ জানে না অবরুদ্ধ সে,
কারও দৃষ্টিতে আসে না পতনের অধিকতা যারা।

সে জানে ছায়াঘোর জ্ঞান এক ধরা দেয়নি এখনও,
তাতেই দিয়েছে এই শক্তিকে তার অধিকার, তার ন্যায্যতা।
সে অনুসরণ করে চলে অস্পষ্ট ভীতিকর পদচিহ্ন সব
যারা ফিরে চলেছে রাত্রিগর্ভে এসেছিল যেখান হ'তে।
পৌঁছিল সে এখন এমন স্থানে যা এখনও হয়নি যথানির্দ্দিষ্ট,
কারও অধিকারে নয় এখনও;
সকলেই সেখানে প্রবেশ করে কিন্তু দীর্ঘকাল রয় না,
মানব-বর্জিত রাজ্য পাপের হাওয়া ঘেরা
চারিদিকে ঘন-বসতি, নীড় নাই কোথাও,
প্রত্যন্তদেশ জগতের আর নরকের মাঝখানে,
নাস্তি অবশ্য হ'ল সেখানে প্রকৃতির প্রভু,
অবকাশ এমন যেখানে সত্তার নেই স্থান,
হতে যা চেয়েছিল হয় নাই তা কোন কিছু,
মহান্ রূপাভাস এক ঢেকে রেখেছে বিশাল রিক্ততাকে।
কিন্তু কোন কিছু স্বীকার করে না তার আপন মিথ্যাচার;
স্বীকার করে না তা নিজেরও কাছে নিজের দ্বিচারী হৃদয়-যন্ত্রে,
বিপুল কপটতা হয়েছে বস্তুর স্বধর্ম্ম,
কপটতা আশ্রয়ে চলে তাদের জীবন।
বস্তুহীন নাস্তি সুনিশ্চিত করে দেখায়
প্রকৃতির যতেক মিথ্যা রূপাবলী,
দেখায় সত্য ক'রে আর জীবন্ত করে তাদের ক্ষণ তরে।
সে-সকলকে আহরণ করেছে পরম জাদু এক মহাশূন্য হতে,
তারা ধারণ করে যে আকার যে বস্তু, নয় সেসব তাদের আপনার,
দেখায় যে বর্ণ তার রয় না তা স্থায়ী হয়ে,
মরীচিকা বাস্তবের প্রতিবিম্ব তারা,
প্রোজ্জ্বল রামধনু প্রোজ্জ্বল মিথ্যা এক,
মুক্তকর মুখে শোভা পায় অবাস্তব সুষমা,
নির্ভরের যোগ্য স্থায়ী নয় কিছু;
হর্ষ পোষণ করে অশ্রুবিন্দু, শ্রেয় দেখা দেয় শ্রেয়রূপে,

কিন্তু হেয় থেকে শ্রেয়কে আহরণ করে না কেউ ;
প্রেমের পরিণাম তখনি ঘণায়, মৃত্যু জীবনের প্রভু ;
শক্তি রয়েছে এক, জগতের দুর্যোগে হাসি ওঠে যার
উপহাস এক বিশ্বের বৈপরীত্যরাশিকে বিলিত করেছে,
পরস্পরের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত করেছে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের জন্যে,
ভগবানের মুখে ফুটিয়ে তুলেছে ব্যঙ্গের ক্রূর রেখা।

দুই সূত্র

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আমাদের সাধারণ জীবন হ'ল অতীতের জের টেনে চলা। যা করে এসেছি, যা ভেবে এসেছি সেই খাতে ও ধারায় করে চলা ও ভেবে চলা। ভবিষ্যতের ভাবনা আমাদের হ'ল অতীতের ছকে কি রকমে আমরা তৈরী হতে পারি।

কিন্তু আসল একটি কথা আমরা ভুলে যাই, একটি নিভৃত অথচ একান্ত সহজ সত্য আমাদের চক্ষে বা ধারণায় ধরা পড়ে না—তা হ'ল নিত্য-পরিবর্তন, জগতের নিরন্তর পরিবর্তন। আমরা ত জানি গচ্ছতি ইতি জগৎ—গমন করে, গতিবান সে তাই জগৎ। কিন্তু স্থূল চক্ষে আমরা চলা হয়ত দেখি কিন্তু পরিবর্তন দেখিনা. সেই সূর্য্য উঠছে, ডুবছে, চাঁদ বাড়ছে, কমছে, নক্ষত্রসব ঘুরে ঘুরে চলেছে মানুষ পশু গাছ-পালা জন্মায় বাড়ে জীর্ণ হয় মৃত্যুকবলিত হয়—প্রকৃতির এই ধারা চিরাচরিত—এই ত অতীত, এই ত বর্ত্তমান, আর এই ত ভবিষ্যৎ—এসব ধরো সনাতনো—নয় কি?

না, তা নয়, এই হ'ল মহামায়া, মহামোহ, অজ্ঞান অচেতনা। প্রকৃতি চলেছে, পরিবর্ত্তন নেই? আধুনিক জ্ঞান আমাদের চক্ষের সম্মুখে খুলে ধরেছে কি পরিবর্তন, বিপুল পরিবর্তন সৃষ্টির মধ্যে হয়ে এসেছে, নিত্য ঘটে চলেছে। আজ সৃষ্টির যে আকার, কাল তা ছিল না, এককালে তা ছিল ধূম-জ্যোতির পিণ্ড—আকাশের নক্ষত্র-খচিত সুন্দর দৃশ্য একদিন ছিল না, নক্ষত্রদেরও যে ছকটি গগনে প্রসারিত তা অটুট অচল নয়, নিত্য-পরিবর্তন তাতে ঘটে চলেছে। পৃথিবীতে আজ দেখছি যে গাছপালা ফল-ফুল, সে শোভা ছিল না একদিন, ছিল না পশু-পক্ষীর বর্ণ-বৈভব, কণ্ঠ-বৈচিত্র্য, মানুষও ছিল না একদিন; ক্রমে এইসব দেখা দিয়েছে, উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ক্রম-পরিবর্ত্তনের ধারায়।

জড় জগতের তবে শুধু যে গতি আছে তা নয়, আছে আবার পরিবর্ত্তন। সে চলেছে ক্রমপরিবর্ত্তিত হয়ে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনেরও আবার আছে বৈশিষ্ট্য। তা কেবল যে-কোন পরিবর্ত্তন নয়, তার আছে একটা লক্ষ্য এবং লক্ষ্যাভিমুখী প্রবেগ অর্থাৎ অগ্রগতি, ক্রমোন্নতি। এরই স্থূল উদাহরণ হ'ল যাকে বলা হয় প্রকৃতির বিবর্ত্তন—প্রথম একান্ত জড়, তারপর প্রাণ, উদ্ভিদ, তারপর আদি মন, পশু, তারপর বুদ্ধি বা মানুষ, তারপর চলবে কি?

এই যে অগ্রগতির স্রোত চলেছে, এ হ'ল সত্যই স্রোত, কোথাও কখনও থেমে নেই, নিত্যবহমান কাল। এগিয়ে চলা, ঊর্দ্ধে উঠে চলা একটা ভবিষ্যতের দিকে, তার অর্ঘ প্রতি মুহূর্ত্ত নিয়ে আসছে নূতন কিছু, নূতনের বীজ. এই যে নিত্য নূতনের ধারা তা বাহ্য চক্ষু দেখে না বটে, কারণ বাহ্য চক্ষু দেখে অতীতের দিকে কিন্তু যে দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে তার কাছে এই নিত্যনব স্বয়ম্প্রকাশ।

অগ্রগতির বা ঊর্দ্ধগতির আরও রহস্য এই যে এই গতিবেগ ক্রমেই কালের স্রোতে তীব্রতর ক্ষিপ্রতর হয়ে উঠেছে। সৃষ্টির উষর যুগের আদিকালের স্থিতি ছিল কোটি কোটি খর্ব্ব-নিখর্ব্ব বৎসর ধরে। তারপরে এল সজল মাটির যুগ, তার স্থিতি কমে গেল, হ'ল তবুও কোটি কোটি বৎসর। তারপরে তবুও দীর্ঘকাল পরেই এল গাছ-পালার যুগ, গাছ-পালার আবির্ভাবের পরে এল পশু-পক্ষীরা, তাদের পরে এল মানুষ, প্রথমে বন-মানুষ, তারপরে গৃহীমানুষ। কিন্তু এই বিভিন্ন স্তরের অবকাশ ক্রমেই হ্রস্বতর হয়ে এসেছে। পশুর আবির্ভাব যদি কোটি বৎসর আগে হয়ে থাকে, মানুষের কয়েক লক্ষের বেশি হবে না। বুদ্ধিযুক্ত মানুষ আরও আধুনিক যুগের। এইভাবে নূতন যুগ পৃথিবীর উপরে প্রকটিত হয়েছে, হ্রস্ব হতে হ্রস্বতর অবকাশের ক্রমে।

সৃষ্টিতে এরকমে আমরা যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি জিনিষের আকারে প্রকারে, ধর্ম্মেকর্ম্মে সে পরিবর্ত্তনের প্রচ্ছন্ন রহস্য হ'ল চেতনার পরিবর্ত্তন। সুতরাং সৃষ্টি চলেছে প্রতিনিয়ত আপনার চেতনা পরিবর্ত্তন করে। হয়ত এই চেতনা ঘুরে চলেছে চক্রের মত এত তীব্রবেগে যে মনে হয় তা যেনেই রয়েছে জড়বৎ অচঞ্চল কিন্তু প্রাচীনেরাই বলে গিয়েছেন, "চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি।"

বিশ্বপ্রকৃতি তবে এই যে ছুটে চলেছে তার অন্তর্গত সকলকে নিয়ে, কিন্তু যা কিছু আবার এই অগ্রগতির সঙ্গে সমতালে চলতে পারে না, তা ক্রমে পিছিয়ে পড়ে, ধ্বসে যায়, জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যায় লোপ পেয়ে। জরা-মৃত্যু অর্থ তাই। জরা-মৃত্যু ঘটে কারণ আধার এগিয়ে চলতে পারে না, আপনাকে পরিবর্ত্তিত করে ধরতে পারে না, বিশ্বপ্রকৃতির বেগের সঙ্গে পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আধার যদি আপনাকে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত করে চলে, বিশ্বপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন দাবী অনুসরণ করে তবে জরা-মৃত্যুর আর কোন প্রশ্ন ওঠে না।

বললাম বিশ্বপ্রকৃতি, কিন্তু তা হ'ল আসলে বিশ্বপুরুষ। কারণ বিশ্বপ্রকৃতি বলতে আমরা সচরাচর বুঝে থাকি জড়, অচেতন বাহ্য-প্রকৃতি। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হ'ল যে চিন্ময়সত্তা বা চিন্ময়ীশক্তি বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে অনুস্যূত, যাঁর জ্যোতির্ম্ময় ইচ্ছা প্রকট হয়ে চলেছে বিশ্ব-বিবর্ত্তনের ক্রমধারায়।

মানুষ যদি নবজীবন, সত্যকার জীবন লাভ করতে চায় তবে তাকে চলতে হবে, এই বিশ্ব-পুরুষের গতি অনুসরণ করে সমান ছন্দে, সমান তালে। তার অর্থ প্রতি মুহূর্ত্তে এগিয়ে চলা, সম্মুখে দৃষ্টিপাত করা সদাসর্ব্বদা, পিছনে তাকান নয়। পৌরাণিক অনেক কাহিনী আমাদের শুনিয়েছে এই কথা, শুভযাত্রায় কখনও পিছনে তাকাতে নেই, পিছনে তাকালেই যাত্রা ভঙ্গ। গ্রীকো অরফিউস ও ইউরিডিসের কাহিনী সুপরিচিত।

অতীত, অতীতের স্মৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে কেটে কেটে চলতে হয়—যতটা তা তুমি পারবে ততটা নূতন মানুষ হয়ে উঠবে, ভবিষ্যতের নিঃশ্বাস দিয়ে গড়ে উঠবে তোমাদের বর্ত্তমানের প্রাণ, অতীতের মৃতদেহ তুমি আর টেনে চলবে না, ভবিষ্যতের রূপ ক্রমে তোমার মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠবে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের একটা প্রক্রিয়া বুদ্ধদেব দিয়ে গিয়েছেন তাঁর ক্ষণিক বিজ্ঞানতত্ত্বে। তিনি বলছেন, জীবনধারা একটা নিরন্তর বহমান ধারা বা টানা রেখা নয়, তার মধ্যে কোথাও ফাঁক নাই ছেদ নাই এরকমটি নয়। আসলে জীবন হ'ল বিচ্ছিন্ন মুহূর্তসকলের সমাহার-মাত্র। তাদের মনে হয় যে অবিচ্ছিন্ন, সুসংহত—সেই মনে হওয়াটাই হ'ল অজ্ঞান মায়া। এই অজ্ঞান যখন চলে যায়, ভ্রান্তজ্ঞান যখন সত্যজ্ঞানে পরিণত হয় তখন আমরা দেখি জীবনের সত্যাকার রূপ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত পৃথক পৃথক বিন্দুমাত্র, মালার মত দেখায় বটে কিন্তু কোন সংযোগ-সূত্র নাই। এই জ্ঞান হ'লেই মালাটি বিশ্লিষ্ট হয়ে খসে পড়ে, বিক্ষিপ্ত হয়ে মিলিয়ে যায় শূন্যে। আমরা বলি সাধারণ চেতনায় প্রতি মুহূর্ত প্রতি মুহূর্তের সঙ্গে সংযুক্ত অতীত-চেতনার আশ্রয়ে, অতীত চেতনাই হ'ল জীবন, জীবনের সংযোগসূত্র। কিন্তু এই অতীতের সূত্রের পরিবর্তে যদি আমরা ভবিষ্যতের সূত্র সেখানে স্থাপন করতে পারি তাহ'লে জীবনধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়ে যায়।

যে ক্ষণিক কণিকা সংগ্রহ নিয়ে জীবন ধারা তাদের অনেকগুলি বহুলাংশেই আপাত:-দৃষ্টিতে মনে হবে পুরাতনের অতীতের অবশিষ্ট এবং তাদের পরিবর্জন বিস্মরণ অনিবার্য। আর এদেরই মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে আবার ভবিষ্যৎ-মুখী ক্ষণিকাসব, প্রায় অলক্ষিতেই প্রয়োজন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় গ্রহণ, সেগুলি সাধারণ চেতনায় আমরা হারিয়ে ফেলি অন্য সকলের সঙ্গে মিলিয়ে গুলিয়ে দিয়ে। তাই ত' জিজ্ঞাসার আরম্ভেই শাস্ত্রবাণী হ'ল সত্যাসত্য নিত্যানিত্য বিবেক।

কিন্তু যদি আমরা একেবারেই পিছনে গভীরে গভীরতম চেতনায় চলে যাই তবে দেখব কোথাও এমন কোন কণিকা বা ক্ষণিকা নাই—আপাতদৃষ্টিতে যতই মলিন পঙ্কিল দুঃস্থ দেখা যাক না—যাকে ঘুরিয়ে ধরা যায় না ভবিষ্যতের পৈঠা করে; পাপকেও পুণ্যের সোপান করে তুলে ধরা যায়। চেতনার গুণে দোষ আর দোষ থাকে না, গুণে পরিণত হয়। কবি ভিক্তর হিউগোর বিখ্যাত চিত্রটি আমরা স্মরণ করতে পারি, তিনি তুলনা করে বলছেন: ফাঁসী কাঠ অস্পৃশ্য বস্তু কিন্তু তাতে ভগবানকে ঝুলিয়ে দাও, তা হয়ে উঠবে ক্রুশ (Attachez Dieu au gibet et vous avez le croix.)

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা বসু

(১৯)

কর্মযোগের শেষের দিকের আলোচনায় এবার আমরা এসে পড়েছি দিব্যকর্মের প্রসঙ্গে। Supramental work সম্বন্ধে যে অধ্যায় শ্রীঅরবিন্দ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তা অসমাপ্ত রয়ে গেছে। দিব্য জ্ঞান লাভের পর যে দিব্যকর্ম, সেই প্রসাদের (Grace) অবতরণে ঐ সিদ্ধকর্ম সম্ভাবিত হবে। কিন্তু সে তো সাধ্য নয় সিদ্ধ, তাই তা ঠিক আমাদের আলোচনায় ধরা পড়ে না। গীতায় দিব্য কর্মের উল্লেখ থাকলেও সে সম্বন্ধে আলোচনা বা নির্দেশ তত স্পষ্ট নয়।

সমস্ত কর্মের কর্মাধ্যক্ষ তিনিই, তাঁর নির্দিষ্ট কর্ম এবং তাঁরই সম্পাদিত কর্মই দিব্যকর্ম। আবার ঐ দিব্য কর্মই তাঁর ইচ্ছামত আমার ভিতর দিয়ে যে ভাবে উৎসারিত হবে, আমাকে দিয়ে যে সুরটি তিনি বাজিয়ে তাঁর সঙ্গীতে পূর্ণতা আনবেন, দিব্য সুরলোকের সেই বিশেষ ধ্বনিটি আমাকে সেধে নিতে হবে। সেটা ধরতে পারলে তবেই আমার কর্মযোগ তাঁর দিব্য কর্মযোগ হয়ে উঠবে।

গীতায় কর্মযোগের পর পর কয়েকটি স্তর দেখানো হয়েছে, তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। ভগবান নিজে সেখানে নৈষ্কর্ম্যের বিরোধী হয়ে বলেছেন "ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে"। আবার কর্মে সর্বারম্ভপরিত্যাগী ভক্ত যে তাঁর প্রিয়, তাও তিনি অন্যত্র বলেছেন। বিবিক্ত পুরুষ দ্রষ্টা আর প্রকৃতিই কর্মকর্ত্রী, এই ভাবে পুরুষই নৈষ্কর্ম্যের আধার। কি রকম? না নিজে থেকে কোন কর্ম ঘটিয়ে তোলা হচ্ছে না, অথচ কর্ম করা হয়ে যাচ্ছে, এই হল ভাব—অকর্তার ভাব। তাই বলে অকর্মের দিকে যাতে ঝোঁক না পড়ে, অর্জুনকে সে ভাবে কর্মের নির্দেশ দিতে গিয়ে কর্মের বিশ্লেষণ করেছেন এই বলে যে, কর্ম না করে কেউ থাকতেই পারে না—"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ"। শক্তির স্পন্দই হল জীবনের অর্থ সে শক্তি প্রতিনিয়ত অবিচ্ছেদে স্পন্দিত হয়ে চলেছে। কিন্তু তা বলে জীবনে কি অস্পন্দের অবস্থা নেই? তা তো হতে পারে না। স্পন্দ থাকলে এক অস্পন্দকেও যে থাকতে হবে। কাজেই জীবনের ছন্দে ঐ স্পন্দ ও অস্পন্দ দুইই মিলিয়ে নিতে হবে অর্থাৎ কর্ম ও অকর্ম দুই মিলিয়ে তবে কর্মযোগের সিদ্ধি।

সাধারণ ভাবে জগতের দিকে তাকালে দেখা যায় ভূত মাত্রেই কর্ম করে। কর্ম না করে জীবন ধারণই হয় না, এক কথায় পেট চলে না ভিক্ষা করেও উদর পূর্তি করতে হয়। জীবিকার সংস্থান হলে আদর্শ বোধের কথা আসে। সমাজ স্থিতি বজায় থাকলে উন্নততর কর্ম সম্ভব বলে আমরা লোকসংগ্রহের কর্ম ধরে রেখেছি। তাতে সমাজস্থিতি আরও ভাল

ভাবে বজায় থাকে, কেননা মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সেই কারণে প্রাচীন যুগেও ধর্মের শাসনে ও তার অনুকূলে লোকসংগ্রহ কর্ম আদর্শ ছিল। মনুষ্য-সমাজের রীতি নীতি ও ধর্মবোধ বৃহত্তর মনুষ্যজগতের স্থিতি ও গতির ছন্দ বজায় রাখে, তাতে সমগ্রভাবে সকলের কল্যাণ। এই সমাজকল্যাণ বজায় থাকে যদি প্রত্যেকে তার নির্দিষ্ট কল্যাণকর্ম ঠিকভাবে করে চলে। একটি সংসারে সন্তানের জন্য পিতামাতার ত্যাগ ও কল্যাণবোধ জগৎ-সংসারে ব্যাপ্ত করে দিতে পারা যায়। তাই এই দুই আদর্শ—জীবনধারণের কর্ম ও লোকসংগ্রহার্থে কর্ম ধর্মজীবনে ও যোগে অনেক দূর পর্যন্ত গ্রহণীয় কর্ম হয়েছে, এটা পরীক্ষিত সত্য। এই ভাবে শরীরযাত্রা নির্বাহ-রূপ কর্মকে ধর্মের অনুকূলে যোগজীবনে নিয়ে সংক্ষিপ্ত করে ফেললে আবশ্যক বস্তু বা উপকরণ অতি সংক্ষিপ্ত করে নেওয়া যায়। ভক্ত কবীর ছিলেন তন্তুবায়, তাঁত বোনা ছিল তাঁর জীবিকার কর্ম। নিষ্ক পুরুষ কবীর তাঁর নিজের জন্য এককালে দুখানার বেশী বস্ত্র বয়ন করতেন না, কেননা তাঁর প্রয়োজন বেশী ছিল না। প্রাচীনকালে সাধক জীবনের ঐ অপরিগ্রহের আদর্শ মানব সমাজের সব স্তরেই বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এতে মনস্বীর জীবন ধারণ অত্যন্ত সরল ও সহজ হয়ে নিশ্চিন্ত হলে (plain living and high thinking)—এই নীতি এদেশের মনে বেশ দৃঢ়ভাবে গেঁথে বসেছিল। পাশ্চাত্ত্য জীবনধারণের কর্ম কোলাহল আমাদের এই বহুকালের নিশ্চিন্ত জীবনে যে ঝড় তুলেছে, তাতে রবীন্দ্রনাথও একদা বলেছিলেন কর্মব্যস্ততায় কর্মক্ষেত্রে গলরজ্জুবদ্ধ হয়ে মরার কথা (to die in harness)। অতদূর পর্যন্ত সর্বথা সত্য না হলেও সারাজীবন ধরে ত্যাগের তপস্যা এদেশে উচ্চতর জীবনে যে আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পাশ্চাত্ত্যের বিপরীতমুখী প্রাণচঞ্চল বৃত্তির পক্ষে তা হজম করা সহজ ছিল না। ওদেশের মনীষীরা এখন কেউ কেউ বুঝতে আরম্ভ করেছেন ন্যাপ্তলালের সেই কথাটির অর্থ যে কেমন করে মৃত্যুকে জয় করা যায়, ভারতবর্ষ আমাদের তা শেখাতে পারে। সারা জীবন ধরে যে মৃত্যুর প্রস্তুতি, শেষ ধরেই যে জীবনের শুরু তাকে ধরা—এতে ত্যাগের মহিমা উজ্জ্বল হয়ে ভোগের সমারোহকে ম্লান করে দিয়েছিল। এ থেকে যে শিক্ষা ব্যাপ্ত হয়েছিল, তাতে ধর্মের শাসনে নিজেকে রেখে প্রাণশক্তিকে একটা খাত কেটে বহাতে হবে। তার জন্য বিধিনিষেধের এক বন্ধনে অভ্যস্ত হওয়ার মূলে ছিল সংযমের সাধনা। অভাববোধকে কমিয়ে এনে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি লাভ করার প্রচেষ্টায় ত্যাগের শিক্ষা হয়। আর পাশ্চাত্ত্য সমাজে ঠিক এর বিপরীত ভাবে অভাববোধ বাড়িয়ে তুলে সমাজজীবনে নিত্য নতুনের চাহিদায় মানুষের লোভের প্রবৃত্তি তার সদ্‌বৃত্তিগুলিকে যেন গ্রাস করতে বসেছে; এই অশান্তির ঝড়ে সমগ্র ভাবে জাতির জীবনে সর্বত্র অভাব বেড়েই চলেছে। শান্তিও নেই, স্বস্তিও নেই। এ দেশের নাগরিক জীবনে এই ঢেউ প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছে—ওদেশে জীবনের মানে অভাববোধ এনে তাকে উচ্চতর মানে তোলাই আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উনিশ শতকে এই লোকসংগ্রহের কর্ম ওদেশে মানবহিতবাদ বা পরোপকারবাদের বোধে বুদ্ধিমান মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। মিল ও বেন্থামের প্রবর্তিত নীতি তখন

এদেশের শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বঙ্কিমচন্দ্র গীতার ব্যাখ্যায় ঐ লোকসংগ্রহের কর্মকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে যে দেখিয়েছেন, তাতে ঐ মিল ও বেন্থামের প্রবর্তিত নীতির প্রচার দেখতে পাওয়া যায়। সকলের কল্যাণ করার জন্য কর্ম করাই কর্মযোগ। লোকমান্য তিলক তাঁর গীতার ব্যাখ্যায় কর্মযোগকে উচ্চে তুলে ধরেছেন— যোগ সর্বভূতহিতে রত এই দৃষ্টি প্রধান করে। প্রাচীন হিন্দু সমাজে পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থায় ঐ সর্ব ভূতের হিতের প্রতি উদার দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু মাত্র মানুষ কেন, "মদাত্মা সর্বভূতাত্মা" হলে বিশ্বের কোন কিছুই তো বাদ দেবার উপায় নেই। আত্মার সম্বন্ধ হলে জগৎ-সংসারে সকলের কথাই না ভেবে তো পারি না। কিন্তু তখনকার সামাজিক ব্যবস্থায় এ যুগের থেকে সমাজের গণ্ডীটা অনেক ছোট ছিল মনে হয়। মানুষের নিজস্ব ক্ষুদ্র গণ্ডী বাড়িয়ে বহুকে নিয়ে সমাজ তৈরী হয়। সে সমাজ মানুষের হিতার্থেই গঠিত। কিন্তু এখন মনুষ্য সমাজ বলতে সারা পৃথিবীতে যে সমাজ ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। স্বদেশ ও সমাজ এ সবের হিত করতে গিয়ে সেই হিতকে কোথায় টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যে মানুষের বুদ্ধি দিয়ে সমাজকে সামলানো যাচ্ছে না। সামাজিক বা সমষ্টির মধ্যে একটা মনস্তত্ত্ব-মূলক রীতিও গড়ে ওঠে। তাতে যার যা পরিবেশ তার প্রভাব তার মধ্যে কাজ করে, হঠাৎ তাকে বদলে দিলে সেটা সামলানো গণ্ডীবদ্ধ সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

স্ত্রী পুত্র পরিবার ও তা থেকে দলের ও দেশের কাজ এ সবই অযোগী চিত্তের ব্যাভিচারে পর্যবসিত হতে পারে। জগৎহিতবাদে তা থেকে পৌছানো লক্ষ্য থাকলেও অযোগী চিত্তের অনেক ফাঁকি দিয়ে তাকে অনেক সময় ভরতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ তা থেকে সাবধান করার জন্য সেদিকটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন যে জীবনধারণ কর্ম থেকে লোকসংগ্রহের কর্ম পর্যন্ত এই ক্ষুদ্র অহং কুলে কুলে এক আবর্তরিতার প্রাচীর গড়ে তুলে কর্তব্য কর্ম করছি এই অভিমানে সব কিছু কর্ম নষ্ট করে দিতে পারে। সেই সব ফাঁকিগুলি বুঝে বুঝে চিত্তকে মুক্ত রাখতে হবে। তার অর্থ কিন্তু এ নয় যে কর্তব্য কর্মে কোনও ফাঁক থাকবে। সেই কারণে শ্রীঅরবিন্দ গীতোক্ত কর্মযোগের ধারাই গোড়া থেকে ধরিয়ে দিয়েছেন যে যোগীর প্রথম কর্ম কৌশল হল অকর্তা হয়ে কর্ম করা ও কর্মে অকর্ম দেখা। এখানে যে দুটি বিষয় সম্বন্ধে সাবধান হতে হয়, তা হল অহন্তা ও মমতা, আমি ও আমার এই বোধ। অহন্তা থেকে এই বোধ আসে যে "আমি আছি" বলে এ কাজ চলছে, না হলে কি চলতে পারে? এটাই হল ভ্রান্তি বা মায়া। যে কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছি, সেখানে বাহির থেকে কোন পরিবর্তন হলেই সর্বনাশ। "অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে"। আমার কর্তৃত্বে আঘাত লাগলেই আমি বিমূঢ় হয়ে পড়ি। আমি করছি বলে আমার মতলবমত ফলাকাঙ্ক্ষা মনের গহনে থেকে যায়। ভাল কাজই করছি, সেটা বেছে নিয়েছি, তাই প্রত্যাশা থেকে আশা ভঙ্গ হলে সেটা মনস্তাপের কারণ হয়। কিন্তু সে রকম হলে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে কর্মফল আমার হাতে নেই, আমার সাধ্যমত চেষ্টায় আমি কোন ত্রুটি রাখিনি। তবে কর্মের ফল সম্বন্ধে সচেতন থাকলে একটা ক্ষোভ আসতে পারে, তাতে একটা খেলুড়ের সহজ ভাব (sporting spirit)

আনতে হবে। যত্ন করে কর্ম করেও যদি না সিদ্ধ হয়, তবে আমার দোষ কোথায়? বিচার করার ভার যাঁর পরে, তিনি যদি দণ্ড দেন, হাসিমুখে সে দণ্ড গ্রহণ করতে হবে; পরাজয়কেও মেনে নিয়ে আবার নতুন উদ্যমে কর্ম শুরু করতে হবে।

কর্মফলে নিরাসক্ত থাকা হল গীতায় কর্মযোগের প্রথম পদক্ষেপ। আসক্তি বা বাসনা অনেক সময় কর্মে উদ্যম আনে এটা ঠিক। কিন্তু সেটাই যে সব সময় কর্মের উৎসাহ নিয়ে আসে, তা নয়। কর্মের ইচ্ছাই হল শক্তি। সাত্ত্বিক কর্মের লক্ষণ হল ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত কর্ম। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষ করে বলেছেন, যুদ্ধ করতে এসেছ, ধৃতি কই? উপনিষৎ বলেন সত্যকে ধৃতি দিয়ে আকড়ে ধরার কথা। ফলে আসক্ত না হয়েও ধৃতি ও উৎসাহ সহকারে কর্ম করতে শিখলে কর্মযোগের প্রথম স্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

এ ভাবে আপনাকে আলাদা করে রেখে দেখে কর্ম করে যেতে পারলে ক্রমশ কর্মে রস পাওয়া যায়। সুখ-দুঃখ জয়-পরাজয় লাভ-ক্ষতি ইত্যাদির দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত থেকে নির্দ্বন্দ্ব হতে হবে। সেজন্য সহ্য করার শক্তি বা তিতিক্ষার সাধন বড় কথা। আমাদের প্রবাদ বাক্যে আছে তিনটি শ এর কথা, শ ষ স, তার অর্থ হল সহ্য কর সহ্য কর সহ্য কর। এই তিতিক্ষার পরিণামে ভিতরের শক্তি বেরিয়ে আসে এবং তখনই কূটস্থ আত্মার সাক্ষাৎকারে অকর্তার কর্ম ঠিক মত করা সম্ভব হয়। পুরুষ ও প্রকৃতিকে তফাৎ করতে শিখলে দেখা যায় কর্মের ভার প্রকৃতির আর পুরুষ তার সাক্ষী, তিনি অচল অটল। তার অর্থ কিন্তু এ নয় যে পুরুষ কর্ম করেন না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলেছেন যে আমি কর্ম করি যদিও তিন লোকে কর্ম করে আমার পাবার কিছু নেই, কর্তব্যও নেই। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যদি কর্ম না করেন তাহলে জগৎ ধ্বংসের পথে যাবে, কেননা সাধারণ লোকে কর্মত্যাগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। অর্জুন বলেছিলেন যুদ্ধ তো ভাল কথা নয়, যুদ্ধের সময় কুলস্ত্রীগণ নষ্ট হয় ও তার ফলে বর্ণসঙ্কর ঘটে। তাতে শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষ করে বললেন যে এই যুদ্ধকর্ম না করলে আমিই বর্ণসঙ্করের কর্তা হব। বিশৃঙ্খলা মনুষ্য জাতিকে বিনাশের পথে নিয়ে যায়। অথচ ভগবান নিজেই এই যুদ্ধকর্ম ফলিত করে রেখেছেন, কাজেই অর্জুনের দায়িত্বও রইল না। এই হল ভগবানের নিজের কর্ম—গভীরে এক প্রশান্তি দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থিত, সর্বদা সেই সন্নিহিত দৃষ্টির আলোয় ও পরিচালনায় প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে কর্ম ঘটে চলেছে। এই অকর্তার কর্ম, আর এই রকম করে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে একসঙ্গে নিয়ে কুরুক্ষেত্র বুঝতে পারলে নিমিত্ত কর্ম ও অকর্তার কর্ম কেমন করে দিব্য কর্মও হয়ে ওঠে, তা বুঝতে পারা যাবে।

তাহলে কর্মের লক্ষ্য কি হবে? ধর্মের কর্মকে আমরা তিন ভাবে দেখেছি কর্ম অকর্ম ও বিকর্ম। তিনটিকে এক সঙ্গে নিয়েই যোগে কর্ম করতে হবে। ভাল করে চিনে নিয়ে বুঝে নিয়ে বিকর্মকে পরিহার করে অকর্মকে দেখতে হবে ও কর্ম করতে হবে। তাহলে অকর্ম বিকর্ম ও কর্ম তিন নিয়েই হবে নিমিত্ত কর্ম। এ ভাব আমাদের দেশে খুব প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে যে যজ্ঞার্থে কর্ম বা উৎসর্গের ভাবনা নিয়ে কর্ম করলে বন্ধন বা

আসক্তি হবে না। আর তা না হলে কর্ম বন্ধনের কারণ হয়—"যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ"। তাই সবচেয়ে বড় কথা হল "মৎকর্মপরমো ভব"। শ্রীঅরবিন্দ বলেন সেই "মৎ কর্ম" থেকে বিচ্যুতিই বিকর্ম। তখন কোন স্বার্থে বা মৎলবে কাজ হয়, সে সবই বিকর্ম। যা হতে সর্ব ভূতের উৎপত্তি এবং যা দিয়ে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই তাঁর কর্মই হল মানুষের স্বভাবজ কর্ম এবং সেই স্বভাবজ কর্মে সিদ্ধি লাভ করতে হবে। আবার সেই স্বভাবজ কর্মেই হবে তাঁর অর্চনা। এ সবই গীতার অনুশাসনে আমরা পেয়েছি। কার্লাইল (Carlyle) এই ভাবের কথা বলেছেন Work is worship। কিন্তু শুধু কর্ম করলেই অর্চনা হল না, জ্ঞানসহকারে কর্ম করা চাই। কর্ম সকলের উৎপত্তি যে একই ভূতভাবন উৎস হতে, সেই উৎস সম্বন্ধে সর্বক্ষণ সচেতন থাকতে হবে। সর্বব্যাপী ঐ পরম সত্তাই পরম শিব আর উৎস বা প্রবৃত্তির মূলে পরম শিবেরই স্বীয়া শক্তি—এই সমগ্র বোধে কর্ম চলতে থাকলে কর্মযোগে সিদ্ধি লাভ হবে। শিব-শক্তিকে এক সঙ্গে নিয়ে চলতে না পারলেই কর্ম হয়ে যাবে বিকর্ম। আর ঐ সামরস্য নিয়ে কর্মযোগ শুরু করলে মানব সেবা, জগৎহিতবাদ ইত্যাদি ছোট আদর্শ গুলি তার মধ্যে বসানো যায়। কিন্তু সেসব কর্মে মোহগ্রস্ত হয়ে আটকে যেতে না হয়, তাতে সাবধান হতে হবে। দিব্যকর্ম পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য প্রসারিত হয়ে চলবে। তাই শিব ও শক্তির জ্ঞান একসঙ্গে নেওয়ার অর্থ হল যে, প্রবৃত্তির উৎস ও তাকে ধরে আছে সর্বব্যাপী যে পরম সত্তা এই যুগ্মবোধকে অদ্বৈত ভাবনায় সর্বক্ষণের জন্য চেতন করে রাখতে হবে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি চিৎপ্রকর্ষই কর্মের লক্ষ্য আর তা-ই জীবনের পুরুষার্থ। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চারটিকেই সাধারণ ভাবে মানব জীবনের পুরুষার্থ বলে আমরা জেনেছি। কাম ও অর্থ যদি ধর্মশাসিত না হয়, তা হলেই তা সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গীতা বলেছেন কাম যেন হয় ধর্মের অবিরুদ্ধ কাম, আর সেই কামের অর্থে ঘণা থেকে আসে জীবনের অভ্যুদয়। এই অভ্যুদয়ের পথে চললেও পিছন থেকে ধরে থাকবে অকর্তার ভাব, আর সেই মোক্ষভাবনাই নিঃশ্রেয়সের পথ। একটা যন্ত্রের মধ্যে Flying wheel যেমন অচল ও অনড় থাকার ফলে অন্যান্য ছোট ছোট চাকাগুলি চলে, তেমনি অকর্তার ভাবে পিছনে স্থির ও প্রশান্ত থেকে সব কিছু কর্মের প্রবৃত্তি ও গতিকে সংযমে রাখতে হবে। পিছনের ঐ স্থির অকর্তা বা অনড় চক্রটি হল মোক্ষ। এই রকম করে যজ্ঞার্থে কর্ম সম্পন্ন হলে বলা যায় ধর্মের শাসনে রয়েছে অর্থ কাম ও মোক্ষ। এই বিরাট বিশ্বে যে যজ্ঞকর্ম চলছে, তার যজ্ঞেশ্বর তো স্বয়ং তিনি। কাজেই ব্যষ্টির দিক দিয়ে দেখলে প্রত্যেকের পুরুষার্থ হল যজ্ঞেশ্বর প্রভুর উদ্দেশ্যেই কর্ম করা আবার সমগ্র বিশ্বের দিক থেকে দেখলে সমষ্টির কর্মও তো তাই; তা তাদেরও পুরুষার্থ। সেই যজ্ঞেশ্বর প্রভুই তো ভগবান, তিনিই অকর্তা হয়ে সকল কর্মের উৎসকে ধরে আছেন। যোগকর্ম করে শুদ্ধ হতে হতে এই বোধে বোধ হয় যে, তাঁর দ্বারা বিধৃত হয়ে আমি চলেছি। সেই আমার সত্যসঙ্কল্প। তাঁরই অকর্মের কর্মে আমার নিমিত্ত কর্ম হতে দেখছি ও সেই ভাবেই

আমাকে কর্মযোগে যুক্ত থাকতে হবে। নিবৃত্তিযোগেও অকর্মকে যদি আমরা তাঁর আপন ঘরে বসাতে পারি, তাহলে অকর্তার কর্মই করা হবে।

আমার ক্ষুদ্র সংকল্প কামসঙ্কল্প হলে তার ভার বড় দুঃসহ, তা বারবার ভাঙে, হাতড়ে বেড়াতে হয় অথচ তার দার্ঢ্যের অভিমান অনমনীয়। তাই নিয়ে হানাহানির অন্ত থাকে না, ভাঙা-চোরার মধ্যে চরম অবিশ্বাস এসে হানা দেয়। সেই প্রলয়ের মুখে দাঁড়িয়ে থেকে চিনতে হয় শ্রদ্ধা কি বস্তু, জানতে হয় বিশ্বাসই বা কাকে বলে আর অনুভব করতে হয় প্রেমই বা কোথায়। এই উপলক্ষে 'বলাকা'র কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা স্মরণ করতে পারি। সময়টা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর, হিংসার উন্মত্ততায় পৃথিবী টলমল করছে। মানুষের চিত্তে জীবনের মূল্যবোধ সব হারিয়ে যেতে বসেছে, সেই মৃত্যুর মুখোমুখি হতাশার চরম ক্ষণে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—

"আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল।
বাঁচি আর মরি বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—

সামনে ধ্বংসের এই অতল সমুদ্র, তবুও এই মৃত্যু পেরিয়ে যেতেই হবে।" এগুলি সব বিরাট ঘটনা, ঘটছে বিশ্বের মধ্যেই, তারই মধ্যে তাকে পেরিয়ে নতুন কিছু ঘটবেই। নূতন উষার আবির্ভাবে যে নতুন যুগের সূচনা সেই স্বর্ণদ্বার খুলে পথ সহজ হবে, এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধৈর্য ধরতে হবে। সেই মহাসন্ধিক্ষণে পুরাতন সব কিছু হারিয়ে নগ্ন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, আর তখনই সাধকের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে দিব্য শক্তিসম্পাতের ফলে (Divine intervention) সাধক দিব্য অধিকার লাভ করে। ঐ মহতী বিনষ্টির পটভূমিকায় ভগবান বলেছেন যে তিনি নিজেই সংহার-রূপী কাল—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ... । তাঁর নিজের কুল যদুবংশ পর্যন্ত সেই ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার পেল না। কিন্তু তাঁর দিব্য জন্মের রহস্যও ঐ মহাসন্ধিক্ষণে সম্ভাবিত হয় "—বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" এই পরম ভরসাটি চরম হতাশার ক্ষণে ধরে থাকতে হবে। তিনি অজ অব্যয়াত্মা, আবার ভূত সকলের ঈশ্বর তিনিই : স্বীয়া প্রকৃতিকে অধিষ্ঠাত্রী করে আত্মমায়া বা প্রজ্ঞাপ্রকৃতি দ্বারা এই ভূত সকলের মধ্যে ভূতপতি তিনি জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাতেই বিশ্বব্যাপারের ছন্দ ধারণ করে যে ধর্ম, সেই ধর্ম আবার নতুন করে সংস্থাপিত হয়। এই রকম করে ঋতছন্দ তাঁর আপন নিয়মে বিধৃত হয়ে চলে, সেই ছন্দঃ প্রতিষ্ঠায় দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের বীজ নিহিত থাকে। এই লক্ষ্যের সহায়ক সাধুগণ বিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে নিগৃহীত হয়ে থাকেন, তাই তাঁদের পরিত্রাণ করাও যুগাবতারের আপন কর্ম।

আমরা দেখতে পাই, বিশ্বজগতে কালের পরিক্রমণ চলছে যন্ত্রের মত এক আবর্তগতির ভিতর দিয়ে। কিন্তু সেটা যে যান্ত্রিক আবর্তন মাত্র নয়, ক্রম-অভিব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সেটা ধরা পড়ে। বারবার পুনরাবৃত্তি হলেও একটা গুণগত উৎকর্ষের দিকে

প্রকৃতির যাত্রাপথের লক্ষ্য। তাই এক একটা সন্ধিক্ষণে উপরের চাপে এই আবর্তনের ফলেই নতুন করে একটা গঠন (mould pattern) প্রকৃতির মাঝে সংঘটিত হয়। দিব্যসংকল্পের এই প্রয়োজনই যুগসন্ধিতে তাঁর দিব্যশক্তিসম্পাতের নিমিত্ত হয়ে থাকে। সেই শক্তিসম্পাতের ফলে যুগে যুগে তাঁর আবির্ভাব যেমন সম্ভাবিত হয়, প্রকৃতিতে সৃষ্টি-ব্যাপারও তার পরম লক্ষ্যের দিকে এক ধাপ অগ্রসর হয়ে যায়। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের সময় তাঁর সংহার-মূর্তি দেখিয়ে তিনি তাঁর সেই পরম রহস্যটিও ব্যক্ত করে দিলেন। মহা-মরণকে বাদ দিয়ে মহাজীবনের প্রতিষ্ঠা তো সম্ভবপর হয় না। দিব্য সংকল্পের প্রয়োজনেই সংহাররূপী মহাকালের ভয়ঙ্কর রূপ তিনি করুণা করে যুগমানব অর্জুনের সামনে প্রকটিত করে দেখিয়ে দিলেন। সেই ভীষণ কালাগ্নি রুদ্র স্বয়ং লোকসমূহ গ্রাস করছেন, দেবগণ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করছেন, তাঁরা তাঁরই দেবশক্তি, তাই তাঁর মহিমা তাঁরা বুঝতে পারছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ সকলে স্বস্তি উচ্চারণ করে তাঁর স্তব করছেন, তার মধ্যে প্রবেশও করছেন। কেউ কৃতাঞ্জলিপুটে ভীত হয়ে প্রার্থনা করছেন, গন্ধর্ব যক্ষ অসুর সিদ্ধগণ সাধ্যগণ বিশ্বদেবগণ সকলেই বিস্মিত ও চমৎকৃত। আর যত বড় বীর যোদ্ধা পরাক্রমশালীই হোক না কেন, মধুছন্দের বিরোধী হলে তাদের আর রক্ষা নেই, তারা অবশের মতই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়ে গ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তিনিই স্বয়ং এই মহাকাল বিশ্বরূপ, এই দৃষ্টি খুলে গেলে তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান্ হয়ে শান্ত মনে সানন্দে মৃত্যু বরণ করা যায়। তা হল দিব্যজন্মেরই বরণ। যুগসন্ধিতে দিব্যজন্মের প্রকট ভাব এবং তাঁর দিব্য কর্মে পরম পুরুষার্থ সাধিত হয়। সেই ভাবটা খাঁটি হলে আমার মধ্যেও মূর্ত হবে সর্বজনহিতায় অশেষকল্যাণগুণকর তাঁর নিজের ইচ্ছা। তখন প্রজ্ঞাদৃষ্টি খুলে যাবে—"সত্যমেব জয়তি নানৃতম" দেখতে ও বুঝতে পারব। তীব্র সংবেগে শ্রদ্ধা জ্বলন্ত; আত্মবিশ্বাস ও ভগবৎবিশ্বাস তখন এক একাকার হয়ে যায়। তাঁর ইচ্ছা সত্য সংকল্প সত্য, তাই সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতি সেই সংকল্প বহন করে চলেছে। এই সত্য হৃদয়ঙ্গম হলে আমার কর্মও দিব্য কর্ম হবে। কিন্তু প্রবর্ত দশার লোক-সংগ্রহের কর্মকে যেন এই ভূমির কর্ম বলে গোলমাল করে ধাঁধায় না পড়ি। দিব্য কর্ম কর্মযোগের পরিপাকে দিব্যভূমির প্রকৃষ্ট ফলস্বরূপ। সাধ্য সাধনার শেষে এই সিদ্ধ কর্মের আবির্ভাব হয় মানুষের আধারে তাঁর মহিমায় ও তাঁর করুণায়।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন এই দিব্য কর্মের এক তীব্র অনুভূতি আছে। নিমিত্ত কর্মে সঙ্গী চালক আর নিজেকে তার যন্ত্র, এই বোধে বোধ হয়। কিন্তু তাঁর আবেশ যখন সর্বাঙ্গীণ হয়, তখন "আমি" বলে ভিন্ন বোধ একেবারেই থাকে না, আমি লুপ্ত হয়ে যায়, তিনিই স্বয়ং করেন এই বোধের প্রতিষ্ঠায় দিব্য কর্ম সম্ভাবিত হয়। পরম দেবতার আপন কর্ম তখন সম্পন্ন হয়, আধারের কোন দ্বৈতবোধ আর থাকে না। শ্রীঅরবিন্দের ভাষণে ও কর্মে আমরা দিব্য কর্মের আভাস পেয়েছি, কৃষ্ণমূর্তির ভাষণের সময় যে আবেশ নামত, সে বিষয়ে এ্যানি বেসান্ত জানিয়েছেন যে তিনি ভগবদাবিষ্ট হয়েই তখন কথা বলতেন। He বলতে বলতে তার জায়গায় I বলতেন। এই "I" স্বয়ং Messiah। এটা হল

সেই যন্ত্রের flying wheel-এর অবস্থানের একটা দৃষ্টান্ত। তিনি অকর্তা হয়ে স্তব্ধ নৈঃশব্দ্যের মধ্যে অটল হয়ে আছেন, আবার তাঁরই আবেশের ফলে এই 'আমি' স্বয়ং তিনি হয়ে গেছে। যন্ত্র চলছে তাঁরই ঋত ও সত্য ছন্দে গতিতে ও নিয়মনে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নিজের কথা শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়কে বলেছিলেন যে এই যে তিনি হাত তুলছেন, সেও তাঁর শক্তিতে। এ শুধু গল্পের ভাব নয়, স্বয়ং তিনিই কর্মে অংশগ্রহণ করছেন তিনিই মানুষ আধার হয়ে গেছেন—participation in the Divine, not only Instrument of the Divine। এই হল দিব্য কর্মের মূল কথা, তাঁর শরিক হয়ে কর্ম করা। কর্মযোগের এই পর্যন্ত পরাকাষ্ঠা।

এর পরেও শ্রীঅরবিন্দ অতিমানস কর্ম (Supramental work) সম্বন্ধে যে অসম্পূর্ণ অধ্যায়টি লিখে রেখেছেন, তাতে দিব্যকর্মের ফলিত দিকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সবই তিনিময় হয়ে যদি কর্ম দেখতে পাই, তাহলে আমি আর থাকি না, তিনিই থাকেন, সবই তিনি। কিন্তু সেই ভগবৎ ভাবে আপ্লুত অবস্থা কর্মযোগে সর্বদা থাকে না বলেই নিমিত্ত কর্মের আদেশ—"মৎকর্মপরমো ভব"। এই ভাব চলতে থাকলে আবেশে ঐ পরের অবস্থা এসে যায়, যখন এ আমি থাকেনা, দ্রষ্টাস্বরূপে হয় রূপান্তরিত আমির অবস্থান আর তাঁর পরমা শক্তিই শুধু থাকেন—সেই হল দিব্যজীবন। তাই সব কর্মই তাঁর অর্চনা। ফলাকাঙ্খা থাকছে না, কাজেই ব্যর্থ যদি হই, সে তো আমার ব্যর্থতা। পরমা প্রকৃতির কর্ম কি কখনও কোথাও ব্যর্থ হতে পারে? জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ এ সব দ্বৈতের মূল্য সেখানে একরসে পর্যবসিত হয়। ঐ তাঁর 'নিমিত্ত' হয়ে চলা আর বিদ্যুৎ ঝলকের মত আবেশে তাঁর শক্তিপাত—এইভাবে সিদ্ধ হয়ে অনালোকের আলোর পথে চলাই হল কর্মযোগের সাধ্যের অবধি বা চরম সিদ্ধি।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে আমাদের দেশে কর্মে যে বিতৃষ্ণা দেখা যায় তা এসেছে বৌদ্ধদের এক যুগ থেকে। বেদেই পাওয়া যায় মস্করী সম্প্রদায়ের কথা, তাঁরা ছিলেন বেদের কর্মকাণ্ডের বিরোধী। "মা কুরু" থেকে মস্করী শব্দটি এসেছে। তা থেকে "কিং কৃতেন", করে কি হবে? এই "কিং কৃতেন" পালি ভাষায় কীকট হয়েছে। কীকট সম্প্রদায়ের নীতি হল একেবারেই কিছু না করা। তাদের মতে কর্ম মাত্রেই বন্ধন। কেননা কর্ম আসে বাসনা থেকে। বাসনা থেকেই জন্ম, জন্ম থেকেই দুঃখ। তৃষ্ণা বা তৃষ্ণার মূলই কেটে ফেলতে হবে যদি দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি চাই। বারবার জন্ম ও কর্মের আবর্তনে এই পৃথিবীতে আসাকে তাঁরা বলতেন ভব, আর এ থেকে নিরোধ হল অনাবৃত্তি —"...ন পুনরাবর্ততে"। যদি এই জন্ম হওয়াই নিরুদ্ধ করতে হয়, তাহলে কর্মের নিরোধ চাই ও তার মূলে বাসনাকেই নিরুদ্ধ করতে হবে। এই হল দুঃখবাদ থেকে উৎপন্ন নিবৃত্তির দর্শনের দৃষ্টি-ভঙ্গী। কিন্তু এ তো সবাই মানে না বা মানতে পারে না। কেননা জন্ম হলে কর্ম করে মানুষ কি শুধুই দুঃখ ভোগ করে? তা তো নয়, দুঃখের সঙ্গে সুখও আছে এবং আত্মার স্বভাব হল আনন্দ পাওয়া। সুখ ও দুঃখ সবের মধ্যে থেকে যে

আনন্দকেই রস স্বরূপে পায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন আত্মহত্যায় পর্যন্ত এক রস আছে বলেই সেটা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তার ভোক্তা এক গুপ্ত পথে (occult way) সেই রস পান করে থাকে। রোগের যন্ত্রণা ভোগও সেই রকম চৈত্যসত্তার (Psychic being) রোগ ভোগের আকাঙ্ক্ষা থেকেই আসে, তারই অভিজ্ঞতা (experience) সঞ্চয়ের জন্য। জগতের যা কিছু ভোগ, ব্যথা বেদনা হাসি কান্না জ্ঞান কর্ম প্রেম সবের মধ্যেই চৈত্যপুরুষ রস ভোগ করেন, সেজন্যই ভোগের ব্যবস্থা। বাউলের সেই গানটা আবার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—"যোগে প্রেম ভোগে প্রেম রোগে প্রেম ঝরে"। যেহেতু ব্রহ্মই সব হয়েছেন, তদতিরিক্ত কিছুই থাকতে পারে না। তিনি রসস্বরূপ হলে রোগভোগে তাঁরই রস। এই ভাবে যদি সবটা নিয়ে বুঝি তাহলে কর্ম নিরুদ্ধ করে জন্ম নিরোধ করব কেন? দেহ সম্বন্ধে আরও একটা কথা আছে। যে দেহ নিয়ে জন্ম, তা হল আমার ভোগায়তন। আমি বাসনামুক্ত হলাম, দেহটা নেই; আমি কোথায়? সেই অসৎ মহাশূন্যে। সে বড় বিষম ঠাঁই। যাজ্ঞবল্ক্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থার কথায় বলেছিলেন "ন প্রেত্য সংজ্ঞা-স্তীতি"। কিন্তু সেখানে গিয়েও ফিরে আসা হয় কেমন করে? বুদ্ধের নির্বাণলাভের পর বুদ্ধ তো আবার ফিরে এসেছিলেন। তাহলে সেখান থেকে ফিরে জগতে আসা যায়। এমন তো হতে পারে যে শেষ যাওয়া এমন গভীরে তলিয়ে গেল যে আর ফেরা হল না। কিন্তু এরও প্রতিবাদ আছে বোধিসত্ত্বের বারবার ফিরে আসার কথায়। পরিনির্বাণগত বুদ্ধও রেখে গেলেন মৈত্রেয় বুদ্ধকে। তাহলে জন্ম নিরোধ হচ্ছে কোথায়? জন্মনিরোধ তো একেবারে করা যায় না, তবে এই আধারের লয় হয় আবার নতুন আধার গ্রহণ করতে হয়। জলের বুদ্বুদ জলে মিলে যায়, কিন্তু অসংখ্য বুদ্বুদ আবার দেখা দেয়। ব্রহ্মই তাহলে বারবার জন্ম নিচ্ছেন। জলের বুদ্বুদ হয়ে আমি তুমি সকলে জলে মিশে গেলাম বা ব্রহ্মই হয়ে গেলাম। তারপর? বৈষ্ণবেরা বলে থাকেন ভগবানের পার্ষদ বা লীলা সঙ্গী হয়ে ভগবান যখন আবির্ভূত হন তাঁর সঙ্গে আসা—এই হল ভক্তের কর্ম। চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায় অভিনয়ের পূর্বে মঞ্চের নিখুঁৎ ব্যবস্থা ঠিক রাখার (setting) মত যবনিকার অন্তরালে লীলানয়ের আবির্ভাব ও লীলার সব ব্যবস্থা যেন ঠিক করা থাকে। তাহলে সে দর্শনের মতে বিশুদ্ধ সত্ত্বের নিত্য ইচ্ছায় তিনি যেমন বারে বারে আসেন তাঁর বিভূতিও সেই সঙ্গে আসে। সৃষ্টির মূলে নিত্যকালের প্রবহমানতার সঙ্গেই সেই ব্যবস্থা তাঁর নিজেরই পরিকল্পনা মত হয়ে রয়েছে। তাই ঘুরে ফিরে জগতে সেই যুগসন্ধি বারবার আসবেই যখন তিনি নিজে অবতীর্ণ হয়ে দিব্যকর্মের সূত্র ধরিয়ে দেন।

বৈষ্ণব বলেছেন "মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান"। যতক্ষণ মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁদের মতে ততক্ষণ কিছু হয় না। অনন্ত জীবন যেমন, তেমন অনন্ত কর্মও। তাঁকে নিয়ে সেই কর্ম তাঁরই সেবা। এই হল ভক্তের নিত্য কর্ম। তাই তাঁর সঙ্গে নৃত্যের উল্লাসে ভাঙা গড়ার মধ্যে ভাঙার কাজও করে চলতে হয়, এইভাবে বুঝতে পারলে তবেই জীবনের সমগ্র দর্শনের চিত্র পাওয়া যায়। উপশমে সবই লয় হয় সেটা ঠিক আর সেটা চাইও, কিন্তু

তা দেবার বা পাবার কর্তা তো তিনিই, আমি নই। যাঁর উপশম, তাঁরই আবার মদরসের খোয়াড়, সেই ভাগাড়ে বসে ভূত প্রেতের ঠ্যাঙানিও আছে। তিনি গড়বেন বলে যখন ভাঙবেন, তা সে যে ভাবেই হক ভাঙাগড়া হবে। এ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যতই সূক্ষ্মের দিকে যাওয়া যাক, তার শেষ নেই। যেমন কায়ব্যূহবাদে বলা হয়ে থাকে অনন্ত সঞ্চিত কর্ম আছে। প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হলে যোগী অসংখ্য কায় পরিগ্রহ করে বিস্তৃত হয়ে সবের মধ্যে ঢুকে ভোগ করলেন তবে শান্তি হল। একটা সান্ত্বনা বা শান্তি তো আনতেই হবে তা যে বাদেই চলা হক না কেন। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু কর্মক্ষয়ের কথা বলেন না। প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হলে জ্ঞানের উদয়ে তো মৃত্যুই সম্ভাবিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্বের (impersonally personal) কথা এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে সম্যক্ জ্ঞানী হয়েই দিব্য কর্মের অনুষ্ঠান করতে হয়। রামানুজ এই প্রসঙ্গে নাকি পরিহাস করে বলেছিলেন তাহলে কি পিণ্ডপাতের দ্বারা বরণে সিদ্ধি হয়? জ্ঞানের পর যে দেহ তা হল অবিদ্যা— এ সব নিয়ে অনেক তর্ক ও বাদানুবাদ আছে। শঙ্করবেদান্তে ভামতী প্রস্থান ও বিবরণ প্রস্থানে এ সব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তির কর্মপিপাসা থেকে না হয় তার প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হল কিন্তু ভগবানের প্রারব্ধ কর্ম কি কোন ব্যক্তির ইচ্ছায় থেমে যাবে, যে ব্যক্তি সংসার-গণ্ডীর মধ্যে থেকে দিনগত পাপক্ষয় করে চলে? সেখানে কেউ যদি মনে করে আমি এটা করব না, তাকে যেন ঘাড় ধরিয়ে সেই কর্ম করানো হল, এমন বহু ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি নিজে পরিচালক হয়ে যেমন যুদ্ধ ঘটিয়ে দিলেন, তেমনি তাঁর ইচ্ছা ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করে সমগ্রভাবে জীবন দর্শন করলে সব যুক্তিই পঙ্গু হয়ে পড়ে। কোনও "বাদ" দিয়েই তাঁর কর্মের নাগাল পাওয়া যায় না। তাঁর ইচ্ছায় যুক্ত হয়ে কর্মকে বুঝে নিতে হবে, এই হল কর্মের সমগ্র দর্শন (integral philosophy)। ত্রয়ী পথে জ্ঞান ভক্তি ও কর্মযোগের মিলনে জ্ঞানে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া (oneness), ভক্তিতে ও প্রেমে তাঁর লীলারস আস্বাদনে ডুবে যাওয়া (fusion & embrace), এ সব উপলব্ধ হলেও শক্তির প্রকাশ চাই কর্মের প্রচণ্ড উল্লাসে। তখন যুক্তি ও ভক্তির সঙ্গে শক্তির মিলন ঘটে, তা না হলে পূর্ণযোগের পথ ঠিক উন্মুক্ত হয়না। তাই ঐ ত্রয়ীকে একসঙ্গে করে সব্যসাচী হয়ে তাঁর কর্ম করে যেতে হবে, তাঁর কর্ম করতে করতে কর্মই হয়ে যেতে হবে—সেটাই হল নিমিত্ত কর্মে যুক্ত থাকা, সম্পূর্ণভাবে তাঁর হয়ে যাওয়া। এই জন্যই তিনি আদেশ দিলেন "মৎকর্মপরমোভব"। তা না হলে তিনি ও আমি একরস হব কেমন করে?

বৃন্দাবনদাস চৈতন্য ভাগবতে বলেছেন যুক্ত না হলে ভগবানকে ভালবাসা যায় না। ভক্তিতে পাটোয়ারী বুদ্ধি থাকলে সে ভক্তি শুদ্ধ হয়না। শ্রীঅরবিন্দ সেই শুদ্ধা ভক্তির প্রসঙ্গেই বলেছেন পূর্ণ জ্ঞান না হলে ভক্তি সিদ্ধ হয় না, আধারে কৃষ্ণপ্রেমের অবতরণ হয়না। শ্রীবাসের আঙিনায় মহাপ্রভু চৈতন্যকে ভাবাবিষ্ট শ্রীবাস বলছেন যে জন্মে জন্মে জীব যে অনন্ত দুঃখ পায়, তা আমি ভোগ করব। ঠাকুর তুমি তাদের সকলকে

মুক্ত কর। এ জীবপ্রেম কি রকম? ভগবান বুদ্ধ বলেছেন সর্বশেষ প্রাণীটির পর্যন্ত নির্বাণ অধিগত না হলে তিনি পরিনির্বাণে যেতে পারেন না। একটি প্রাণীকে মুক্তি দিতে লক্ষ জন্মের বন্ধন স্বীকার করা সে কি রকম জ্ঞান আর সেই হৃদয় আর তার প্রেমই বা কি রকম? এ যুগেও বেদান্ত কেশরী বিবেকানন্দের গর্জন শুনতে পাই—"মুক্তি চাইনে, সর্ব জীবের মুক্তি দে না! মা তুই নেনে আয়!" এই সব শেষে শুনে বুঝি এই সেই পুরুষের প্রেম, পুরুষোত্তমের প্রেম-বীর্য। সে তো শুধু প্রেম-বিলাস আর পূজাগ্রহণ নয়। ধরার ধূলির সঙ্গে কাদা মাটি জেদ মাখামাখি হয়েও মুক্তির পথ খনন করে চলা, সোমপাত্র গঠন করার জন্য সূক্ষ্ম তন্তু বয়ন করে চলা—এই সব হল দিব্যজীবনের ভূমিকায় দিব্য কর্ম—যা শ্রীঅরবিন্দ সর্ব মানবের জন্য করে চলেছেন। Life Divine গ্রন্থে তিনি অসম্ভূতির দিকও দেখিয়েছেন। অসম্ভূতিতে গিয়ে কেউ কেউ আসতে চায় না বা আসেওনা। সে সবই তাঁর ইচ্ছায়। কিন্তু তাঁরই যে সম্ভূতি, তাকে তো অস্বীকার করা যাবে না। এক দিকে ঝুঁকে পড়লে সমগ্র দর্শন খণ্ড হয়ে যায়, কিন্তু সমগ্রে অভিভূত হয়ে খণ্ডকে দেখতে পারলে তার বাষ্টিত্বও বজায় থাকে, অখণ্ডের খণ্ড হয়ে সে শোভা পায়, সে "সৎকর্মপরন" হয়ে যায়। *

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

—শ্রীঅরবিন্দ—

খামারের মেয়ে

(অসমাপ্ত নাটক)

The Maid in the Mill

অথবা

The Maid of the Farm

পাত্রপাত্রী

কিউপিড	
এটি	
ফিলিপ	স্পেনের রাজা
বেলট্রান	সামন্তরাজ
আন্তোনিও	তার পুত্র
বেসিল	তার ভাগ্নে
কনরাড	তরুণ সামন্তরাজ
রনসেভাস	সভাসদ
গুজমান	
খামারপতি	
আচিল্লো	তার পুত্র
জেরোনিমো	ছাত্র
কারলস	ছাত্র
ফ্রায়ার বালতাজার	গুরুমশায়
ইউফ্রোসিন	খামারের মেয়ে
ইসমেনিয়া	কনরাডের ভগ্নী
ব্রিগিদা	তার সম্পর্কিত বোন

অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সালানাক্তা সহরে রাজসভা]

রাজা ফিলিপ, কনরাড, বেলট্রান, রনসেদাস্, গুডমান,
আন্তোনিও, বাজিল, ইসবেলিয়া, ব্রিগিদা, পার্শ্বদবর্গ

রাজা ফিলিপ

সামন্তরাজ বেলট্রান!

বেলট্রান

রাজন্!

রাজা ফিলিপ

পালাটা কি হবে জানতে পারি কি?

বেলট্রান

গোপন কিছু নেই মহারাজ! তবে খেলনাটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিছু নেই, নামটিও স্মরণে আসছে না। আমরা কাস্তিল-বাসী, আদিকাল থেকে লোহা পিটিয়ে তৈরী, আমরা চালাতে চাই সেনাবাহিনী, সাম্রাজ্য—এ সব রেশমী কোমল জিনিস থেকে বহুদূরে আমরা। আমাদের দুঃসাহস নেই, ভেগা আর কালদেরন্ দুজন নাটুকের মধ্যে ওজন কার বেশি মেপে দেখবার—ওদের মত পালা-রচনা করবার। তবে মহারাজ আমাদের সন্তানেরা তাদের রুক্ষ পিতৃপুরুষদের ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছে, তারা প্রায় ফরাসী হয়ে উঠেছে! আন্তোনিও, তোমার কথা বল এখন।

আন্তোনিও

পালাটি হ'ল রাজা পারিসকৃত বিচার আর স্পার্টা-বাসিনী হেলেন-হরণ।

রাজা ফিলিপ

ওটা ত' পুরোনো পালা!

ইসমেনিয়া

আন্তোনিও? স্বয়ং আন্তোনিও? বেচারা পথহারা চোখ দুটি আমার—কোথায় তোমরা ঘুরে মরেছ?

বেলট্রান

আন্তোনিও

যতই পুরানো ততই ত' পালা খোলে বেশি। কারণ পালা কানে শোনা যায় একটিবার মাত্র—মঞ্চের উপরে ঘটনার ধারা ছুটে চলে বেগে, বুঝবার ক্ষমতাটা চলে ধীরে পিছনে পিছনে কষ্ট-চেষ্টা করে। সূক্ষ্ম ইঙ্গিত সব গুলিয়ে দিয়ে আলো-ছায়ার খেলা মিলিয়ে দিয়ে দেখে শুধু মোটামুটি অঙ্গগুলি। তারপর গল্পটা যদি নূতন হয় তবে মনটি পড়ে থাকে ঘটনাগুলির মধ্যে, ভুলে যায় ফুলের সুগন্ধ আঘ্রাণ করতে, মন্থরগামী ছায়াকে তাকিয়ে দেখতে—প্রবাহের সঙ্গে ছুটে চলতে এতই তাড়া তার। কিন্তু গল্পটি যদি জানা থাকে মন পায় অবসর, ছুটতে ছুটতেও সংগ্রহ করে চলে সূক্ষ্ম তুলির টান যেন, চোখে যা পড়ে না—কিন্তু এ জিনিস হারালে সর্ব্বাঙ্গ-সৌন্দর্য্যে খুঁত থেকে যায়। এই রকমেই শিল্পনৈপুণ্য এসে প্রতিভাকে সার্থক করে ধরে। তাছাড়া পুরানো হলে, স্রষ্টাকে পুরানোকে নূতন করে তুলবার কাজে সকল প্রযত্ন নিয়োগ করতে পারে। অন্যটি হ'ল নবোদ্ভাবন, তদ্ভব জিনিষ, যদিও মাধুর্য্যময়। স্রষ্টা হ'লেন তিনি যিনি মহৎ উপাদান মহৎ ভাবে ব্যবহার করেন, অতল প্রাচুর্য্য থেকে তুলে ধরেন সুঘন রূপ—তিনি নন যিনি হাওয়া থেকে মধুর ছায়া শুধু উদ্ভাবন করেন। মাফ করবেন, মহাশয়, আমি আমার সীমা ভুলে গিয়েছিলাম, মহাজনের সান্নিধ্যে কথা বলে গিয়েছি যথাতথা।

রাজা ফিলিপ

সামন্তরাজ বেলট্রান, আপনার ছেলেটির ভবিষ্যৎ আছে বেশ—নম্র চতুর সুন্দর যোগাযোগ, উদার সমালোচক, চিত্তাকর্ষক কথক।

ইসমেনিয়া

তাই ত! তাই ত। আমার হৃদয় ও কেড়ে নিয়েছে আমার বুকের ভিতর থেকে!

ব্রিগিদা

চুপ করবে?

রাজা ফিলিপ

সামন্তরাজ, আমি শুনেছি আপনার জমিজমা নাকি প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দানে সমৃদ্ধ। আমি বোধ হয় কখনও দেখিনি। স্পেনদেশের নাটি প্রতিটি কণা আমার হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে, তাদের সব চোখ দিয়ে না দেখলে তৃপ্তি নেই; কিন্তু আমার বাল্যকাল কেটেছে বিদেশে, আমার জন্মও বিচিত্র বংশে আর অনেক বিপত্তির ভিতর দিয়ে সবেমাত্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, সুতরাং আমি ত' বিশুদ্ধ বিদেশী। এই সুন্দর রাজ্যের উপর দিয়ে আমি ছুটে গিয়েছি ঝড়ের মত, মানুষের মত নয়—কখনও পলাতক কখনও স্বাধিকারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত শুধু সাফল্যের ঘূর্ণিবায়ুর কল্যাণে। তবে আপনি হয় ত' ব্যস্ত ছিলেন আপনার বৃহৎ কাজে সব, এই সামান্য যৎকিঞ্চিতের উপর লক্ষ্য দিতে পারেননি।

বেলট্রাম

আমার ছেলে আমার চেয়ে ভাল উত্তর দিতে পারবে এ কথার, আমি মানছি মহারাজ। আমার কিছু এসে যায় না, এ গাছটা একটা নিমারের মত হোক আর ও গাছটা হোক অজগরের মত। আমি নিজে কখনও পার্থক্য আবিষ্কার করতে পারিনি একটা ক্ষেতের থেকে আর একটি ক্ষেতের—আসল কথাটি ছাড়া, তাদের আকার, সীমানা আর আয়। আর এসব এককালে ছিল পরিমাণে বেশ—এখন কমে গিয়েছে—কিন্তু কার কল্যাণে, তার পুনরুক্তি করে আর আপনাকে বিরক্ত করব না। যদিও হৃদয় আমার বলছে সে কথা অন্তরে অন্তরে।

রাজা ফিলিপ

আন্তোনিও, বল তবে তুমি। কিন্তু আমি শুনতে চাই না পরিপাটি ফরাসী ধরণের বাসাবাড়ি আর সাজান বাগানের কথা, জীবনটি যেন সুসজ্জিত একখানা পাথরের মূর্ত্তি, প্রস্তরীভূত মহিমা। সে-সব বিচারকের দৃষ্টিকে পরিতৃপ্ত করে কিন্তু হৃদয়কে নয়। প্রকৃতিকে যখন অ-প্রকৃতি করা হয়েছে, তার যত আকার ও মাহাত্ম্যের ছন্দ নির্মমভাবে কেটে দেওয়া হয়েছে, হয়ে পড়েছে আড়ষ্ট রেখা শুধু, অতৃপ্ত হৃদয় চায় তখন মুক্তি-প্রসার—তুলনা ক'রে দেখে সে ঊর্দ্ধে বিশাল আকাশের অসীনতা, আর অনুভব করে একটা বেসুর। তোমাদের শিল্পীরা সৌন্দর্য্যকে খাড়া করে মেপে মেপে, ওজন করে দেখে এতখানি চুণ আর এতখানি বালি, রেখা টানে আর-এক রেখার সমান্তরাল টেনে কিন্তু আসল যে বস্তুটি তা তারা হারিয়ে বসে। কুশল কারিগরের কাজ যান্ত্রিক মাপে নিখুঁত কিন্তু তার চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হ'ল অসংস্কৃত সামর্থ্য, রুক্ষ বটে কিন্তু তা প্রাণে গিয়ে স্পর্শ করে।

আন্তোনিও

আমাদের ক্ষেত-খামার হ'ল প্রাণ্য খেলা, খোদাই করা প্রকৃতি নয়।

রাজা ফিলিপ

তার কণ্ঠ তুমি শুনতে পাও? নির্বাক সে, তখন ত' তেমন সুশ্রী নয়!

আন্তোনিও

হ্যাঁ, আমাদের ত' রয়েছে স্রোতস্বিনী, কুলুধ্বনি করে চলেছে নল-খাগড়ার ভিতর দিয়ে, পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে, রয়েছে তার পাশে দেবদারু, তার ডালপাতা ছড়িয়ে যেন এলোচুল, রয়েছে ভুলে-যেও-না ফুল—পাতায় ঢাকা নীলের যাদুখেলা, জাতি-যুথী-কর্নী-মনসা, কাঁটাঝোপ, মধুময় জংলী মাঠ—তারপর দেখতে দেখতে শ্রান্ত হয়ে পড়ি যখন কি রকমে মধুভার পীড়িত মৌমাছি একটিমাত্র ফুলের আশে পাশে গুণগুণ করে তন্ময় হয়ে গিয়েছে তখন ফিরে তাকিয়ে দেখতে পাই শুনতে পাই দুপুরের পাখীর ঝাঁকের গুঞ্জন। প্রত্যেকেই তারা আপন আপন বুকভরা গানে নিমগ্ন, আবার সকলে মিলে থেকে থেকে তুলে ধরেছে সমবেত মধুর সুর-সঙ্গত।

রাজা ফিলিপ

তোমাদের ওখানে অনেক গাছপালা?

আন্তোনিও

সারি সারি বীথিকা, সবুজের সভা, আবার পৃথক পৃথক এক একটি বিরাট মহীরুহ ঝুঁকে রয়েছে পরস্পরের দিকে, মিলতে মিশতে যেন ইচ্ছুক। কতকগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে, আর কতগুলি শুধু যেন সবজ জংলী।

ইসমেনিয়া

বিষের কি শুনতে এমন মধুর? শত্রুর কণ্ঠ কি শ্রবণে দেবতার আহ্বান এনে দেয়? বোন ব্রিগিদা?

ব্রিগিদা

চুপ, বোকা মেয়ে। আমরা ভয়ানক কাছে এসে পড়েছি, কেউ তোকে দেখে ফেলবে।

ইসমেনিয়া

কি হ'ল তাতে? বোন, দেখলেই বা ক্ষতি কি? সকলেই মধুর সঙ্গীত শুনে প্রশংসা করতে পারে, দোষ দেবে না কেউ।

ব্রিগিদা

জিভটা সংযত করুন মহাশয়া, নইলে চললাম আমি।

রাজা ফিলিপ

আমার কিন্তু তুমি দুঃখের মধ্যে ফেলেছ। রাজসভায় এই মলিন ছবি সম্পূর্ণ আর এক রকমের। এই সব দেওয়াল স্বচ্ছন্দ নিঃশ্বাসকে চারদিক থেকে বন্ধ করে রেখেছে। ভগবান তাঁর ঐশ্বর্য্য ঐ সুদূর উদ্ভ্রান্ত পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে জিইয়ে রাখেননি এখানে এ রকমে বিকৃত করে ধরবার জন্যে। প্রথম পাপ এল মানুষ যখন হাতে পাথরের উপর পাথর পুঞ্জীভূত করে তুলল। গুহ্যমান, তুমি ত' বিজ্ঞ, সুধীর বিচারক, বল ত' আমাদের জন্যে ভগবান যে বাতাস মুক্ত করে রেখেছেন তার মধ্যে জীবনযাপন করা কি শ্রেয় নয়— পৃথিবীর অবাধ মহিমার কোলে কৃষক হয়ে থাকতে তাকে অনুভব করতে, বুদ্ধিতে তাকে না জেনে কৃষকেরই মত জীবনদাতা শীতল স্রোতস্বিনী থেকে পান করতে— দ্রাক্ষার কটু ফেনায়িত উন্মত্ততার জন্য উৎকণ্ঠ না হয়ে, আয়াসলব্ধ মাংসের গুরুতার আস্বাদের মনোহারিতার পরিবর্ত্তে কালো রুটি কি ভুট্টা কি শুধু সামান্য সাধারণ স্বাস্থ্যকর শস্যের দানা কি যথেষ্ট নয়? তুমি মনে কর না কি, এই রকমের জীবন অপরূপ সূর্য্যালোকে পরিস্নাত, বলিষ্ঠ পৃথিবীর স্তন্যে সাক্ষাৎ পুষ্ট ও পালিত এই প্রাণময়ী মহিমাময়ী জননীর অন্তরঙ্গ স্পর্শে তাঁর বলপ্রদ সেবাকর্ম্মে তৈরী করে তোলে এক মহত্তর গোষ্ঠি রাজসভার পরিপুষ্ট গোষ্ঠির চেয়ে? আমরা কিন্তু শিশুদের মত দূরে সরে পড়েছি জননীর বুকের অমৃতময় ধারা হতে, সূর্য্যালোক থেকে আমরা বঞ্চিত, বঞ্চিত বাতাসের বর্ষার সোল্লাস অভিবাদন থেকে। আমরা গড়ে উঠেছি একটা উচ্চতর নম্যাৎ রূপে, নতুন মানুষ যেন, পৃথিবীতে স্থান নেই তাদের, বুদ্ধিতে এত নির্জীব, স্বর্গেও তাদের অধিকার নেই, এত কলুষিত তারা।

গুজমান্

আমি ঠিক তা মনে করি না, মহারাজ!

রাজা ফিলিপ

ঠিক তা নয়, গুজমান? রাজার থেকে চাষী কি সুখী নয় বেশি? চাষীর ঘুম পরিশ্রম সুফল নিয়ে আসে, তার ঘুম নির্বিঘ্ন শিশুর মত। উৎসবের প্রাচুর্য্য তাকে ঘিরে ধরে না রাজাকে যেমন করে ধরে, রাজা মানুষ হিসাবে নিজেকে বোধ করতে পারেনা। চাষীর আছে বন্ধুজন, তার সমকক্ষ সাথী সব, যৌবনে সে বিবাহ করে বাল্যের সহচরী হিসাবে যাকে সে ভালবেসেছিল, সেই প্রিয় সহধর্ম্মিনীর কল্যাণে সে লাভ করে বলিষ্ঠ

সন্তান সব, ক্রমে তার কোলে উঠে বসে পৌত্র-পৌত্রী সব সুখী প্রশান্ত বার্দ্ধক্যে। মানুষের সত্যকার জীবন সে যাপন করেছে, জীবনের কর্ত্তব্য উদ্‌যাপন করে সে চলে যায় মৃত্যু পার হয়ে, একটা দুয়ার পার হয়ে যেন, কোন প্রশ্নই না তুলে।

গুজমান

জীবমাত্রই আপন কর্ম্ম করে চলতে চলতে কামনা করে আর এক জনের কর্ম্ম। মনে করে নিজের ভাগ্য তার গুরুভার, জগতে একমাত্র তার। প্রত্যেকেই তার আপন প্রত্যয়ের মধ্যে সীমিত। আর সকলের প্রত্যয় তার কাছে অস্পষ্ট দূরের ছায়া, কোন কায়া নেই, ডুবে গিয়েছে কপোল-কল্পনার দূরগ্রাহিতার প্রসারে। তার অন্তহীন বার্ত্তা নিয়ে, শূন্যের ভিতর দিয়ে পৃথিবী ঘুরে চলেছে অন্ধ আর্ত্ত গোলক একটি, জানে না সে শুক্রগ্রহের দুঃখ, তার দিকে দৃষ্টিপাত করে ঈর্ষাভরে, বলে ওঠে এদের আছে আলো, এদের আছে সৌন্দর্য, কেবল আমিই শুধু অন্ধকার, আমিই শুধু অস্তিহারা।" মাটি জীবনের জন্য পরম আগ্রহে ধীরে এগিয়ে চলে সাগরের দিকে, সাগর আবার চলতে চলতে শ্রান্ত হয়ে একান্ত উৎসুক হয়ে ওঠে প্রশান্ত পৃথিবীর দিকে ফিরে যেতে। কিন্তু সত্যসত্যই তাই যদি করা হত যেমন প্রত্যেকে চায় তাহ'লে প্রত্যেকের আবার পশ্চাদাপ হ'ত, বিরোধ করত তাকে যে এ-পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে। মাটি দেখত হারিয়ে গিয়েছে তার ফুলরাশি তার তৃণদল তার পাখীর ঝাঁক, সাগর কামনা করত তার প্রবালের জন্যে তার গুহার জন্যে। কারণ, যিনি শ্রমকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন তিনি সেইসঙ্গে দিয়েছেন সামর্থ্য। সামর্থ্যই অস্তিত্বের অন্তরঙ্গ, তাকে হারানো অর্থ মৃত্যু। সামর্থ্যের বাহ্যরূপই হ'ল শ্রম। শুধু তাই নয়, শ্রম নিজেই নিজের জন্য সৃষ্টি করে শক্তি, শ্রমের অভাবেই আসে দুরবস্থা। শ্রমিক কায়িক ক্ষেত্রে ভগবৎ স্বরূপ, অন্তরে সে শূন্য তবুও আপন সীমানার মধ্যে সে হয়েছে ধন্য। কিন্তু নগরের শিক্ষিত সন্তান তাকিয়ে দেখে যদি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে, ঘোষণা করে, "আমি যদি আমার জীবনে সহজ হই, আদিম হই ঐ লোকটির মত তবে কত সুখীই না হব!" যদি সত্যসত্যই এরকম আবেষ্টনে তাকে আবদ্ধ করে রাখা যায় তবে তার প্রকৃতি অবস্থার এই লৌহ-পিঞ্জরের বিরুদ্ধে মাথা কুটবে, পাগল হয়ে উঠবে প্রায়, বৃহত্তর ক্ষেত্রের জন্যে। প্রকৃতির অদল-বদল হয় না পরস্পরের মধ্যে, প্রত্যেকে তার নিজের মধ্যে আবদ্ধ, পৃথিবী তাদের এ রকম করে গড়েছে, পৃথিবী পশুবৎ অথচ দয়াময়ী জননী, হাতড়ে সে চলেছে মনের খোঁজে। সে তার তেজস্বী প্রকৃতির কল্যাণে উৎপাদন করেছে তার সন্তানদের, প্রাণসমৃদ্ধ করেছে তাদের আপন স্তন্য দিয়ে, আপন ধমনীর উচ্ছ্বসিত প্রবাহ দিয়ে অথবা বিহঙ্গের মত করে তাদের নিজের কাছ থেকে ছুঁড়ে দিয়েছে আকাশের পথে। আবার এমন জীবসব আছে যারা বীর্য্যধর পশু-প্রকৃতির মধ্যে দৃঢ়মূল, পূর্ণ পার্থিব-ধর্ম্মী তবুও তারা শূন্যের দিকে আপনাকে ছড়িয়ে দেয়, উঠে যায় আকাশের কোলে। তবে এদের সংখ্যা বিরল, কোন বিশিষ্ট অধিকার সম্পন্ন দেশের অধিবাসী নয়, নয় কোন নগরের বা ক্ষেত্রাঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। হলচালনা করলেও

তারা রয়ে যায় তবু বিদ্ধ, যেন গাঢ়প্রকৃতি, মাটি থেকে সামর্থ্য আহরণ করেও তাকে শিক্ষিত সংযত করে ধরে, আপন আন্তরসত্তাকে দেয় এক বিপুলতর প্রতিষ্ঠা। মানুষ শক্তিমান "আন্তেয়াস" দৈত্যের মত; তাদের স্থির আসন হ'ল জন্মক্ষেত্র ও পৃথিবী—তাকে ছেড়ে উঠে গিয়েছে যেসব মহত্তর মানবসন্তান তারা মৃত্যু কবলিত হয়েছে, তাদের মস্তিষ্কের মাহাত্ম্য নিয়ে। সুতরাং মাটির আকর্ষণ যারা আর যারা সহরের কলম-গাছ্ প্রত্যেকেই রাখে যেন আপন আপন স্বাবস্থা অথবা উর্দ্ধায়িত হয়ে কি পুনরুজ্জীবিত হয়ে, যদি সম্ভব হয়—প্রত্যেকেরই আপন আপন পৃথক ধারায় চলে প্রাণ দিয়ে শক্তি দিয়ে। একপক্ষ যেন অসংস্কৃত ঈর্ষার বশীভূত না হয়, আর একজন যেন মিথ্যাকল্পনার বশে একটা একান্ত অস্বাভাবিক প্রত্যাবর্ত্তনকে এ ভ্রান্তিকর নামে অভিহিত না করে যে তা হ'ল প্রকৃতির কোলে পুনঃস্থিতি।

রাজা ফিলিপ

নিশ্চয় তোমার বিচার, গুরুমান! ভগবান আর তাঁর পার্শ্বদেরা আমাদের যেস্থানে স্থাপন করে দিয়েছেন সেখানে বসে হতাশ করা উচিত হবে না আমাদের। যা হোক তবুও প্রাণের চাওয়া আমি উপভোগ করতে চাই আমার রাজপদবী স্মরণে না রেখে। তাই আমি আগামীকাল বের হয়ে যাব একজন সাধারণভাবে গণ্যমান্য নাগরিকমাত্র হয়ে। আপনারা সকলে ভুলে যাবেন একদিনের জন্য যে আমি রাজা, আমার হাবভাবের উপর দৃষ্টিপাত করবেন না। কিংবা আমার হুকুমের জন্য উৎসুক নেত্রে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, মানমর্য্যাদা দেখিয়ে ভুল ভেঙ্গে দেবেন না—সমানে সমানে যে আদব-কায়দা তাই রেখে চলবেন।

প্রধান ব্যবস্থাপক

কিন্তু মহারাজ—

রাজা ফিলিপ

কি বলছেন মহাশয়, আপনার সনাতন বিস্মৃতা—

স্পেনদেশের রাজারা—

রাজা ফিলিপ

নিরঙ্কুশ, বলবেন ত—তা কেবল প্রজাদের সম্বন্ধে। রাজারা রীতি-নীতির দাস। আমি কিন্তু তোমাদের এই বাসি অনুষ্ঠানগুলির শাসন মেনে চলব না; রাজারা ত দাস এক উদ্ধত অনাত্যসভার কাছে, তাদের উপর আমার দখল থাকবে, যখন খুশি পোশাকের মত গায়ে

তুলে নেব, যখন খুশি চলব খুলে ফেলে দিয়ে। যাক্, আপনি আপনার আপত্তি জানিয়ে যথেষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছেন। আপনার বক্তব্য আমি শুনেছি। এখন তবে আপনারা শুনুন, সামন্তরাজ সকলে।

সামন্ত রাজবৃন্দ

মহারাজের যেমন আদেশ।

রাজা ফিলিপ

আন্তোনিও বলে যাও তবে, পালা অভিনয় করবে কারা?

বেলট্রান

সে কথা আমি বলতে পারি মহারাজ। গ্রামা মেয়েরা, মাটির কন্যারা। মাঠের হাওয়া তাদের গালে ফুটিয়ে তুলেছে রক্তিম স্বাস্থ্য। আমাদের স্পেনদেশের সর্য্যালোক তারা, কণ্ঠে তাদের আসীন কিন্নরী, তাদের কাছে আমাদের মহিলারা লজ্জায় মুখ লুকোবেন। এক খামার অধিকারীর আছে সুন্দরী মেয়ে, অপরূপ সে, ভাল পোশাক পরিয়ে দিলে, তাকে পরানো হবে পোশাক—সারা স্পেনদেশে কোন মেয়েই তার পাশে দাঁড়াতে পারবে না, দাঁড়িয়ে সুখী হতে পারবে না। আমার ছেলেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে কথায় গানে প্রসাধনে সুরূপণের সহায়ে তাদের রাজানুগত্য প্রকাশ করতে।

রাজা ফিলিপ

নিজেকে আমি ধন্য মনে করি তাদের এই সহৃদয় প্রযত্নের জন্যে। তবুও বলতে হয় বন্ধুবর, এইসব সালঙ্কার অভিনয় ছাড়াও মহত্তর বস্তু আছে। অবশ্য আমি এদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিনা, মনে করবে না আমি এতখানি শালীনতাবর্জিত—যেখানে খাঁটি হৃদয় ব্যক্ত করে ধরেছে তাদের প্রাচুর্য্যপূর্ণ নীরবতা সেখানে আমি কিছু ছোট করে ধরতে চাই না, তবুও আমার একটি আকাঙ্ক্ষা আছে যার বিনিময়ে আমি শত অভিনয়-উৎসবও চাই না। জিনিষটি মহান, সামান্য একটি কথা সনগ্রভাবে তাকে দান করতে পারে কিন্তু আমার আশঙ্কা তোমার পক্ষে তা অতি কঠিন।

বেলট্রান

মহারাজা, আপনি জানেন, আমি আপনার সেবাদাস, আমার আনুগত্যে কখনও সন্দেহ করবেন না। দান করুন কি জিনিস, আপনার তা গ্রহণ করবার অপেক্ষা শুধু। আর নয়, আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন।

রাজা ফিলিপ

সে কি আর বন্ধুবর—মহানুভব মৈত্রী ছাড়া—নতুন সখা, দুটি বিপক্ষ বীরবংশের মধ্যে, একটা মহনীয় মধ্যস্থতার কল্যাণে দুটি উদার হৃদয়ের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ নির্বাসিত—এ রকম নান্দী অভিনয় হ'ল শ্রেষ্ঠ মহোৎসব। এই ধরণের সমুজ্জ্বল রত্নরাজই প্রজারা উপহার দেবে তাদের রাজাদের কাছে। তুমি কনরাড, তুমি উদার-হৃদয় বেলট্রান যে বেষ তোমাদের দুজনের গরিমাকে পৃথক করে রেখেছে তাকে আমি সম্মান দেই। তবুও সহৃদয়তার উপর রয়েছে ভগবানের আশীর্বাদ আর তাই হ'ল পরম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মভাব। এ দুর্বলতা শ্রেয়কর, স্বীকার করে নাও একে। হৃদয়দুয়ার তোমাদের খুলে দাও উন্মুক্ত করে, যে শান্তি আসতে চাইছে তাকে আসতে দাও; জগৎ বর্জন করেছে ক্রোধ-রিপু, তার ভস্মাবশেষ তোমাদের দুজনার মধ্যে যেন আর লুকিয়ে থাকতে না থাকে, দুঃখ-শোকের দিন গত হয়েছে, তাদের আর জিইয়ে রেখ না। কনরাড্, তুমি কি আমার কথায় অস্বীকার করবে? তুমি যে কতবার আমার জন্য তোমার জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে গিয়েছ!

কনরাড

মহারাজ, যে বিদ্বেষ কোনদিন আমি পোষণ করিনি তাকে আমার পরিত্যাগ করব কি রকমে? অপরের হৃদয়-বৃত্তি প্রভাব বশে আমি কোনদিন জীবন-যাপন করিনি; আমার নিজের আপন ভাগ্য গড়েছে যে ঋজুপথ তাতেই আমি এগিয়ে চলেছি। যে ভালবাসে বাসুক, যে বিদ্বেষ করে করুক, উভয়কেই আমি গ্রহণ করি প্রশান্ত লঘুতার চিত্তে। আমার প্রেমাস্পদকে বন্ধু হিসাবে আলিঙ্গন করি, শত্রুকেও আলিঙ্গনবদ্ধ করি মল্লযোদ্ধার মত। আমার সংকল্প অনুসারে কাজ করে চলি কারণ তা হ'ল আমার আপন সংকল্প, আমি যেখানেই যাই, সেইখানেই যাই, কারণ তাই হ'ল আমার আপন পথ। কেউ যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে তা হ'ল তারই ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা নয়, ফলে সে যদি দুঃখ পায় তবে এও তারই ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা নয়, আমি আমার নিজের ধ্রুবতারা, সে মানুষকে আমি শাপ দিই না এজন্যে। আমার ভাগ্য তার ভাগ্যগড়ার ঊর্দ্ধে, ঠিক যেমন আমার অন্তঃপুরুষও তার প্রেম ও প্রীতির বাইরে। কোন মানুষকে আমি বিদ্বেষ করি না আর সানন্তরাজ বেলট্রান যদি তাঁর হাত প্রসারিত করে দেন আমার দিকে সানন্দে নিশ্চয়ই আমি গ্রহণ করব দৃঢ়মুষ্টিতে, ভুলে যাব প্রাচীন আঘাত প্রাচীন ক্ষত, তারা ত বহুদিন নিরাময় হয়ে গিয়েছে।

বেলট্রান

বন্ধুবর কনরাড, আপনি অতি মহৎ, অতি উদার। কে এখন বলতে পারে দুষ্কৃতিকারী ক্ষমা করতে জানে না। কনরাড আমার আত্মীয় স্বজনকে হৃতসর্ব্বস্ব করেছে, আমার প্রজাদের হত্যা করেছে, আমার প্রাচীন জায়গা-জমি থেকে আমায় বঞ্চিত করেছে, আমার বিপুল সংসারকে বিশীর্ণ করেছে। ঠিকই, বেলট্রান ক্ষমা লাভ করল। তবে কি

আপনি এখন আপনার উদার প্রকৃতিকে আরও উদার করে ধরবেন না, আমার আরও ক্ষতি সাধন করবেন না, আরও নূতন বিশালতর ক্ষেত্র করায়ত্ত করবেন না, আপনার ক্ষমাপূর্ণ হৃদয়ের পরিশীলনের জন্যে? আপনার বন্ধুত্বের জন্যে আমাকে আরও দুর্ভাগ্য বরণ করতে হবে, আরও ক্ষতি সব।

রাজা ফিলিপ

যথেষ্ট, আর নয়!

বেলট্রান

ক্ষমা করবেন, মহারাজ, এতখানি গাঢ় খ্রীষ্টীয়তার জন্য আমার প্রশস্তি ত' সামান্যই হয়েছে। সামন্তরাজ কনরাড্, আপনাকে আর বিরক্ত করব না। হয়ত' সাধুসন্তদের আর ভগবৎ-জননীর কৃপায় আমিও আমার মধ্যে একটু ভাবগা করতে পারি ক্ষমার আসনের জন্য।

কনরাড

আপনাকে আমি ভয় করি না, সামন্তরাজ বেলট্রান। আমাদের তরবারি আঘাত হেনেছে পরস্পরে—আমারটি শক্তিমান প্রমাণিত হয়েছে। আমি যা অধিকার করেছি তা করেছি শস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে। তেমনি আমার উপর আপনার জয় হ'ত যদি আপনি সৌভাগ্যের স্বপক্ষে দাঁড়াতেন, তাকে আপনার অনুগত করে রাখতেন আপনার তরবারির কল্যাণে, আপনার শ্লেষবাক্যে কোন ধার নেই যতদিন না আমার কাছে থেকে সে ভাগ্যকে কেটে ফেলে দিতে পারেন।

রাজা ফিলিপ

নিরর্থক কথা সব! আর না, যথেষ্ট! সামন্তরাজ কনরাড, ভোরের সঙ্গে আপনিও ফিরছেন নিজের ঘরে?

কনরাড

মহারাজ, আপনার অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছি, আমার ভগ্নীরাও আমার সঙ্গে যাবে।

রাজা ফিলিপ

মহারাণী কিন্তু তাঁর প্রিয়জনকে ছাড়তে চাইবেন না। তবে আপনাকেও নিরাশ করতে আরও বেশি অনিচ্ছুক হবে না আপনারা আসুন তবে আমার সঙ্গে। আপনিও সামন্তরাজ বেলট্রান—

(রাজা, বেলট্রান, ওজনান এবং পার্শ্বদদের প্রস্থান)

রণসেদাস

শুনছেন একটি কথা।

কনরাড

যতগুলি চাও বলতে পার রণসেদাস।

রণসেদাস

শুনুন, (কানে কানে) সানতুরাজ, আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু চিরকাল রয়েছি

কনরাড

তাই ত' ছিলে তুমি চিরকাল।

(রণসেদাস নিষ্ক্রান্ত)

ভগ্নি, আদরের বোনটি, আমি ঘরে ফিরে চলেছি একটা জরুরী কাজের জন্যে, আমার উপস্থিত থাকা দরকার। ডন মারিও আর তাঁর স্ত্রী তোমাকে নিয়ে যাবেন সেখানে। যাচ্ছ ত' না আমাকে থেকে যেতে হবে তোমার জন্যে ?

ইসবেনিয়া

ভাইটি, তুমি যা কর তাতেই আমি খুশী তবুও তোমার আশীর্বাদ সর্ব্বদাই চাই।

কনরাড

তুমি সুখী হও, আমি যতখানি চাই তার চেয়েও অনেক বেশি।

ইসবেনিয়া

নিশ্চয় তা হতে হবে, না হ'লে আমি অসুখী রয়ে যাব।

ব্রিগিদা

কি কাজ করবে লোকটা এখন, মেয়ে-চুরি ছাড়া আর কি করতে পারে ? চল বোন, চল যাই !

ইসবেনিয়া

দাঁড়াও একটু, ওদের পিছনে এত কাছে কাছে না যাওয়াই ভাল।

ব্রিগিদা

শালীনতা? তা বেশ। মাফ কর, আমি অন্ধ ছিলাম।

বাজিল

তুমি প্রেমিক না মেষশিশু? আন্তোনিও, কথা বল না, এখনও ও ইতস্তত: করছে।

আন্তোনিও

বলব?

বাজিল

ভেগে পড় বাপু তবে এখান থেকে! আর ওর দেখা পাবে না। আমার ধৈর্য্য ফুরিয়ে গেছে।

ব্রিগিদা

বোন, বুঝেছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার পা ধরে গিয়েছে। ব'স একটু। আর তাতেও যদি শ্রান্তি এসে যায় তবুও ধৈর্য্য ধরে থাকলে—ধৈর্য্য শক্তিময় গুণ এক, তাহ'লে তোমার পুরস্কার স্বরূপ নুকও বাচাল হয়ে উঠতে পারে।

ইসমেনিয়া

কি তবে করি বল ত, বোন?

ব্রিগিদা

কেন? প্রথমে তুমিই কথা বল, কনস্তান্ত-ভগ্নী, তুমি হও মহম্মদ আর ও হবে বেচারা পাহাড়। তোমার। বাবা:! আমার ত' মনে হয় মহম্মদের পাহাড়ই হবে দুয়ের মধ্যে বেশি চলমান, একটা ভূমিকম্পও দেখছি একে টলায় না। লোকটার হয়েছে কি? নিশ্চয় ও বাজি রেখেছে একটা ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে।

ইসমেনিয়া

ব্রিগিদা, তুমি কি পাগল হয়েছ? এতখানি নির্লজ্জ হতে হবে? একে অপরিচিত, তারপর আমার বংশের শত্রু।

ব্রিগিদা

না, নিশ্চয়, কখনও কথা বলবে না, বটেই'। পরম নির্লজ্জের মত।

ইসমেনিয়া

তামাশা করছ তুমি ব্রিগিদা, আমি এমনি তরল যে আমাকে বোবা হয়ে থাকতে হবে পাছে কথা বললে লোকে আমার ভুল বোঝে? দুর্বল মানুষে অথবা যে মানুষেরা নিজের শুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দিহান তারা তাদের প্রত্যেক কথা প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গির উপর কড়া পাহারা দিয়ে থাকে যেন। আমি কেন নিজেকে হীন করে এমন বেঁধে রাখব নিজেকে চারদিকে। অভিবাদন যদি জানাই কয়েকটি মাত্র কথায় গম্ভীর নির্লিপ্ত-ভাবে, এই এমন ভালমানুষ তরুণটির সঙ্গে, যেমন বলা উচিত। তাকে তুমি নির্লজ্জতা নাম দিচ্ছ কেন?

ব্রিগিদা

না, নিশ্চয় কথা বলবে না।

ইসমেনিয়া

নিশ্চয় নয় কেন? নিশ্চয় আমি বলব।

ব্রিগিদা

শোন বাছা আমার কথা! কখ্খনো বলবে না, কখ্খনো বলবে না।

ইসমেনিয়া

আমি ত' বলবই! আমি যে চাই সেজন্য নয় (চাইতে যাব কেন?), তুমি যে আমাকে কেবল উত্যক্ত কর তোমার সব ফাঁকা সাধুত্ব নিয়ে সেইজন্যে।

ব্রিগিদা

বেশ, বেশ। তুমি ত' তাই চেয়েছ এই আধঘণ্টা ধরে। আর এখন নাকি তোমাকে জোর করে কাজটা করান হয়েছে। যাও, যাও, ঝাঁপিয়ে পড় গিয়ে; আমি এই রইলাম দাঁড়িয়ে তবু হিসাবে।

ইসমেনিয়া

পারা যায় না তোমাকে নিয়ে—না, না, ওভাবে তুমি আমাকে পাগিয়ে রাখতে পারবে না।

ব্রিগিদা

ও কথা ত' আমি বলতে চাই নি।

ইসমেনিয়া

মহাশয়!

বাজিল

তাড়াতাড়ি তোমার আন্তোনিও, তোমার মনুষ্যত্বকে ফিরিয়ে নিয়ে এস, তা না হ'লে চিরকালের জন্য তোমার লজ্জা আর ঘুচবে না।

ইসমেনিয়া

ব্রিগিদা, এস না, সাহায্য কর আমায়।

ব্রিগিদা

পারব না আমি বাপু।

ইসমেনিয়া

মহাশয়, আপনি যে কথা বললেন, স্বর্গের বাণী যেন। মহাশয়, আমি বলছি এ কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য নয় যে আমাদের ইতিপূর্বে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, যেহেতু আপনার স্মরণে রাখবার সম্ভাবনা নেই—না, আমি বলছি এইজন্যে যে আপনি বা আর যে কেউ হোক না, আমার সম্বন্ধে যেন এই ধারণা না করে যে আপনি যখন আন্তোনিও এবং আমার শত্রু এবং অনেক কিছু ভিনিষ আমায় আঘাত করেছে হৃদয়ের মধ্যে গিয়ে, সুতরাং কেউ যদি সৎ কথা বলে বা সৎকাজ করে তবে আমি তার প্রশংসা করতে পারি না, বা গুণগ্রাহী হতে পারি না—সে পাত্র যে কেউ হোক না। আমি এই বলতে চেয়েছিলাম। আমার সম্বন্ধে এ কথাটি যে কেউ জানবে না তা আমি মেনে নিতে পারিনি, তাই আমি মুখ খুলেছি।

বাজিল

বল না কথা একটু, না হয় থাক চিরকাল বোবা হয়ে।

ইসমেনিয়া

বুঝেছি, কেন আমি মুখ খুলেছি তার ভুল অর্থ নিয়েছেন আপনি, আমাকে ঘৃণা করছেন তাই। মহাশয়, আপনি হয় ত ঠিকই ভেবেছেন, আপনার কণ্ঠ এমন মধুর যে পাখীরা অবধি গাছের ডাল থেকে ছুটে আসবে মুগ্ধ হয়ে, শত্রুরা অবধি মোহিত হয়ে যাবে—আর এমন হতভাগিনীও কেউ থাকতে পারে যার হৃৎপিণ্ড মায়াবলে

কেড়ে নিয়ে যাবে—অবশ্য এমন তুচ্ছ জিনিষের জন্য আপনার কিছুমাত্র যদি লোভ থাকে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখবার জন্যে—হারিয়ে গিয়েছে, হারিয়ে গিয়েছে, হায়, হায়, ব্রিগিদা, ব্রিগিদা—

বাজিল

কি বোকা! চুপ কেন? মুখ খোল না, দেখছ না মেয়েটা খ' হয়ে গিয়েছে। বল, বল, কথা, ভেড়ারও অধম তুমি।

ইসমেনিয়া

কথাটা তাই বটে! কিন্তু অন্যায় হবে যদি আপনি মনে করেন আমি ঐ ধরণের মেয়ে, একান্ত অন্যায় হবে, আন্তোনিও। আপনি মনে করেন আপনার মুখের একটি কথার অপেক্ষায় রয়েছি, আপনাকে ভালবাসা জানাবার জন্যে আপনার মুখের একটি মাত্র কথায় আপনার অনুগত দাস হয়ে থাকবার জন্যে, একটি মাত্র কথা, আর আমি আপনারই—

বাজিল

কি চমৎকার বক্তিমাটি! হা ভগবান, এ কথা শুনেও তুমি চুপ করে রয়েছ!

ইসমেনিয়া

আপনি তবে আমাকে ঘৃণাই করেন। তবুও আমাকে কিন্তু রাগাতে পারবেন না! আপনি মনে করেন কি, যেহেতু আপনি জানেন আমি হলাম সামন্তরাজ কনরাডের ভগ্নী আর আমি এখন রয়েছি যার সঙ্গে তাঁর নাম তারা সান্তা ক্রুজ, আর রাস্তার নাম ভেলাসকুয়েজ, আপনি দেখেছেনও বাড়িটার সামনেটা মার্বেল পাথরের আর রয়েছে ঝুলন বারান্দাওয়ালা জানালাসব, সন্ধ্যানুষ্ঠানের পরে আপনার প্রয়োজন হবে শুধু সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে রাস্তা সব শূন্য যখন আর আমি অমনি পাঠিয়ে দেব কাউকে আপনার কাছে? নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয় নয়, আমি চাই না, আপনি আমাকে সামান্যা মেয়ে বলে বুঝবেন। আপনি যদি সত্যসত্যই মহানুভব আর আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করেন তবে খুব সাবধানে মেনে চলবেন আমার নিষেধাজ্ঞার মর্ম্ম। ব্রিগিদা!

ব্রিগিদা

এস চলে—রেখে দাও তোমার দুটি কথা আর হিমশীতল গম্ভীর বাক্যকটি। তা দিয়ে তুমি ভদ্রলোকের মুখের বাকা জমিয়ে দিয়েছ।

আন্তোনিও

ভগবান সেই মেয়ে ত! তার নিজের মুখের কথা, স্বপ্ন ত' নয়! আর আমি কি না বোবা হয়ে গেলাম! তার রসলাস্যের মধ্যেও ছিল একটা গরিমা, আর সব চেয়ে বেশি যখন সে হাসত, জাগিয়ে দিত এমন শিহরণ, আমার বুক এমন কেঁপে উঠত যে মুখে আমার কথা ফুটতে পারেনি। হায়, আমি বোবা হয়ে গেলাম, লজ্জায় এতখানি মরে গেলাম যখন কিনা আর একটি পা বাড়িয়ে দিলেই আমার হাতের মুঠির মধ্যে পেয়ে যেতাম স্বর্গ।

বাজিল

আন্তোনিও!

আন্তোনিও

না! আমার ত' ভুল হয়নি। দেখলাম লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, গালের উপরে ছড়িয়ে পড়ল অপরূপ আবীরগোলা তার বুকের মধ্যে থেকে উৎসারিত হয়ে যেন অফুরন্ত মহাসাগর,—এমন গোলাপী রং, তার লালিমায় হারিয়ে দেয় গোলাপকেও। সত্যিই ত' প্রত্যেকটি কথা তার কপোলের শুভ্রতায় উপরে এমন মহিমময় বৈষম্য তুলে ধরল যে সেখানে দেখা দিল সৌন্দর্যের অসম্ভব নব নব উন্মেষ, সরমে বঙ্কিম মুখ তার তবুও যেন সেই মধুর দুর্বলতার লজ্জায় ক্রোধভরে সপ্রতিভভাবে সে তার ছোট বাঁপাটি সান্ত্রাজীর মত তুলে ধরল কিন্তু বৃথা চেষ্টা তার এই মধুর নয়ন-পল্লবদুটিকে সাহসে ভরে দিতে, কিন্তু তারা কাঁপতে কাঁপতে ক্রমে নিমীলিত হয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ল। হায়, একটিবারের জন্যে যদি, যদি আমার জিহ্বা আমার চোখ দুটির মত সাহসী হয়ে উঠত, কিন্তু ও-দুটি ত' তার সঙ্গে রজ্জু দিয়ে যেন আবদ্ধ ছিল, সাহস তাদের হয়েছিল নির্মম প্রয়োজন।

বাজিল

আহা, বেচারা আন্তোনিও! তুমি মস্তপ্রস্ত হয়েছ, তোমার অঙ্গসবই হারিয়েছ আন্তোনিও! যে তোমাকে এমন করেছে তাকে কাঁদিয়ে ছাড়লে তবে ত! একটা ইন্দ্রিয় হতে চিরকাল বঞ্চিত হবে এখন। এতদিন জিহ্বা ছিল না, তা ফিরে এসেছে, কিন্তু শ্রবণশক্তি দুটি নিয়েছে। শুনছ আন্তোনিও! এখানে আর দাঁড়িয়ে কেন?

আন্তোনিও

আমি স্বপ্ন দেখছি, যেখানে নিয়ে যাও সেখানেই চলব আমি, সারা জগতে আর কোন স্থান নেই, এক আছে সে আর নয়· শুধু নীরবতা।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা

পবিত্র

সোমবার ১ মার্চ ১৯২৬

প্রশ্ন গত সপ্তাহের মধ্যে আমার উন্নতি বিশেষ হয়নি। নিজের কারাগার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারিনি, মনকে বশে আনতে পারিনি। দুটি আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া আমি পরে পরে ক'রে থাকি : প্রথম, মনকে যথাসম্ভব শান্ত রেখে ও একটা উচ্চতর অনুভূতির দিকে উন্মীলিত হয়ে অতিমানস সত্যকে উপলব্ধির প্রয়াস করা। দ্বিতীয়, আমার আভ্যন্তর সত্তাকে মনের দখলে থেকে ও তার তৎপরতা থেকে সরিয়ে নিজেকে অতিমানসের দখলে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস করা। তা কি ঠিক কাজ হচ্ছে ?

শ্রীঅরবিন্দের উত্তর আমার মনে হয় এ দুটি একই জিনিসের দুই ধারা, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু এ প্রয়াস তুমি করছ মনের দ্বারা ; প্রথম দিকে তা অপরিহার্য, কিন্তু স্থির প্রশান্তি যেটা আসে তা কোনো প্রয়াস নয়, তা বিশেষ একটা বস্তু, "মনোময় বস্তু"।

প্রশ্ন সে কথা মনে বুঝি, কিন্তু অন্তরে উপলব্ধি করিনা। প্রয়াসই আমাকে করতে হয়, যা স্থূল মস্তিষ্কের কাজ, তা বুঝতে পারি। চেষ্টা করার চাপ ছেড়ে দিলেই এসে পড়ে চিন্তাশক্তির তরঙ্গ, আর বাইরের শব্দ কোলাহল আমাকে সহজেই বিচলিত করে। তাতে যদিও চিন্তা আনেনা, কিন্তু মনটা তৎক্ষণাৎ সেদিকে চলে যায়।

উত্তর চেতনার বিস্তারের মধ্যে ওগুলি সবই হবে, তবু তোমাকে তা বিচলিত করবে না। তখন এই বোধ করবে যে সবই হচ্ছে তোমার বাইরে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলছি। প্রথম যোগ ক'রে খুবই আটকে পড়েছিলাম। কিছুতেই অগ্রসর হতে পারিনা। আমার ভাই তখন এক ক্ষমতাশীল যোগীকে (বিষ্ণুভাস্কর লেলে) খুঁজিয়ে দিলে। দশ দিন রইলাম তার সঙ্গে। সে আমাকে পাশে বসিয়ে বললে, সকল চিন্তাকে ইচ্ছার জোরে দূর ক'রে দিতে। তাই করতে থেকে তিন দিনের মধ্যে মন নীরব ও স্থির হয়ে গেল। চিন্তাগুলো সামনে ভাসছে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমাকে তাদের খেলার ক্রিয়ার পুতুল করতে পারলে না। আমি ছিলাম রাজনৈতিক নেতা, ওখান থেকে বেরোবার পর আমার বক্তৃতা দেবার ডাক পড়ল। আমি প্রত্যাখ্যান করলাম, কারণ মনে কোনো চিন্তাই আসছে না। কিন্তু সেই যোগী আমাকে বক্তৃতায় যেতে বললে, আর বললে যে, চিন্তা তখন আপনি আসবে। তাই হলো। পরে আমি পত্রপত্রিকাতেও লিখেছি ঐ ভাবে। বাংলা দেশে গিয়ে আমাকে অনেক স্থানে ভাষণ দিতে হলো। মনের কাজ সেখানে আপনা হতেই চলতে থাকল, কিন্তু আমি নিজে রইলাম তার থেকে নির্লিপ্ত ও অচঞ্চল হয়ে।

এই স্থিরতা প্রথমে মনেতেই আসে মনের দুটি অংশ থাকে, তার একটিতে করে প্রকৃতির ক্রিয়াবিকাশ, আর অন্য অংশটিতে কেবল পুরুষের অচঞ্চল স্থিরতা।

প্রশ্ন তা বেশ বুঝতে পারি। এই পর্যন্ত ফল পেয়েছি যে ওর স্থিরতা ও প্রশান্তি অনেকটা এসে গেছে, জীবনের ছোটোখাট ব্যাপার তাকে সহজে বিচলিত করছে না, সহজাত বোধির দ্বারা সকল পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে নিতে পারছি।

উত্তর ওটা খুবই দামী জিনিস। প্রকৃতির সঙ্গে এই মিল রাখা আরো বাড়িয়ে যাও।

সোমবার ৮ মার্চ ১৯২৬

প্রশ্ন এই সপ্তাহে আর বেশি কিছু হয়নি। আমার মন কখনো হয় তামসিক, কখনো রাজসিক, কখনো বাইরের কোলাহলে অস্থির মনকে যতই শান্ত করি ততই তার প্রতিক্রিয়া বাড়ে।

উত্তর ভিতরের ক্রিয়া কেমন হয়?

প্রশ্ন সর্বদাই হয় দুটি জিনিস মনকে স্তব্ধ ক'রে উপরের প্রভাবের দিকে অবহিত রাখা; কিংবা শান্ত মন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তারও উপরে নিজেকে অনুভব করা, যা চকিতের মধ্যে এক একবার এসে যায়।

উত্তর যদি তুমি সকল চিন্তাকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ ক'রে দিয়ে একেবারে নীরব নিশ্চল হয়ে থাকতে পারো তাহলে তিনটি জিনিস হতে পারে। একটা গভীর প্রশান্তি উপর থেকে এসে তার মধ্যে তোমাকে ডুবিয়ে রাখবে। কিংবা তোমার চেতনা বাহ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যরূপ স্তরে চলে যাবে অথবা বাইরের ভাবগুলো এসে তোমাকে জোর ক'রে আক্রমণ করবে। প্রথম দুটি না হলেও তৃতীয়টি হবে। তাই বিশেষ দরকার হলো উপরের প্রভাবের দিকে একাগ্র হয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকা, অর্থাৎ উপরের দিকেই নিজেকে খুলে রাখা।

প্রশ্ন সে মনোভাব আর সে আস্পৃহাকে ধরে রাখা আমার পক্ষে কঠিন হয় যখন চিন্তার কাজ থামিয়ে রাখি—কারণ চিন্তাই তো সে ভাব আনতে সাহায্য করবে।

উত্তর তা কেন? কঠিন মনে করো বলেই তা কঠিন হয়, ওতে অভ্যস্ত হওনি বলে। অভ্যাস ক'রে নিতে হবে। সেটাই এখন দরকার। চেতনা যদি স্থূলের রাজ্যকে ছেড়ে যায় তখন ও সব ক্রিয়া আপনা হতেই চলে যাবে। অন্ততপক্ষে তাতেই তোমাকে অভ্যস্ত হতে হবে। সেই চেষ্টাই এখন থেকে করবে।

প্রশ্ন অমন বাধা বোধহয় খুবই সাধারণ। মনের চেষ্টা কেবল তার পথটা কোনোপ্রকারে বজায় রাখবে। আমাকে কেবল এদিক ওদিকে ছোটাতে চায়।

উত্তর হাঁ, খুবই সাধারণ জিনিস।

প্রশ্ন বোধ করি জগতের সংস্রব থেকে সরে গেলে এই সব বাধাগুলোকে দূর করতে পারা সহজ হয়। তাই সন্ন্যাসীরা জগৎ সংসার থেকে পালায়। কিন্তু তা ছাড়াও অন্য উপায়ে মনকে সংযত রাখা যায়।

উত্তর হাঁ আর সন্ন্যাসীরা পালিয়ে গিয়েও যেটুকু ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে ঘোরে, সেখানেও এই একই রকমের বাধাগুলো গিয়ে জোটে, তখন তুচ্ছ জিনিসও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নিজেকে সরানো যে বৃথা তা অনেকেই জেনেছে। কাশীতে এক বৃদ্ধ যোগী আমাকে বলেছিল যে আবার যদি গোড়া থেকে শুরু করতে পারতাম তাহলে এ রাস্তা একেবারে বদ্‌লে ফেলতাম, কিন্তু এখন বুড়ো হয়ে গেছি। যারা অনেকদিন হলো সংসার ছেড়েছে তারা আর সেখানে ফিরে যেতে পারে না কারণ ফিরলেও আর তা সহ্য করার ক্ষমতা তাদের নেই। তবে আমরা যে লোক সংস্রব থেকে একটু তফাতে আছি তা ঐ কারণে নয়, বাইরের লোকদের চিন্তাধারার চাপকে কতকটা এড়াবার জন্য।

প্রশ্ন আমি যে উপলব্ধির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছি, তাকেই কি বলে দ্বিতীয় জন্ম?

উত্তর হাঁ—কিন্তু এ যোগে অনেক নতুন জন্মই অতিক্রম করতে হবে।

বুধবার ১৫ মার্চ ১৯২৬

প্রশ্ন ধ্যানের সময় আমার সমস্ত মনটা নীরব হয়। মনের ভিতর প্রতিচ্ছবি আসা, বুদ্ধি বিচারণা, ধারণা কল্পনা, সবই থেমে যায়। আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া থামিয়ে দিয়ে আমি অনড় হয়ে থাকি। চেতনার কোনো পরিবর্তন হয়না, কেবল তার যন্ত্রগুলিতে ছাড়া। এখন ধ্যানের মধ্যে আমায় কি করতে হবে? এই নতুন ভাবটি কি সাধারণ জীবনেও আনা চাই?

উত্তর: প্রথম বিশ্লেষণে দেখবে যে মন দুই ভাগে বিভক্ত এক, যার মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়া চলে; দুই, যে অংশ পুরুষ রূপে অচল অনড় থাকে। এই দ্বিতীয় অংশটির শক্তি আরো বাড়িয়ে তাকে প্রথম অংশের কাজগুলির সাক্ষীস্বরূপ করা দরকার। মনের চিন্তার কাজগুলো যেন তার চোখের সামনে হচ্ছে, সে দেখছে যে বিশ্বপ্রকৃতি ঐ অংশের মধ্যে চিন্তার লীলা ঘটাচ্ছে। তার কাজগুলিকে বিশ্বশক্তির ক্রিয়া বলেই জানবে। চিন্তাগুলি বাইরের থেকে এসে ওর মধ্যে আকার নিচ্ছে। আর জানবে তার কাজগুলির উপরে তোমার কর্তৃত্ব আছে; ইচ্ছা করলেও তুমি তার কোনোটাকে বেছে নিয়ে অনুমোদন করতে পারো,

কোনোটাকে বা প্রত্যাখ্যান করতে পারো, ইত্যাদি। এমনি করেই তোমার কর্তৃত্ব শুরু হবে। তা ছাড়া তুমি জানবে যে তোমার ঐ পুরুষ অংশ হলো উপরকার বিরাট বিশ্বপুরুষেরই প্রতিফলন। তাই জেনে দুদিক দিয়েই তোমার অহংবোধ বর্জন করবে। এতে মনকে চিন্তাশূন্য করতে মনের উপর যে চাপ দাও তা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে, শুধু সাক্ষী ভাবটি বজায় থাকবে। চিন্তা এসে পড়লে দেখবে যে তা কোথা থেকে আসছে, তাকে অনুসরণ করবে। পরে মনের দুই পৃথক অংশকে একত্রে মিলিত করে নেবে।

প্রশ্ন : আমি বোধ করি যে মন একটাই, কেবল তার অবস্থা বদলায়, একটা সক্রিয় একটা নিষ্ক্রিয়।

উত্তর : ঐ ভাবে সংশ্লেষণ করার আগে প্রথমে তাকে দুই পৃথক অংশে ভাগ ক'রে নেবে। তখন দেখবে যে চিন্তাগুলি তুমি করছো না, করছে প্রকৃতি; এই হলো প্রথম মুক্তি। চিন্তাশক্তিকে তোমার বাতিল করা হচ্ছে না কেবল দেখবে যে সেগুলো বাইরের থেকে আসছে।

প্রশ্ন : কিন্তু চেতনার কোনো পরিবর্তন আসেনি, আর এর মধ্যে আধ্যাত্মিক কিছু নেই।

উত্তর তা ঠিক। কিন্তু এ কাজ তোমার যন্ত্রগুলির প্রস্তুতি, সুতরাং খুবই জরুরী।

শনিবার ১৩ মার্চ, ১৯২৬

প্রশ্ন গুরু, একটা কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে করুন ধ্যানে বসেছি। প্রথম যা হয় তা অনেকটা অর্ধ সক্রিয় মনের কাজ, তাতে আগের ক্রিয়ার রেশ থাকে। অল্পে অল্পে তা থেমে গিয়ে মন শান্ত হয়ে আসে। তখন আমি আমার নীরব মনের সামনে আছি : কিন্তু তখন ভিতরে অন্য এক ক্রিয়া চলে যা নিজেই শুরু করেছি। যেন নিজেকে আমি বলছি "এখন চিন্তাকে আমি লক্ষ্য করব...কোথা থেকে তা আসে...সব তো এখন নিস্তব্ধ...কিন্তু আমার এ কথাও এখন বন্ধ করা চাই, ইত্যাদি।" এও থামিয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু এটা কোথা থেকে আসে? বোধ হয় পুরুষেরই কাজের ফল, কিংবা তার জ্ঞান ও ক্রিয়ার যন্ত্র। প্রকৃতি অংশের নয়, কারণ তাতে প্রকৃতির নিজেকে নিজে প্রতিরোধ করা হয়। কিন্তু অপর পক্ষে যে পুরুষ অচল অনড় সে কেমন ক'রে কিছু পরিবর্তন আনবে? তার নিজের পরিবর্তন ছাড়া তা হওয়া অসম্ভব নয় কি?

উত্তর : প্রথমে এই হয় যে প্রকৃতি নিজেরই সঙ্গে সংগ্রাম করে—তার একটা দিক অন্য দিকের বিরুদ্ধে। কিন্তু পুরুষ পুরো নিষ্ক্রিয় নয়। তার নিষ্ক্রিয় সাক্ষী হয়ে থাকা

হলো সাংখ্যের কথা। পুরুষ সাক্ষী বটে, কিন্তু তা হলেও সে অনুমন্তা, অর্থাৎ ইচ্ছামত প্রকৃতিকে অনুমতি দিতে কিংবা না দিতে পারে। আর প্রকৃতি কেবল নিজের জন্যই কাজ করে না, পুরুষের জন্যও করে—কাজ করাই তার কাজ। কিন্তু পুরুষ আরো বেশি কিছু। সে যদিও কর্মী নয়, কিন্তু সে জ্ঞাতা ও ঈশ্বর। সে যা নির্দেশ দেবে প্রকৃতি তাই করবে। অধিকাংশ লোকের পুরুষ থাকে মনের ক্রিয়ার পিছনে লুকিয়ে। প্রকৃতির লীলাতে তার অনুমতি থাকে, কিন্তু তখন সে স্বাধীন নয়, প্রকৃতির প্রভাব তার উপরে রয়েছে। তাই প্রথমে পুরুষের সাক্ষী স্বরূপটির মুক্তি হওয়া দরকার। তখন প্রকৃতির কাজের উপর তার শক্তির উপলব্ধি হবে।

প্রশ্ন পুরুষের অনুমতি কি সচেতন ভাবে হয়? অথবা তা আরো গভীরের ব্যাপার?

উত্তর মনের অহঙ্কারের মধ্যে নয়, তাই মনে হয় তা অচেতন। কিন্তু মুক্ত পুরুষ চেতনই হয়।

প্রশ্ন এই যে অংশকে আমার আমি বলে জানি যে অংশ নীরব মনকে দেখতে পায় ; তার কোনো তৎপরতাতে যোগ দেয় না, সেটা কি মনোময় পুরুষ?

উত্তর . হাঁ।

প্রশ্ন পুরুষের অনুমতি কি অবিভাজ্য, আর বিশ্বপুরুষ কি তার প্রেরণাদাতা নয়?

উত্তর : ব্যক্তিপুরুষ যেমন আছে, তেমনি বিশ্বপুরুষও আছে, আবার এ দুইকে ছাপিয়েও পরাৎপর পুরুষ আছে। ব্যক্তিপুরুষ নিজে সুস্পষ্ট—যদিও নিজেকে সমগ্র থেকে স্বতন্ত্র বোধ করেনা। আর পূর্ণচেতন হলে তখন সে পরাৎপর পুরুষের নাগাল পায়। এই ব্যক্তিপুরুষ ব্যতীত কোনো সুগঠিত ক্রিয়া সম্ভব নয়। যেমন, অনেক সাধক আছে যারা ক্রিয়াকেই মুছে দিতে চায়। পরমহংস অবস্থা, যাতে সে আপন ক্রিয়া সম্বন্ধে অজ্ঞান, শিশু বা জড়ের মতো, বাতাসে ওড়া পাতার মতো তার কাজগুলি হয়—এ হলো ক্রিয়া-বিরতির সূত্রপাত স্বরূপ। সে ক্রিয়া যখন ফুরোবে, দেহলয়ের সময় সে সমস্তই ঝেড়ে ফেলবে। কিন্তু আমরা ক্রিয়াকে বাদ দিতে চাইনা, আমরা চাই সংকীর্ণ ক্রিয়ার বদলে সত্যজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সত্য ক্রিয়া এনে ফেলতে। চিন্তা হলো জ্ঞানের হাতিয়ার, কিন্তু তা সর্বনিম্ন হাতিয়ার। পুরুষ যখন প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হয় তখন সে সরাসরি জ্ঞানের অধিকারী জ্ঞাতা হয়। আপন অন্তর্দৃষ্টিতে সে সত্যের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পায় (যেমন, তুমি যখন রেগে ওঠো তখন এমন কথা ভাবোনা যে "আমি রেগেছি", তখন তা প্রত্যক্ষই জানা—প্রত্যক্ষ জ্ঞানও সেইরকম)। পরে যখন সেই জ্ঞানকে মনের ভাষায় তর্জমা

ক'রে আনো তখন তা স্বয়ংনির্ভর হয়ে থাকে। আর সে জ্ঞানের সামান্য মাত্র বা বিকৃত একটু টুকরো মাত্রই মনের ভাষাতে আনা যায়। তাই আমি সে কথা ভাষাতে বলতে অক্ষম হচ্ছি। সেই শক্তি যখন তোমাতে আসবে তখন আমি কোনো কথা না বলেই সেই সত্যকে সরাসরি তোমায় দেখিয়ে দিতে পারব।

প্রশ্ন যখন আমি নিজেকে চিন্তামুক্ত বলে বোধ করি তখন কিন্তু নিতান্ত নিস্তেজ ও অক্ষম হয়ে পড়ি, জ্ঞান বা ক্রিয়া কোনো কিছুই থাকেনা।

উত্তর ওর পরে আসবে নতুন অবস্থা। তখন দেখবে জ্ঞান চিন্তাতে সীমাবদ্ধ নয়।

প্রশ্ন আর আমার চিন্তা যে প্রকৃতি হতে জন্মাচ্ছে তাও দেখিনা। আমার মন যে আমি নয় সে কথা জানি, কিন্তু মনে হয় চিন্তাগুলো যেন মনের মধ্যেই জন্মায়।

উত্তর হাঁ, কিন্তু জন্মায় বিশ্বমনের মধ্যে, তোমার মনের মধ্যে এসে তা আকার নেয়। যতক্ষণ তুমি মস্তিষ্কের অধীন ততক্ষণ এ কথা বুঝবে না। কিন্তু পরে টের পাবে যে বিশ্বমনের ক্রিয়াই এসে ঢুকছে তোমার মনের ক্ষেত্রে।

প্রশ্ন : কেমন ক'রে সেরূপ অবস্থা আসবে ?

উত্তর অমনি পৃথক ক'রে নিয়ে দেখতে থাকো। তুমি বলছ যে পুরুষের আত্যন্তরীণ ভাষাকেও তুমি নীরব করতে পারো। নিজেকে পুরুষ থেকেও পৃথক ক'রে নিতে পারো কি ?

প্রশ্ন তাও পারি, তাকে দেখি আমার থেকে বাইরে।

উত্তর সেই পার্থক্য আরো বাড়িয়ে যাও। ও রকম আরো অনেক অবস্থা তোমাকে পার হয়ে যেতে হবে। এক একটা অবস্থা কাটাতে অল্পবিস্তর দীর্ঘ সময় লেগে যায়।*

---

* অনুবাদক : পশুপতি ভট্টাচার্য

পথের কথা

১৮ অক্টোবর, ১৯৬৯

পূর্ণ উপলব্ধির জন্য সমগ্র সত্তাই আলোকদীপ্ত হওয়া চাই ; কিন্তু তার প্রথম অবস্থার পক্ষে মনের তরফের পূর্ণ পরিণতি না হলেও দেহের তরফে তা সহজ হতে পারে...তবে আমাদের ক্ষেত্রে যখন মনের পরিণতি সম্পূর্ণটাই হয়ে গেছে, বোধ করি সেই পরিণতির অবস্থা আমরা অতিক্রম করেছি,—সেই পূর্ণ পরিণতির পর মনকে এখন বাদ দেওয়া যায় ; পূর্ণযোগের উপলব্ধিতে তাই দরকার, কিন্তু দেহ সাধারণত নিতান্তই মনের অধীন বলে রূপান্তরের পক্ষে যথেষ্ট নমনীয় হয় না। মনকে তাই আমি সরিয়ে দিয়েছি...অবশ্য অন্য কাউকে তা করতে বলিনা। কারণ তাতে দশ জনের মধ্যে নয় জনই মারা পড়বে।

ভক্ত মনের সম্পর্কে বলছেন ?

মা মন যদি লোপ পায়।

ভক্ত তাতে কি আমি মারা যাবো বলছেন ?

মা মন আর প্রাণ।

ভক্ত প্রাণের কথা বুঝলাম, কিন্তু মনকে যদি ত্যাগ করি ?

মা না গো ছেলে, তা আমি চাই না (হেসে) তা নয়...মন কেবল নেমে দাঁড়াবে। খুব বেশি অনড় ও নিষ্ক্রিয় থাকবে, তবেই উচ্চ-শক্তি সব কিছু ভেদ ক'রে দেহসত্তায় ঢুকতে পারবে। প্রতি বারেই আমি দেখি যে তা চাপ দিচ্ছে দেহের একটা কোনো অংশে আর সে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হচ্ছে—যাকে বলব "অনড়তার চূড়ান্ত"। বুঝলে ? পরিপূর্ণ জড়ত্ব।...যার নিজের কিছুমাত্র ক্রিয়া নেই। মন যাদের খুব পরিণত তাদের পক্ষে এটা হওয়া খুবই কঠিন। কারণ তাদের সমগ্র দেহ মনের বাধ্য থেকে তার হুকুমে চলতেই অভ্যস্ত, তার হুকুমেই সে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় ইত্যাদি হয় এই জিনিসটাই ঘোচানো দরকার।

কেমন ক'রে বোঝাই ?...মনের ভিতর দিয়ে বিকাশ পাওয়া মানে সমস্ত সত্তার, এমন কি, বাস্তবের পর্যন্ত নিত্য জেগে ওঠা এবং তার ফলে তার যা বিপরীত অর্থাৎ আবার ঘুমিয়ে পড়া। কিন্তু চরম শক্তিকে ধারণ করতে হলে চাই দুদিক থেকেই অনড়তা—ঘুমেরও অনড়তা। অথচ পূর্ণ সচেতন, পুরোপুরি সজাগ। দেহ বোঝে সেই পার্থক্য। সেই পার্থক্য দেহ এমনিতেই বোধ করে...। যেমন, সন্ধ্যার সময় আমি যখন দেহকে এলিয়ে দিয়ে এক ভাবে বসে থাকি ঘন্টার পর ঘন্টা,—সে সময়ে যদি ঘুমিয়ে পড়ি তো তৎক্ষণাৎ

দেহ দারুণ যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে জেগে ওঠে। তারপর আবার পূর্বাবস্থা এসে যায়। তেমন যন্ত্রণা আমি মাঝে মাঝে টের পাই—আর এই অনড় অবস্থা ফিরে এলেই তা চলে যায়, কিন্তু পুরোই চেতন থাকে। এ অনড়তাকে কি বলব জানিনা...কিন্তু তা জড়ত্বের অনড়তার উল্টো।

এর থেকেই এখন বুঝেছি যে আদি সৃষ্টির শুরু হয়েছিল কেমন জড়ত্ব থেকে। সেই জিনিসকেই আবার ঘুরিয়ে আবিষ্কার করতে হবে (মা বড়ো ক'রে হাত ঘুরিয়ে দেখালেন), চেতনার সব রকম অবস্থার ভিতর দিয়ে পার হয়ে। তাতেই আমাদের এখন এমন গণ্ডগোল ! (হেসে) কিন্তু ইচ্ছাকর্তৃত্ব হলে তখন আর তা গণ্ডগোল নয়।

ভক্ত কিন্তু আমার পক্ষে মুশকিল এই যে আস্পৃহা করতে গেলেই সক্রিয় হতে হবে।

মা হাঁ, হাঁ।

ভক্ত সক্রিয় আস্পৃহা আমার থামানো চলবে না। অনড় হয়ে সব কিছুকে ছাড়তে পারি, কিন্তু—

মা হাঁ, কিন্তু আস্পৃহার ক্রিয়া তখন এসে পড়ে।

ভক্ত তখন সক্রিয় হতেই হয়।

মা হাঁ, জড়তাকে দূর করতে। কারণ এখনও জড়তা আমাদের জন্মগত।

ভক্ত তাহলে তখন কি করা ? সব কিছু চেপে দেওয়া...না আস্পৃহার তীব্রতা বজায় রাখা ?

মা বলা কঠিন, কারণ প্রত্যেকের রাস্তা তার নিজের, কিন্তু দেহের পক্ষে আস্পৃহাই দরকার।

ভক্ত : সক্রিয় আস্পৃহা তো ? তাহলে সেখানে অনড়তার প্রশ্ন আসছে না।

মা : কিন্তু যখন তার পাওয়া হয়ে গেছে, উপায়টা সে বুঝে নিয়েছে।

ভক্ত তার মানে দুইরকম জিনিস একত্রে মিলিয়ে ?

মা : হাঁ, দুটোই একত্রে। তাই দেহ করতে পেরেছে—সম্পূর্ণ অনড় থেকে তীব্র আস্পৃহা। অনড়তা থেকে যখন আস্পৃহা চলে যায় তখনই আসে ঐ যন্ত্রণা, তখনই এটা জেগে ওঠে। এই হলো তীব্র আস্পৃহা যা ভিতরে ভিতরে অনড়, যেন সমস্ত কোষগুলি অসাড় হয়ে গেছে।...এই রকমই হবে যাকে বলব তীব্র আস্পৃহা, তাতে থাকবে অতিমানসের দিব্যস্পন্দন। নিজেকে আমি তাই বলি।

কিন্তু দেহ যখন এক মিনিটের জন্যও জড় হয়ে পড়ে—অর্থাৎ যা আস্পৃহাশূন্য অনড়তা, তখই সে এমন যন্ত্রণা নিয়ে জেগে ওঠে যেন মারা যাবার অবস্থা ! বুঝতে পারলে ?

অতটাই হয়। কারণ এইরূপ অনড়তার মানে...সেখানে আসছে পরা চেতনার সর্বোচ্চ স্পন্দন, তা এতই বেগবান যে...তা অনড়তারই সমান—তা অনুভব হয় না। তাই সে বেগ জড়তারই মতো।

সেই জিনিসই এতে প্রতিষ্ঠা নিচ্ছে। তাই আমি বুঝতে পারছি (যেহেতু দেহ বুঝছে) যে সৃষ্টিটা কেমন ক'রে হয়েছে।...একটা পূর্ণাবস্থাতে শুরু, কিন্তু সে অচেতন পূর্ণতা তার থেকে তাকে চেতন পূর্ণতায় আসতে হবে, দুইএর মাঝে রইল অপূর্ণতা। কথাগুলো হয়তো ঠিক হলোনা, কিন্তু আসল কথাটা তুমি বুঝতে পারছ।

(নীরব থেকে)

বুঝতে পারবার দরজায় এসে পৌঁছলেও তা মনের বুঝ নয়, একেবারেই না। (মনের বুঝও আছে কিন্তু সে হলো একেবারে শূন্য) আর এ বুঝ হলো হয়ে-বোঝা। মনের গম্য সেটা হয়না। কেবল এই দেহ—যা গ্রহিষ্ণু, উন্মীলিত, এই দেহ যখন কতক রূপান্তরিত হয় তখন সে বোঝে। যাকে আমরা সৃষ্টি বলি, তা যে কেন এবং কেমন ক'রে, এ দুটো জিনিস সে বোঝে। কোনো ভেবে চিন্তে নয়, অনুভব করে নয় হয়ে-বোঝা, যা জ্ঞানপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়...একটা চেতনা আসা।

আর যখন সেইরকম ভাবে বুঝে জানি, তখন এই হয় (আলো জ্বলে ওঠার ভঙ্গী), আবার তা নিভে যায়, আবার জ্বলে ওঠে, কিন্তু যখন আসে তখন এতই সহজ ও সুনিশ্চিত যে অবাক হয়ে ভাবি এ কথা আগে কেন জানতে পারিনি।

তবু আরো অনেক বেশি সময়ের দরকার...কত যে তা জানিনা। আর সময়ের ধারণা তো স্বেচ্ছাকৃত। কিন্তু আমরা সকল অনুভূতিকে আগেকার চেতনার তর্জমা করতে যাই, মনে করি তাই দরকার, তাই বিলম্ব হয়।

(নীরব থেকে)

মানুষ এতাবৎ যা কিছু বলেছে, যত কিছু লিখেছে, যত কথা শিখিয়েছে, সমস্তই একই ধরনে বাক্যে বলা মাত্র। শুধু বোঝাবার চেষ্টা, কিন্তু তা অসম্ভব। আর যখন এটা ভাবি (হেসে) যে এই সব আপেক্ষিক ব্যাখ্যা নিয়ে পরস্পরে কতই লড়তে হয়েছে।

(দীর্ঘক্ষণ নীরব থেকে)

যত দিন বাচ্ছে ও যা কিছু ঘটে যাচ্ছে সমস্ত দেখে দেহটার যে অনুভূতি হচ্ছে তা এই রকম...কোনো সময় কোনো ভাবে আসছে অমরত্বের চেতনা, আবার নানারকমের প্রভাবে (পূর্বাভ্যাসের ফলে) সে নেমে আসছে মরত্বের চেতনাতে...কিন্তু তার ফলে হচ্ছে মারাত্মক যন্ত্রণা কেবল ওর থেকে বেরিয়ে সত্য চেতনাতে এসে পড়লেই তা চলে যায়। বুঝতে পারি এমন হয় কেন। আগেকার যোগীরা যে বলত জগৎ অবাস্তব, তার কারণ এই অমরত্বের চেতনার কাছে মরত্বের চেতনা নিতান্ত অবাস্তব মায়া। (হাতের আঙুলের মধ্যে

আঙুল চালিয়ে দুই চেতনার আসা যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন) একবার এই একবার ওই। অনরত্বের চেতনা খুবই অস্থির, প্রশান্ত...অতি ক্ষিপ্রগামী তরঙ্গের মতো, এত দ্রুত যে মনে হয় নড়ছেই না। আর অন্যটি ফিরে এলেই সেই আবার মানুলী কষ্টভোগ ও নিখ্যার জ্বালা। এখনও তাই (পূর্ববৎ ভঙ্গী)। ...ওর থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র সফল উপায় সমর্পণ। কথায় বলা নয়, ধারণাতে আনাও নয়, শুধু সেইরকম একটা স্পন্দনাবস্থা যার মধ্যে রয়েছে দিব্যের স্পন্দন, তারই যা কিছু মূল্য।

কিন্তু সেটা যদি বাক্যে বলতে যাই, অমনি...

কিন্তু এই হচ্ছে সর্বক্ষণ রাত্রেও আসছে, দিনেও আসছে, অন্য সময়েও এই (হেসে হাত খুলে দেখালেন)...তখন আর সমস্যা কিছু নেই, বিপত্তিও নেই, কোনো কিছুই না।

(নীরব থেকে)

একটা পটভূমি রয়েছে অচেতন নেতির, এখনও আছে সব কিছুর পশ্চাতে, সর্বত্র নয় কি? তুমি খাচ্ছ দাচ্ছ, শ্বাস নিচ্ছ, ঐ নেতিকে গ্রহণ করছ...এ জিনিসের রূপান্তর আনতে এখনও বিস্তর মেহনত করতে হবে। কিন্তু যখন অপর দিকে গেলাম (দিক নয়), অপর অবস্থাতে, তখন সবই এমন সহজ, স্বাভাবিক, যে প্রশ্ন উঠবে তবে অত কঠিন লাগছিল কেন,—কিন্তু আবার যেননি ওদিকে ফিরে যাওয়া, অমনি... (মা হাত দুটি দিয়ে মাথা চেপে ধরলেন)। নিশ্রণ এখনও রয়েছে সন্দেহ নেই!

আগেকার সাধারণ চেতনার অবস্থা (মানে চেতন ভাবে তেমনি বোধ করা), তা হলো কেবল মৃত্যু ও ব্যাপার। আর এই অনারূপ অবস্থাতে মনে হবে মৃত্যু ও ব্যথা...নিতান্ত অবাস্তব।

এই নাও ফুল (মা একটি ফুল দিলেন যা রূপান্তরের প্রতীক)।

অধৈর্য হওয়া নয়। বিশ্বাস নিয়ে ধৈর্য রাখো।

বস্তুত প্রত্যেকের পক্ষে যা হয় সবস্তই ভালোর জন্য, কেবল সাধারণ ধারণাই অধৈর্য হয়। ...যখন সবস্তটাকে দেখবে তখন জানবে যে অধৈর্যের সৃষ্টি হয়েছে জড়তা ঘোচাতে, কিন্তু এখন তার কাজ শেষ হয়ে গেছে, তার সময় আর নেই।

১৯ নভেম্বর ১৯৬৯

আজ সকালে ৮টার কাছাকাছি আমি অনেক কিছু বলতে পারতাম...একটা দিন আগে কোনো কিছু ঘটনার সঙ্গে নানারকম সমস্যা নিয়ে, কিন্তু আজ প্রাতে (রাত্রিশেষে) যে অনুভূতি এলো তাতে সকল কিছুর ব্যাখ্যা হয়ে গেল। দুঘন্টা যাবৎ ছিল একটা স্বচ্ছ ভাব (চিন্তা নয়, স্পষ্টই বোধ), যে সৃষ্টি কেন ও কেমন করে হচ্ছে। সে বোধ

এমনই দীপ্তিসমুজ্জ্বল যে তা একেবারে নিঃসন্দেহ। চার পাঁচ ঘন্টা পর্যন্ত থেকে সেটা মিলিয়ে গেল; ঔজ্জ্বল্য ধীরে ধীরে কমতে কমতে অস্পষ্ট হয়ে গেল।...অনেককেই তখন দেখলাম...কিন্তু এখন আর তা বোঝাতে পারব না। কিন্তু তখন সবই পরিষ্কার; বিরোধী ভাবগুলো সবই রইলো নিচে (মা নিচের দিকে চাইলেন) আর যা কিছু ব্যাখ্যা, শ্রীঅরবিন্দ যা বলেছেন, X যা বলেছেন নিজের নিজের অনুভূতি থেকে, সবই যথাস্থানে স্থান পেয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তখন সবই বেশ বলতে পারতাম, কিন্তু এখন বলা কঠিন।

তাই নয় কি ? যা কিছু পড়া গেছে, যত থিওরি কিংবা ব্যাখ্যা জানা গেছে, তা ছাড়াও কিছু বাকী থেকেছে যার "ব্যাখ্যা" দেওয়া কঠিন (সে চেষ্টা করা বৃথা)। যেমন, ব্যথা পাওয়া ও ব্যথা দেবার ইচ্ছা, অভিব্যক্তির সেই দিকটা। তার আগে ছিল অবশ্য মৌলিক প্রেম ও অপ্রেম, অন্য প্রান্ত থেকে, কিন্তু বাকী সব কঠিন কথা। আজ তা ছিল সব সহজ, সমুজ্জ্বল, সুস্পষ্ট !...(মা কি নোট লিখেছেন দেখালেন) একটা ভোঁতা পেনসিলে লিখেছি...পড়তে পারবে কিনা জানিনা। তখন যা লিখেছি তা ঠিক জেনেই লিখেছি, কিন্তু এখন তা শুধু বাক্য।

(ভক্ত নামের লেখা নোটগুলি পড়লেন)

স্থায়িত্ব ও পরিবর্তন

জড়তা ও রূপান্তর

হাঁ, ভগবানের মধ্যে এগুলি ছিল আদিসূত্র। বিশেষত ওর মধ্যে সহজ ঐক্য। এখন এগুলি মাত্র কথা—

স্থায়িত্ব ও পরিবর্তন

জড়ত্ব ও রূপান্তর

চিরন্তনী ও অগ্রগামী

ঐক্য...(ভক্ত ওর পর পড়তে অক্ষম হলেন)

ওটা বস্তুত আমিই লিখিনি, অর্থাৎ আমার সাধারণ চেতনাতে নয়, পেনসিলটা ছিল... জানিনা কেন ওকথা লিখলাম। (মা নিজেও চেষ্টা করে পড়তে পারলেন না) সৃষ্টির ব্যাপার দেখলাম ও বুঝলাম, কেন, কেমন ক'রে, কিসের অভিমুখে, সবই একসঙ্গে, অতি সুস্পষ্ট, সুস্পষ্ট...স্বর্ণাভ, সমুজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়, গরিমান্বিত।

পৃথিবীই ছিল তার কেন্দ্রস্থল, সেখানে প্রথমে যা সব চেয়ে কঠিন পাথরের জড়ত্ব, তারপরে...(মা আবার পড়তে চেষ্টা করলেন)...জানিনা সেটা আসবে কিনা।

(বহুক্ষণ নীরব থেকে)

এই ভাবে ভাষাতে ব্যক্ত করা যায় ("পরাৎপর" এবং "সৃষ্টি")। পরাৎপরের মধ্যে

সকল কিছু সম্ভাবনাই একত্রে রয়েছে, সেখানে কিছু প্রভেদ নেই। সৃষ্টিতে তা প্রক্ষিপ্ত হয়েই সব পৃথক হয়ে বৈপরীত্য এসে গেল (তাই বলা হয় সৃষ্টি মানেই পৃথক করা : যেমন দিন ও রাত্রি, কালো সাদা, ভালো মন্দ ইত্যাদি, আর তা কিন্তু আমাদেরই ব্যাখ্যা)। অথচ সব মিলিয়ে সেই একটাই, তাকে বদলানো যায়না, নাশ করা যায়না। সৃষ্টি মানে সেই ঐক্যের পৃথকীকরণ—বলা যায় চেতনার বিভক্তি। তার শুরুতে এক ঐক্যচেতনা, এখন বহুধা, ফিরে যাবে আবার সেই ঐক্যে। তার জন্য এই ঘুরপথ, আমাদের জন্য টুকরো টুকরো করা, স্থান-কালের দ্বারা। আমরা এই চেতনার প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজের সম্বন্ধে এবং মূল ঐক্য সম্বন্ধেও এককালেই চেতনা আনতে পারি। সেই কাজই করা হচ্ছে, অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চেতনাটুকুও তার আপন অবস্থা বজায় রেখে সামগ্রিক চেতনাকে পুনরাবিষ্কার করতে চলেছে—যার ফলে মিলবে মূল ঐক্য সম্বন্ধে এবং এই বিবর্তনগতি সম্বন্ধে পূর্ণ চেতনা। আমাদের পক্ষে তা আসবে কাল-বোধের ভিতর দিয়ে নিশ্চেতনা হতে ঐ চেতনাতে ফিরে যাওয়া। আর এই নিশ্চেতনাই সেই মূল ঐক্যের প্রথম প্রক্ষেপন (যদিও এ সব কথার কোনো অর্থ হয়না)—সেই জিনিসই হলো নিশ্চেতনা। সেই নিশ্চেতনা ক্রমে ক্রমে জীবসত্তার মধ্যে চেতন হয়, আর তারা তাদের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সচেতন হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তন বা রূপান্তরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে পৌছবে গিয়ে মূল ঐক্যে। এর দ্বারাই সকল কিছুর সুব্যাখ্যা হতে পারে।

কিন্তু বাক্যে বলা তো কিছুই না। সমস্ত কিছুই, অতি স্থূল বাস্তব থেকে অতি সূক্ষ্ম আকাশীয় পর্যন্ত, সমস্তই রয়েছে ওর মধ্যে—স্পষ্ট, সুস্পষ্টভাবেই দেখা যায়।

আর অশুভ, যাকে আমরা মন্দ বলি, তারও অনিবার্য স্থান আছে ওর মধ্যে। মূলের চেতনা পেলে তাকে অবশ্য তখন আর মন্দ বলে বোধ করবেনা। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সত্তা তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চেতনাতে মন্দকে দেখছে কিন্তু চেতনা তো এক, সে যখন ঐক্যে পৌঁছবে তখন ভাল মন্দ দুই মিলে এক হয়ে যাবে। এই জিনিস, হাঁ এটাই উপলব্ধি করতে হবে। এই আশ্চর্য জিনিসই আমি তখন দেখেছি।...আর আদি প্রারম্ভের কথা (আরম্ভ কিছু আছে কি ?), যা কেন্দ্রচেতনা থেকে অনেক "বাইরে" তা হলো এই বহুধা,—চেতনা, অনুভব, সংবেদন—সকল কিছুরই বহুধা। এই বিচিত্র বিভক্তি নিয়েই সৃষ্টি, আর এই নিয়েই জগৎ চলেছে ; বাধা, সুখ, সকল কিছু ওরই ভিতর দিয়ে...যাকে বলে ব্যাপন, যদিও তা ঠিক নয়, আমরা স্থান কালের মধ্যে আছি বলেই তাই বলি ব্যাপন, সমাহরণ, কিন্তু আসলে তা নয়।

X কেন যে বলেছিলেন আমরা রয়েছি "সাম্যের" কালে, তা বুঝলাম অর্থাৎ এই অগণ্য চেতনাবিন্দুর সকল বৈপরীত্যের যখন সাম্য হবে, তখন কেন্দ্রচেতনা পুনরাবিষ্কার

হবে। এখন যা বলি তা যে কতখানি বৃথা সেটা জেনেই বলছি। কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই। যা আসল তা একেবারেই নিরেট...পুরোপুরি তাই।

যখন আমি দেখছিলাম তখন তাই ছিল। কিন্তু তখন তা বলা যেতোনা। (মা তাঁর লেখাটি দেখালেন) তখন কাগজে এটা লিখতে বাধ্য হয়েছি. জানিনা কি লিখেছি।...প্রথম কথাটা—

স্থায়িত্ব ও পরিবর্তন

তার মানে—মূলে স্থায়িত্ব. তা অভিব্যক্ত হলো জড়ে, তার উত্তরণ পরিবর্তনে। পরের কথা—

জড়ত্ব ও রূপান্তর

তা তো হয়েই গেছে—সে ভাব চলে গেছে।

চিরন্তনী ও অগ্রগামী

তিন কথাই বিপরীত নিয়ে। এর পর ফাঁক (এখানে মা লাইন টেনে দিলেন): তারপরে এলো চাপ. তখন লিখলাম—

ঐক্য... (পরের তিনটি বাক্য অস্পষ্ট)

ওটা খাঁটি অনুভূতির কথা, কিন্তু পড়া যাচ্ছেনা—বোধ হয় ইচ্ছাকৃত তোমার অনুভূতি এলেই তুমি ওটা পড়তে পারবে।

ভক্ত (পড়তে চেষ্টা ক'রে) এর মধ্যে একটা শব্দ দেখছি "বিশ্রাম"।

মা হাঁ, তাই হবে। বিশ্রাম এবং...(নিবিষ্ট থেকে) "শক্তি", তাই নয় কি?

ভক্ত ও! হাঁ, বিশ্রাম ও শক্তি একত্রে।

মা তাই হবে। আমি ও কথা বেছে নিইনি...যখন বলছি "আমি" তার মানে কিন্তু সেই চেতনা (মাথার উপর দিকে ইঙ্গিত), কিছু একটা আমাকে চাপ দিয়ে লেখালে। (মা আবার লিখলেন)

স্থায়িত্ব ও পরিবর্তন
জড়ত্ব ও রূপান্তর
চিরন্তনী ও অগ্রগামী

ঐক্য শক্তি ও বিশ্রাম একত্রে

অর্থাৎ দুই একত্রে মিলে অভিব্যক্তিমুখী চেতনাকে ফিরিয়ে আনলে। এটা ব্যক্তির মাপে নয়, বিশ্বের মাপে। ওর মাঝে তাই লাইন টানলাম, অর্থাৎ ওর সঙ্গে এটা মিশে যায়নি।

ভক্ত : কিন্তু মা, যখনই আপনি অতিমানস অনুভূতির কথা বলেন, তখনই বলেন যে তা দ্রুত গতিশীলের মতো অথচ সম্পূর্ণ স্থির অনড়। এমনিভাবেই প্রায় বলে থাকেন।

মা : তুমি তো জানো, আমি কখন কি বলি তা মনে থাকেনা।

ভক্ত আপনি বলেছেন যে তার স্পন্দন এতই দ্রুত যে বোঝা যায়না, মনে হয় জমাট অনড়।

মা হাঁ, তেমনি এক দীপ্তিময় গরিমার মধ্যে আজ সারা সকাল কেটেছে।

যত কিছু ধারণা, কল্পনা, এমন কি সূক্ষ্মবুদ্ধির বিচারও তখন হলো যেন...নিতান্তই ছেলেমানুষি। যে অনুভব পেলাম তা সম্পূর্ণ খাঁটি, তা নিয়ে বলবার কিছু নেই।

মানবীয় স্তরের যত কিছু প্রতিক্রিয়া, এমন কি যা সব চেয়ে উচ্চ ও মহৎ, তাও নিতান্ত ছেলেমানুষি।...শ্রীঅরবিন্দ এক জায়গাতে যা লিখেছেন সেই কথাই কেবল মনে হয়। কোথায় একদিন পড়লাম সুদীর্ঘ একটা ছত্র, তার মধ্যে রয়েছে "যখনই আমি ঈর্ষা বোধ করি তখনই জানি যে পুরানো মানুষটা এখনও আছে"। ত্রিশ বছরের চেয়েও বেশি আগে ওটা পড়েছি—ত্রিশ বছরই হবে, যখনই দেখলাম "ঈর্ষা"র কথা, তখনই ভাবলাম শ্রীঅরবিন্দের ঈর্ষা কেমন ক'রে হবে? ত্রিশ বছর পরে বুঝলাম যে লোকে যাকে "ঈর্ষা" বলে এ সেই জিনিস নয়, এ সম্পূর্ণ অন্যরূপ চেতনার কথা। আজ সকালে সেটা স্মরণ হলো "যখনই ঈর্ষা আসে তখনই জানি পুরানো মানুষটা এখনও আছে।" এ আমাদের "ঈর্ষা" নয়...এই যে আমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যক্তিচেতনার বিন্দু নিজেকে অনুভবকেন্দ্রে রেখে দেখতে পায় কোন জিনিস ভিতরে আসছে (নিজের মধ্যে প্রবেশের ভঙ্গী) কিংবা যা বেরিয়ে যাচ্ছে (অনুরূপ ভঙ্গী); আর যখন এমন হয় যে কোনো কিছুই ভিতরে কেন্দ্রস্থ হতে আসছে না, কেবল বাইরেই গিয়ে ব্যাপ্ত হচ্ছে, তখন তাকেই তিনি ঈর্ষা বলেছেন আর পুরোনো মানুষটা এখনও আছে মানে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যক্তিচেতনা এখনো নিজেকে কেন্দ্রীভূত রেখেছে, যা নাকি কর্মের, বোধের সংবেদনের কেন্দ্র।

(নীরব থেকে)

আমি দেখি যে দেহ দিয়ে যখন কাজ করি তখন চেতনার একটুও অদলবদল না হয়ে তা ক'রে যেতে পারি। চেতনার দিকে তাতে কোনো ব্যাঘাত হয়না, তার আড়াল হয় কেবল লোকজন এলে এইখানে বসে যখন প্রাত্যহিক কাজ শুরু করলাম, তখন আগন্তুকদের উপর দিব্যচেতনাকে প্রক্ষেপ করলাম। কিন্তু আবার তা ফিরে এলো (কি বলব?), কিনারাতে এলো, অর্থাৎ ভিতরে নয়, তাই দেখলাম যেমনি তুমি প্রশ্ন করলে। কিন্তু এখন সে জিনিস আর নেই, যা ছিল সমস্তটাই এক; এখন তার সব বদ্‌লে গেছে—তার চেহারা পর্যন্ত। সেটা ছিল অতিমানস চেতনা, এই আমার বিশ্বাস।

ভক্ত : কিন্তু যে চেতনা পুরো ব্যাপক ও ক্ষিপ্র, যা পথের অংশমাত্র না দেখে সবটাই দেখতে পায়...

মা : হাঁ, হাঁ।

ভক্ত তাহলে সমস্যাটাই তার সফলক্রিয় ও পুরোপুরি জিনিস হবে।

মা : হাঁ।

ভক্ত আর মন্দ কিছু বলতে তা কেবল একটা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর দেখামাত্র, তাই বলি "এটা মন্দ" কিন্তু সমস্ত পথটা যে দেখছে...সেই সামগ্রিক চেতনার কাছে মন্দ বলে কিছু নেই।

মা বৈপরীত্য কিছু নেই, বিরোধও কিছু নেই। সবই এক ঐক্য, তারই মধ্যে আছি। চিন্তা কিংবা বাক্য দিয়ে তা বলার নয়। তাই বললাম...সে অনন্ত বিস্তার ...এক নিষ্কম্প জ্যোতির্দীপ্তি, অথচ এমন অনায়াস বোধ যা বোঝবার নয়। এখন ঠিকই জানি যে তা অতিমানস চেতনা। আর ওতে নিশ্চয় বাহাটাও ক্রমশ বদলাবে।

(বহুক্ষণ নীরব থেকে)

কৃপার যে মাহাত্ম্য, সমস্তকে একজোট করে যেমনভাবে তা এগিয়ে নিয়ে যায় তা বাক্যে বোঝানো অসাধ্য। কিন্তু যারা সেদিকে সমর্থন না দিয়ে কেবল দেখতে চায় যে তাদের কি ঘটছে, তারা তাই নিয়ে যতই ভুল বোঝে ততই বেশি কষ্ট পায়।

ভক্ত : কিন্তু এ কথা ভাবাও কঠিন যে প্রতি মুহূর্তেই যা কাজ করছে...তা সেই পূর্ণতা।

মা : হাঁ, তাই।

ভক্ত : প্রতি মুহূর্তেই পূর্ণ?

মা প্রতিটি মুহূর্তে। আর কিছু নয়। ওর মধ্যে যখন ছিলাম তখন ও ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অথচ তখন আমি বাইরের কাজে খুব ব্যস্ত আগেই বলেছি—সব কাজই ঠিক ঠিক হয়ে যাচ্ছিল : বরং তা আরো ভালো ভাবেই হচ্ছিল কি বলব, জোর ক'রে নয়, স্বাভাবিক ভাবেই করা।

সেই চেতনাতে থেকে জীবনের সকল কাজই করা যায়—বেশ ভালো ভাবেই। কোনো কিছু বদলাতে হয়না, যা কিছু বদলাবার তা সহজে আপনি বদলে যায়।

একটা দৃষ্টান্ত বলি। একজনকে নিয়ে কয়েকদিন থেকে একটু মুশকিল হচ্ছিল, আর নান করব না। তার কোনো কোনো কাজ শোধরাতে রীতিমত চাপ দিতে

হচ্ছিল। আর দেখলাম সে নিজেই জেনেছে সম্পূর্ণ অন্য ভাবে, নিজের থেকেই বললে তার পরিবর্তন হচ্ছে (সত্যই তাই), আর তাকে কোনো কিছু বলতে হলোনা চেতনার চাপ দিতে হলোনা। এই দেখ একটি প্রমাণ।...আপনা থেকে হয়ে যায়, সত্যের আরোপ আপনা থেকেই হয় কেবল সত্য চেতনাতে অবস্থান করা, তাতেই যথেষ্ট।

কিন্তু তবু দেহ তার কাজের জন্য আপন ক্ষুদ্র চেতনাটুকু সব সময় বজায় রাখে (নিজের জন্য নয়, নিজের সম্বন্ধে তার কোনোই ফিকির নেই)। সেই শ্রীঅরবিন্দের কথা "এখনও পুরোনো লোকটা রয়েছে, তা আজ সকালে বুঝলাম, কারণ সে তখন ছিল না। এমনি খুব প্রশান্তভাবে জানা যে এখনও সব ঠিক হয়নি—এখানে কিছু ব্যথা, ওখানে কিছু বিপত্তি, এগুলো অনাসক্ত ভাবে বোধ করা (তার কোনো গুরুত্ব নেই), তারপর তাও মুছে গেল! ...আর বোধ করি আসবেনা। বাস্তবিকই এক রূপান্তর। সোনা ঢালা বিস্তার বোধ—পরমাশ্চর্য, স্বর্ণজ্যোতি, প্রশান্ত, শাশ্বত, সর্বশক্তিপূর্ণ।

কেমন ক'রে এলো...এ আশ্চর্য কৃপাকে বর্ণনা করার কোনো ভাষা নেই। এই কৃপার স্পষ্ট দেখা ক্রিয়া সকল ধারণার অতীত।...অবশ্য দেহ অনুভব করলে। যা হলো তা বলব না কিন্তু তা সত্য প্রতিক্রিয়া, তবে আগেকার মতো কিছু নয়, কেবল সে হাসলো, সে হাসি দিব্যের হাসি। সে ভাব ছিল সারা দিন ও পরের অর্ধেক দিন। সেই বিপত্তির ধাক্কাই দেহকে পৌঁছে দিলে উন্নতির শেষ ধাপে, পুরো চেতনাতে নিয়ে গেল। সঙ্গতি থাকলে বছরের পর বছর তাই থেকে যেতো—আশ্চর্য, অতি আশ্চর্য!

লোকেরা কি বোকা! কৃপা এলেও তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়, বলে ওঃ! কী নিদারুণ!...আমি অনেক কাল থেকেই জানি, কিন্তু আমার যা অনুভূতি...তা জাজ্বল্যমান।

ভক্ত প্রতি জিনিসটা প্রতি মুহূর্তেই তো আশ্চর্যরকমে পূর্ণতা নিয়ে হবে?

মা হাঁ, ঠিক তাই।

ভক্ত : কিন্তু কেবল আমাদের দৃষ্টি তার সঙ্গে সমান হয় না।

মা হাঁ, আমাদের চেতনা যে স্বতন্ত্রীকৃত। কিন্তু একে বিদ্যুৎবেগে নিয়ে গেল সেই মহাচেতনার দিকে, তা এককালেই রইল তার নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যে অথচ সম্পূর্ণ সমগ্রের মধ্যে।

(বহুক্ষণ নীরব থেকে)

(তাঁর নোটের উপর লিখলেন) এতে আজকের তারিখটা লিখে রাখছি।

ভক্ত আমরা আছি এখন ১৯ তারিখে।

মা নিশ্চয়ই ১৯ নভেম্বর ১৯৬৯, অতিমানস চেতনা।

(নীরব থেকে)

অতিমানস শক্তির প্রথম অবতরণটি হয়েছিল এক ২৯ তারিখে, আর আজ ১৯ তারিখ ...এর মধ্যে ঐ ৯ সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্য...এমন কত কিছুই আছে যা আমরা জানি না।

(নীরব থেকে)

এ উপলব্ধি আমার হয়ে গেছে কতক আংশিকভাবে যে আভ্যন্তরীণ সঙ্গতির অবস্থাতে যখন দেহের দিকে কোনো মনোযোগ থাকেনা, তখন দেহ আপনা হতে সুন্দরভাবে কাজ করে। কিন্তু এই "আত্মকেন্দ্রিকতা" এতেই সমস্ত বিগড়ে দেয়। এ আমি অনেকবার দেখেছি ...বস্তুত লোকে নিজেই নিজেকে অসুস্থ করে। ভাগ করা সংকীর্ণ চেতনা দিয়ে। তাকেই যদি কাজ করতে দাও...উচ্চ চেতনা ও কৃপা কাজ করছে, সর্বত্রই, সুতরাং ভালো থাকতে সকলেই পারে, কেবল বোকামিতেই যত গোলমাল হয়...এই আশ্চর্য! শুধু আত্মকেন্দ্রিক থাকার বোকামি, তাকেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "পুরোনো মানুষটা"। অদ্ভুত বৈকি।

১০ ডিসেম্বর ১৯৬৯

কাজ এগিয়ে যাচ্ছে এমন লম্বা পদক্ষেপে যে বাড়িশুদ্ধ তাতে কেঁপে উঠছে, তবু কাজ চলেছে এগিয়ে। কারো কারো বেলাতে, যেমন X-এর, সেটা চেতন ভাবেই হচ্ছে। ঐ মেয়েটি অনেকদিন আগে একটা হাঁটুতে চোট খেয়েছিল, অন্য পায়ের চেয়ে সেই পা-টি তার দুর্বল, সহজে অসুস্থ হয়। সে এটা লক্ষ্য করেছে যে যখন সে ভাবে কিছুই হয়নি, তখন কিছুই দোষ থাকে না, সব তখন সেরে গেছে। আর সাধারণ চেতনাতে যেমনি চলে যাসে অমনি অসুস্থতা শুরু হয়ে যায়...অনেক বারই তাই হয়েছে। শুনে কৌতূহল হলো। অন্যেদেরও তাই হয়।

তার কারণ খুবই স্পষ্ট, চেতনার অবস্থান্তর মাত্র। যখন ভালো চেতনা রয়েছে (অর্থাৎ সংকীর্ণতায় আবদ্ধ না থেকে ঊর্দ্ধমুখী চেতনা) তার মধ্যে সমস্ত কিছুই ঠিক থাকে; আর যেমনি পুরোনো বদ্ধ চেতনাতে ফিরে যাবে কিংবা চেতনা অলস হবে অমনি অসুস্থতা এসে পড়েবে। যেন স্পষ্ট শিক্ষাই দিচ্ছে। আশ্চর্য বৈকি। আর দেহটা তাই শিখে নিতে থাকে, সে তাড়াতাড়ি শিখে নেয়।

(নীরব থেকে)

অবশ্য খুবই বৃহৎ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, যার পরে মানুষ আর অপর দিকে না চেয়ে

আপন পূর্ণতা আনতে সচেষ্ট হবে। ...এই ভাবে আপন জীবনের যাত্রাবদল করা সকল উন্নতির মূল। মানুষের প্রথম প্রবৃত্তি—ঘটনার ত্রুটি ধরা, পরের দোষ ধরা...এটা এমন ওটা তেমন হলো কেন...সব কিছুতেই দোষ। কিন্তু প্রথম ধাপে এই হওয়া চাই—আমি যদি যথোচিত হতে পারি, দেহ যদি যথোচিত হয়, তবেই সব ঠিক হবে। আর নিজের উন্নতির জন্য যদি অন্যদের উন্নতির পথ চেয়ে থাকো, তবে অনির্দেশ্য কাল ধরে অপেক্ষাই করতে হবে। এই কথাটি সর্বত্র প্রচারের দরকার। ঘটনার উপর বা অন্যের উপর দোষ চাপিয়ো না, কারণ ঘটনা যতই মন্দ হোক, যদি তুমি সত্য ভাব নিয়ে আপন সত্য চেতনাতে থাকো তাহলে তোমার আভ্যন্তরীণ উন্নতির কোনো বাধাই হবেনা—এমন কি মৃত্যুও না, এই আমি বলি। বস্তুত এই প্রথম শিক্ষা।

(নীরব থেকে)

শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন যে পাপের ধারণাটা এনে ফেলা হয়েছে উন্নতির কাজ ত্বরান্বিত করতে, আর অমনি দেখ (হেসে) মানুষ কেবল অন্যের পাপই দেখে—নিজের পাপটা কখনই দেখেনা! এই কথাটি শ্রীঅরবিন্দ বেশ চমৎকার ক'রে বলেছেন, এখন তা স্মরণ নেই।

১৩ ডিসেম্বর, ১৯৬৯

শ্রীঅরবিন্দের চুম্বক বাণীগুলি (Aphorism) আমি এখন প্রত্যহই পেয়ে যাচ্ছি, যা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। ওর মধ্যে খুব ভালো ভালো জিনিস আছে।... তার কতকগুলি যেন শ্রুতিলিপির মতো (বুদ্ধির জিনিস ঠিক নয়, উচ্চমানস থেকে মনের চিন্তায় আসা), যেগুলি আমার অতিমানস চেতনার অনুভূতির সঙ্গে মিলে যায়, আর ভালো ও মন্দের তথাকথিত পার্থক্য ছেলেমানুষি বলে মনে হয়, সেগুলিকে শ্রীঅরবিন্দ খুব সংক্ষিপ্ত বাণীতে বুদ্ধিগ্রাহ্য ক'রে গেঁথেছেন। তবে...যারা বোঝে তারাও তো ঠিকভাবে বোঝেনা, নিতান্ত মামুলী ভাবে বোঝে।

তোমার মনে আছে? ...একটাতে তিনি বলেছেন "আমি যদি রাম না হতে পারি তবে রাবণ হবো...", কেন তা বলেছেন বুঝিয়ে দিয়েছেন (কারণ রাবণ হলো ভগবান বিষ্ণুরই উল্টো পিঠ)। তাঁর বাণীসঞ্চয়ের মধ্যেই এটা আছে।

(নীরব হলেন)

ভক্ত : এখানে একটি বাস্তব সমস্যা বলছি : যে জিনিসটা দোষের বলে আমি ত্যাগ করতে চাই, কিন্তু কেমন ক'রে হবে তা জানিনা, এমন কোন ক্রিয়া আছে

যার দ্বারা তা হতে পারে? তা কি উপর থেকে হবে? প্রত্যেক বার কোনো সমস্যা এলেই আপনি তাতে আলোকপাত করেন, তাই...

মা কেমন সে জিনিস, সত্তার কোন অংশের, তারই উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক সমস্যাতেই তার আপন বিশেষত্ব আছে। ওর পক্ষে সাধারণ নিয়ম কিছু হতে পারেনা।

ভক্ত যেমন সেদিন বললেন জন্মদান মানে "মোচন" (মা হাসলেন), আপনার স্মরণ আছে? বললেন, যারা নিজেদের যা কিছু চেপে রাখে, তাদের সন্তানদের মধ্যে গিয়ে তাই বর্তায়।

মা হাঁ, হাঁ।

ভক্ত আর ওর থেকেই নির্দেশ মেলে যে কোন জিনিসটা অনুচিত।

মা হাঁ।

ভক্ত এখন জানতে চাইছি যে তেমন দোষকে না চেপে কি বর্জনের নির্দেশ মেলে? তার উপরে আলো ফেলতে গেলেই তা নিচের তলায় লুকিয়ে যায়।

মা হাঁ, তাই সাধারণত হয়। সেখানে উলটো উপায় চাই, তলায় যেতে দেওয়ার বদলে তাকে সামনে খুলে ধরতে হবে, আলোর দিকে...সে আসতে চাইবেনা, তবু (হেসে) ঐ হলো উপায়। সেখানেই এ চেতনার মূল্য। ...চেপে দেওয়ার কারণ হলো ভালো মন্দ নিয়ে বিচার করা, মন্দ মনে হলে তাতে সংকোচ বা লজ্জা, তাই তাকে ঠেলে দিতে চাও (হাতের ভঙ্গীতে), চোখের কাছে রাখতে চাওনা। কিন্তু...প্রথম কাজ এটি বুঝে দেখা যে আমার চেতনার দুর্বলতাই সে কথা বলছে, কিন্তু ওর চেয়ে একটা বড়ো চেতনা আছে (নিশ্চিত জানি) যার কাছে অমন প্রভেদ নেই, যাকে আমরা "মন্দ" বলি তারও স্থান আছে এরই মতো যাকে আমরা "ভালো" বলি, আর যদি সেই বুঝে দেখাকে—কিংবা অনুভবকে কিংবা ক্রিয়াকে—আলোর দিকে তুলে ধরি, তাহলে তাতেই ও দোষ দূর হবে। (মা এখানে পরে যোগ করলেন—দুটো জিনিস যদি বিপরীত হয় তবে দুটোকে এক ক'রে জুড়ে দিলেই তার প্রকৃতি বদ্‌লে যায়।) সে জিনিসকে চেপে না দিয়ে কিংবা নির্মূল করতে না গিয়ে (তাকে নির্মূল করা যায়না) তাকে আলোর কাছে হাজির করো। এই নিয়েই আমি কয়েকদিন ধরে এক আশ্চর্য অনুভূতি পেয়েছি: যাকে বরদাস্ত করতে চাওনা কিংবা যা তোমাকে বিব্রত করছে তাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করার বদলে তাকে মেনে নাও নিজের একটা অংশ বলে—আর এমনি ক'রে তুলে ধরো উপরের দিকে (মা হাত খুলে ধরলেন)। সে জিনিস অবশ্য এটা চাইবেনা, কিন্তু তাকে বাধ্য করার উপায় আছে:

আমাদের মনের অসম্মতির ভাবটা কমিয়ে আনলেই অন্যও প্রতিরোধ কমে আসবে। অসম্মতির স্থানে যদি প্রণিধান এনে ফেল তাহলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। আমার তাই মনে হয়, যে জিনিস তোমাকে নিচের দিকে নামাচ্ছে তাকে উচ্চতর বুদ্ধির সাহায্যে বুঝে দেখবে। অবশ্য তা মনের কাজের অতীত তো বটেই। যেমন এর আগেই বললাম, শ্রীঅরবিন্দের চুম্বক বাণীগুলি বুদ্ধিগ্রাহ্য হলেও তা স্তিমিত হয়ে যায়, বাক্যাতীত বোধের ঔজ্জ্বল্য থাকেনা—সেই বোধটি এলে তবেই ঠিক কাজ হয়।

কথায় বলে কোনো লাভ নেই (মা হাসলেন), বলে বুঝিয়ে দিলেও তা ঝিমিয়ে যায়, যেন আরো এক পোঁচ রং মাখিয়ে তাকে আরো অস্পষ্ট করা হলো।

(মা হঠাৎ একটা খাতা তুলে নিয়ে আগে পড়া কোনো চিঠির একটা উত্তর লিখে ফেললেন)—এই দেখ, যেমন বলতে বলতে হঠাৎ এটা এসে গেল, এই ভাবেই কাজ হয় এইভাবে হঠাৎ আসে, তার পর যতক্ষণ না লিখে ফেলি ততক্ষণ কিছুতে যাবেনা। আশ্চর্য কথা।

এর কোনো পূর্বাপর মিল নেই... (আমি এ কথা ভাবিনি মোটে, বস্তুত আমি এখন কিছু ভাবিনা)। কার কখন কি দরকার তাতে মিল থাকেনা। উত্তরটা এমনি ক'রে বলে দেওয়া হয়। তার ভাষা, ভাব, ভঙ্গী, কার বেলাতে কি লিখতে হবে। আমার চেতনা রয়েছে ওখানে (উপরে নির্দেশ), তার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। সে কেবল গ্রহণ করে। আর তারপরেই এমনি উত্তরের হাতুড়ি পিটতে থাকে (অনুরূপ ভঙ্গী), যতক্ষণ না লিখে ফেলি ছাড়বেনা। এই বড় বিস্ময়ের কথা...আর এভাবে অনেক কাজ করেও ক্লান্তি হয়না! (হাসলেন)

ভক্ত ঐ জিনিসের একটা বীজ যদি আমায় দেবে!

মা এই নাও! (মা হাসতে হাসতে হাত বাড়ালেন)

ভক্ত: কারণ মনকে নীরব করেও—সেই ভাবেই আমি লিখি—তবু তার মধ্যেও আমাকে হুঁশিয়ার থাকতে হয় পাছে পুরোণো মনোভাব কিংবা প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে ঢুকে যায়।

মা ও, হাঁ।

ভক্ত: সেই ভয় থাকে।

মা হাঁ, পুরোণো ভাব এসে পড়ে। কিন্তু এমন বোধ করোনা যে উপর থেকে কিছু আসছে।

ভক্ত : এই বোধ করি যে কিছু শক্তি উপর থেকে এলো।

মা তারপরে ?

ভক্ত : হাঁ, তারপরে কিন্তু লিখতে গিয়ে ভাবি...

মা ও তাই প্রায় হয়।

ভক্ত : ভাবি যে এটা বলা বোধ হয় ঠিক হবেনা।

মা মন সেখানে বাধা পায়।

ভক্ত তা জানি না।

মা অমন আবারও হয়। লিখে পাঠিয়ে দিয়ে ভেবে দেখি কি লিখেছি, তখন বলি, না: ওটা লেখা ঠিক হয়নি ! ...পরে বুঝি যে ঠিকই হয়েছে, ওটা মনের প্রতারণা।

ভক্ত আমার অমন বহুবার হয়। এই সেদিন Z কে চিঠি লেখার সময়... সে প্রায়ই এমন কথা লেখে যা মেনে নেওয়া যায়না, কিন্তু আমি কিছু বলিনা কিন্তু সেদিন খুব কড়া ক'রে লিখে বললাম, ও সব কথার মানে কি? পরে ভেবে দেখলাম সে চিঠি পাঠানো উচিত হবেনা, তাই আর পাঠালাম না।...এমন স্থলে কি করা উচিত তা যে জানিনা !

মা ওখানে, ছেলে...

(মা নীরব হলেন)

ভক্ত : বলা কঠিন বটে।

মা হাঁ, কিন্তু যখন তুমি আস্পৃহা নিয়ে উপরের দিকে চাও কিংবা উচ্চ চেতনার দিকে নিজেকে খুলে ধরো, তখন তো কিছু দানা বাঁধে ?

ভক্ত তখন বেশ নিরেট ভাব হয়।

মা নিরেট তো ?...তবে বুঝে নাও যে এখানে একটিমাত্র উপায় আছে, অহং বর্জন, এই হলো কথা। যখন দেখবে যে "আমি" ছেড়ে গেছে, আর কোনো কিছু আর নেই, সব সমান, সমান হয়েছে (সমতল ভাবে হাত নাড়লেন), কি বলব—একটা স্থায়ী মনোভাব যা কেবলই বলছে : "তোমারই ইচ্ছা, তোমারই ইচ্ছা" (বাক্য এখানে অনর্থক)। এমন নিশ্চিত বোধ যে এই দেহ নিজে নয়, একে দিয়ে কেবল কিছু

করানো হচ্ছে—যা আছে সে কেবল সেই, যে চাপ দিয়ে করাচ্ছে (চাপের ভঙ্গী)। সেই বিরাট সর্বচেতন সর্বব্যাপী (দুই হাত বিস্তার করলেন)...পরে তা তুমি দেখতেই পাবে (দেখা মানে কোনো আকার দেখা নয়, কিন্তু এমন সে দেখা যা আকার দেখার চেয়েও নিখুঁত)...সেই বিরাট শক্তিকে, বিশাল স্পন্দনকে দেখা....যা চাপ দিচ্ছে, চাপ দিচ্ছে...সমগ্র জগৎ সেই চাপে নড়ছে, দুলে যাচ্ছে, আর সব কিছু তার মধ্যে ঢুকে বিস্তার পাচ্ছে। সত্যিই এ পরমাশ্চর্য। আর তাই হলো একমাত্র সমাধান। আর বাকী যা রইল তা কেবল আশ্পৃহা, ধারণা, প্রত্যাশা।...তখন পর্যন্ত অতিমানব, অতিমানস নয়। তখনও সেই উচ্চতর মানব আরো উপরের দিকে ঠেলে উঠবে, কিন্তু তা...নিরর্থক, নিরর্থক।

ছবিটা স্পষ্ট। মানুষ চাইছে ঠেলে উঠতে, আঁকড়ে ধরতে, কিন্তু নিজেকে ছাড়ছেনা, চাইছে কেবল পেতে! ওতে হবেনা। নিজেকে ছাড়তে হবে তবে সে আসবে, নতুবা তার জায়গা নেই।

সকল রহস্যের মূল এখানে। যেমন দেখ, মানুষের এ দিকটা চায় আদায় ক'রে নিতে, টেনে আনতে (কপালের উপর দিকে ভঙ্গী)...উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্তু ওতে নয়, ও নয়! অবশ্য সকল সম্ভাবনাগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবার পরে তখন মানুষ বুঝবে...বুঝবে যে কেবল ওই আছে। নিজেকে পাত করে ফেলতে হবে (মুছে ফেলার ভঙ্গী), নিঃশেষ ক'রে দিতে হবে।

খুবই কঠিন, নিজেকে নিঃশেষ করা।

(নীরব থেকে)

আচ্ছা, হবে হবে (হেসে), যাবো আমরা পৌঁছে।

সব ভালোই হবে গো ছেলে।

—শ্রীমা

---

* BULLETIN OF S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

কঠিন ডানায় ওড়া

বীরবাহু

এখন আমাদের অবস্থা চমৎকারই বলিতে হইবে! ফ্লাইং অফিসার রহমন এবং আমি সারাদিন অনাহারে এবং প্রায় বিনা পানীয় জলে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া পথশ্রমে ক্লান্ত এবং ক্ষুধায় অবসন্ন। আর যাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আজ সারাদিন আমরা এত পরিশ্রম করিলাম, তিনিই আমাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ডজ ওয়েপন ক্যারীয়ার লইয়া ছাউনিতে ফিরিয়া গেলেন! যাঁহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করা হইল, তিনি আমাদের কথা একবার চিন্তায়ও আনিলেন না। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে আমরা আজ সকালে এ অঞ্চলে তাঁহাদের খোঁজে আসিয়াছি, আর তাঁহারা গতকল্য অপরাহ্ণ হইতে এই পাহাড়ী জঙ্গলে পড়িয়া ছিলেন।

সন্ধ্যা আরম্ভ হইতেই ডজ ওয়েপন ক্যারীয়ার আমাদের খোঁজে ফিরিয়া আসিল। এবার গাড়ীতে আমাদের জন্য কিছু খাদ্য ও পানীয় ছিল। আমরা সেই রাত্রেই রাঁচীর ছাউনিতে ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন স্কোয়াড্রনের বিমান সবগুলিই উড়িয়া আসিবার কথা। সেইজন্য আমরা যে দশবার জন বৈমানিক রাঁচী বিমান-বাহিনীর ছাউনিতে পৌঁছিয়াছিলাম, তাহাদের সকলকে স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার দপ্তরের সম্মুখের প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁহার আদর্শগুলি সমস্ত ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন। আমরা যে যার কাজ ভাল করিয়া বুঝিয়া লইলাম। আমাদেকে আদেশগুলি বুঝাইয়া দেওয়ার পর তিনি সার্জেন্ট কিংএর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বিমান কেন ভূপাতিত হইল সেই কথা বুঝাইবার কালে ইংরাজীতে বলিয়া ফেলিলেন "Don't trust the I.O.Rs." (অর্থাৎ ভারতীয় বৈমানিক যাহারা অফিসার নয় তাহাদেকে বিশ্বাস করিওনা)।

স্কোয়াড্রনে পদার্পণ করার পর হইতেই তাঁহার কার্যকলাপ আমাদের ভাল বোধ হইতেছিল না। স্কোয়াড্রনে আসার পর তিনি একদিনও বোমা বর্ষণে গেলেন না। এমন কি, স্কোয়াড্রন যে বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া এত সুনাম অর্জন করিল, একবার সে বিমানে আকাশে উড়িয়াও বিমানের কদর বুঝিবার চেষ্টা করিলেন না। তারপর স্কোয়াড্রনের বৈমানিকরা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে এই মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্কোয়াড্রনকে ফিরাইয়া আনিলেন। বোমা-বর্ষণ-কার্য্যে নিজের সাহসের অভাবের কথা লুকাইয়া রাখিয়া স্কোয়াড্রনের বিশ্রাম লওয়ার প্রয়োজন জানাইলেন, যাহাতে তাঁহাকে বোমাবর্ষণে যাইতে না হয়। অভারতীয় গোরা বৈমানিকদেকে পুনরায় স্কোয়াড্রনে নিয়া আসিলেন এবং প্রত্যেক বিভাগেই তাদেকে কাজে বহাল রাখিলেন। সর্বোপরি দুইখানা ভাল বিমান নিজের ভুলের জন্য বিপথে গিয়া জঙ্গলের মধ্যে অবতরণের সময় বিনষ্ট হইল। বিমান দুইখানার

মধ্যে একখানাও আর মেরামতের উপযুক্ত ছিল না। কাজেই স্কোয়াড্রন দুইখানা বিমান নিজেদের দোষে হারাইল। তাঁহার অসঙ্গত ব্যবহারে স্কোয়াড্রনের অপমানের সীমা চরমে উঠিল যখন তিনি ভারতীয় বৈমানিকদের সম্মুখেই অভারতীয় গোরা বৈমানিকদের একজনকে বলিলেন যে ভারতীয় বৈমানিকদেকে বিশ্বাস করিওনা।

আমরা যে কয়জন ভারতীয় বৈমানিক ঐ স্থানে তখন উপস্থিত থাকিয়া এই নূতন স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের আদর্শগুলি বুঝিয়া লইতেছিলাম তাহাদের সকলেরই সহ্যের সীমা ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। সার্জেন্ট কিংকে ভারতীয় বৈমানিকদেকে অবিশ্বাস করিতে উপদেশ দেওয়ার কথা শোনামাত্র আমরা ভারতীয় কয়জনই রুখিয়া দাঁড়াইলাম এবং তাঁহাকে এ কথা ফিরাইয়া লওয়ার জন্য দৃঢ়ভাবে বলিলাম। আমাদের রুক্ষভাব দর্শনে তিনি পলাইয়া যাওয়ার জন্য পা বাড়ান মাত্র, আমরা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং তৎক্ষণাৎ নিথ্যা দুর্নাম সংশোধন করিতে আবার অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলিলাম। তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন এবং দুঃখিত (sorry) বলিয়া নিস্তার পাইলেন।

এদিকে দুইখানা বিমান ভুলপথে লইয়া গিয়া অযথা হারানর জন্য দিল্লীতে কেন্দ্রীয় দপ্তর তাঁহার যোগ্যতার বিষয়ে খুব সম্ভবত সন্দীহান হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষত সাত নম্বর স্কোয়াড্রনের স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডারের বিশেষ গুরুভার বহন করিবার শক্তির প্রয়োজন ছিল। দিল্লী কেন্দ্রীয় অফিস সেইদিনই তাঁহাকে বিমানযোগে ডাকিয়া পাঠাইল। তিনিও আর বিলম্ব না করিয়া সেইদিনই রওনা হইয়া গেলেন এবং স্কোয়াড্রনে আর ফিরিয়া আসিলেন না।

এবার আমাদের স্কোয়াড্রন স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার বিনাই দিন কয়েক কাটাইল।

রাজ্যবিহীন রাজা থাকা সম্ভব। কিন্তু রাজাবিহীন রাজ্য কখনও থাকে না। কোন স্কোয়াড্রনও স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার বিহীন হইয়া চলিতে পারেনা। যদিও কোন স্কোয়াড্রন-লীডার স্কোয়াড্রন ছাড়াও থাকিতে পারে।

অবাঞ্ছিত স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডারকে আমাদের স্কোয়াড্রন হইতে অপসারিত করিয়া কেন্দ্রীয়-দপ্তর অন্য কোথাও, যেখানে বিমানে উড়িবার কোন আশঙ্কা নাই, পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল। আমরাও এই রকমে তাঁহার হাত হইতে নিস্তার পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। নূতন স্কোয়াড্রন-কমাণ্ডার নিয়োজিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের বি ফ্লাইটের ফ্লাইট কমাণ্ডার লেফ্‌টেনান্ট লাল স্কোয়াড্রন চালাইবার গুরুভার বহন করিবার জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত হইলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ফ্লাইট লেফ্‌টেনান্ট হইতে উন্নীত হইয়া স্কোয়াড্রন লীডার পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং স্কোয়াড্রনের পাকা কমাণ্ডার হইলেন। সাথে সাথেই স্কোয়াড্রনে অবসাদের যে একটা ছায়া দেখা গিয়াছিল, তাহা অপসারিত হইল। স্কোয়াড্রন নির্জীব হইতে পুনরায় সজীব অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গেই আবার কানাঘুষা সুরু হইয়া গেল। সব-জান্তারা পুনরায় অতি সঙ্গোপনে নানা প্রকার নূতন তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য চেষ্টায় রহিল। কেহ বলিল 'ভল্টি তেন্‌জিয়ান্স' বিমান হইতে বোমা-বর্ষণের কাজ এবার আমাদের সাঙ্গ হইল। বিমান-বাহিনীর দিল্লীস্থিত কেন্দ্রীয়-

দপ্তর আমাদের স্কোয়াড্রনের কাজে খুব খুশী, সেইজন্য শীঘ্রই আমাদের নূতন কোন বিমান দেওয়া হইবে—এমন বিমান যাহা এখনও এদেশে আসে নাই। নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা গুজব রটিতে লাগিল।

কোন গুজব যখন রটে তখন সাধারণতঃ দেখা যায় যে সেই গুজব কোন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহাদের উর্ধ্বর মস্তিষ্ক হইতে গুজবের জন্ম হইয়াছে তাহাদের পক্ষে সেই সত্যের কথা জানা হয়ত একেবারে অসম্ভব ছিল। তবুও তাহাদের মস্তিষ্কে সত্যের আভাষ আসিল কেমন করিয়া? এ সব তথ্য বিশ্লেষণ করা সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নয়। গুজবে রটিল যে ভলটি ভেন্‌জিয়ান্স বিমানে শুধু সোজা-অবতরণ করিয়া (dive) বোমাবর্ষণ করা হয়। জঙ্গী-বিমানের সাথে লড়াইয়ের জন্য এ বিমান মোটেই কার্য্যকরী নয়। দুশমন জাপানীদের জঙ্গী বিমানের পাল্লায় পড়িলে ভল্‌টি ভেন্‌জিয়ান্স বিমান কোন মতেই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। এই কারণে আমাদের স্কোয়াড্রনকে নূতন প্রকার বিমানে শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করা হইবে—এমন বিমান যেগুলি জাপানী সেরা জঙ্গী বিমানগুলির সাথে সমানভাবে পাল্লা দিতে পারিবে। তখনকার দিনে জিরোই ছিল জাপানী জঙ্গী-বিমানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জিরোর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

রাঁচীর বিমান ঘাঁটির আম্র-কাননের ছাউনিতে আমাদের বেশী দিন বিশ্রাম করিতে হইল না। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের বিমানগুলির অকেগুলিই অন্য স্কোয়াড্রনের বৈমানিকরা আসিয়া লইয়া গেল।

মনে থাকিতে পারে বৎসর তিনেক পূর্বে পাইলট অফিসার গিলবার্টের সাথে বিশাখা-পটনম হইতে ট্রেনযোগে রাঁচীতে আসিয়াছিলাম। তখনকার কাজ ছিল বিলাতি-রাজকীয় বিমান-বাহিনীর আটাশ সংখ্যক স্কোয়াড্রন হইতে লাইসাণ্ডার বিমান সংগ্রহ করিয়া একশত চার সংখ্যক মিশ্র স্কোয়াড্রনে লইয়া যাওয়া। একশত চার নম্বর স্কোয়াড্রন তখন বিশাখা-পটনমে পত্তন করা হইয়াছে মাত্র। সেই যে মাসের এক সকালে আকাশে বিমান উড়াইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখার সময় বিমানের এঞ্জিন বিগড়াইয়া যায়। যাহার ফলে রাঁচী বিমান-বন্দরের অবতরণ পথের ঠিক এক কিনারে যে শুষ্ক নদী আছে সেই নদীতে বিমান সহিত পতন হয় এবং ফলে একজন গোরা বৈমানিকের মৃত্যু হয় আর পাইলট অফিসার গিলবার্ট সাংঘাতিকভাবে আহত হন। পতনের ফলে আমার দেহ বিমান হইতে ছিটকাইয়া শুষ্ক বালুর উপর পতিত হয়। কোমরে সামান্য আঘাত লাগা ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয় নাই। এ সমস্ত পুরাতন কথা।

তিন বৎসর পূর্বেকার আরও একটি পুরাতন কথা মনে পড়িল। সেবার রাঁচীতে বিলাতি আঠাশ সংখ্যক স্কোয়াড্রনে আমরা দুইজন ভারতীয় আসিয়াছিলাম। আমি আসিয়াছিলাম পাইলট অফিসার গিল্‌বার্ট আসার কয়েকদিন পূর্বে। রাত্রি বাসের জন্য একটা ছোট তাঁবু মিলিয়াছিল। আটশ নম্বর স্কোয়াড্রন রাঁচীতে বিশ্রাম লওয়ার জন্য আসিয়াছিল। সেইজন্য তাহারা তাহাদের কাজ করিত শুধু সকালে। বেলা বারটার পর বিমান-বন্দর

হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুপ্রহরের আহারের পর পরদিন সকাল সাতটা পর্যন্ত আর কোন কাজ নাই—বিশ্রামের জন্য প্রচুর অবসর। স্কোয়াড্রনের গোরা বৈমানিকরা তাহাদের অবসর কাল বেশীর ভাগ সময়ই স্কোয়াড্রনের ক্যান্টিনে অতিবাহিত করিত। সে রসভোগের জন্যে তাহা করিত আমরা সে রসে বঞ্চিত ছিলাম। সেইজন্য অপরাহ্নে সময় কাটান বড়ই মুস্কিল হইত। দুপ্রহরের আহারের কিছুকাল পরেই ছাউনির তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িতাম এবং চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতাম। ঘোরাঘুরিতে বেশ পরিশ্রম হইলেও সময় চমৎকার-ভাবে অতিবাহিত হইত। পরিশ্রমের ফলে রাত্রির আহারের জন্য ক্ষুধা বৃদ্ধি হইত এবং নিদ্রাতে কোন ব্যাঘাত হইত না, বরঞ্চ পরদিন সকালবেলা পর্যন্ত সুগভীর নিদ্রাসুখ উপভোগ করা যাইত।

ছাউনির আম্র-কানন হইতে বাহির হইয়া একটু অগ্রসর হইলেই প্রশস্ত রাজপথ। রাজপথ একটা ছোট্ট গ্রামকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া পার হইয়া দক্ষিণ দিকে বাঁক লইয়াছে, এবং একটি শুষ্ক নদীর উপর সেতু হইয়া ওপারে চলিয়া গিয়াছে। আরও দেড়-দুই মাইল অগ্রসর হইলে পথের বামদিকে লাল-টালির-ছাতের একটা সুন্দর বাংলো বাড়ী ছিল। বাড়ীতে কাহাকেও কখন থাকিতে দেখি নাই। এমন কি পাহারা দেওয়ার জন্য একজন চৌকিদার পর্যন্ত দেখি নাই। তখনও বাড়ীর চারিদিকে ছিল কাঁটা তারের বেড়ার ঘেরা কিন্তু কাঁটাতারের দরজা বন্ধ রহিয়াছে কখনও দেখি নাই, সব সময় খোলাই পড়িয়া থাকিত। ফুল গাছ দু একটা ছিল বটে, কিন্তু অযত্ন অবহেলা হেতু ফুল বিশেষ ফুটিতে দেখি নাই। বাগানের কোন শ্রী ছিল না।

ঐ পোড়ো বাড়ী আবিষ্কার করার পর রোজ অপরাহ্নে প্রায় সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত সেখানে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। রাজপথ চলিয়াছে দক্ষিণ দিকে। রাজপথের ওপারে পশ্চিম দিক। সন্ধ্যার দিকে যখন সূর্যদেব পশ্চিম প্রান্তে হেলিয়া পড়িলেন, তখন বাঁচীর আকাশে অপূর্ব বর্ণচ্ছটা শুরু হইল। অপরূপ মনোরম দৃশ্য। এই উপভোগ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিতে বেশ কষ্ট হইত।

কিন্তু অন্য উপায় ছিল না—কেননা রাত্রির আহারের জন্য ঘন্টা বাজিয়া উঠিত সন্ধ্যা আরম্ভের সাথে সাথেই। বিলম্ব করিয়া আহারের জন্য গেলে একটুকরা রুটি পর্যন্ত পাওয়া দুষ্কর হইত। তখন বাগান বাড়ী হইতে ধীরে ধীরে ছাউনিতে নিজের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিতাম।

একদিন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বশগুল হইয়া বসিয়া আছি। আর দূরে পশ্চিম দিকে ছোট টিলা পাহাড়ের পাস দিয়া সূর্যদেব চলিয়া পড়িতে শুরু করিয়াছেন—আকাশে বর্ণচ্ছটার খেলা আরম্ভ হইয়াছে—কে যেন আকাশের চারিদিকে আবির ছড়াইতে শুরু করিয়াছে। দুনিয়ার সব কথা ভুলিয়া গিয়াছি আর স্তব্ধ হইয়া আকাশে আবিরের রং বদলান দেখিতেছি, হঠাৎ "বাবুজী" ডাকে সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। তাকাইয়া দেখি চৌদ্দ-পনের বৎসরের একটি সুদর্শন বালক। মুখ দেখিয়া বেশ পরিচিত বলিয়াই মনে

হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার? কোথায় তাহাকে দেখিয়াছি? আর আমার সাথে তাহার কিই-বা প্রয়োজন। যুদ্ধের সময় নানা প্রয়োজনে মানুষ ফৌজীদের নিকট আসিয়া থাকিত। সেইজন্য ফৌজীদের সব সময় সতর্ক থাকিয়া চলাফেরা করাই বাঞ্ছনীয় ছিল।

বালক হিন্দীতে বলিল তাহাদের বাড়ী রাজপথের উপর যে গ্রাম সেইখানে। তাহাদের বাড়ীতে সে আর তার মা থাকেন। তাহার এক বড় ভাই ছিল। সে ফৌজে লড়াই করার জন্য গিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে ফৌজীদের কমাণ্ডারের নিকট হইতে পত্র আসিয়াছে যে তাহার ভাই নিখোঁজ হইয়াছে। নিখোঁজ হইয়া যাওয়ার মানে সে বা তাহার মা বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্য কোন একজন ফৌজীকে তাহার মা খুঁজিতেছিলেন যে এই কথার তাৎপর্য্য তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে। বিমান-বাহিনীর ছাউনিতে শুধু গোরাদেরই তাঁহারা দেখিয়াছেন, এবং গোরাদের জিজ্ঞাসা করায় হয়ত কোন বিপদ হইতে পারে, এই কথা মনে হওয়াতে তাঁহারা গোরাদের এই কথার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করেন নাই। আজ কয়েক দিন হইল একজন দেশী আদমীকে গোরাদের ছাউনিতে থাকিতে বালক ও তাহার মা দেখিয়াছেন। দেশী আদমীকে পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসায় কোন বিপত্তি না থাকার বিবেচনায়, আজ মা তাঁহার পুত্রকে এই দেশী আদমীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাহাদের বাড়ীতে লইয়া আসিতে বলিয়াছেন।

তখনই উঠিয়া পড়িলাম। পথে বালকের সাথে অনেক কথা হইল। তাহার নিজের সুখ-দুঃখের কথা। কোন স্কুলে পড়ে? ক্লাসে কোন ছেলেটি সব চেয়ে দুষ্টু আর কোন ছেলেটি পড়ায়-শুনায় ক্লাসে প্রথম? বালকের পিতা নাই। ঐ একটি ভাই, সেও ফৌজে লড়াই করিতে গিয়া নিখোঁজ হইল। বালকের পড়া-শুনা শেষ হইলে সে নিশ্চয় কোন স্কুলের শিক্ষক হইবে। শিক্ষকেরা কত সম্মানের পাত্র। ছাত্ররা শিক্ষকের সব কথা মানিয়া চলে। শিক্ষক হওয়ার পর সে মাকে অন্যত্র থাকিতে দিবে না—নিজের কাছেই রাখিবে, ইত্যাদি। নানা গল্প ও কথা শুনিতে শুনিতে গ্রামে আসিয়া বালকের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বালকের মাতা বালকের চেয়েও গৌরবর্ণ এবং সুশ্রী। মাতা ফৌজীদের পত্র বাহির করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন দেখাইলেন। পত্র পড়িয়া যাহা বুঝিতে পারিলাম, তাহার তাৎপর্য্য একমাত্র এক কথাই হয়, কিন্তু সে কথা ফৌজীর মাতাকে বুঝাইয়া বলার ক্ষমতা আমার ছিল না। বলিলাম পত্রের কথা আমিও এখন বুঝিতে পারিতেছি না; পুত্রের নাম-নম্বর ইত্যাদি চিরকুট কাগজে টুকিয়া লইয়া বলিলাম, যদি কখনও রাজধানী দিল্লীতে যাওয়া হয়, তখন ফৌজীদের কেন্দ্রীয় দপ্তরে গিয়া একবার খোঁজ লইব এবং কোন প্রকারে সেই সংবাদ তাঁহাকে জানাইবার চেষ্টা করিব।

মাতা-পুত্রে অনেক আদর যত্ন করিলেন। বলিলেন রোজ সন্ধ্যায় তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া যেন গল্প করিয়া যাই। ইতিমধ্যেই বালক আমাকে ভাইয়া বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কত অল্প সময়ের মধ্যেই নিকট আত্মীয় হইয়া গেলাম। সেইদিন

রাত্রে কিন্তু আহার এবং নিদ্রার ব্যাঘাত হইল। সমস্ত রাত্রি ভাইয়ার ভাইয়ের কথা মনে পড়িল। কিন্তু ভাইয়ার মাতাজীকে তাঁর পুত্রের বিষয়ে ফৌজীদের পত্রের তাৎপর্য্য বুঝাইবার কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইলাম না।

এর কয়েকদিন পরেই বিমান সহ নদীর শুষ্ক বক্ষে পতন হইল, এবং পতনের দিনই রাঁচী ত্যাগ করিয়া ট্রেনযোগে বিশাখাপটনমে ফিরিয়া গেলাম এবং ভাইয়ার কথা আর মাতাজীর কথা একেবারে বিস্মরণ হইল।

এবার রাঁচীতে আসার পর একদিন গেলাম মাতাজী আর ভাইয়ার সন্ধানে। দুই এক ঘর বাসিন্দা ছাড়া গ্রাম প্রায় শূন্য দেখিলাম। মাতাজী ও ভাইয়ার বাড়ি বন্ধ এবং বাড়ী দেখিয়া মনে হইল সেখানে কেহ বসবাস করে না। যে দুই এক ঘর বাসিন্দা গ্রামে ছিলেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহারা জানাইলেন যে বিমান বাহিনীর গোরারা গ্রামের উপর উৎপাত শুরু করে, তখন উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া মাতা-পুত্র যেখানে বিমান বাহিনীর গোরারা উৎপাত করিতে পারিবে না, তেমন দূর গ্রামে চলিয়া গিয়াছেন। ফৌজী পুত্রের সন্ধান মাতাজীর মিলিয়াছে কিনা অজানা রহিয়া গেল। আর অজানা রহিয়া গেল ভাইয়া তাহার পঠন-পাঠন সমাপ্ত করিয়া কোন স্কুলের শিক্ষকতা লইয়াছে কিনা?

এরপর শুরু হইল পুনরায় অন্য জায়গায় গমন করিবার জন্য প্রস্তুতি। মাস দুয়েকের মধ্যেই এই ভীষণ শ্রান্ত (?) স্কোয়াড্রনের উপর হুকুম আসিল নূতন প্রকার বিমান চালনা এবং মেরামত কার্য্য বিনা কালবাক্যে শিক্ষা করিয়া বর্ম্মা-অভিযানে রওয়ানার জন্য। সোজাসুজি নামিয়া আসিয়া ভল্‌টি ভেন্‌জিয়ান্স বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া জাপানী ফৌজের আক্রমণ ক্ষমতা লোপ করা হইল, এবার নূতন প্রকার বিমানে জাপানী স্থলসৈন্যের উপর হামলা করিয়া তাহাদের পিছু হটাইতে হটাইতে একেবারে বর্ম্মা মুলুক হইতে বিতাড়িত করার পালা।

নূতন বিমানের সমস্ত শিক্ষনীয় কাজ, উড়াইবার কায়দা হইতে আরম্ভ করিয়া বিমানের কলকব্জা মেরামত এবং এঞ্জিনের সমস্ত প্রকার কাজ ছয়-সাত সপ্তাহের মধ্যেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার জন্য দিল্লীস্থিত বিমান-বাহিনীর কেন্দ্রীয় অফিস হইতে বিশেষ হুকুম আসিল। আবার সাজ সাজ রব। এবার যাইতে হইবে দূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান সহর পেশাবরে। পেশাবর হইয়া কয়েকবার অন্য স্থানে যাওয়া হইয়াছে, কিন্তু পেশাবর সহরে কখনও বাস করা হয় নাই। এবার বিমানের কাজ শিক্ষার জন্য যাইতে হইবে অতি পুরাতন শহর পেশাবরে, দুর্দ্ধর্ষ পাঠানদের কেন্দ্রে।

ভল্‌টি ভেন্‌জিয়ান্স বোমারু বিমান মোটে কয়েকটা অবশিষ্ট ছিল। সেই বিমান গুলিতে কয়েকজন বৈমানিক রওনা হইলেন; আর সকলে মিলিয়া ট্রেনযোগে রওনা হওয়া গেল।

বৈমানিকরা নিয়ত বিমানে উড়িয়া বেড়ায়। তাহার গতিবেগ ট্রেনের তুলনায় অনেক-গুণ বেশী। সে যখন উড়িয়া চলে তখন বিমান তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্তে; বিমানের উপর

তাহার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ। যেমনভাবে তাহার ইচ্ছা, ঠিক সেইভাবেই সে বিমান উড়াইয়া লইয়া যায়। সে যখন বিমানে দূরদেশে যায় তখন তার গতিবেগ ঘণ্টায় অন্ততঃ তিনশত মাইল হয়। দৃশ্যপট পরিবর্তনের জন্য সময় খুব সামান্যই প্রয়োজন হয়। গতিবেগ যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে পটপরিবর্তনও ততই শীঘ্র হইবে। কিন্তু ট্রেনে যাইতে হইলে বৈমানিকের পক্ষে সময় কাটান দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। তাহার গতিবেগ ঘণ্টায় তিন চারিশত মাইলের পরিবর্তে হয় মোটে ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ মাইল। আর ট্রেনের গতির উপর তাহার কোন কর্তৃত্বই থাকে না। এই দুইয়ে মিলিয়া ট্রেনে যাত্রা বৈমানিকের পক্ষে হয় মহা আক্ষেপের বিষয়। তখন বৈমানিকের মধ্যে নানাপ্রকার রোগ দেখা দেয়। বিরক্তিই সেই রোগগুলির মধ্যে প্রধান। সেই অবস্থাতে তাহার না লাগে পুস্তক পড়িতে ভাল, না লাগে অন্য বৈমানিকের সাথে কথা কহিতে। যে পথ অতিক্রম করিতে তার পাঁচ-ছয় ঘণ্টার প্রয়োজন ছিল, ট্রেন-যোগে গেলে তখন তাহার প্রয়োজন হয় কম পক্ষে তিনদিন। প্রত্যেক দিন তখন তাহার কাছে মনে হয় প্রকাণ্ড লম্বা—দিন, সময়, কাল আর পার হয় না। বৈমানিকের কাছে তখন সময় খুঁটি গাড়িয়া বসিয়া থাকে। কিছুতেই আর শেষ হয় না। তখন তার এনুইয়ের (Ennui) চরম অবস্থা দেখা দেয়।

ঘটনাচক্রে এই অবস্থায় উপনীত হইলে, দুইজন অন্তরঙ্গ বৈমানিকের মধ্যেও শুধু বচসা ছাড়া, মনোমালিন্যের সাধারণভাবে যতগুলি প্রথা আছে সবগুলিই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এবার আমাদের ট্রেনে রওনা হওয়ার পর ঘটিলও তাহাই, শুধু একজোড়া বৈমানিক-দের বেলায় নয়, দুইতিনবার কয়েকজন বৈমানিকদেকে লইয়া এই দুঃখের ব্যাপার সংঘটিত হইল। যাঁহারা এবার কর্তাস্থানীয় ছিলেন, তাঁহাদের কাজ অনেক বাড়িয়া গেল। তাঁহাদেকে থাকিতে হইল খুব সজাগ হইয়া। এই প্রকার পরিস্থিতির যে উদ্ভব হইতে পারে সে কথা কর্তাব্যক্তিরা পূর্বাহ্ণেই অনুমান করিয়াছিলেন এবং সকল বৈমানিকদেকেই তাহাদের হেপাজত হইতে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র জোয়াড়ুনের আগ্নেয়াস্ত্র দপ্তরে জমা দেওয়ার হুকুম দিয়াছিলেন।

মনোমালিন্যের উৎস বোধ হয় দ্বেষ বা ঈর্ষা। তখন কেমন করিয়া কাহার মনের মধ্যে এই বৃত্তিগুলির প্রবেশ হইবে বলা শুধু শক্ত নয়, বোধ হয় অসম্ভব। পূর্বদিন যাহাকে রক্ষা করার জন্য আমার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করিয়াছি আজ তাহার হাঁটিয়া চলিবার ছন্দ আমার খুবই অপছন্দ, হয়ত তাহার কথা কহিবার ভঙ্গি দেখিয়া আমার মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হয়; এমনকি সে যখন হয়ত বিশ্রাম লইতেছে বা ঘুমাইতেছে, তখন তাহার অঙ্গের কোন বিশিষ্ট ভঙ্গি আমার মনের মধ্যে বিষম মারাত্মক ভাব সমূহের সঞ্চার করে। মনের মধ্যে এই বিরোধী ভাবগুলি কেমন করিয়া কোথা হইতে আসে সাধারণ মানুষের পক্ষে সে সমস্ত তথ্য জানা সম্ভব নয়। এই বিরোধীভাবগুলির চাপে পড়িয়া সাধারণ মানুষ অনেক সময় ভুল করিয়া বসে। পরে যখন সে ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিবার অবসর পায়—অর্থাৎ যদি কখনও সে সৌভাগ্য তাহার হয় তখন সে আশ্চর্য হইয়া দেখিতে পায় যে তাহার ব্যবহার

কথাবার্তা, কার্যকলাপ কিরূপ বুদ্ধিহীনের মত হইয়াছে। সাথীদের সাথে তাহার ব্যবহার কত হীন স্তরে নামিয়া গিয়াছে। অনুতাপ তাহার মনে একবার নিশ্চয়ই আসে, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই সংসাহস আর সৌজন্যের অভাবে সে তাহার বুদ্ধিহীনতার কথা স্বীকার করিতে পারে না। আর যাহারা পারে, তাহারা বোধ হয় সব সময় সকলের নিকট ভালবাসা আর সম্মানের পাত্র হয়।

ট্রেন পেশাবরে পৌঁছাইল। পেশাবর অতি পুরাতন শহর। ইতিহাসের কত নূতন পাতা এই শহরে বা আশে-পাশের স্থানে লিখিত হইয়াছে।

পেশাবরে পৌঁছাইবার পর দিন হইতেই আমাদের পুরা উদ্যমে নূতন বিমানের কাজ শুরু হইয়া গেল। এবার বোমারু বিমানের পরিবর্তে সত্যসত্যই জঙ্গী বিমানে শিক্ষা। তাহাও তখনকার সময়ের প্রায় শ্রেষ্ঠ জঙ্গী বিমান "হকার হ্যারিকেন"—ইহা আটটি ব্রাউনিং মেশিন গান অথবা দুইটি হিস্পানো কামান ও চারটি ব্রাউনিং মেশিন গান সমন্বিত।

Space donated by

NATIONAL TOBACCO Co.

of

INDIA Ltd.

1 & 2, Old Court House Corner

CALCUTTA-1

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্তিকা

১৫ই আগস্ট, ১৯৭০

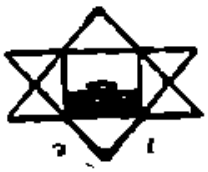

আগষ্ট ১৫, ১৯৭০

দেহ অবধি ভগবানকে
স্মরণ করবে।

—শ্রীঅরবিন্দ

"সাবিত্রী"
১১-১-৭১৪

সাবিত্রী

দ্বিতীয় পর্ব—সপ্তম সর্গ

রয়েছে দূরে তবু তার প্রভাব প্রবেশ করেছে সর্বত্র,
বুকের উপরে এঁকে রেখেছে দাসত্বের লাঞ্ছনা
কুটিল হৃদয় এক, হাস্য এক অদ্ভুত বিরস
ব্যঙ্গ করে ক্রূর জীবন-প্রহসনকে,
ঘোষণা করে মূর্ত বিপদের আগমনী,
করাল পদভার এক আপনাকে লঘুতর করে চলে নিঃশব্দে,
কেউ যেন বুঝতে না পারে, সতর্ক না হয়ে ওঠে।
কেউ শোনে না তাকে যতক্ষণে না এসে পড়ে একান্ত সন্নিকটে ;
অথবা সকলে দেখে ভাগবত আগমনের সুলক্ষণ যত,
অনুভব করে ভবিষ্য-সিদ্ধির সুবাতাস, স্বর্গীয় আশা এক,
শোনে নব বারতা, নব তারকার অপেক্ষায় রহে
শত্রু এসেছে গোচরে আলোর বসন পরিধান করে,
মনে হয় স্বর্গ হতে দেবদূত যেন নেমে এসেছে সহায় হয়ে,
অসত্যের হাতে সে দিয়েছে আয়ুধরূপে শাস্ত্র আর ধর্মবিধি,
জ্ঞান দিয়ে করে প্রতারণা, পুণ্যের সহায়ে হত্যা করে অন্তর-আত্মাকে,
স্বর্গগামী পথ ধরে নিয়ে যায় অনন্ত নরকে,
ঢেলে দেয় শক্তির আনন্দের প্রাচুর্যবোধ ;
আর অন্তরাত্মায় জাগে যখন সতর্কবাণী,
তখন সে আশ্বস্ত করে শ্রবণে সুমধুর সুরধারা বর্ষণ করে,
অথবা মনকে নিয়ে যায় বন্দী করে আপন জাল বিছিয়ে,
তার নিরেট ন্যায়শাস্ত্র মিথ্যাকে সত্য করে ধরে,
তার পুণ্য পাণ্ডিত্যে বিজ্ঞেরা হতবাক,
তার কথা যেন ভগবানের আপন কণ্ঠ,
বিশ্বাসঘাতকতা আর চাতুরী দিয়ে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ।
সে রাজ্যে সত্য কখন হ'ল একটা কৌশল মাত্র,
হাসির মধ্যে রয়েছে ফাঁদ পাতা
আর বিপদের আবরণ হ'ল নির্বিঘ্নতা,
সহজ বিশ্বাস তার প্রবেশদ্বার,
মিথ্যা আসে চক্ষে সত্যের হাসি নিয়ে

বন্ধুমাত্রই হতে পারে শত্রু কিংবা গুপ্তচর ;
যে হাতে তুমি হাত মিলিয়েছ তাতে লুকোন রয়েছে শাণিত ছুরিকা,
আলিঙ্গন হতে পারে শেষ নিয়তির লৌহ-পিঞ্জর।
যন্ত্রণা আর বিপদ তাদের ভীত ত্রস্ত শিকারকে অনুসরণ করে চলে,
কথা বলে তার সঙ্গে কোমল স্বরে অসহায় বন্ধুজন যেন এক,
অকস্মাৎ আক্রমণ ঝাঁপিয়ে পড়ে তীব্রবেগে অলক্ষিতে ;
ভীতি হৃদয়কে আঁকড়ে ধরে পদে পদে,
কণ্ঠে তার ফুকারে মর্ম্মন্তুদ বেদনা,
ডাকে সে, উদ্ধার করে কেবা, নিকটে কেউ নাই কোথা ;
সকলেই চলে অতি সাবধানে, মৃত্যু রয়েছে সদা আশেপাশে ;
কিন্তু ব্যর্থ এ প্রয়াস সতর্ক হয়ে চলে,
যা কিছু রক্ষা করবে তারাই হয়ে ওঠে মৃত্যুপাশ ;
তার পর অবশেষে দীর্ঘ অপেক্ষার পরে মুক্তি আসে যখন,
নিয়ে আসে সামর্থ্যহারা সুখস্বস্তি এক,
তখন সে হয় শুধু পরিচ্ছিন্ন পথ এক ঘোরতর নিয়তির অভিমুখে ;
সন্ধি নাই কোথাও, নাই কোথাও নিবিঘ্ন আশ্রয়,
নিদ্রার অবসর নাই, অস্ত্রশস্ত্র তুলে রাখা যায় না ;
সংগ্রামের আকস্মিক আক্রমণের জগৎ এ যে।
প্রত্যেকে এখানে বেঁচে রয় শুধু আপনার জন্যে
প্রত্যেকের যুদ্ধ প্রত্যেকের সঙ্গে, সকলেই সমান বিদ্বেষ নিয়ে,
দাঁড়ায় সেই মনের বিরুদ্ধে যে চায় উচ্চতর শ্রেয় এক।
সত্য হয়েছে নির্বাসিত, যাতে কণ্ঠ তার যায়না শোনা,
তার আলো দিয়ে অন্ধকারের বুকে দুঃখ না হানে,
তার জ্ঞানের মাহাত্ম্য দিয়ে তিরস্কার না করে
বর্ত্তমানের স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয়েছে অরাজক রাজ।
এখন তবে দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন, মর্ম্মদেশ তবু রয়ে যায় তেমনি ভীতিপ্রদ :
রূপ হ'ল ভিন্ন, প্রাণ সেই একই :
রাজধানী আছে, রাজ্য নাই,
রাজা নাই, রয়েছে কেবল বিবদমান দল যত,
সনাতন অজ্ঞানের সে দেখল নগর এক,
আলোহারা মাটির উপরে প্রতিষ্ঠা তার,
প্রত্যেকে চলেছে নিঃসঙ্গে আপন আপন অন্ধকারে,
এই একমত তাদের শুধু, পাপের বিভিন্ন ধারায় চলবে তারা,
প্রত্যেকে চলবে আপন পথে আপন স্বার্থের তরে,

আর-সকলের পরে আরোপ করবে একই মিথ্যা, একই অসত্য ;
অহং সেখানে মহাপ্রভু, আসীন ময়ূর সিংহাসন 'পরে,
পাশে স্থান নিধ্যার, সহচরী তার, রাণী তার,
বিশ্ব তাদেরই দিকে তাকিয়ে রয়েছে স্বর্গ যেমন ফিরে রয়
অটুট সত্যের দিকে, ভগবানের দিকে ;
অন্যায় তার অটুট রাজাদেশ বলে ন্যায়সঙ্গত করে ধরেছে
ভ্রান্তির বিধিবদ্ধ ব্যবসায়ে যত ওজনের মহা ভার,
কিন্তু ওজন সব মিথ্যায় ভরা, সমান তারা নয় কখনও ;
হাতে তার তুলাদণ্ড আর তরবারি, শোনদৃষ্টি রেখেছে
পাছে বিশ্বাসঘাতক বাক্য কোন ব্যক্ত করে ধরে
তার প্রাচীন কু-শাসনের সম্পূজিত সূত্র সব ;
স্বেচ্ছাবৃত্তি যথাতথা বিচরণ করে সমুচ্চ বাক্‌বৈভবে আপনাকে আবৃত করে,
উচ্ছৃঙ্খলতা ঘোষণা করে চলে শৃঙ্খলা আর ন্যায়াধিকারের বার্তা,
স্বাধীনতার পূজার জন্য নাই কোন বেদী,
সত্যকার স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাজ্য আর বধ্য শিকারের মত,
সম্মেলন বা মৈত্রী কোথাও দেখা যায় না,
প্রত্যেক গোষ্ঠি ঘোষণা করে তার আপন অকাট্য নির্মম বিধি
নীতিকথার পটে ক্রূরলেখায় আঁকা শাস্ত্রের বিধান যত,
অথবা শুধু মতবাদ এক মত্তাবেগে আদৃত প্রশংসিত
বেদবাক্য যেন সমুচ্চ স্বর্গের পুণ্য বিধানের,
কোন বাহ্য অনুষ্ঠান যেন বর্ম্মাবৃত লৌহকবচরক্ষিত,
এনে দিয়েছে তার আভিজাত্যের কঠোর গর্ব্বিত ভঙ্গিমা,
তার নির্ম্মম নিদারুণ সভ্যতার ঠাট,
শিক্ষাহীন হৃদয়হীন এক ঘোষ্ঠ গোষ্ঠি
উঠে এসেছে পৃথিবীর আদিম জঠর ভেদ করে
বলাৎকার আর বাহ্য ব্যবহার হ'ল তাদের সত্য আর ধর্ম্ম ;
শকুনির বুভুক্ষা চর্ব্বণ করে তার কাম্য খাদ্য,
শাণিত চঞ্চু হানে আঘাত আর নখরাগ্রে দীর্ণ করে দুর্বল ভক্ষ্য যত ;
মনোরব পাপের মধুর অন্তঃপুরে
প্রকৃতিকে মেনে চলে তারা, নয় কোন নীতিমান ভগবান।

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ

(একটি পুরাতন চিঠি)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ "অরবিন্দ বাবু"র জীবনের আদর্শ কি? উত্তরটা আমাকে খুব অল্প কথায় দিতে হইবে, সুতরাং আমাকে বলিতে হইবে কয়েকটি মোটা-কথা, তাতে তোমাদের বুঝিবার যদি কিছু অসুবিধা হয়, ক্ষমা করিবে, আমার কিন্তু তাতেই বুঝাইবার সুবিধা হইবে। আর দ্বিতীয় বিপত্তি অবশ্য তোমাদেরই দিক হইতে আমার বলার ভঙ্গী; আমি গল্প করিতে জানিনা, আমার কথা হইবে কাটখোট্টা রকমের, সাধুভাষায় যাকে বলে 'দার্শনিক'। এ দুটি দ্বিতীয়িকায় যদি তোমরা ভয় না পাও, তবে অবহিত চিত্ত হইয়া শুনিতে পার; ভণিতা শেষ করিয়া আমি আরম্ভ করিতেছি।

অরবিন্দ বাবুর জীবনের আদর্শ—প্রশ্নটাও কিছু রূপকথার প্রশ্ন নয়, বলিয়া রাখি—এ কথার দুই অর্থ হইতে পারে, 'আদর্শ' কথাটা 'অরবিন্দ বাবুর' সাথে যাইতেছে না, 'জীবনের' সাথে যাইতেছে অর্থাৎ অরবিন্দ বাবু নিজের জীবনে কি করিতে চাহেন তাই, না অরবিন্দ বাবু জীবনকে—মানবজীবনকে কি করিতে বলেন তাই। দুই-ই শেষে এক হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, অরবিন্দ বাবুর এটাও আদর্শ যে, নিজে যাহা করেন না বা করিতে পারেন না, পরকে তাহা করিতে বলেন না, পরকে তিনি সেই আদর্শই দেন যাহা নিজের জীবনে পাইয়াছেন গড়িয়াছেন। সুতরাং যে অর্থেই প্রশ্নটা লও না, উত্তর একই হইবে। অরবিন্দ বাবুর জীবনের আদর্শ, আমি এক কথায় বলিব—জীবন। তবে সে জীবনের ঠিক ঠিক অর্থটা বুঝা দরকার। সে জীবন কি? সে জীবন কি নয় তাই দেখি আগে।

অরবিন্দ বাবুকে তোমরা অনেকেই মনে কর সাধু, সন্ন্যাসী আর সেই জন্যেই হয়ত তাঁহাকে পূজা কর। একবার একখানা কাগজে তাঁহাকে মস্ত সাধু সন্ন্যাসী বলিয়া নানা উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল—তিনি সে সব পড়িয়া হাসিয়াই কুটপাট, সময়ে সময়ে সাধু সন্ন্যাসী নাম দিলে তিনি যে চটিয়াও না গিয়াছেন এমনও নয়। সন্ন্যাসীরা জীবন চাহেন না, তাঁহারা চাহেন জীবনকে ছাড়াইয়া আর একটা কিছু পাইতে। জীবনের যত সহজ কাজকর্ম—অন্নবস্ত্র সংস্থান, ঘর গৃহস্থালী, লেখাপড়া, দেশের কাজ দশের কাজ অর্থাৎ সমাজের মধ্যে থাকিয়া সকলের সাথে মিলিয়া মিশিয়া যত কাজ কর্ম, সন্ন্যাসীরা সে সব চাহেন না; সে সকল ত্যাগ করিয়া কিম্বা হাতের মধ্যে পড়িলে কোন রকমে শেষ করিয়া তাঁহারা ধ্যানে সমাধিতে আপনাকে শেষ করিয়া হারাইয়া ফেলিতে চাহেন। অবশ্য সন্ন্যাসীরা বলেন জীবনকে তাঁহারা ছাড়েন না, হারান না, তাঁহারা পান জীবনের সারপদার্থটুকু, গভীর, নিবিড় জমাট একটা জীবন। কিন্তু জীবনের সাধারণ অর্থ তা নয়, অরবিন্দ বাবু অন্ততঃ সে রকমের জীবন চান না। সাধারণতঃ জীবন অর্থ আমরা বুঝি বাঁচিয়া থাকা, সুখে থাকা, স্বাস্থ্যে থাকা, সমাজের সকলের দাবিদাওয়া মিটাইয়া কাজকর্ম করিয়া চলা। অরবিন্দ বাবুও তাই বলেন। সন্ন্যাসীর জীবন বা অ-জীবন নয়, সাধারণের সহজ জীবনের ছাঁচেই অরবিন্দ বাবুর জীবনের আদর্শ ঢালা।

তবে আর সকলের সাথে অরবিন্দ বাবুর পার্থক্য কোথায়? খাওয়া দাওয়া নিত্য-নৈমিত্তিক কাজকর্ম্ম করা ত সকলেই করে, এর মধ্যে আদর্শ আবার কোথায়? অরবিন্দবাবু কি ইহার জন্যই সাধনা করিতে বার বৎসর অজ্ঞাতবাসী হইয়াছেন? না, তাহা নয়। অরবিন্দ বাবু সাধারণ জীবন চাহেন, তাহা কিন্তু আমার একেবারে তোমার আমার মত ভয়ানক সাধারণ জীবন নয়। খাই দাই যার যার মত কাজ করি যার ঘুমাই, এ রকম জীবন নয়; এমন কি এ সকলের সাথে শিক্ষা, শক্তি, বিদ্যা, ধর্ম্ম প্রভৃতির চর্চা যোগ করিয়া দিলে যে জীবন হয় সে জীবনও নয়। জীবনের যত ক্ষেত্র যত প্রকাশ তাহা ত থাকিবেই, জীবন পূর্ণ-জীবন হইবে এবং সকলের পরিচিত সাধারণই থাকিবে—এ সকল হইল বাহিরের কথা; কিন্তু সেটাকে চালাইতে হইবে ভিতরের একটা নূতন ভাবে, নূতন আলোকে, নূতন প্রেরণায়।

অরবিন্দ বাবু বলেন জীবনের মধ্যে যে দুঃখ কষ্ট নিরানন্দ অসামর্থ্য আছে দেখিতে পাই সেটা জীবনের দোষ নয়। জীবনকে যদি আমরা চালাইতে জানি তবে তাহাই হইয়া উঠে আনন্দের সুষমার পূর্ণ বিগ্রহ। জীবন যেন একটা নদী, নদী যে সকল কাদাবালি লইয়া চলে সে জন্য হউক অথবা নদীর উপরে যে পুল বা বাঁধ দেওয়া হয় সে জন্য হউক অথবা অন্য পাঁচরকম কারণে হউক মোহনা যখন বন্ধ হইতে থাকে যখন নদীর মধ্যে চড়া পড়িতে থাকে তখন দেখ নদীর চেহারা কেমন হইয়া পড়ে—বিস্তৃত বিসর্পিত বক্ষে কেমন ধুক ধুক করিয়া চলিয়াছে একটি ক্ষীণ মৃতপ্রায় ধারা। জীবনের চেহারাও আমরা ঐরকম দেখিতেছি—শুষ্কপ্রায় মৃতকল্প; কারণ জীবনের মোহনাটা আটকাইয়া গিয়াছে জীবনের সাথে শত অশুদ্ধি ময়লা জিনিষ লইয়া আমরা চলিয়াছি। আসল জীবন, পূর্ণ দুইকূল ছাপান জীবন পাইব তখনই যখন জীবনের মোহনা খুলিয়া দিয়াছি, জীবনকে নির্ম্মল টল টল করিয়া তুলিয়াছি।

জীবনের নদ উঠিয়াছে, গিয়া পড়িয়াছে এক মহাসাগরে। সেই মহাসাগরের খোঁজ লইতে হইবে। সন্ন্যাসীরা জীবনের ওপারে যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন, অরবিন্দবাবু বলেন তাঁহারও জীবনের উৎস জীবনের সাগর-সঙ্গম হইতেছে সেই একই অমৃত। তবে সন্ন্যাসীরা সে অমৃতকে পাইতে চান জীবনকে ছাড়িয়া দিয়া, অরবিন্দ বাবু জীবনের মধ্যেই সেই অমৃতকে বহাইয়া দিয়া জীবনকে শুদ্ধ পূর্ণ সিদ্ধ ও সার্থক করিয়া তুলিতে চাহেন।

জীবনের মূল সেই অমৃত জিনিষটা কি? সাধু সন্ন্যাসীরা বলেন ব্রহ্ম, সাধারণ লোকেরা বলে ভগবান—আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমি বলিব সেটা তোমার নিজের অন্তরাত্মা। মোটের উপর এ তিনটি নাম এক জিনিষেরই। তুমি নিজে আসলে কি বস্তু, কি সত্তা তোমার মধ্যে মূর্ত্তি ধরিয়াছে, তাহাই তোমার ভাগবতশক্তি, তোমার ব্রহ্ম-সত্তা। এ জিনিষটির স্বরূপ কি, তাহা বলিবার স্থান আমার আর নাই, শুধু এইটুকু বলিব, সেটা অনুভবের জিনিষ, সেটিকে পাইলে মানুষ বোধ করে তার সবই পূর্ণ অখণ্ড—সে অসীম, সনাতন, শক্তিমান, জ্ঞানবান, সে যেন অনন্ত বিরাট। ভিতরে এই ভাবটি জাগাইয়া, ইহারই আলোকে ইহারই প্রেরণায় তোমার অন্তঃকরণের প্রত্যেক স্তর উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে, নূতন গড়ন দিয়া গড়িতে হইবে—তোমার চিন্তা, তোমার ভাব, তোমার

কর্ম্ম সব পাইবে একটা রূপান্তর ও একটা নূতন জীবন আর তোমার জীবনের প্রতিষ্ঠান তোমার কর্ম্মের ক্ষেত্রও আস্তে আস্তে সেই সাথে রূপান্তরিত সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

অন্তরাত্মার ভাগবত অমৃত সিঞ্চনে তোমার জীবনকে পরিষ্কার পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিবে, তবেই সে জীবন হইবে পূর্ণ শুদ্ধ। কিন্তু এ জন্য বাঁধাধরা কষ্টকল্প সাধনার দরকার নাই। সাধারণ যোগীরা বা ধার্ম্মিকেরা যে রকম ব্রত নিয়মাদি পালন করেন সে রকমে নিজেকে যন্ত্রণা দিবেনা। সাধারণভাবে যেমন চলে জীবন সেইভাবেই চলিতে থাকুক, তোমার যেমন ইচ্ছা করে তেমনি সে কাজ করিও। বাহিরের আটঘাটের উপর কোন জোর দিওনা। আগে বদলাইতে থাক ভিতরের ভাবটা—মনটাকে ক্রমে সর্ব্বাবস্থায় শান্ত অচঞ্চল করিয়া তোল আর অনুভব করিতে থাক অসীম অমৃত সত্তাকে। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত যখন তোমার সমস্তখানি ভিতরে ভিতরে একটা সাম্যে শান্তিতে সুখে হাসিতে টলটল করবে তখন তোমার সেই অমৃতসত্তা হইতে সকল কাজ সহজ স্ফূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিবে। বাহিরের কোন কাজই দূষণীয় নয়—ভিতরের অমৃত-সত্তার সহিত তোমার যে কাজের যত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ—সে কাজ বাহা দৃষ্টিতে যেমনি বোধ হউক না কেন তাহাই হইতেছে তোমার ধর্ম্ম, তোমার ভাগবত বিভূতি, তোমার দিব্যজীবন।

অরবিন্দ বাবুর আদর্শ এই দিব্যজীবন। এই দিব্যজীবনের জন্য তিনি সকল মানুষকে আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলেন তাঁহার সাধনা শুধু নিজের জন্য নয়—তিনি দুই এক জনকে লইয়া তৃপ্ত নহেন। মানুষের সমাজের ভিতর হইতে গড়িয়া তুলিতে, সৃষ্টি করিতে হইবে পূর্ণ ভাগবত জীবনের অধিকারী একটা দেবসমাজ। তিনি চাহেন এমন কতকগুলি পুরুষ ও নারী যাহারা এইরকম জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ। ইহাদের চারিদিকের, এক কেন্দ্রে হউক আর বিভিন্ন কেন্দ্রে হউক, নূতন সমাজ ক্রমে দানা বাঁধিয়া উঠিবে, সমস্ত জগতে তাহা ছাইয়া পড়িবে। অরবিন্দ বাবুর দেশসেবাও এই উদ্দেশ্যে। তিনি বিশ্বাস করেন নূতন নূতন সমাজের; তাঁহার কথায় দেব-সঙ্ঘের বীজ এই ভারতে, ভারতের মধ্যেও বাংলা দেশে, বাংলাদেশেও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে। বাংলার ছেলেমেয়ে তাঁর ভরসা, ভারতের ভবিষ্যৎ মানবজাতি যে রূপ গ্রহণ করিবে, বাংলার ছেলেমেয়েকে সেই রূপ প্রথমে অন্তরে ধরিতে হইবে, তারপর নিজের জীবনে ফলাইতে হইবে, তারপর পরস্পরে পরস্পরে মিলিয়া সমাজ বাঁধিয়া উঠিতে হইবে।

অরবিন্দ বাবু বলেন এই যে নূতন দেবসমাজ এটা তাঁর কল্পনা নয়। তিনি স্থির জানেন এ কাজ হইবেই। তুমি বিশ্বাস কর বা না কর কাল-পুরুষ তাঁহার কাজ করিয়া লইবেনই। তোমার শ্রদ্ধা থাকে, সামর্থ্য থাকে কালপুরুষ তোমাকে মাথায় করিয়া লইয়া লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিবে, আর যদি অল্পপ্রাণ অশ্রদ্ধার দাস হও তবে তোমাকে পদদলিত করিয়া যাইবে। তিনি প্রকৃতির গতি দেখাইয়া বলেন, উদ্ভিজ্জ হইতে পৃথিবীতে পশু উঠিয়াছে, পশু হইতে মানুষ উঠিয়াছে—এইবার মানুষ হইতে সিদ্ধ বা দেবতা উঠিবে। এটা নিয়তি। প্রশ্ন—তুমি নিয়তির সহায় হইবে না অন্তরায় হইবে?

আমার মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল। যে কথাগুলি বলিলাম তাহা স্পষ্ট, তোমাদের বোধ-গম্য হইয়াছে কি না জানিনা। কিন্তু জিনিষটি ত জ্যামিতির একটা প্রতিজ্ঞা নয় যে

একবার দেখাইয়া দিলেই সব বুঝিয়া ফেলা যায়। জিনিষটি তিলে তিলে জীবনের প্রতিপদে বুঝিয়া অনুভব করিয়া চলিতে হইবে। আমিও ত একদিনে বুঝি নাই। আর এখনই সব বুঝিয়াছি কি? যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতেই লাগিয়াছে দশটি বৎসর।

তারপর আর একটি কথা বলিয়া শেষ করি। তোমাদের হয়ত কৌতূহল থাকিতে পারে, অরবিন্দ বাবুর এই আদর্শ বা সাধনা সম্বন্ধে আমার নিজের মতামত কি? নিজের মতামত আমি বলা প্রয়োজন মনে করিতাম না, কিন্তু বলিলে তোমাদের যে শুধু কৌতূহলই নিবৃত্তি হইবে তাহা নয়, বোধ হয় কিছু লাভও হইতে পারে, তাহা বলিতেছি। অরবিন্দ বাবুর যে রকম শ্রদ্ধা আমার সেরকম নাই, হয়ত শ্রদ্ধার হেতুস্বরূপ যে সকল উপলব্ধি তিনি পাইয়াছেন আমি তাহা এখন পর্য্যন্ত পাই নাই। মানুষকে এখন এমন দীন হীন দেখি, আমার মধ্যে, আমার চারিদিকে সমাজের সকল ভাইবোনদের মধ্যে এত কার্পণ্য দেখি, জানিনা এরা সকলে কি রকমে দেবতা হইয়া উঠিবে। হইতে পারে, ক্ষুদ্রের মধ্যে পঙ্গুর মধ্যে আমি শুধু ক্ষুদ্রত্ব শুধু পঙ্গুত্বটাকেই বড় করিয়া দেখিতেছি, বৃহতের সামর্থ্যের দিকটার উপর তেমন জোর দিইনা। অরবিন্দ বাবু প্রায়ই বলিতেন মানুষের খারাপ দিকটার উপর মোটেও নজর দিওনা, সেটাকে তাচ্ছিল্য করিও, শুধু নজরে রাখিও ভালর দিকটা, এটার উপরই জোর দিও—তবে দেখি ভালটা কেমন ফুটিয়া উঠিতেছে আর খারাপটা তার আওতায় পড়িয়া শুকাইয়া মরিতেছে। সে যাহা হউক, পূর্ণ শ্রদ্ধা বিশ্বাস না থাকিলেও, অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস আমার নাই। আর আমার জোর এইখানে যে, এই আদর্শ যদি কাল্পনিক অসম্ভব আকাশ-কুসুমই হয় তবে সে মিথ্যাকে আমি সত্যের চেয়ে বেশী ভালবাসি। আর সেটা যে মিথ্যা তার প্রমাণ আজ হইবেনা, দূরে থাকিলেও হইবেনা। সোনা কি পিতল তাহা কষিয়া দেখিতে হইবে। আমি কষিয়া দেখিতেছি; তোমরাও আসিয়া কষিয়া দেখিতে পার।

১৯২০

খামারের মেয়ে

শ্রীঅরবিন্দ

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পালেরমোর বেলট্রানের সহরতলীস্থ বাগানবাড়ি]

আন্তোনিও—বাজিল

বাজিল

তোমার জন্যে আমি লজ্জায় মরে যাই। একজন মহিলা এসে তোমার প্রেম জানাচ্ছেন—তাঁর রূপ-শ্রীর তুলনা নেই, কি চমৎকার মনোহর তার ভাব-ভঙ্গিমা, মনে হয় স্বর্গের দেবী যেন, প্রত্যেক বাক্যটির পরে থেমেছে, তোমাকে সুযোগ দিয়েছে—আর তুমি? কি লজ্জা! তিনি উত্তর দিয়েই চলেছেন কক্ষটির নৃতবৎ নৈঃশব্দকে লক্ষ্য করে যেন। ধিক্ তোমায়, তোমার নাম আন্তোনিও নয়, তুমি বেলট্রানের সন্তান নও। তোমার আত্মীয়-স্বজন হ'ল আল্পস্ পাহাড়ের তুষারপ্রপাত আর না হয় ঐ থামটাকে বলতে পার, হ'ল তোমার পিতৃদেব।

আন্তোনিও

বাজিল! তোমার ভর্ৎসনার উপযুক্ত আমি। কিন্তু ব্যাপারটি যদি আবার ঘটে তবে আমি জানি আবার আমি বোবা বনে যাব। আমার জিহ্বা কল্পনায় টৈ-টুম্বুর, কিন্তু কার্যতঃ ঊষর সে। আমি তার থেকে দূরে যখন তখন তার সঙ্গে প্রেমালাপে দেবতা জাগে আমার কণ্ঠে, আমার মন কথার তোড়ে ভেসে যায় নীল নদের বিস্তার যেমন, জলের ধারায় যায় ভেসে, কিন্তু আমার সম্মুখে উপস্থিত হলেই আমি হয়ে পড়ি তার মূক অধম মানুষটি। যা খুশী আমাকে নিয়ে সে করতে পারে। আহা, মনে কর ত' তার কথাগুলি, তারপর যখন সে—সে, আমার শ্বেতশুভ্রা দেবী—তার দৃষ্টির হাসা-উদ্ভাসে স্বর্গের করুণা ঢেলে দেন, কণ্ঠে বিশ্বের মহাসঙ্গীত তুলে ধরেন—লাভ-রক্তিম সারলোর গোলাপফুলটি যেন, অর্দ্ধ-নারী, অর্দ্ধ-দেবী—সে যখন আমাকে বরণ করে নিল বিনা আয়াসে, আমাকে স্নান করিয়ে দিলে তার বুকের বিপুল ঔদার্যের ধারায়—তখন আমি কথা বলতে পারি? তখন মুখের ভাষার অর্থ হ'ত চটুল ভালবাসা।

বাজিল

যা, যাও; তোমার মত লাজুক প্রেমিকেরা পুরুষের কলঙ্ক, আমাদের রাজত্বে

রাজদ্রোহী তারা। আমি তোমাদের সব-ক'টাকে বনবাস দিয়ে দিতাম, আটকে রাখতাম নরুণীপে যেখানে মেয়েদের একেবারে প্রবেশ নিষেধ যাতে তোমাদের মত জাতটা নির্ব্বংশ হয়ে যায়।

আন্তোনিও

তুমি বলছ কথা প্রেমের সারনর্ম্মের বিরুদ্ধে, প্রেমের জীবন সেবায়।

বাজিল

নির্ভেজাল রাজদ্রোহ! পুরুষদের মেয়েদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর করে গড়া হয়নি? পুরুষেরাই ত' মেয়েদের রাখবে শাসনে, আপন বলে বাধ্যতা আদায় করবে, আপন জ্ঞানে তার ইচ্ছাকে চালাবে, আপন বুদ্ধিতে তাকে নির্ব্বাক করে রাখবে—তিনটি ভীষের কর্ম্ম। জাননা, মেয়েরা একবার স্বাধীন হ'লে পৃথিবী ভাসিয়ে দেবে প্রলয় জলে তাদের বাকাস্রোতে, তাদের বুদ্ধি অনুসারে সৃষ্টিকে দাঁড় করাবে উল্টে তার চূড়ার উপরে, ন্যায়শাস্ত্রকে ঢেলে নূতন করে গড়তে হবে, অঙ্কশাস্ত্র মাতাল হয়ে চলবে আর বিচারশক্তি হতাশায় গদি ছেড়ে দেবে। মেয়েদের সংকল্প একবার যদি ছাড়া পায় তবে ইন্দ্রদেবের বজ্রও তাকে থামাতে পারবে না।

আন্তোনিও

তুমি ত' বেশ সহজেই বলে যাচ্ছ, কিন্তু একবার যদি প্রেমে পড়তে তবে ওসব কথা নিজে থেকে ফিরিয়ে নিতে, কোন তর্ক দেখানর প্রয়োজন হ'ত না।

বাজিল

আমি? আমি কথা ফিরিয়ে নেব? আন্তোনিও, তোমার অবস্থা যদি একটু আগে থেকে জানতাম। দেখিয়ে দিতাম কি করে প্রেম করতে হয়।

আন্তোনিও

প্রেম করবে একটি মেয়ের সঙ্গে? আচ্ছা! বোর্ডের উপরে অন্ততঃ ছক এঁকে শিখিয়ে দাও ত' আমাকে।

বাজিল

বেশ, নিশ্চয় করব তা। তোমার মত দুর্ব্বল হৃদয়ে যদি একটু সাহস দিতে পারি। হ্যাঁ, আসছে মনে এখন। ঠিক করলাম আমি নূতন একটা প্রেমশাস্ত্র লিখে ফেলব। তাই হবে একমাত্র নব বাৎস্যায়ন।

আন্তোনিও

বল, বল, বল আরও বল, শুনছি কান পেতে।

বাজিল

সর্ব্বপ্রথমে তাকে চুমু খাব।

আন্তোনিও

কি? অনুমতি না নিয়ে?

বাজিল

অনুমতি? মেয়ের অনুমতি চাই চুম্বনের জন্যে? আর কোন কাজের জন্য তার সৃষ্টি হয়েছে?

আন্তোনিও

যদি সে চটে যায়?

বাজিল

সে ত' আরও ভাল! পুনরাবৃত্তি করে তাকে বুঝিয়ে দাও তোমার পুরুষালি শক্তিটা কি? আরম্ভেই তবে একটা বিশেষ বিজয়। তা ছাড়া তোমার নিজের দিক থেকেও তোমার কর্ত্তব্য হবে তোমার নিজের পছন্দসই। অধিকন্তু তারও খুব পছন্দ হবে। যখনই সে ভর্ৎসনা সুরু করবে আমি তার মুখ বন্ধ করে দেব আমার বাক্‌চাতুর্যে, হাস্যে চূর্ণ করে দেব দুর্গম দুর্গপ্রাকার অবধি। একবার যদি তার মুখে হাসি ফোটাতে পারি তাহ'লে সে হবে বলত্রয়ে বিজয়, অশ্ববাহী পদাতিক আর গোলন্দাজ কর্থাৎ বাক্যের বুদ্ধির ও পেশীর বল। বাকী রইল সন্ধি—ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহায়ে হোক বা বিনাসহায়ে। 'ওটি ত' বাহ্য রূপমাত্র, আসল বস্তুতে কোন পার্থক্য ঘটায় না।

আন্তোনিও

তোমাদের মত মানুষের জন্য দরকার ফাঁসিকাঠ। বেশ হ'ল, তারপর?

বাজিল

কিছুই নয়, যদি না তুমি তোমার বিজয় পাকা করতে চাও—শুধু লুঠ করা নয় তৈমুরের মত—তাও অবশ্য তোমায় আমি শিখিয়ে দেব। তাকে শুধু সমঝিয়ে দিতে হবে তার অধীনতার কথা। নিশ্চিতভাবে অব্যর্থভাবে তাকে দেখিয়ে দাও তোমাকে পেয়ে কি সৌভাগ্যবতী হয়েছে সে, সমস্ত জীবন ধরে কৃতজ্ঞ থাকলেও শেষ হয় না, বুঝিয়ে দেবে তাকে তুমি তাকে হরণ করেছ তারই মঙ্গলের জন্য, তাকে সুসভ্য সুশিক্ষিত করে তুলবার জন্যে। প্রত্যেকটি কথার জন্য দণ্ডবিধান করবে যদি তাতে থাকে ভালবাসার অভাব। পীড়ন করবে, শেষ মুহূর্ত্ত অবধি আর সে জন্যে আদায় করবে কৃতজ্ঞতা, যখন তার গায়ে হাত তোল

তখন তা তাকে অভ্যাসে করাবে তোমার প্রশস্তি গাইবার জন্য। এসব অতি সাধারণ কথা। সব বিজ্ঞ সহৃদয় বিজেতারাই এই কৌশল আয়ত্ত করেছেন। তখন সে তোমাকে ভালবাসবে চিরকালের জন্য।

আন্তোনিও

তুমি পাষণ্ড, অনন্ত নরকে তুমি পুড়ে মরবে। স্বর্গে প্রেম যদি তার বিচারদণ্ড ধরে থাকে তখনও।

বাজিল

সে ভয় আমার নেই।

আন্তোনিও

আর সেই জন্যেই ত' নিরাপদে গর্ব্ব কর, কল্পনায় যুদ্ধ চালাও যার ভার অন্যেরা বহন করে। আমি দেখেছি আরামকেদারায় বসে নাগরিক-সমালোচকেরা বিপুল বিজয় অর্জন করেন বাক্যের রক্তপ্লাবনে, মানচিত্রের উপর আঙ্গুল চালিয়ে সামরিক কৌশল দেখান, বলে ওঠেন "এই ইউজেনের ত্রুটি, এখানে মার্লোবারো দোষ করেছেন—আর দেখ শিশুর চক্ষেও ধরা পড়ে তা—সেনাপতি ভিলা এখানে স্পষ্টই কি প্রমাদ করেছেন যে জন্যে তাঁর হাল হল মালপ্লাকের যুদ্ধে।" আমার মনে হয় তুমিও ও ধরণের কাগজকলমী রণনীতিজ্ঞ। তুমি প্রেমিক?

বাজিল

হা ভগবান! তোমার জন্য আমার বড় দুঃখ হয়, আন্তোনিও, তুমি নিজের চোখে দেখবে আমার মহান উদাহরণ, শিখবে আমায় দেখে।

আন্তোনিও

উত্তম! আমি হ'লাম তোমার শিষ্য, কিন্তু শোন, সুন্দর মুখ একখানা চাই, নতুবা তার জন্য আমি লড়াইএ নামব না। আর হওয়া চাই সুজাতা, অন্যথা তোমার দম্ভ আমি স্বীকার করব না।

বাজিল

বেশ রাজী। কিন্তু কথায় বলে শরীরম্ খলু ধর্ম্মসাধনম্—দেহটির স্থান আগে। সে যাক তোমার সর্ত্তেই আমি রাজী, নতুবা হয় ত' আমাকেই বাদ দিয়ে রাখবে নিজে সুযোগ পাবে বলে।

আন্তোনিও

ওই যে দেখ আসছে শত্রুপক্ষ। ওকে যদি জিনে নিতে পার তবে ত' তোমায় বলব ভাগ্যবান।

বাজিল

কি সুন্দর মুখখানি। এই পাগলা লড়াই এমন মহার্ঘ রত্নটির জন্য শোভা পায় না।

আন্তোনিও

তুমি পিছে হটছ?

বাজিল

আমি? এক আঙুলও নয়। দেখ কি করে আমি ওকে বাগে আনি।

আন্তোনিও

ওই যে এসে পড়েছে।

(ব্রিগিদার প্রবেশ)

ব্রিগিদা

পূজ্য মহাশয়, এই লিপিটা আপনার হস্তে প্রদান করবার জন্য আমার উপর হুকুম হয়েছে।

বাজিল

আমার কাছে, সুন্দরী?

ব্রিগিদা

আমার খাতায় আপনার দেহ-লক্ষণ সব লেখা আছে, দেখা যাবে আপনিই কিনা—মিলিয়ে দেখতে হবে—চুল লম্বা, সাধারণ কবিদের যতখানি, পোষাক বিশেষত্বহীন, হাবে-ভাবে নম্র—মনে হচ্ছে মহাশয় এ আপনি নন—চলনে আভিজাত্য, দুর্বা ঘোটেও নয়, দেখতে সুপুরুষ—নিশ্চয় মহাশয় এ আপনার জন্য নয়।

বাজিল

হুঁঃ।

আন্তোনিও

কি ভাই, চুপচাপ। দাগো তোমার কামান, কই দাগো।

বাজিল

আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও। বিশ্ববিজয়ীকে তাড়াহুড়ো করতে হয়? স্বয়ং সীজারকেও আগে তাঁর স্থিতিটা পরীক্ষা করে দেখতে হয়, পরে তবে কাজে নেমে যাওয়া। আমার বিজয়শঙ্খ শুনবে তুমি অনতিবিলম্বে।

ব্রিগিদা

আপনার পত্রখানা এই, গ্রহণ করবেন না, মহাশয়?

আন্তোনিও

আমার জন্যে তাহ'লে বরাঙ্গণে, দেখতে ত' চিঠিখানা বেশ শ্রীময়ী—কিন্তু কার কাছ থেকে হতে পারে? হাতের লেখা ত' পরিচিত নয়? মেয়েলি হাত বোঝা যায়। কিন্তু তবু পুরুষালি ঢংও কিছু আছে,—টানের মধ্যে দেখা যায় ক্ষিপ্রতা আর স্বতঃপ্রেরণা। সুন্দরি, তুমি তবে এসেছ কার কাছে থেকে?

ব্রিগিদা

কেন, পূজনীয় মহাশয়? আমি ত' তার স্বাক্ষর নই। আপনি যদি একটু ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেন, তাহ'লে আমি বলতে পারি, নিশ্চয় আপনার মুস্কিল আসান হয়ে যাবে।

বাজিল

মেয়েটি ত' বড় চতুর, আন্তোনিও, ও-রকম কথা ভাবতে পেরেছে। বয়স হবে ত' বছর আঠার, তা না হয় এ এক অলৌকিক ব্যাপার।

আন্তোনিও

তারপর, ভাই?

ব্রিগিদা

এই যে, মগজওয়ালা ছেলেটি। কি অদ্ভুত চোখ করে দেখছে আমায়, চিনে ফেলবে হয় ত'।

আন্তোনিও

ইসমেনিয়া অস্ত্রোকাদিজ। কি আনন্দ, কি আনন্দ।

ব্রিগিদা

আপনার অসুখ করল? মুখ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

আন্তোনিও

এখন শমন নিজে যদি একেবারে আমার হৃদয় দুয়ারে এসে পড়ে কিংবা তার নিশ্বাস ঝড়ের বেগে আমার চোখের পাতায় আঘাত করে, এ বস্তু তাহলে তাকে দূরে নির্বাসিত করে দেবে। ঐ যে হাতের লেখাটি আমার চোখের সামনে ভাসছে।

ব্রিগিদা

মশাই গো, আপনার মুখ যে একেবারে রক্তশূন্য—চিঠির মধ্যে তবে বিষ ছিল কি?

আন্তোনিও

এ বিষ যেন আমায় দেওয়া হয় ঘণ্টায় ঘণ্টায়, আমার সুখ নিয়ে যেন আমি আর খেলা না করি, ডানা মেলে সে যেন উড়ে যায়, হয়ে যায় যেন স্বপ্ন একখানা। স্বাগত! স্বাগত! লিপিকা, তুমি এসেছ কে-শুভ্র হাতখানি কাছে থেকে আমি পুজো করি তবে:

"সানস্তরাজ আন্তোনিও মহানহিনবরেষু"

আপনি আমার এই দুঃসাহসিক অভিসার কি চোখে যে দেখবেন জানি না। আপনার চিন্তায় আমার যে কি দুঃসহ যন্ত্রণা তা ভেবে আর কূল পাই না। আন্তোনিও, শোন তবে সাদা সত্য। তোমার ভালবাসা ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। এ কথায় যদি তুমি আমার আত্মমর্যাদায় সন্দেহ কর কিংবা মনে কর এ হ'ল বন্ধনহারা ত্রস্ততা কিংবা অব্যবস্থিতচিত্ততা, মানুষে যেমন বলে থাকে "ঘরায় আসে যে প্রেম ঘরায় সে চলে যায়" চিঠিখানা তবে ছিঁড়ে ফেলে দাও, সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়খানিও। না, না, আশা করি ছিঁড়বে না। আমি তোমায় ভালবাসি। তবে আমি জানি আমাদের দুটি পরিবারের অনৈক্য আর তোমার সঙ্কুচ ভয়শীলতা আমাকে আমার হৃদয়-প্রভু থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। কিন্তু আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি লজ্জা সরম, ফেলে দিয়েছি বিশ্বপ্রশংসিত রমণীসুলভ ছলাকলা উভয়ের ছেদটিকে মুছে দেবার জন্য। এস আমার কাছে আন্তোনিও, এসো অক্ষুণ্ন সম্মান নিয়ে, আমার বংশের মাহাত্ম্য থেকে এতটুকু বিচ্যুত হইনি, হতে পারি না, আমার বিশুদ্ধ স্বরূপ থেকেও নয়, যে ভালবাসব আমি হীনভাবে। প্রিয় আমার! আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি শালীনতা, সলাজ ছলনা কিন্তু সত্যবস্তুটিকে আমি আঁকড়ে ধরে রাখব অন্তরঙ্গ করে, তা তোমারই মূর্ত্তি। কথা আমার শেষ হয়না—তবে শেষ ত' করতেই হবে, শেষ তবে করি এই কথা দিয়ে "প্রিয় আমার, আমায় ভালবাস, আমার মান রেখ আর না হয় ভুলে যেও আমায়।"

এর চেয়ে মধুরতর লিপি স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে কখনও নেমে আসেনি। হে আমার স্বপ্নবতী, আমার ওষ্ঠাধরকে পুণ্যময় করে তোল, কল্পনায় যদি আমি হাতে ধরতে পারতাম সেই শুভ্র হাতখানি তোমাকে যে লিখে দিয়েছে, তাই হ'ত আমার চরম সার্থকতা। তুমি আমাকে দ্বিগুণ বড় করে দিয়েছ, মনে হয় আমি আন্তোনিও ছাড়াও আরও একজন। আকাশ আমার কাছে নেমে এসেছে কিংবা পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে দিব্য জ্যোতি এক। এস এস,

আমার হৃদয়ের উপরে আমি এঁকে রাখতে যত্ন করব এই কথাগুলি, যে মৃত্যু যখন আসবে ওখানেই তাকে দেখতে পাবে আর অমনি চলে যাবে, এ হল স্মৃতিফলক যার অমর-লিপি একখানা।

বাজিল

মহাশয়া, আপনি তবে রাজকুমারী ইসমেনিয়ার পরিবারভুক্ত?

ব্রিগিদা

তাঁর গরীব আত্মীয়া এক, মহাশয়।

বাজিল

আপনার মুখখানা দেখে মনে হয় খুবই পরিচিত যেন। আমি প্রায়ই যেসব জায়গায় যাই সেখানে কোথাও কি আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি?

ব্রিগিদা

মহামহিমবর, আমি আশা করি আপনি মনে করেন না আমি ও-স্তরের জীব একজন। আমি গরীব মেয়ে, সৎপথে চলি।

বাজিল

কি রকম? কি রকম?

ব্রিগিদা

কি রকমে জানি না। প্রাণে যা এল তাই বলে ফেলেছি।

বাজিল

তোমার জিহ্বা ত' চমৎকার চলন্ত। শুনবে দুটি কথা?

ব্রিগিদা

নিশ্চয়! তবে মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেন না।

বাজিল

সুন্দরী, তুমি।

ব্রিগিদা

ব্যস। খুশী হ'লাম শুনে আপনার কণ্ঠ। আপনার দুটি কথা আমার ভয়ানক ভাল লেগেছে। আসি তবে—

বাজিল

সে কি ? আমি ত' শুরুই করিনি আমার কথা।

ব্রিগিদা

আপনার অঙ্কশাস্ত্র তবে ভুল। আপনার মাষ্টারমশাই যদি তাঁর যষ্টিখানি সদ্ব্যবহার করতেন তা হ'লে আপনি আরও মনোযোগী ছাত্র হয়ে উঠতেন।

বাজিল

কি আপদ ! শুনবে কি আমার কথা ?

ব্রিগিদা

আচ্ছা বেশ, বশাই। সংখ্যার উপর না হয় আমি আর জোর দেব না, কিন্তু পায়ে ধরি আপনার নিজেরই জন্যে শপথ করে আর কথা বলবেন না। আপনার বাক্‌ভাণ্ডারের উপর এমন টান পড়লে তা আর বেশিদিন টিকবে না।

বাজিল

তুমি যদি একটু থাম তবে এমন খবর দেব তোমাকে তুমি খুশী হয়ে উঠবে।

ব্রিগিদা

তা হোক সুখবর, নব খবর, সাধু খবর, আপনাকে ধন্য ধন্য করব সে জন্যে।

বাজিল

কুমারী, তুমি কিন্তু সত্য সত্যই পরমাসুন্দরী।

ব্রিগিদা

মহাশয়। আমাদের মহারাণী অনেককাল গত হয়েছেন। পরের খবরটি কি ?

বাজিল

পরের খবর ? এই তোমাকে আলিঙ্গন করব।

ব্রিগিদা

ওঃ, ওটা ত' হ'ল ভবিষ্যদ্বাণী। আলিঙ্গন আর মৃত্যু সমানে আসে আমাদের সকলের ভাগ্যে। কোন ব্যাধির কল্যাণে একটি আর কোন মানুষের কল্যাণে অন্যটি, মহাপণ্ডিতেরাও

তা আগে থেকে বলতে চান না। দুর্যোগের আগমনী গণনা করে দেখায় কোন ফল নেই। যখন তা এসে পড়ে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন কোন আপত্তি না করে তাকে মেনে নিতে পারি, এর চেয়ে ভাল আর কিছু যদি না করতে পারি।

বাজিল

এবার তোমাকে আমি আলিঙ্গন করবই একটুও দেরী না করে।

ব্রিগিদা

হেতুটা কি?

বাজিল

বলি নাই তোমাকে তুমি যে বড় সুন্দর?

ব্রিগিদা

আমার আরশিটাও ওই কথা বলেছে, একবার নয়, একশ'বার কিন্তু তুলেও ত' আমায় আলিঙ্গন করতে চায়নি? সে যখন চাইবে তখন না হয় আমি তোমার সিদ্ধান্ত মেনে নেব। না! এই যে আমরা যথেষ্ট ঘনিয়ে এসেছি পরস্পরের কাছে—দূরত্বটা ঠিক রাখবেন মহাশয়।

বাজিল

এইবার আমার সিদ্ধান্তটি প্রমাণ করব আমার ওষ্ঠাধরের সহায়ে।

ব্রিগিদা

আমারটি আমি রক্ষা করব এই আমার হাত দিয়ে। আমি বলে দিচ্ছি দুটির মধ্যে আমার হাতের যুক্তিটিই হবে বলীয়ান।

বাজিল

বেশ, বেশ!

ব্রিগিদা

আপনার মনোভাব জেনে খুসী হলাম, কিন্তু মহাশয়, আমি ত' আর থাকতে পারছি না। আমার সখিরাণীকে কি বলব গিয়ে?

আন্তোনিও

বলবে তাঁকে আমার হৃদয়খানি তার পায়ে লুটিয়ে আছে। আমি তারই, শুধু

তারই, যতদিন না আকাশ খসে পড়ে এবং তারও পরে। আরো বলবে তাকে, আমার সামান্যতার উপর তার যে মধুর অনুগ্রহ তার জন্য ধন্য আমি—ইনার পুত্র আনকিসের চেয়েও বেশী, যখন কামদেবের মাতৃদেবী সোনার স্বর্গ হতে নেমে এসে তার কোলে আশ্রয় নিয়েছিলেন; বলবে তাকে, স্বর্গের দেবীর মত তাকে আমি প্রণতি জানাই, সাধুসন্তের মত পূজা করি। সে আর আমার জীবন একই আমার কাছে। তাকে ছাড়া আমার হৃদয় কোথাও নেই, তার সুখ ছাড়া আর চাওয়া নেই, আর আলো, তার দৃষ্টি যতটুকু আমাকে দেয়। বলবে বলবে তাকে গিয়ে...

ব্রিগিদা

থামুন, থামুন কুমার, আপনি নিজে গিয়ে তাকে বলবেন এসব কথা। এসবের অর্দ্ধেকও আমার মনে থাকবে না, বাকী অর্দ্ধেক আমার বুদ্ধির অগম্য। বলব গিয়ে তাকে আপনি আসছেন নিশ্চয়—

আন্তোনিও

সূর্য্য যেমন ওঠে তার নিশ্চিত সময়ে কিংবা অর্দ্ধরাত্রি জাগে যেমন তার কর্ত্তব্যকালে আমি আসব নিশ্চয়ই—

ব্রিগিদা

চমৎকার! এ তিনটি কথা বেচারী মেয়েটি অন্ততঃ বুঝতে পারবে। শুনুন তবে ভাল করে—সন্ধ্যা হ'লে অপেক্ষা করবেন কিছুক্ষণ, জায়গাটি আপনি জানেন ওলাস কুয়েজ স্কোয়ার থেকে এক ঢিল দূরে রাজকুমারীর জানলা থেকে দৃষ্টির মধ্যে। আমি আসব তখন আপনার কাছে আর আপনার তরোয়ালখানা যদি অর্দ্ধেকও তৎপর ও দুর্দ্ধর্ষ হয় আপনার জিহ্বার চেয়ে তবে আপনারা দুজনেই ওখানে থাকলে আমি খুশী হব। তবে আশা করি সন্তদের কৃপায় ও-দুটি বস্তুর প্রয়োজন হবে না। কিন্তু মহাশয় আপনাকে কিছু বিমর্ষ মনে হয়—ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন, আপনি বড় সুবক্তা ও রসিক পুরুষ।

আন্তোনিও

ভাই বাজিল, আমার সুখের সীমা নাই। মাফ করো তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। নির্জ্জনতা চায় দেবতাকে আর আমি দেবতা হয়ে উঠেছি আপন স্বরূপে। এই পত্রখানি আমাকে দেবতায় পরিণত করেছে, আমি একা থাকতে চাই আমার মহাসুখের সঙ্গে।

(নিষ্ক্রান্ত)

বাজিল

ভগবান! আমিও যেন যাদুগ্রস্ত হয়ে না পড়ি! ভগবান! ভগবান! ব্যাপারটা হ'ল কি করে? আকাশে কি সূর্য্য এখনও রয়েছে? ওটা কি পাখীর গান? না কাঁসরের

ভাঙ্গা গলা ? আমি ত' মাতাল হয়ে পড়িনি ! আমি ত' এখনও ধরতে পারি এটা হ'ল গাছ আর ওটা কাঠবিড়ালী। ব্যাপার কি ? আমি কি বাজিল নই ? সুরসিক সুবক্তা বাজিল বলে লোকে কাকে ডাকে ? মাতৃজঠর থেকেই কি আমার হাসি ফুটে ওঠে নি ? আমার প্রথম কণ্ঠধ্বনি ছিল না কি আমার নূতন জগৎকে নিয়ে একটা রসিকতা ? মাতৃস্তন্য পান করার পূর্বেই কি আমি একটা সুভাষিত বলে উঠিনি ? সর্বনাশ। একটি বালিকার জিহ্বা আমায় বেরে পিটিয়ে শেষ করে দেয়নি ? এক সামান্য চটুলতার ব্যাপারিণী কি আমার কণ্ঠরোধ করে দেয়নি ? হয়েছে ত' তাই ! না, তা হতেই পারে না। আমি দেখছি নাস্তিকের মতবাদে বিশ্বাস করতে চলেছি—জারকরস আমার চোখে মূল্যবান হয়ে উঠছে। প্রতিভা হ'ল একরকমের অজীর্ণতা আর শেক্সপীয়রের একটি পংক্তি হ'ল এক টুকরো মাটন-মাংসের দিব্যরূপান্তর আর প্লেটোর চিন্তাবলী হ'ল একটা রোগগ্রস্ত পেশীর নির্য্যাস কালির দাগে বেঁধে রাখা হয়েছে। আচ্ছা, আজ সকালে আমার অনশনভঙ্গ হ'ল কি দিয়ে ? মশলা-মাখা হেরিং ? রুটি ? জেলী ? চা ? হে বন্দী হেরিং মাছ, তুমি কি নির্বুদ্ধিতার মূর্ত্ত আকার ? চাটনি কি বুদ্ধি-চাতুর্য্যের শত্রু ? নিশ্চয় হবে তাই ? হে মহামহিম জারকরস, হে জননী, হে তারিণী, নম, নমো তোমায়, করুণা কর হে দেবী, আমি তোমার পূজারী।

ওঠো বাজিল ! আজ তুমি তোমার ধূসরিত বিজয়মালা ফিরে আবার অর্জন করবে, আর না হয় চিরকালের জন্য তুমি নির্ব্বাসিত হবে সুধীজনের সভা থেকে। সজ্জিত হও তুমি, ব্যঙ্গনার শ্লেষের রাজসজ্জায় খুলে ধর ব্যঙ্গের তরবারি, মেলে ধর বক্রোক্তির ঢাল, আজ রাত্রেই সেই মেয়েটির সঙ্গে আমি দেখা করব। তাকে ছিঁড়ে ফেলব কূটবাক্যে, পীড়ন করব উপহাসে, উত্যক্ত করব রসিকতা দিয়ে, উদ্ভট বাক্যের কাঁটায় তাকে জর্জরিত করব সর্ব্বাঙ্গে, আমার বাক্‌চাতুর্য্যে তাকে অভিভূত করব, ছিন্নভিন্ন করব, কেটে ফেলব দুভাগ করে, চেপে মৃত্যু কবলিত করব, ঝুলিয়ে দেব, টেনে হিঁচড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব। এ সবও যদি ব্যর্থ হয়, হে ভগবান, শেষ প্রতিহিংসা নেব, তাকে বিয়ে করে ফেলব। দোহাই ভগবানের।

অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

দেহ-রহস্য

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে নেশার চল বিশেষ আছে আমরা জানি—গাঁজা, ভাঙ্, চরস অনেক পাকা সন্ন্যাসীদের সাধনারই অন্তর্গত। সিদ্ধি শব্দটাই স্বার্থক। সিদ্ধি-সেবনের ফলেই পরমার্থ সিদ্ধি হয় না কি। সাধুসন্তদের কথা দূরস্থান, দেবাদিদেব মহাদেব শিব নিজে কি উদাহরণ দেখিয়েছেন?*

আধুনিক শিক্ষিত সভ্যসমাজে এই অঙ্গটিকে কিছু শালীন ও মোলায়েম করে ধরা হয়েছে অর্থাৎ নেশা অনুমতি পেয়েছে তামাকু বা হুকা পর্যন্ত। আধুনিক সাধুদের যদি এই অঙ্গটির হেতু জিজ্ঞাসা করা যায় তবে তাঁরা এই ধরণের কথা বলেন যে এ হল প্রকৃতিকে ট্যাক্স দেওয়া। প্রকৃতিকে ত্যাগ করা হয়েছে, তার কোন দাবীদাওয়া মেটান হবে না —সন্ন্যাসের সাধুত্বের অর্থই ত' এই। কিন্তু যতদিন দেহ আছে ততদিন প্রকৃতির অধিকার ত' কিছু থাকবেই—নিম্নপ্রকৃতির জের বা রেশ এই সহজ উপায়ে টানা হয়। স্থূল প্রকৃতির রাজত্বে স্বীকৃতির জন্য সবচেয়ে কম মূল্য এইভাবে অধিকার করা হয়েছে। অজ্ঞান জগতের সঙ্গে যোগাযোগ এই স্বল্পতম পরিমাণে ও পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে **reductio ad minimum.**

কিন্তু ইদানীং কালে অধ্যাত্মসাধনার জগতে নূতন একটা তরঙ্গ দেখা দিয়েছে—তরঙ্গ কেন, প্রায় বন্যার মত—এর জন্মস্থান পাশ্চাত্য জগৎ। পাশ্চাত্যের জ্ঞানী গুণী মনীষী সত্যকার আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসু অনেকে, তাঁরা একটা নূতন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে চলেছেন—বলছেন—যদিও নূতন ঠিক নয়, পুরাতনেরই নূতন সংস্করণ। জিনিষটাকে তাঁরা একান্ত গুরুগম্ভীরভাবে গ্রহণ করেছেন, তাকে বিশেষ মর্য্যাদা ও কৌলীন্য দিয়েছেন, দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং একে ঘিরে একটা শাস্ত্রই গড়ে উঠেছে—আধ্যাত্মিক সাধনেরই শাস্ত্র।

সাধন-প্রক্রিয়ায় মাদক-দ্রব্যের ব্যবহার এবং বিশেষ তীব্র মাত্রায়—প্রধান এমন কি একমাত্র উপায় বলে—সহজ উপায় বলে—হয়ে উঠেছে অপরিহার্য্য পদ্ধতি। তাঁরা

---

* নেশায় চুর হয়ে বুঁদ হয়ে থাকতেন মহাদেব, তাই ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক সমাধির আশ্রয়। কবি ভারতচন্দ্রের অঙ্কিত প্রমত্ত শিবের চিত্র আমরা সকলেই ভাল জানি—

মহাদেবের আঁখি ঢুলুঢুলু।
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হৈল ভুল॥
নয়নে ধরিল রঙ্গ অলসে অবশ অঙ্গ
নটপট জটাজুট গঙ্গা হল খুল।

বলেন মাদকদ্রব্য যে কেবল বুদ্ধি লোপ করায় তা নয়, স্বভাবে চেতনায় যে বিশৃঙ্খলা ঘটায় তাই তার একমাত্র ফল নয়; তীব্র মাদকতা যে কেবল সাধারণ চেতনাকে বিপর্যস্তই করে তা নয়, তার ফল প্রথমতঃ সাধারণ চেতনার কঠিন বন্ধন, তার কঠোর দাসত্ব থেকে মুক্তি। দ্বিতীয়তঃ তাতে চেতনাকে পৌঁছে দেয় বা তুলে ধরে আর একটা স্তরে যেখানে লাভ হয় চেতনার মুক্ত প্রসার এবং নবতর অনুভূতি ও উপলব্ধি। মানুষের চেতনা স্থূল ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার মধ্যে আর আবদ্ধ থাকে না, পার্থিব জগতের অন্তরালে রয়েছে যে স্তরে স্তরে আরও কত জগৎ নূতন বস্তুর নূতন বিধি-বিধানের, তার সন্ধান এনে দেয়। এ সব জগৎকে যদি আত্মার ভগবানের পরমার্থের জগৎ বলে না-ই গ্রহণ কর তবুও মনে চেতনায় স্বভাবে আসে যে একটা মুক্তির স্বাদ, বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিচরণ, একটা নিবিড় আনন্দ-উল্লাস, তার গতি সত্যকার আধ্যাত্মিকতার দিকে কি নয়?

এই রকম ফলের জন্য মাদকদ্রব্যটি একটি বিশেষ প্রকরণে তৈরী করা হয় যাতে তার হয় একটা বিশেষ গুণ। বস্তুতঃ এই পাশ্চাত্য তান্ত্রিকেরা যে দ্রব্যটি তৈরী করেছেন, আবিষ্কার করেছেন তার প্রকার বিশেষ পর্যায়ে পড়ে। তার নাম L. S. D. (রাসায়নিক সংজ্ঞায়—অন্যথা mescalin)। যত বিষাক্ত ততই তার ফল হবে না কি অনিবার্য্য ও অপরিসীন।

তান্ত্রিকের উল্লেখ আমি করলাম, কারণ ভারতের তন্ত্রই, বাস্তবিকপক্ষে তন্ত্রই এই সাধনার অনুসরণ করেছে, তার রহস্য প্রয়োগে ব্যক্ত করেছে। এবং বলা হয়েছে মহাদেব শিব স্বয়ং এই তন্ত্রসাধনার উৎস ও আদিগুরু। তন্ত্রের কতকগুলি আচারের ও অনুষ্ঠানের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা একটা প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান স্থাপন করেছেন তন্ত্রের ও বেদান্তের মধ্যে; এবং তাঁরা বলেছেন বেদান্ত হ'ল আর্য্যদের সাধনা, এবং ভারতে বহিরাগত সংস্কৃতিধারা, ভারতের স্থানীয় আদি ধারা হ'ল দ্রাবিড়-সংস্কৃতি, আদি অর্থাৎ আদিম সংস্কৃতি। এইভাবে ভারতকে এরা দুইভাগে ভাগ করে থাকেন, উত্তরাপথে আর্য্য বা বৈদান্তিক শিক্ষা, দক্ষিণাপথে দ্রাবিড়ী বা তান্ত্রিক শিক্ষা। ইন্দ্র বরুণ, অগ্নি সূর্য্য, যম—এঁরা হলেন আর্য্য দেবতা আর শিব হলেন দক্ষিণী অনার্য্য দেবতা।

ইতিহাসের দিক দিয়ে বাস্তব সত্য যাই হোক তবে এটুকু পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে তন্ত্র হয়ত ছিল একটা প্রাচীনতর ধারা এবং লোকসমাজে অধিকতর পরিচিত ও প্রচলিত এবং সেইজন্যই অধিকতর বিকৃত বা কলুষিত বা অবগুণ্ঠিত।

বৈদান্তিক ধারার লক্ষ্য ছিল মানুষের উচ্চতর প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করে তাদের আরও উর্ধ্বে তুলে ধরা, গন্তব্য ছিল পরম শান্তি, পরম চেতনা, নিষ্কলুষ, নিরঞ্জন বৃহৎ স্থিতি। তন্ত্র আশ্রয় করেছে মানব চেতনার নিম্নার্ধ, কারণ শক্তির মূর্ত প্রকাশ এই নিম্নার্ধেই। পরার্ধে বৈশিষ্ট্য যদি হয় জ্যোতি স্থিতি, অপরার্ধের বৈশিষ্ট্য হ'ল শক্তি ও গতি। অন্য কথায় মানব আধারে হৃদয় মন ও বুদ্ধি এরাই হ'ল বেদান্ত সাধনার যন্ত্র ও অবলম্বন আর তন্ত্রের যন্ত্র হ'ল প্রাণ ও দেহ। আলোর উন্মেষ যেমন হয় ধ্যান-ধারণা-সমাধির আশ্রয়ে, শক্তির উন্মেষ হয় কোন প্রক্রিয়ার আশ্রয়ে? তন্ত্র দিয়েছেন সেই রহস্য-কথা।

তন্ত্রেরও রয়েছে দুটি ধারা—দক্ষিণমার্গ, যা অনেকখানি গ্রহণ করেছে বৈদান্তিক অনুপ্রেরণা কিন্তু তন্ত্রের বামমার্গই দিয়েছে তান্ত্রিকতার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

আমি বলেছি বৈদান্তিক চেতনার আশ্রয় ও অবলম্বন হ'ল আধারের উর্ধ্বতর বৃত্তিগুলি। তাদের গড়ন অপেক্ষাকৃত লঘুতর, যত উর্ধ্বে যাই ততই তারা যেন বায়বীয় হয়ে ওঠে, তাই তাদের সহজ ও স্বাভাবিক গতি হ'ল উর্ধ্বদিকে, অন্ততঃপক্ষে উর্ধ্বদিকে ঘুরিয়ে চালনা করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। হৃদয়ের ভাব বা অনুভব, মনের চিন্তা সহজেই উর্ধ্বতর আলোকের ও অনুভবের গ্রহণে সমর্থ হয়। আধারের অধোভাগের ধর্ম বিপরীত, তারা যেন ভারগ্রস্ত, যত নীচের দিকে যাই ততই তারা ভারী ও জমাট হয়ে ওঠে যেন, তাদের সহজ স্বাভাবিক গতি হ'ল নিম্নদিকে—তাদের মাধ্যাকর্ষণের ধর্ম। প্রাণের (উর্ধ্বতন হোক বা নিম্নতন হোক), দেহের বৃত্তিসব স্বভাবতঃই নিম্নাভিমুখী, তারা চলে আলোর প্রসারের, বিশালের বিপরীত দিকে, অন্ধকারের ও সঙ্কীর্ণতার দিকে। বৈদান্তিক সাধনা তাই আধারের এই নিম্নাঙ্গকে আদৌ প্রশ্রয় দেয় নাই, যতটা সম্ভব নিরাশ করে, অনাহারে রেখে দিতে চেষ্টা করেছে, যাতে উপরের ভাগের উর্ধ্বগতির পিছুটান না হয়, কোন রকম বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তন্ত্রের অর্থাৎ বামমার্গ তন্ত্রের স্থিতি, গতিমুখ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এমন কি বিপরীত। তাতে জোর দিয়েছে আধারের অধমাঙ্গের উপর—অবহেলা ও নিরাশ ত করেই নাই, দিয়েছে প্রশ্রয়, করেছে চর্চা ও অনুশীলন। কারণ বলেছি উত্তমাঙ্গের রাজ্যে যদি হয় আলোকের বৃহত্তের, অধমাঙ্গের রাজ্য হ'ল সত্তার ঘনীভূত কেন্দ্রীভূত সামর্থ্যের। এই শক্তি ও সামর্থ্য কেবল প্রাকৃত চেতনার ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য নয়, পরম অধ্যাত্ম চেতনারই প্রকাশ, মূর্ত রূপায়ণ। সচ্চিদানন্দ শঙ্করের একরূপ কিন্তু তাঁর আর এক রূপ হ'ল শঙ্করী।

ভাগবত চেতনা শুধু নয়, ভাগবত শক্তি অর্জন করতে হ'লে প্রয়োজন আধারের নিম্নতন বৃত্তির সজাগ অনুশীলন ও কর্তৃত্ব। মানুষের প্রাকৃত স্বভাব হ'ল নিম্নতন বৃত্তির দাসত্ব, এক্ষেত্রে সে অসহায় পুতুলমাত্র। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনায় সর্বত্রই প্রথম সোপান হ'ল বৃত্তির দাসত্ব হতে মুক্তি এবং তার উপর কর্তৃত্ব। বৈদান্তিক সাধনায় এ কর্তৃত্ব তুলনায় অনেক সহজ, কারণ যাদের উপর কর্তৃত্বস্থাপন করা হয় তাদের আগে হতেই দুর্বল নিস্তেজ করে রাখা হয়। তাই সেখানে আলোর প্রকাশ হ'লেও সে অনুপাতে শক্তির প্রকাশ ঘটে না। তন্ত্র চায় বেদান্ত সাধনায় অনাদৃত, প্রায় ঘৃণিত অঙ্গগুলিরও সমান মর্যাদা যেন দেওয়া হয়, অনুশীলিত শক্তিমান করে রাখা হয়। যখন তারা সম্পূর্ণ শক্তিমান তখনই তাদের সম্পূর্ণ সার্থকতা ঘটতে পারে।

বেদান্ত সাধনার হোক আর যে-কোন সাধনারই হোক তার প্রতিষ্ঠা হ'ল, তার সাফল্যের প্রথম সূত্র হ'ল এই বাণী "বিকারহেতৌ ন বিক্রিয়ন্তে চেতাংসি যেষাম্ ত এব ধীরাঃ", চিত্তবিকারের কারণ সম্মুখে থাকলেও চিত্তবিকার হয় না তাদেরই বলি ধীর। তবে বৈদান্তিক সাধনার লক্ষ্যই হ'ল বিকারের হেতুটি ধ্বংস করা, নির্মূল করা। এরই রকমফের হ'ল খ্রীষ্টীয় সাধনার মন্ত্র "lead us not to temptations."। কিন্তু তান্ত্রিকবীর

বিকারের হেতুকে যে কেবল সহ্য করেছেন বা জিইয়ে রেখেছেন তা নয়, তাকে যথাসম্ভব বাড়িয়ে তুলেছেন, তীব্রতর তীব্রতম করে তুলেছেন সজ্ঞানে ও সচেষ্টায়। এই রকমে ঢেউএর মাথায় যখন উঠে দাঁড়িয়েছি তখন যদি তার বশীভূত না হয়ে ভেসে না গিয়ে যদি তাকে সংযত করতে পারি, আপন কর্তৃত্বাধীনে রাখতে পারি, তাতেই চেতনার সত্যকার কৃতিত্ব, সত্তার গৌরব বেড়ে যায়, চেতনারও উন্নয়ন ঘটে। উত্তাল প্রকৃতিকে এ রকমে বশীভূত করে উত্তর চেতনায় পরিচারিত করাই হ'ল সমস্ত সাধনা। বৈষ্ণব তান্ত্রিকও তাই ত বলছেন—

"সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে ত' রসিকজন"।

বামাচারের পঞ্চমকার অত্যন্ত সুপরিচিত, এ সকল উপাদানকে বৈদান্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, বলা হয় এরা প্রতীকমাত্র, চেতনার বা সূক্ষ্মবৃত্তির উপমানমাত্র কিন্তু আচারী কৌল তান্ত্রিকেরা এ সকলকে সরল অর্থেই গ্রহণ করে। আমি বলেছি তাদের লক্ষ্য হ'ল আধারের নিম্নতর ভাগকে যতখানি সতেজ সক্রিয় সমর্থ করা যায় যে ভাবে, সেই সব প্রক্রিয়া তারা সরলভাবে গ্রহণ করেছে; তবে এ প্রক্রিয়ার সাফল্য ও সার্থকতা নির্ভর করে সবই, তাদের ব্যবহারের উপায়ের উপর, একটা আন্তর কৌশলের উপর—যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।

আধুনিক জগতে অতীন্দ্রিয় সাধকের মহলে L. S. D. ব্যবহারের কথা আমরা বলেছি, আরও স্মরণ করতে পারি প্রাচীনতর শিব-সাধনায় সিদ্ধি-ঘোটনের অনুষ্ঠান।* এ সব প্রক্রিয়া আদৌ সূক্ষ্মজগতের নয়, সবই একান্ত স্থূল জড়-পদার্থের ব্যাপার, উদ্দেশ্য একই, প্রকৃতিকে মন্থন করা। এই মন্থনের ফলে বিষের ও অমৃতের দুই-ই উৎপাদন হয়, সাধকের নির্ব্বাচন করবার শক্তি ও নৈপুণ্য থাকা প্রয়োজন। বৈদিক ঋষিদের উপজীব্য সোম সবলের ক্রিয়া প্রক্রিয়াও সর্ব্বজন পরিচিত কাহিনী।

মাদক দ্রব্যের ব্যবহার যে উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় তা কিছু বলেছি। সাধারণ চেতনা, মনোবুদ্ধির বিধিনিষেধ একান্ত জড়িত ও আবদ্ধ; মনের এই জাল থেকে মুক্তি না হ'লে অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ করা যায় না। এটি হ'ল প্রথম প্রয়োজন। মনের খেলা বন্ধ করতে হবে তবেই খুলবে অধ্যাত্মের দুয়ার। মনের এই সাধারণ খেলা একটা নিত্যচঞ্চল ক্রিয়াশীল

---

* ভারতচন্দ্র এই মাদক-প্রস্তুতের সমস্ত প্রক্রিয়াটি বিশদ করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যাতে কোথাও কোন ভুল না হয়। দ্রব্যগুণ নির্ভর করে তার যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী পাচনের উপর।

আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি॥
অল্প করি সিদ্ধি লহ মণ লক্ষ বার।
ধুতুরার ফল তাতে যত দিতে পার॥
মহুরী মরিচ লঙ্গ প্রভৃতি বশলা।
অধিক করিয়া দিয়া করহ রসলা।
দুগ্ধ দিয়া ঘন করি ঘুরাও ঘোটনা।
দূর কুসুম্ভায় আজি হয়েছে বাসনা॥

যন্ত্র, যন্ত্রের মত তা চলেছে নিরন্তর অনিবার্য্যভাবে। তাকে থামান, বন্ধ করে দেওয়া ইচ্ছার জোরে বা আকাঙ্ক্ষার বলে বা সদিচ্ছার প্রয়োগে আদৌ সম্ভব নয়। বিষ দিয়েই বিষক্ষয় হতে পারে। তাই মাদকদ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে, এতে নওড়াঘাতে মস্তিষ্কের যেন পেষণ করে দেওয়া হয় অথবা প্রবল প্লাবনের তোড়ে গালিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। শাস্ত্রবাক্যে সাধুসন্তের একটা লক্ষণ দেওয়া হয়েছে বালোন্মত্ত পিশাচবৎ—অর্থাৎ মনের যে বৃত্তি বাহ্যজ্ঞান কাণ্ডজ্ঞান মানুষকে বেঁধে রাখে অজ্ঞান-জগতের ধারায় তাকে প্রথমে লোপ করে দেওয়া প্রয়োজন। তখন ভিতরে যেন একটা ক্ষেত্র বা খোলা মাঠ তৈরী হয় যেখানে নূতন চেতনার বীজ বপন করা যেতে পারে সহজেই। কিন্তু, একটা বৃহৎ কিন্তু আছে। তা সম্ভব, যদি অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ার গতি যদি চালাতে হয় সত্যের দিকে, মঙ্গলের দিকে তবে তা সম্ভব একমাত্র যার একটা তিলিমের কল্যাণে—পিছনে থাকা চাই একটা কম্পাস-চেতনা, একটা হাল ধরে আছে এমন সত্তা। নতুবা বাহ্য শৃঙ্খল হতে মুক্তি অর্থ অন্তরের বিশৃঙ্খলার মধ্যে মুক্তি। তাই ত' প্রতিটি শক্তিকে তার সকল উন্মাদনা নিয়েই দাঁড়াতে হয় প্রশান্ত শিব সত্তার উপরে। এখানেই অস্ত্র এসে বেদান্তের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, শিব-চেতনাই প্রকৃতির কালী-শক্তিকে সংযমের মধ্যে শৃঙ্খলার মধ্যে শুদ্ধির মধ্যে উন্নীত করে ধরতে পারে।

দেহের, প্রাণের, নিম্নতন প্রাণের অবধি সামর্থ্য বাড়াতে হবে, তাদের সঞ্জীবিত করে ধরতে হবে নূতন তেজে, কিন্তু তা আসলে এবং সত্যসত্যই সম্ভব হতে পারে বাহ্য উপকরণের বা উদ্দীপনার সহায়ে নয়, তাদেরই ভিতরে, এই প্রাণের ও দেহেরই অন্তস্তলে, মূলে রয়েছে যে পরমা-চিৎশক্তি, কেবল অতীন্দ্রিয় বিশ্বাতীত সচ্চিদানন্দ রূপে নয় কিন্তু এদেরই নিজস্ব স্বরূপগত ব্যষ্টিগত ভাগবত সত্তা হিসাবে। কেবল সেই সত্তা সেই চেতনাই এই জড় প্রাণ ও দেহকে দিব্যরূপ দিতে সক্ষম।

বাহিরের প্রকরণ দিয়ে, স্থূল উত্তেজকের সহায়ে যে শক্তির উদ্ধার হয় তা মোটের উপর বাহিরের ও স্থূলের পর্য্যায়েই রয়ে যায়—বড় জোর পৌঁছয় গিয়ে উত্তর-মন পর্য্যন্ত—তাকে ছাড়িয়ে অন্তরতমকে উদ্রেক করতে পারে না। হয় ত' কৌশলীর হাতে তটস্থ শক্তি হতে পারে তা কিন্তু স্বরূপের শক্তি নয়। স্বরূপকে স্বরূপ দিয়েই জাগাতে হয়—কথায় বলে না কি গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলেই?

তন্ত্রোক্ত অথবা আধুনিক বামাচারীদের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান কিছুই প্রয়োজন হয় না যদি আমরা সত্যকার মূল আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি, কেবল আন্তর-চেতনায় নয়, মন-বুদ্ধিতে নয়, যদি প্রাণকে দেহকে পর্য্যন্ত সেই আদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। বলেছি তা হ'ল শিবচেতনা।* প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী এই শিবচেতনার জাগ্রত স্থিতি ও আবির্ভাব

---

* পূর্ব্বে যে সিদ্ধি-ঘোটনার কথা বলেছি সেই সম্পর্কে নির্দ্দেশ হল, (ভারতচন্দ্র)

প্রক্রিয়াটি করতে হবে—"ত্রিপুর-মর্দ্দন-নাম মনে মনে স্মরি"

আরও "সমুখে থুইয়া সিদ্ধি মুদিয়া নয়ন
বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন॥"

প্রয়োজন প্রকৃতির গতিবিধির পিছনে। তবে শিবচেতনার আছে তিনটি স্থিতি এবং প্রকৃতির সঞ্জীবন, উন্নয়ন, পরিবর্তন কি ধরনের ও কতখানি হয়েছে তা নির্ভর করবে ঐ স্থিতিক্রমের উপর। প্রথম হল শিবের জগদতীত ব্রাহ্মীস্থিতি, দ্বিতীয়তঃ শিবের জীবভূত স্থিতি যা প্রত্যেক ব্যষ্টিকে ধারণ করে নিয়ন্ত্রণ করে ও উর্দ্ধায়ণ ঘটায়। শিবের তৃতীয় পদবী হ'ল প্রত্যেক ব্যষ্টির প্রত্যেক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী চেতনা। মানুষের প্রাণের প্রবেগের মধ্যে স্থূলদেহের প্রতিকোষে ও প্রতি অণুর পশ্চাতে রয়েছে তাদের প্রত্যেকের আপন আপন বিশিষ্ট শিবশক্তি। বহতো মহীয়ান শুধু নয়, অণোরণীয়ান, তবুও আবার জড় হতে জড়তর জড়তম। এই শিবশক্তি যখন পূর্ণজাগ্রত ও পূর্ণক্রিয়মান, তার যন্ত্র ও মূর্ত্ত প্রকাশ যখন হয়ে ওঠে প্রাণের ও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তখনই দেখা দেয় সত্যকার পূর্ণ কায়াশুদ্ধি ও কায়াসিদ্ধি।

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বপক্ষে

ভারতীয় সাহিত্য

শ্রীঅরবিন্দ

(১)

নয়নাভিরামের মধ্যে দিয়ে যে-শিল্প আত্মাকে স্পর্শ করে তা একটা জাতির অন্তঃপুরুষ, রূপরসবোধ এবং সৃজনশীল মনের অভিনব এক সংহত প্রকাশ হয়ে ওঠে, কিন্তু যদি দেখতে চাই সেই প্রকাশের নমনীয়তা ও বৈচিত্র্য তাহলে যেতে হবে তার সাহিত্যে, কারণ স্বচ্ছ আলেখ্য এবং বাকপ্রতিমার উর্ণনাভ সাজিয়ে বাক্‌ই তার সর্বপটীয়সী শক্তিতে এবং বহু ধারায় আমাদের কাছে সূক্ষ্মপথে পৌঁছে দেয় প্রকাশমান আন্তর সত্তার আলো-ছায়া, দোলা ও অজস্র ইঙ্গিত। একটা সাহিত্যের মহত্ত্ব প্রথমত তার ভাবের মহনীয়তা এবং গাম্ভীর্যে, চিন্তার মাহাত্ম্যে ও তনুশ্রীতে, তবে সেই সঙ্গে, বাকশিল্পের চূড়ান্ত সব অনুশাসন মেনে, ততখানিই যতখানি সে একটা জাতির আত্মা কিম্বা জীবন্ত ও আদর্শ মনকে, একটা যুগকে সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলে ধরতে পারে তার শ্রেষ্ঠ অথবা সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল প্রতিনিধিদের প্রতিভার ভেতর দিয়ে। যদি জিজ্ঞাসা করি উভয় ক্ষেত্রে ভারতীয় মনের কৃতিত্ব কী যা সংস্কৃত ও অন্য ভাষায় রূপ নিয়ে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে তাহলে নিশ্চয় দুয়ো দেবার বা অস্বীকার করার ন্যায়সঙ্গত কিছু সেও খুঁজে পাবে না যে জীবনের ওপর প্রতিক্রিয়া এবং সংস্কৃতি-চরিত্রের ওপর একান্ত মারমুখী। প্রাচীন ও ক্লাসিকাল সংস্কৃতে যে মহাসৃষ্টি—গুণে আয়তনে এবং উৎকর্ষের প্রাচুর্যে, তার প্রবল অপূর্বত্বে তেজে সৌন্দর্যে, তার ভাবে সৌকর্যে গঠনে, গৌরবে সুবিচারে এবং বাণীনাধুর্যে, উর্ধ্বে ও বিস্তারে তার অন্তঃপুরুষের অধিকারে—তা বিশ্বের সেরা সব সাহিত্যের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর আসনে। রায় দেবার যোগ্য ব্যক্তি যাঁরা তাঁরা সর্বত্র চিরকাল বলে এসেছেন, ভাষা জিনিষটাই মানবমনের তৈরী নানা সাহিত্য-বাধ্যমের ভেতর সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে নির্দোষ ও বিস্ময়করভাবে যথোচিত, যুগপৎ মহৎ মধুর সুনম্য, দৃঢ় পরিচ্ছিন্নাঙ্গ পরিপূর্ণ ধ্বনিতরঙ্গোদ্বেল ও সূক্ষ্ম, এবং এর গুণ চরিত্রই যথেষ্ট প্রমাণ এর মধ্য দিয়ে যে-জাতির মনটি প্রকাশ পাচ্ছে তার গুণ চরিত্রের, যে সংস্কৃতি প্রতিফলিত হচ্ছে তার। কবি মনীষী তার যে সুপ্রয়োগ করেছেন তা তার সামর্থ্যের মহিমার নিচে হয়নি। ভারতীয় মন কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই নিখুঁত অনুপম সৃষ্টি করেনি, যদিও তার মুখ্য গঠনমূলক অনবদ্য সৃষ্টির বৃহত্তর অংশ সেই ভাষাতেই। পর্যাপ্ত বিচারের পক্ষে দেখতে হবে পালিভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্য এবং কোথাও কম কোথাও পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিস্ফুট প্রায় ডজনখানেক সংস্কৃতজ ও দ্রাবিড় ভাষায় কাব্য সাহিত্য। এই সবশুদ্ধ মিলিয়ে একটা প্রায় মহাদেশিক চেহারা—প্রকৃত স্থায়ী সৃষ্টির পরিমাণের দিক থেকে একটুও পেছিয়ে না, পরম উৎকর্ষের দিক থেকেও প্রাচীন মধ্য এবং আধুনিক য়ুরোপের সৃষ্টির সঙ্গে সমান। যে দেশ

যে সভ্যতায় মহৎ শিল্পী ও মহৎ নাম বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ মহাভারতের বিরাট কীর্তি, কালিদাস ভবভূতি ভর্তৃহরি জয়দেব ও ভারতীয় ক্লাসিকাল নাট্য কাব্য রসসাহিত্যের কত সমৃদ্ধ সৃষ্টি, ধর্মপদ ও জাতক-কাহিনী, পঞ্চতন্ত্র, তুলসিদাস, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ, রামদাস ও তুকারাম, ত্যিরুভাল্লুভার, কাম্বান, নানক কবীর মীরাবাই এবং দক্ষিণের শৈব সন্ত ও আলবারদের স্তব ও গান,—উল্লেখ করলাম শুধু সুপরিচিতদের নাম এবং বৈশিষ্ট্যময় রচনাগুলির, যদিও প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎকৃষ্ট রাশি রাশি অন্য রচনা আছে নানা ভাষায়,—তারা নিশ্চয় সকল শ্রেষ্ঠ সভ্যতার সমকক্ষ ও বিশ্বের পূর্ণ সমুন্নত ও সৃজনশীল সকল জাতির সমান। তিন হাজার বছরেরও আগে যার শুরু এবং আজো যার ধারা রিক্ত নয় এত মহৎ এত চিকন সূক্ষ্ম যে তার তুলনা নেই, এবং সে-ই তো শ্রেষ্ঠ ও একান্ত অকাট্য প্রমাণ যে এ সভ্যতায় একটা অসাধারণভাবে দৃঢ় ও প্রাণবন্ত কিছু রয়েছেই।

যে সমালোচনা এই অলভ্য কীর্তির এবং প্রকাশমান আত্মা ও সৃজনশীল বুদ্ধির জ্যোতি-মাহাত্ম্য অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য করে তা তৎক্ষণাৎ অন্ধ বিদ্বেষ অথবা দুর্বার বিরাগের দরুণই দোষী সাব্যস্ত, প্রতিবাদেরও কোনো প্রয়োজন হয় না। আমাদের শয়তানের উকিলটি যেসব আপত্তি তুলেছেন তার বিচার সময় ও উৎসাহের নিতান্ত অপচয়; কারণ, সাহিত্যের মহত্ত্ব সম্পর্কে কিছু অপরিহার্য নিয়ে তো সন্দেহ জাগেনি, আক্রমণের কৃতিত্বের পক্ষে দেখা দিয়েছে খুঁটিনাটি ও মনোভাবের বিরুদ্ধে শুধু এলোপাতাড়ি বিকৃতি ও নিন্দা এবং কটকর তথা অতিরঞ্জিত ধিক্কার—যাতে বড় জোর পার্থক্যটাই প্রকট যার এক দিকে ভারতের আদর্শপ্রবণ মন ও অবাধ কল্পনা আর অন্যদিকে য়ুরোপের অধিকতর বাস্তবপন্থী সমীক্ষু মন ও অপেক্ষাকৃত কম সমৃদ্ধ ও সমুদ্ধ কল্পনা। এই মতলবের ও রীতির সমালোচনার সঠিক তুলনা হবে যদি একজন ভারতীয় য়ুরোপীয় সাহিত্যের কুশ্রী অথবা ব্যর্থ অনুবাদটি মাত্র পাঠ করে তাকে বিরুদ্ধ ও গালিগালাজের সমালোচনায় ধরেন, ইলিয়াডকে অমার্জিত রিক্ত অর্ধ-বর্বর আদিম শৈশবাবস্থার ভীনকাব্য বলে উড়িয়ে দেন, দান্তের সমুচ্চ শিল্পকে নিষ্ঠুর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় উদ্দাম কল্পনার নিশিদুঃস্বপ্ন বলেন, শেক্সপীয়রকে অখ্যাত করেন মাতাল বর্বর বলে যাঁর পর্যাপ্ত প্রতিভায় মৃগীরোগের মতো কল্পনার হঠাৎ কখনো প্রাদুর্ভাব, গ্রীস স্পেন ও ইংলণ্ডের যাবতীয় নাকটকে দেখান কদাচার এবং উত্তাল আতঙ্কের স্তূপ বলে, ফরাসী কাব্যকে নীরস অথবা বাহারে অলঙ্কারের শ্রেণীবদ্ধ কসরৎ এবং ফরাসী উপন্যাসকে মালিন্যলিপ্ত চরিত্রহীন বলে ভাবেন—তা যেন লাম্পট্যময়ী দেবীর বেদীমূলে বলিদানের কালক্ষেপ, এখানে-ওখানে একটু-আধটু গুণপনা স্বীকার করেন, কিন্তু কেন্দ্রস্থ মর্মরহস্য রূপরসের গুণাগুণ কিম্বা শৈলী-নীতিটি বুঝতে আদৌ চেষ্টা করেন না, বরং নিজের মূঢ় পদ্ধতির জোরে সিদ্ধান্তে আসেন যে পেগান ও খ্রীষ্টীয় য়ুরোপের দুই আদর্শই ভ্রান্ত ও মন্দ, তার কল্পনা একটা 'স্বভাবগত এবং পুরুষানুক্রমিক' সর্তচারিতা বিনম্রতা দারিদ্র্য ও বিশৃঙ্খলায় জর্জরিত। এমন রাশীকৃত মিথ্যার সমালোচনায় কোনো সার্থকতা নেই, এবং এই সমান হাস্যকর বিষোদ্গারের মধ্যে অপরের চেয়ে কম নিরর্থক এবং মূঢ় দুএকটি মতামতের ওপর পথ-চলতির দৃষ্টিই ফেলা যেতে পারে। কিন্তু ভারতীয় কাব্য ও সাহিত্য

সম্পর্কে এই অক্ষমতা যদিও সর্বসাধারণ য়ুরোপীয় মনের আসল ধারণার প্রতিচ্ছবি নয়, তবু এখানে দেখি ভারতীয় রচনার আত্মা অবয়ব ও রূপরসের মূল্য সমাদরে বারংবার ব্যর্থতা, বিশেষ করে এই জাতির সংস্কৃতির সম্পন্ন মনের প্রকাশে পূর্ণতার ও শক্তির সমাদরে। সহানুভূতিশীল সমালোচকদের কাছ থেকেও এরকম নিন্দার স্বীকৃতি নেলে যে ভারতীয় কাব্যে রয়েছে প্রাণবীর্য বর্ণ ঐশ্বর্য, আবার সেই সঙ্গে এমন সিদ্ধান্ত যে তারই জন্য আসে না তৃপ্তি ; এর অর্থ—এই যে সৃষ্টির ক্ষেত্র যেখানে চিত্রকলা এবং স্থাপত্যকলার চেয়ে সহজে বিভিন্ন মন মিলতে পারে সেখানেও খানিকটা বুদ্ধিগত ও মেজাজগত অবোঝাবুঝি ঢুকে পড়েছে, অর্থ—দুই মতিগতির মধ্যে পার্থক্য আছে এবং একজনের কাছে যা মনোরম অর্থ-বহ তেজগর্ভ তা অন্যজনের কাছে শুধু আকৃতি ছাড়া রূপরসবোধের বা বুদ্ধির আনন্দের পদার্থ কিছু নয়। এই বিপত্তির মূলে খানিকটা হল ভাষার জীবন্ত আত্মায় প্রবেশে ও তার প্রাণস্পন্দন অনুভবে ব্যর্থতা, আবার খানিকটা হল অভিন্নতার মধ্যে আধ্যাত্মিক বিভিন্নতা যা একান্ত বৈপরীত্য ও বিসদৃশের চেয়েও বিভ্রান্তিকর। উদাহরণস্বরূপ, চীনা কাব্য একান্তই আলাদা জাতের, সেখানে পাশ্চাত্ত্য মন যখন বিভুঁই বিদেশ বলে এড়িয়ে যেতে না চায় তখনই একটা নির্ঝঞ্ঝাট সমাদর রচনা করতে পারে, কারণ মনের গ্রহণা-কাঙ্ক্ষার তখন দুঃসহ স্মৃতি বা তুলনায় বাধা পায়না বা ব্যাহত হয় না। অন্যদিকে, য়ুরোপীয় কাব্যের মতে ভারতীয় কাব্যও আর্য মনের বা আর্যভাবান্বিত জাতীয় মনের সৃষ্টি, প্রত্যক্ষই একই প্রবৃত্তি তার উৎস, একই সুরে তার বিচরণ, একই ধরণের রূপাবলির প্রয়োগ, অথচ অন্তরের অন্তরে এমন স্বতন্ত্র যে তা তার রূপরসের আলোছায়ায়, কল্পনার ধরণে, আত্ম-প্রকাশের ভঙ্গিতে, ভাবোদ্ভিন্ন মনে পদ্ধতিতে আকৃতিতে গঠনে একটা প্রকট ও তেলাবক পার্থক্য। য়ুরোপী ভাব ও রীতিতে অভ্যস্ত মন এখানেও সেই একই রকম তৃপ্তি খোঁজে অথচ পায় না, এমন একটা দুর্গ্রাহ্য ভিন্নতার সম্মুখীন হয় যার মর্মের কাছে সে অপরিচিত, আর সূক্ষ্ম অন্তঃসারী তুলনার প্রবাহ ও ব্যর্থ প্রত্যাশা তার পরিপূর্ণ গ্রহণ ও নিবিড় বোধের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মূলত এটা অন্তরালের সম্পূর্ণ আলাদা একটা মতিগতির এই সংস্কৃতির ভিন্ন হৃদয়ের অক্ষম সমঝদারি যা এনে দেয় এই মিশ্র অনুরাগ ও বিরাগ। বিষয়টি এত ব্যাপক যে এরকম অল্প পরিসরে এর আলোচনা অসম্ভব : ভারতীয় জাতির মনীষা ও অন্তরাত্মার স্বাক্ষর হিসাবে গৃহীত সৃজনশীল কল্পনা ও সম্বোধির সেরা শিল্পকর্মের প্রতিনিধিমূলক কিছু নমুনার আলোচনায় কয়েকটি প্রসঙ্গ মাত্র উত্থাপন করব।

জাতির মধ্যাহ্ন-যৌবনে আদিকালের ভারতীয় মন—যখন অতল আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি সক্রিয় হয়েছে, একটা বোধিদীপ্ত দৃষ্টি, একটা গভীর স্বচ্ছ ও বিরাটভাব অন্বিত, বুদ্ধিগত ও সদাচারগত চিন্তা এবং বীরত্বব্যঞ্জক কর্ম ও সৃষ্টি তার অনন্য সংস্কৃতির ও সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন ও নকশা তৈরী করে তার স্থায়ী গঠন তুলেছিল,—প্রতিফলিত তার প্রতিভার চারটি অপূর্ব রচনায়—বেদ, উপনিষদ, আর দুইটি মহাকাব্য, প্রত্যেকটি এমন এক আপন বৈশিষ্ট্যে আকারে উদ্দেশ্যে স্বকীয় যে অন্য কোনো সাহিত্যেই তার তুলনা মেলে না। প্রথম দু'টি তার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষ রূপ, অপর দুটি তার জীবনে

শ্রেষ্ঠ অংকের বিস্তৃত এক সৃজনশীল ব্যাখ্যা, যে ভাবধারা তাকে প্রাণিত ও যেসব আদর্শ তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল তার ব্যাপক পরিচয় এবং যেসব প্রতীক ও প্রতিমায় যে এঁকে তুলেছিল মানুষ প্রকৃতি ভগবান ও বিশ্বশক্তি সব তাদের আলেখ্য। বেদে আমরা পাই একটা রূপায়িত আধ্যাত্মিক সম্বোধি এবং মনস্তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় অনুভূতির কাছে প্রতিভাত ও প্রসূত (এসব জিনিসের সেই প্রথম ধরণটি ও প্রতিমা); উপনিষদগুলি আধার আকার প্রতীক ভেদ করে আবার তাদের ত্যাগ না করেও ছাড়িয়ে গিয়েছে ওপারে, এসব তো অনুষঙ্গ ও অনুস্বর ভাবে বরাবরই চলেছে, এদের মধ্যে প্রকাশ অদ্বিতীয় এক জাতের কাব্যের মাধ্যমে আত্মা ঈশ্বর ও মানুষের চরম ও অনতিক্রম্য সত্য সব এবং বিশ্ব ও তার নিয়ম ও শক্তিসমূহ তাদের অপরিহার্য গভীরতম নিবিড়তম সমৃদ্ধতম বাস্তবতা নিয়ে,—এমন একটা দুর্নিবার অবাধ অভিজ্ঞা দিয়ে এই সমুচ্চতম স্বচ্ছতম রহস্য সব জাজ্বল্যমান দেখা যা বোধি ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি ভেদ করে উঠেছে নিছক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে। তারপরে এল বুদ্ধি ও প্রাণের শোভন সৌকর্য, এল আদর্শগত সদাচারগত রূপরসসম্পৃক্ত আত্মিক আবেগসংশ্লিষ্ট স্নায়ুগত ও বাস্তবিক জ্ঞানের সমৃদ্ধি—মহাকাব্য দুটি যার আদি লিপিসাক্ষর এবং অবশিষ্ট সাহিত্য যার পরাবৃত্তি; তবে বনিয়াদ বরাবর একই এবং পুরাতনের বদলে নতুন ও প্রায়শ বৃহত্তর রূপরীতি ও অর্থবহ প্রতীক যা-ই আসুক বা মাথা গলিয়ে ঢুকে সংযুক্ত হয়ে সমস্তটিকে পরিবর্তিত রূপান্তরিত করুক, আসলে তারা গঠনে ও প্রকৃতিতে সেই মৌলিক দৃষ্টি ও প্রথম আধ্যাত্মিক অনুভূতিরই ধর্মান্তর ও ব্যাপৃতি, অসম্পৃক্ত নবোন্মেষ কিছুতে নয়। সাহিত্য রচনায় ভারতীয় মনে রয়েছে একটা নিরন্তরতা ও নিরবচ্ছিন্নতা—চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে যুক্তিসঙ্গত যে বিরাট পরিবর্তন সব দেখি তা সত্ত্বেও।

বেদের রচয়িতা আদিকালের বোধিদীপ্ত প্রতীকপসারী মন, যার কাছে পরবর্তী মানব-মন একেবারে অপরিচিত—দারুণ বুদ্ধিমান এবং একদিকে চালিত যুক্তিশীল ভাব ও নির্বস্তু ধারণায় আর অন্যদিকে কোনো ঐশী বা গূঢ় তাৎপর্য না খুঁজে সোজাসুজি গৃহীত ইন্দ্রিয় ও জড় বুদ্ধির কাছে উপস্থিত প্রাণের জড়ের ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কল্পনার প্রশ্রয়কে ঋতের দ্বারী হিসাবে না নিয়ে রসচর্চার খেলা বলে ধরে ও তার ইঙ্গিতগুলি শুধু তখনই গ্রহণ করে যখন তর্কবুদ্ধি ও স্থূল অভিজ্ঞতার দ্বারা সেসব সমর্থিত, সতর্কভাবে বুদ্ধির জালে বাঁধা জ্ঞানোদ্ভাস শুধু জানে আর সব কিছুর দিকে নাক-সিটকায়। অতএব এ তো আদৌ আশ্চর্যের নয় যে শুধু ভাষার নিতান্ত বাহিরের খোলস ছাড়া বেদের সবটাই আমাদের মনের কাছে দুর্বোধ্য লাগবে, একটা প্রাচীন ও অপূর্ণজ্ঞাত শব্দসমাহারের বাধায় সে-ভাষারও সনাক্তদারি নিতান্তই ঠুঁটো, আর এমন সব নিতান্ত অসমর্থ ব্যাখ্যা করা হবে যাতে তরুণ ও উচ্ছৃঙ্খল মানব মনের এই মহান সৃষ্টি প্রতীত হয় তালিযুক্ত ও মসীলিপ্ত লিপি বলে, যা অন্যথা বাস্তববাদী ধর্মের বেশ সরল সমান সাধারণ একটা দলিল হত তা উদ্ভটরূপে ধরে দেখাল আদিম কল্পনায় অযৌক্তিকতার একটা উদ্দাম জগাখিচুড়ী বলে যা প্রতিফলিত ও পরিপুষ্ট করে কেবল বর্বর প্রাণ-মনের অসংস্কৃত ও স্থূল বাসনা-কামনা। পরবর্তী কালের ভারতীয় পুরোহিত ও পণ্ডিতদের তাত্ত্বিক ও আচারপরায়ণ ভাবের কাছে বেদ একটি রূপকথা ও যাগযজ্ঞোৎসবের কাহিনীর বেশি থাকল না; য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা শুধু যা তাদের

কাছে যুক্তিসিদ্ধ চিত্তাকর্ষক শুধু তা-ই—আদিম লোকদের ইতিহাস, রূপকথা এবং জনপ্রিয় ধর্মীয় ধারণা—খুঁজতে গিয়ে বেদের প্রতি আরো কদর্য অন্যায় করেছে, অধিকন্তু একমাত্র স্থূল ব্যাখ্যার উপর জোর দিয়ে এর ভেতর থেকে আধ্যাত্মিক আকর্ষণ এবং কাব্যিক মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যটুকু নিঃশেষে বিলোপ করেছে।

বৈদিক ঋষিদের নিজের কাছে কিন্তু যে মহান দ্রষ্টা ও মনীষীরা তারপরে এসে স্বীয় জ্ঞানগর্ভ ও জ্যোতির্ময় সম্বোধি থেকে গড়ে তুলেছিলেন অতুলনীয় আধ্যাত্মিক আলোক ও অভিজ্ঞান উপর ভাব ও ভাষার অনুপম শিল্পকলা, তাঁদের কাছে বেদ এরকম ছিল না। সেই প্রত্নতাত্ত্বিকের এই দ্রষ্টাদের কাছে বেদ সত্যানুসন্ধানী এবং জীবনের রহস্যার্থ সব প্রতীকে ও রূপনয়নে প্রমূর্ত করবার বাক্। এ বাণীর দৈব আবিষ্কার, তার শক্তির আবরণ-উন্মোচন, তার জ্ঞানগর্ভ রহস্যের ও সৃজনশীল সামর্থ্যের প্রকাশ, যুক্তিগত ন্যায়সঙ্গত অথবা রূপরসিক বুদ্ধির বাচন এ নয়, এটি বোধিজাত উদ্দীপ্ত ছন্দোবদ্ধ বাণী, মন্ত্র। চিত্র ও পুরাণের সেখানে অবাধ প্রবেশ, শুধু কল্পনার প্রশ্রয় হিসাবে নয়, সেই বক্তাদের কাছে একান্ত বাস্তব যেসব সত্য অন্যথা ভাষায় নিকট ও আত্মীয় রূপে প্রমূর্ত হতে পারত না তারই রূপক ও প্রতীক হিসাবে; জীবনের নানা বাহ্যিক ইঙ্গিত ও পার্থিব অস্তিত্বের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ চোখ ও মনকে বন্দী রাখে যে বাস্তবতা তার চেয়েও বৃহত্তর বাস্তবতার পূজারী ছিল সে-কল্পনা। তাদের চোখের সামনে পুণ্যশ্লোক কবির ছবি ছিল এই রকম,—সে-মনে পড়েছে উর্ধ্বতন আলো আর তার ভাব ও ভাষার রূপটি, সত্যের দ্রষ্টা ও শ্রোতা, 'কবয়ঃ সত্যশ্রুতয়ঃ'। বৈদিক মন্ত্রের কবিরা আধুনিক পণ্ডিতদের দেওয়া তাদের কর্মবৃত্তিটি গ্রহণ করেননি, তাঁরা তো নিজেদের একটা পরাক্রান্ত বর্বর জাতির কাছে শ্লোক ও যাদুমন্ত্র আওড়াবার ওস্তাদ বা একটা ভেল্কীবাজ বৈদ্য বলে ভাবেননি, তাঁরা দ্রষ্টা ও মনীষী,—'ঋষি', 'বীর'। এই কবিরা জানতেন তাঁরা একটা উঁচু মিস্টিক গোপন সত্যের অধিকারী, দৈব জ্ঞানের কাছে গ্রাহ্য বাণীর বাহক, তাঁদের উদ্‌গীথ সম্বন্ধে সে-কথা স্পষ্টই বলতেন তাঁরা—সেসব গোপন বাক্ শুধু দ্রষ্টাদের কাছেই তার সকল রহস্য নেমে ধরে, 'কবয়ে নিবচনানি নিন্যা বচাংসি'। ঠিক পরে পরে যারা এল তাদের কাছে বেদ একখানি জ্ঞানের বই, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেরই গ্রন্থ, একটা রহস্যোদ্‌ঘাটন, শাশ্বত ও নির্ব্যক্তিক সত্যের যেমন অনুপ্রাণিত ও দেবকল্প মনীষীদের দৃষ্ট ও শ্রবণে ধরা পড়েছে তারই পরম উচ্চারণ। যজ্ঞের সামান্যতম ঘটনাকে ঘিরে যে মন্ত্রাবলী রচিত তাদেরও লক্ষ্য ছিল একটা বিশেষ প্রতীকী ও অধ্যাত্মশক্তি বহন করা—প্রাচীন ব্রাহ্মণাংশের রচয়িতারা যেমন সেকথা বেশ জানতেন। পুণ্য শ্লোকগুলি—প্রত্যেকটি জানা ছিল স্বর্গীয় অর্থে পূর্ণ—উপনিষদের ভাবুকদের কাছে ছিল তাঁদের ঈপ্সিত গভীর ও অর্থবহ বীজবাক্যরূপে, এবং যে মহত্তম নজির তাঁরা উদ্ধৃতি দিতেন নিজেদের পরমোৎকৃষ্ট বাচনের সমর্থনে তা হল পূর্ববর্তীদের স্মরণে, 'তদ্ এষা ঋচাভ্যুক্তা'—এই কথাই বলেছে ঋগ্বেদ। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা ভেবে নিলেন, বৈদিক ঋষিদের উত্তরসূরীরা ভুল করেছিলেন, কয়েকটি শেষের দিকের মন্ত্র ছাড়া সব প্রাচীন সূক্তে তাঁরা মিথ্যা ও মনগড়া অর্থ আরোপ করেছিলেন, এবং এই ঋষিদের কাছ থেকে যুগান্তব্যাপী কালগর্ভের ব্যবধানে বুদ্ধিজাত মানসিকতার সাতসমুদ্রপারে থেকে তাঁরাই শুধু

সব মোক্ষন জানেন। কিন্তু সামান্য কাণ্ডজ্ঞান থাকলেও বোঝা যায় যে উভয়ত যাঁরা এই আদি কবিদের অনেক কাছে তাঁদের বিষয়গত মূল সত্যটি হৃদয়ঙ্গমের সম্ভাবনা অনেক বেশি, আর পাওয়া যায় অন্তত এই ইঙ্গিত যে বেদ খুব সম্ভব যা বলে নিজেকে জাহির করে আসলে তা-ই ছিল—একটা গহন জ্ঞানের সন্ধান—ভারতীয় মনের তা প্রথম একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের রূপ আর চিরতরে তাকেই সে বরণ করেছে, জড় জগতের বাহ্যরূপটির ওপারে এবং আন্তর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে 'ঋষি বর্ণিত' সেই একনের বহুদেবনুতি শক্তি ও আত্মস্থিতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ—ঋগ্বেদ যে তার এই মূল রহস্য বলেছে সে এমন সুপরিচিত বাক্যে—একম্ সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।

বেদের আসল প্রকৃতি সঠিক বোঝা যাবে তার যে-কোনো অংশ নিয়ে তার নিজস্ব ভাষা ও রূপক অনুযায়ী সোজাসুজি অর্থ করে। যাঁরা বেদের মধ্যে অপূর্বত্ব পান অধিকতর সরেস বুদ্ধির উচ্চাসনে বসে জনৈক জর্মন পণ্ডিত তাঁদের মুখের দল বলে জানাচ্ছেন যে এটা ছেলেমানুষি নির্বোধ এবং কদর্য ধারণায় পর্যন্ত ভরা, এটা ক্লান্তিকর নিচু ও সাধারণ, মানব প্রকৃতি এতে স্বার্থপরতা ও ঐহিকতার নিম্নস্তরে চিত্রিত, এবং এর মধ্যে আত্মার গভীরতা থেকে উৎসারিত ভাব একান্তই বিরল। ব্যাপারটা ওরকমই দেখান যায় যদি ঋষিবাক্যে আমাদের মনগড়া অর্থ আমরা আরোপ করি, কিন্তু যদি ভ্রান্ত অনুবাদ দ্বারা চালিত হয়ে এই আদিম বর্বরদের কী ভাবা ও লেখা উচিত ছিল তা বিচারের পরিবর্তে তা ঠিক বা তেমনই নিয়ে পড়ি তাহলে পাই বাক্যে ও রূপকে সমুন্নত ও তেজগর্ভ এক বিশুদ্ধ কাব্য—যদিও আজকাল আমরা পছন্দ সমাদর করি যে ভাষা ও কল্পনা তার চেয়ে ভিন্নতর তা, আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা তাতে গভীর ও সূক্ষ্ম, সেখানে অভিভূত বাঙ্ময় ও দৃষ্টিময় অন্তরাত্মার দোলা। তাহলে শুনুন বেদের নিজস্ব কণ্ঠ :

স্তরের পর স্তর জন্মলাভ করছে, আবরণের উপর আবরণ* জ্ঞানপ্রবুদ্ধ হচ্ছে : জননীর অঙ্কে তিনি সব দেখছেন। প্রশস্ত জ্ঞান পেয়ে তারা ডাকছে তাঁকে, শক্তির অনিদ্র প্রহরায় রত তারা, দুর্গম পুরীতে তারা প্রবেশ করেছে। মর্তে জাত জনেরা শুক্লা জননীর পুত্রের জ্যোতিষ্মান (শক্তি) বৃদ্ধি করে ; কণ্ঠে তাঁর সোনা, বাকে তিনি বিরাট, তিনি যেন এই মধুরসের (তেজপ্রভাব) দ্বারা প্রাচুর্যের সন্ধানে। কমনীয় ও কাম্য দুধের মতো তিনি, নিঃসঙ্গ এক বস্তু তিনি এবং যে দু'জন সহচর তাদের সঙ্গে তিনি, সমৃদ্ধির জঠর যে তাপ তা তিনি, তিনি অজেয় এবং বহুবিজেতা। হে শিখা, লীলায় তোমার নিজেকে প্রকাশ করে দাও।† (ঋগ্বেদ) ৫।১৯

কিম্বা এই পরবর্তী সূক্ত,—

তোমার ওই (বহ্নি শিখা), প্রবল দেবতা, তারা নিষ্কম্প অথচ বেড়ে চলে এবং বীর্যবন্ত, সেই যে একের আছে অন্য নিয়ন তার বৈরিতা ও বক্রতা শিথিল করে দাও। হে অগ্নি, তোমাকে বরণ করলাম আমাদের হোতা আমাদের শক্তিসাধনের উপায়রূপে এবং যজ্ঞে তোমার

---

* আবরকের আবরক।

† আক্ষরিক অর্থে 'আমাদের সামনে আবির্ভূত হও।'

অভীপ্সিত ভোজ্য এনে রাখো তোমাকে আবাহন করি...হে সুকর্মকারক, আমরা যেন আনন্দের পক্ষে সত্যের পক্ষে থাকি, শিখারাজির লীলাসঙ্গী বীরার্ষভদের লীলাসঙ্গী হয়ে। শেষে নেওয়া যাক অনুবর্তী তৃতীয় সূক্তের প্রায় সবটা—যজ্ঞের সাধারণ ভাষায় যা আচ্ছাদিত,—

মনুর মতো তোমার আসনে আমরা তোমাকে স্থাপনা করেছি, মনুর মতো প্রজ্বলিত করেছি তোমাকে : হে অগ্নি, হে অঙ্গিরা, যারা কামনা করে মনুর মতো তাদের জন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর। হে অগ্নি, তৃপ্ত হয়ে মানবাধারে তুমি ভাস্বর হলে এবং তোমার প্রতি নিবেদনের ধারা অবিরাম চলেছে...হে দ্রষ্টা, সকল দেবতা প্রীত (তোমাতে) হয়ে তোমাকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন বলে যজ্ঞস্থলে (যজমানগণ) দীপ্তিমান তোমাকে স্তব করে থাকে। দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞের সঙ্গে স্মরণশীলরা স্বর্গীয় অগ্নির স্তব করুক। হে দীপ্তিময়, শিখা বিস্তার করে ওঠ। সত্যের আসনে বস, শান্তির আসনে বস।*

এর সব রূপকের গায়ে যে ব্যাখ্যাই পরিয়ে দিই না, এটি নিছক নিগূঢ়ক এবং প্রতীকী কাব্য, আর ঋগ্বেদ আসলে ঠিক তাই।

এই কয়েকটি বিশিষ্ট মন্ত্রে পরিস্ফুট বৈদিক কাব্যের প্রকৃতি দেখে আমাদের বিস্মিত বা বিভ্রান্ত হবার কিছু নেই যখন এশিয়ার সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় দুই জিনিসটা আরো প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে, যে এর বাক্ প্রয়োগ ও তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও, এর রূপক পদ্ধতির অসামান্যতা এবং চিন্তার জটিলতা ও ইঙ্গিতাত্মক অভিজ্ঞতা থাকলেও, মূলত এটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কাব্যিক প্রকাশে প্রতীকী বা রূপকাত্মক কল্পনার ব্যবস্থা যা পরবর্তী ভারতীয় রচনায় বারংবার দেখা দিয়েছে, তন্ত্র ও পুরাণের রূপকে, বৈষ্ণব কবিদের রূপকে, রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কাব্যেও একটা উপাদান বোধহয় উল্লেখ করা চলে,—আর এই ধারা কিছু চীনা কবি ও সুফিদের ভাবমূর্তিতে দেখা যায়। কবিকে একটা আধ্যাত্মিক ও আত্মিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়, তাঁর পক্ষে তা দার্শনিক ভাবুকের অধিকতর নির্বিবেক ভাষায় সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রকাশ করাও সম্ভব নয়, কারণ তাঁকে তো শুধু বিবসনা ভাবনাটুকু এনে দিলেই হয় না, যত জীবন্তভাবে সম্ভব তার প্রাণস্পন্দন এবং নিবিড় স্পর্শটি পর্যন্ত দিতে হয়। এ-ভাবে হোক আর ও-ভাবে হোক তাকে খুলে দেখাতে হয় নিজের অন্তর্লোক এবং তাঁর চতুর্দিকে জগতের ঠিক আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক মাধুর্যটি এবং সেই সঙ্গে, হতে পারে বেশ, আমাদের সাধারণ মনের পরিচয়ের বাহিরে অন্য নানা চেতনাস্তরের দর্শন ও অভিজ্ঞতা, নানা দেবতা ও শক্তি। নিজের ও অপরের সাধারণ ও বাহ্য জীবন এবং বিশ্বপ্রকৃতি থেকে রূপাভাস নিয়ে তার কারবার বা যাত্রারম্ভ—যদিও এরা নিজেরাই ঠিক প্রকাশ করে না, তবে তাদের মধ্যে দিয়েই আধ্যাত্মিক ও আত্মিক ভাব ও অনুভূতিকে আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করতে বা অবয়বী হয়ে উঠতে বাধ্য করে।

---

* ইংরাজী অনুবাদের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মূলানুগ হতে চেষ্টা করেছি। পাঠকেরা সেখানে মূল দেখে বিচার করবেন মন্ত্রের অর্থ ঠিক কিনা।

আপন স্বরলিপির রূপভাণ্ডার থেকে অন্তর্দৃষ্টি বা কল্পনা অনুযায়ী স্বেচ্ছামতো পছন্দের পর সে তাদের গ্রহণ করে, তারপরে আবার অন্য ব্যঞ্জনার আধারে রূপান্তর দেয় এবং যুগপৎ সেই যে বিশ্বপ্রকৃতি ও প্রাণের তারা অঙ্গ তার মধ্যে প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম তাৎপর্যটি, আন্তর বস্তুরাজিতে বাহিরের রূপাবলি প্রয়োগ করে ভিতরকার আধ্যাত্মিক বা চৈত্যিক রহস্য দিয়ে ভরে দেয় প্রাণের স্থূল যত রূপাকৃতি ও পরিবেশ। অথবা আন্তর অনুভূতির নিকটতম একটা বাহ্য রূপ—পার্থিব প্রতিচ্ছায়া—বরাবর গ্রহণ এবং এতখানি বাস্তবতার সঙ্গে নিরবধি প্রয়োগ করা হয় যে যার আছে সেবস্তু তার কাছে সে যেমন আধ্যাত্মিক অনুভূতিটি তুলে ধরে তেমনি অন্যের কাছে মনে হয় বাহিরের খোলস মাত্র,—ঠিক যেমন ভক্তিরসাপ্লুত মনের কাছে বাংলার বৈষ্ণব কাব্য একটা পার্থিব ও আবেগময় রূপ অথবা ভগবানের জন্য মানবাত্মার প্রেম বলে ইঙ্গিতাভাসে চিত্রিত, অথচ অভক্তের কাছে রাধা-কৃষ্ণ দুই ব্যক্তিকে আশ্রয় করে তা-ই শুধু চিরাচরিত ভক্ত-ভগবানকে ঘিরে প্রথামতো প্রেমসংগীতের মালা গাঁথা। দুটি পথই এক জায়গায় মিলতে পারে, বাহ্য রূপমালার স্থিরনির্দিষ্ট ছকটি কাব্যের দেহ হতে পারে, তবে স্বাধীনতা তো সর্বদাই ছিল তাদের প্রাথমিক বেড়াটি ডিঙিয়ে যাবার, তাদের শুধু প্রারম্ভিক ইঙ্গিত হিসাবে নেবার এবং সূক্ষ্মভাবে রূপান্তরিত করবার অথবা পাশে ঠেলে সরিয়ে রাখবার কিম্বা স্তিমিত গৌণ স্বর বলে ধরবার, আর না হয় নিজের ভিতর থেকেই তাদের এমন তুলে আনবার যাতে আমাদের মনশ্চক্ষের সামনে তাদেরই খোলাস হাল্কা পর্দাটা সরে যায় কিম্বা ফলত এনে দেয় স্বয়ম্প্রকাশ। শেষোক্ত পদ্ধতি বেদের এবং এর ইতর বিশেষ কবির দৃষ্টির আবেগ ও তীব্রতার অথবা তাঁর উচ্চারণের অনুসারে।

আমাদের চেয়ে ভিন্নতর এক মনোবৃত্তি ছিল ঋগ্বেদের এই কবিদের, এক বিশেষ ধরণের প্রয়োগে নিজস্ব রূপকমালা নিয়ে, দৃষ্টির প্রাচীন ছাঁচ সে-সবের অন্তঃসারকে দিয়েছে একটা অলৌকিক রূপরেখা। তাঁদের চোখে এ-লোক আর চৈত্যলোক একটা দ্বিবিধ বিভিন্ন অথচ সংযুক্ত ও অভিন্ন বিশ্বদেবতাদের রূপপরিগ্রহণ ও প্রকাশ, মানুষের স্থূল ও আন্তর জীবন দেবতাদের সঙ্গে একটা স্বর্গীয় লেনদেন, সবের অন্তরালে সেই চিৎপুরুষ ও পরমসত্তা বহু দেবতা যাঁর নাম রূপ গুণ—এই দেবতারা যেমন জড় প্রকৃতির ও তার নিয়ম ও নানা রূপের প্রভু, তেমনি আমাদের চৈত্যসত্তায় অনুরূপ যে সব স্তরপরম্পরা বা শক্তিরাজি তাদেরও অধীশ্বর—কারণ, তারা হল বিশ্বের আত্মশক্তি, ঋত ও অমরত্বের প্রহরী, অসীমের অপত্য, এবং প্রত্যেকে আবার আপন উৎসে এবং অন্তিম বাস্তবতায় সেই পরম চিৎপুরুষের নিজের থেকে নিজের এক অংশ প্রমূর্ত করা। এই দ্রষ্টাদের কাছে মানব-জীবন সত্যমিথ্যার মিশ্রিত বস্তু, মরতা থেকে অমরত্বের দিকে গতি, আলো-আঁধারের মিশ্রণ থেকে সেই ভাগবত সত্যের জ্যোতির দিক চলা যার আবাস উর্ধ্বে অসীমে কিন্তু যা আবার এখানে মানুষের জীবনে ও অন্তরাত্মায় গড়ে তোলা যায়, আলোকের সন্তান আর রাত্রির পুত্রদের মধ্যে এ এক সংগ্রাম, ধনরত্ন লাভ, মানবযোদ্ধাকে ভগবানের রণক্ষেত্রে প্রাপ্ত পুরস্কার দান, একটা প্রযাত্রা একটা যজ্ঞ; প্রকৃতির পটভূমি থেকে এবং যুদ্ধপ্রিয় গ্রাম্য কৃষিজীবী আর্যজাতির জীবনের পরিবেশ থেকে নিয়ে রূপক ব্যবহারের একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেনে তাদের

সহযোগে বৈদিক ঋষিরা এসব কাহিনী বলেছেন, এবং অগ্নিপূজা, জাগ্রত প্রকৃতির শক্তি-রাজির উপাসনা ও যজ্ঞানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এসবের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁদের জীবনে ও আচরণে স্থূল জীবনের ও যজ্ঞের বিশদাঙ্গ সব প্রতীক হয়ে উঠেছিল, আর কাব্যে তো নিষ্প্রাণ প্রতীক বা কৃত্রিম উপমা নয়ই বরং অন্তরের জিনিসের সব জীবন্ত ও সবল ব্যঞ্জনা অথবা প্রতিরূপ হয়েছিল। উপরন্তু ভাবপ্রকাশের জন্য তাঁরা নিয়েছিলেন একটা সুনির্দিষ্ট অথচ পরিবর্তনীয় রূপকের এক রাশি, রূপকথার ও উপদেশাত্মককাব্যের এক উদ্ভূঙ্খল মায়া-জাল, রূপক যেখানে উপদেশাত্মক আর উপদেশাত্মক যেখানে রূপকথা হয়ে উঠেছে এবং রূপকথা যেখানে চিরন্তন রূপকের বেশ নিতে পেরেছে, আর সর্বোপরি এ-সবস্তই তাদের কাছে—একভাবে বলা যায় যাদেরই কিছুটা চৈত্যিক অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ ঘটেছে তাদেরই কাছে—বাস্তব সত্য। পার্থিব তখন তার আলোছায়া ফেলে দিয়ে মিশে যায় চৈত্যের দীপ্তিতে, চৈত্য গাঢ় ঘন হয়ে তলিয়ে গেছে অধ্যাত্মে, আর কোথাও নেই পারাপারের উগ্র ভেদরেখা, বরং রয়েছে তাদের বর্ণ ও ব্যঞ্জনার একটা স্বাভাবিক মিশ্রণ ও মেলামেশা। তাহলে এটা প্রত্যক্ষ হল যে শুধু জড় জগতের নিয়মের উপর নির্ভরশীল যুক্তি ও রুচির মানদণ্ড নিয়ে এই প্রকৃতির দৃষ্টি ও কল্পনা দিয়ে রচিত এই ধরণের কাব্যের বিশ্লেষণ ও বিচার চলে না। 'হে শিখা, লীলাময় হয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হও' এই মন্ত্রের একদিকে যেমন ভাবটি স্থূল যজ্ঞকুণ্ডে তেজগর্ভ হোম শিখার ঊর্ধ্বলেহন ও উজ্জ্বল বিস্তার তেমনি একটা অনুরূপ চৈত্যিক ব্যাপার, আমাদের অন্তরের অন্তরে ঐশীশক্তি ও জ্যোতির বরাভয় শিখাটির আবির্ভাব। যে দুঃসাহসী ও বেপরোয়া রূপক বলছে স্বর্গ মর্তের পুত্র ইন্দ্র তাঁর পিতামাতারও স্রষ্টা পাশ্চাত্য সমালোচকের কাছে তা বীভৎস, উপহাসের বস্তু; কিন্তু যদি সমরণে রাখি ইন্দ্র শাশ্বত চিরনিত্য একটি বিভাব ধরে সেই সর্বোত্তম চিৎপুরুষই, স্বর্গ মর্তের স্রষ্টা, মনোময় ও জড়-জগতের মধ্যবর্তী বিশ্বদেবতারূপে জাত এবং মানুষের অন্তরে তাদেরই সব শক্তি পুনঃসৃষ্টি করছেন, তাহলে দেখব একটা শুধু ভাষলালালাই নয়, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ ও স্বয়ম্প্রকাশ রূপক; বৈদিক পদ্ধতি পরোয়া করে না যদি এতে স্থূল কল্পনার চরিত্রনাশ হয়, কারণ তখন সে সে বৃহত্তর বাস্তবকে প্রাণসঞ্চারী নৈপুণ্য ও জীবন্ত কবিত্বশক্তি দিয়ে এমন ফুটিয়ে তুলেছে যা আর কিছুতে পারা যেত না। বেদের বৃষ ও গাভি, গুহানিহিত সূর্যের রশ্মিমুখ স্থূল মনের কাছে কিম্ভূতকিমাকার জীব, কিন্তু তারা তো পার্থিব জিনিস নয় এবং নিজস্ব স্তরে প্রাণ ও তাৎপর্যে পরিপূর্ণ প্রতীক ও বাস্তব বস্তু। ঠিক এই রকমে বরাবর গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করতে হবে বৈদিক কাব্যের—আমাদের কাছে বিকৃত এবং অতিপ্রাকৃত লাগলেও, তার আপন অন্তঃপ্রেরণা ও দৃষ্টি অনুসারে, তার নানা ভাব ও রূপকের প্রত্যক্ষ ও স্বাভাবিক সত্য অনুসারে।

তাহলে বেদের মাহাত্ম্য ফুটে উঠছে দেখলাম, জগতের প্রথম ও অনবলুপ্ত শাস্ত্র এবং মানব বিশ্ব ও ভগবানের প্রাচীনতম ব্যাখ্যার চিত্তাকর্ষক বিষয় হওয়া ছাড়াও, একটা অনন্য-সাধারণ মহৎ কাব্যসৃষ্টি হিসাবে। আজিকে ভাষণে এ কোনোমতেই বর্বর রচনা নয়। বৈদিক কবিরা আজিকের নিপুণতম শিল্পী, তাঁদের ছন্দ দেববরণের মতো সুরচিত—ধ্বনির

অলৌকিক ও অপরিমিত ভাষা তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে, সে-ধ্বনি যুগপৎ সংহত ও বহুতরঙ্গিত, গতি তার যেমন বৃহৎ তেমনি স্বরালাপ সূক্ষ্ম, তীব্রতায় বাণী তার হয়ে উঠেছে লিরিকধর্মী আর উচ্চতায় এপিকধর্মী হয়ে রূপ নিয়েছে এক প্রবল শক্তির উদ্‌গীথ বলে, নির্মল নির্ভীক আর রূপরেখায় নীলিমাস্পর্শী, সংস্পর্শে মনে হয় সে-বাণী স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত, অর্থ ও ব্যঞ্জনায় পরিপ্লাবী, এমনটি যাতে মনে হয় প্রত্যেকটি সূক্ত যেমন সমর্থ তেমনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ—অনুগামী আর পূর্বগামীর মধ্যে সে রয়েছে এক বিরাটাকার সোপানের মতো। একটা পবিত্র ও দেবব্রতী ঐতিহ্য নিষ্ঠাভরে পালন তাদের রূপ ও অর্থ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তবে এই অর্থ এসেছে মানবাত্মার পক্ষে যতটা সম্ভব সেই গভীরতম চৈত্যিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা থেকে, আর রূপ তো ক্বচিৎ নেমেছে বা আদৌ নামেনি নিষ্প্রাণ আচারে, কারণ প্রত্যেক কবি নিজের জীবনে তা ধরেছেন বা তিনি প্রকাশ করতে চান, নিজের মনের কাছেই প্রকাশে অপূর্ব করেছেন আপন ব্যক্তিগত দৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও সমুচ্চতা দিয়ে। শ্রেষ্ঠ কবিদের বাণী—বিশ্বামিত্র, বামদেব, দীর্ঘতমা এবং আরো অনেকে—নভোনিলীমাস্পর্শী ও বিস্টিক কাব্যের উচ্চতা ও জনক পেয়েছে, আর সৃষ্টি-মন্ত্রের মতো কাব্য—সেগুলি চিন্তার শিখরে প্রবল স্বচ্ছতায় আসীন, যা উপনিষদের অনায়াস বাসের নিত্যধাম। প্রাচীন ভারতের মন যখন তার সমস্ত দর্শন ধর্ম এবং সংস্কৃতির মূল উপাদানের উৎস দেখেছিল এই ঋষিকবিদের মধ্যে তখন সে ভুল করেনি, কারণ সত্যই তো তার দেশবাসীর সমস্তটা ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিকতা সেখানেই রয়েছে বীজাকারে অথবা প্রথম বাণী রচনায়।

বৈদিক মন্ত্রগুলি পবিত্র সাহিত্যের আকারে সঠিক বোঝার বিশেষ গুরুত্ব হল যে তাতে যেমন ভারতীয় মনের নিয়ন্তা প্রধান ভাবগুলি মৌলিকরূপেই চেনা যায় তেমনি জানা যায় তার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার নানা বিশিষ্ট ধারা, তার কল্পনার প্রকৃতি, তার সৃজনশীল মনোবৃত্তি এবং সেই বহুধা বিচিত্র রূপ যার ভিতর দিয়ে অনবরত সে চিত্রিত করেছে নিজের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ আত্মা বস্তু জীবন ও বিশ্ব। এখানে সাহিত্যের বহুলাংশে দেখি স্থাপত্য চিত্রবিদ্যা ভাস্কর্যেরই মতো অনুপ্রেরণা ও আত্মপ্রকাশের অবিকল এক প্রবণতা। তার প্রথম লক্ষণ হল সর্বদা অসীমের বোধ, বিশ্বব্যাপীর বোধ, এমন যেন জিনিস সব দেখা বা আকৃষ্ট বিশ্বদৃষ্টিতে, একক ও অনন্তের মধ্যে বা পটভূমিকায় সব সাজানো ; দ্বিতীয় বিশেষত্ব হল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে অন্তরের চৈত্যস্তর থেকে গৃহীত রূপকের বিপুল ঐশ্বর্যে কিম্বা চৈত্যিক তাৎপর্য প্রভাব রেখা ভাববর্ণের তাপে রূপান্তরিত পার্থিব রূপকে দেখা ও দেখান, তৃতীয় প্রবণতা হল, যেমন রামায়ণ মহাভারতে, পার্থিব জীবনকে প্রায়ই বিরাটাকার করে আঁকা, নয়ত বৃহত্তর আবহাওয়ার স্বচ্ছতায় সূক্ষ্মতর করে ধরা—সঙ্গে দেওয়া মৃন্ময় অর্থের চেয়ে অন্যতর কিছু কিম্বা অন্তত আধ্যাত্মিক ও চৈত্যিক জগতের পটভূমিকায় উপস্থাপিত করা, কিছুতেই নিজের বিচ্ছিন্ন মূর্তিতে নয়। অধ্যাত্ম অসীম কাছের ও বাস্তব, দেবতারাও বাস্তব, আমাদের সত্তার মধ্যেই নিহিত হলে যেমন তেমন সুদূরের নানা জগৎ তত দূরের আর নয়। পাশ্চাত্ত্য মনের কাছে যা ওখানে যা অলীক ও কল্পনা এখানে তা বাস্তব এবং আমাদেরই আন্তর সত্তার জীবনে একটি সূত্র, ওখানে যা সুচারু কাব্যভাব ও দার্শনিক অনুমান

এখানে তা নিয়ত সিদ্ধ ও অভিজ্ঞতায় বিধৃত। ভারতীয় মনের এই ধরন, তার আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা ও চৈত্যিক কৃতনিশ্চয়তা ও ধর্ম-দার্শনিক কাব্য—প্রেরণায় যা তেজস্বী এবং রূপকে ও প্রকাশে যে অদূর ও জীবন্ত, অধিকতর ইহপরায়ণ সাহিত্যে কাব্যভাব ও কল্পনার ক্রিয়াক্ষেত্রেও তত সর্বগ্রাসী না হলেও এর গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয় সাহিত্য

(২)

উপনিষদগুলি ভারতীয় মনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, আর এরকমটি যে হবে, তার প্রতিভার তার পরমোৎকৃষ্ট কাব্যের, তার চিন্তা ও শব্দের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সর্বোত্তম আত্মপ্রকাশ যে সাধারণ জাতের চৌকস সাহিত্য বা কাব্যরচনা না হয়ে এই প্রত্যক্ষ ও গভীর বৈশিষ্ট্যের দিক্‌পরিপ্লাবী আধ্যাত্মিক প্রকাশ হবে তা একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা—তা একটা অতুলনীয় মনোভাব ও অনন্য আত্মভঙ্গিমারই প্রমাণ। উপনিষদগুলি তো গভীর ধর্মশাস্ত্র,—অতল আধ্যাত্মিক সব অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত তারা,—অপর্যাপ্ত আলোক শক্তি ও বিশালত্বে পূর্ণ একটা প্রকাশক বোধিদীপ্ত দর্শনের দলিল,—এবং কাব্যে অথবা ছন্দময় গদ্যে রচিত হোক, তারা অনবদ্য ছন্দে ভাষায়, অমোঘ শব্দসন্নিবেশে, নিরঙ্কুশ ও অক্লান্ত অনুপ্রেরণায় আধ্যাত্মিক কাব্য। এ এমন মনের প্রকাশ যেখানে ধর্ম দর্শন কাব্য এক করে তোলা হয়েছে, যেহেতু এ-ধর্ম তো একটা বৃত্তেতে শেষ হয়নি বা ধর্মাচারের অভীপ্সার গণ্ডীতে বন্দী হয়নি, তা উঠে চলেছে ঈশ্বর, পুরুষ, আমাদের আত্মা ও সত্তার উচ্চতন ও পূর্ণাঙ্গ সত্য আবিষ্কারে, তার বাণী নিঃসৃত হয়েছে জ্যোতির্ময় জ্ঞানের আনন্দ এবং একটা রোমাঞ্চিত ও সার্থক অভিজ্ঞতার আনন্দ থেকে, এ-দর্শন তো সত্যের বায়বীয় বুদ্ধিগত গবেষণা নিষ্কাষণ কিম্বা ন্যায়বুদ্ধির সংগঠন নয়, বরং জীবনে প্রতিফলিত দৃষ্ট অনুভূত একটা সত্য, একটা নিশ্চিত আবিষ্কার ও প্রাপ্তি বাণীযন্ত্রে প্রকাশের আনন্দে অন্তরতম মনে ও আত্মায় বিধৃত, সাধারণ মনের ঊর্দ্ধে নীত রূপরসিক মনের ক্রিয়া এমন কাব্য—অতি বিরল আধ্যাত্মিক আত্মদর্শনের বিস্ময় ও সৌন্দর্য এবং আত্মা, ঈশ্বর ও বিশ্বের গভীরতম জ্যোতির্ময় সত্য প্রকাশ। এখানে বৈদিক দ্রষ্টাদের বোধিদীপ্ত মন ও নিবিড় মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা এমন এক চরমোৎকর্ষে পৌঁছে গিয়েছে যেখানে চিৎপুরুষ—কঠোপনিষদ যেমন বলছে—অনাবৃত করে ধরেছেন আপন কায়া, ব্যক্ত করেছেন তার আত্মপ্রকাশের বাণীটি, মনের কাছে পরিচিত করেছেন নানান ছন্দের সেই স্পন্দন অন্তরে আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কাছে যার আবৃত্তি আত্মার পুষ্টি, পরিতৃপ্তি এবং আত্মজ্ঞানের শিখরে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়।

উপনিষদের এই প্রকৃতির উপর বেশ জোর দেওয়া প্রয়োজন, কারণ বিদেশী অনুবাদকরা একে গ্রাহ্য করেননি—তাঁরা তো চেয়েছেন বুদ্ধিগত অর্থটি বের করতে, অথচ

অনুভব না করে সেই ভাবদৃষ্টির প্রাণস্পন্দন ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার আনন্দ যা এই প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে সেদিনের ও আজকের বাকসিদ্ধ ঋষিদের কাছে শুধু বুদ্ধিরই এক্তিয়ার করেনি, আত্মা ও সমগ্র সত্তার কাছে একটা স্বয়ম্প্রকাশ বস্তু, প্রাচীনের ভাষায় 'শ্রুতি', আধ্যাত্মিক শ্রবণে শোনা, অনুপ্রাণিত শাস্ত্র। উপনিষদের দার্শনিক ভাববস্তু বলছে আজ আর তার মূল্যায়নের উপর জোরজার করার দরকার নেই কারণ বহুজন মনের কাছ থেকে বৃহত্তম স্বীকৃতি না মিললেও তার সমস্ত দার্শনিক ইতিহাসটি তো সেখানে রয়েছে প্রমাণ হিসাবে। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে ভারতবর্ষে অসংখ্য গভীর দর্শনতত্ত্ব ও ধর্মের উৎস এই উপনিষদ—হিমালয়ের গোমুখী থেকে প্রবাহিত সেই তার মহানদনদীর মতোই যা যুগযুগান্ত ধরে উর্বর করে রেখেছে জাতির জীবন ও মন, সঞ্জীবিত রেখেছে তার অন্তরাত্মা, বারংবার দাবির উত্তরে দিয়েছে আলো, দিতে পেরেছে সর্বদা নূতন জ্ঞান, একটা জীবনদাতৃ জলের অফুরন্ত ফোয়ারা। বৌদ্ধধর্ম বহুমুখী সমৃদ্ধি নিয়ে তার সেই পুরনো উপলব্ধিরই এক দিকের একটা পুনর্বাচন—যদিও নতুন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বুদ্ধিগত আখ্যান ও যুক্তির নূতন ভাষ্যে—তারই এই আকৃতিতে পরিবর্তিত অথচ ভাবে অবিকল রূপ সে বহন করে চলেছিল সারা এশিয়ায় এবং পশ্চিমে য়ুরোপের মুখে। ঔপনিষদ ভাবনা বেশ খুঁজে পাওয়া যায় পিথাগোরাস ও প্লেটোর চিন্তার অনেকাংশে, পাশ্চাত্যের দার্শনিক চিন্তায় যে প্রবল প্রভাব ফেলেছে সেই নব-প্লেটোনিজম এবং আস্তিক্যবাদের গভীরতম অধ্যায়ে,—সুফীপথ তো তাদেরই পুনরাবৃত্তি করছে আর এক ধর্মীয় ভাষায়। জর্মন তত্ত্বদর্শনের অধিকাংশ ভাগ এই প্রাচীন শাস্ত্রে অনেক বেশি আধ্যাত্মিকভাবে দেখা মহৎ সত্যের মানসিক উৎকর্ষের চেয়ে ভিন্নতর পদার্থ কিছু নয়, আর আধুনিক চিন্তা যে নিবিড়তর ও অধিকতর জীবন্ত ও ব্যাকুল গ্রহিষ্ণুতা দিয়ে তাদের হজম করছে তাতে দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তায় একটা বিপ্লবের পূর্বাভাস স্পষ্ট; কোথাও নানান অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের বাধ্যনে তারা ঢুকছে, আবার কোথাও কত প্রত্যক্ষ ও অবাধ প্রণালী বেয়ে ধীরে ভরে ফেলছে। এমন কোনো মূল দার্শনিক ভাবের সাক্ষাৎ বিরল যার মূল, বীজ বা নির্দেশ নেই এই সব সেকেলে রচনায়—কয়েকজনের মতে, এই আদ্যাত্মীমানায়—যার উদ্ভাবক এমন ভাবুকদল যাদের অনার্জিত বর্বরোচিত প্রকৃতিজীবী প্রাণসর্বস্ব মূঢ়তা ছাড়া নিজস্ব চিন্তার আর কোনো উন্নততর অতীত বা পটভূমিকা নেই। আজ দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের বৃহত্তর নিয়ন সব জড় প্রকৃতির সত্যে সেই সব সূত্রই প্রয়োগ করছে যা ভারতীয় ঋষিরা আত্মার গভীরতর সত্যে তাঁদের মৌলিক ও বৃহত্তম অর্থ আবিষ্কারে খাটিয়েছেন।

তবু এসব রচনা মগজী জাতের দার্শনিক জল্পনা নয়, তেমন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয় যার আয়াস ভাবনা আঘাত করা, ভাব নির্বাচন এবং সত্যাত্মকগুলি পৃথক করা, সত্যকে যুক্তিবদ্ধ করা অথবা বুদ্ধিগত পছন্দ-অপছন্দ বিচারের যুক্তি দিয়ে মনের ঠেকনা দেওয়া, যুক্তির এ-ভাব বা ও-ভাবের আলোকে জীবনের একটা একান্তদর্শী সমাধান গায়নে ধরে তুষ্ট বোধ করা, সব জিনিস শুধু দেখা ওই এক দৃষ্টিকোণ থেকে, এক নজরে ও এক নিয়ামক পরিবেশে। এই জাতের হলে উপনিষদের আর অমর প্রাণধারা থাকত না, এমন অব্যাহত প্রভাব থাকত না, এমন ফল ফলত না কিম্বা সৌভাগ্য হত না দেখার তার সেই সব উক্তি আজ

স্বতন্ত্রভাবে সম্বর্ধিত হচ্ছে জিজ্ঞাসার অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং বেশ বিপরীত পন্থায়। কারণ, এই দ্রষ্টারা সত্যকে তো শুধু মাত্র ভাবনায় পাননি, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন, বোধদীপ্ত ভাবের দ্যুতি অঙ্গ-বসন ও আবরণাপক প্রতীক পরিয়েছেন, সে অঙ্গ এমন আদর্শ স্বচ্ছ যে তার ভিতর দিয়ে দেখি অসীমকে, কারণ তাঁরা তো জিনিসের বিচার করেছেন আত্মস্থিতির আলোকে এবং সেসব দেখেছেন অনন্তের দৃষ্টি দিয়ে, তাঁদের বাণী চিরকাল তাই সজীব ও অমর—অশেষ তাৎপর্য তার, অনিবার্য নিশ্চয়তা, এমন একটা চূড়ান্ততা যা আবার যুগপৎ সত্তার অনন্ত আরম্ভ, যাতে আমাদের সকল জিজ্ঞাসার পথ যাত্রা শেষ করে আবার ফিরে আসে, উপনিষদগুলি বেদান্ত, বেদের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর প্রজ্ঞার গ্রন্থ, সে প্রজ্ঞা গভীরতর ভারতীয় অর্থে 'জ্ঞান'। যেহেতু কেবল আত্মাকে পূর্ণভাবে জানাতেই এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিপূর্ণতা, তাই বৈদান্তিক ঋষিরা আত্মাকেই জানতে চেয়েছিলেন, তাতেই জীবনধারণ করতে তার সঙ্গে অন্তিম একীভূত হতে চেয়েছিলেন। এই প্রয়াসের ভিতর দিয়ে তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পেলেন আমাদের আত্মা সর্বভূতস্থ বিশ্বাত্মার সঙ্গে এক এবং এই আত্মা সেই ঈশ্বর ব্রহ্ম, তুরীয় এক সত্তা ও অস্তিত্ব, তাঁরা এই এক ও একীকরণের অনুভবে জীবনে জাগ্রত ধরলেন বিশ্বে সর্ববস্তুর অন্তরতম সত্য এবং ভিতর ও বাহির জীবনের নিবিড়তম সত্য। উপনিষদগুলি মহাকাব্যে আত্মজ্ঞান বিশ্বজ্ঞান ও ঈশ্বরজ্ঞানের উদাত্তসুর। বাণীকৃত দার্শনিক সত্যের এমন বহৎ রূপ হয়েও তারা শুধু অবশ্য মননী সূত্র নয়, এমন নয় যে মনকে উজ্জ্বল ও প্রবুদ্ধ করতে পারে অথচ সজীব হয়ে আত্মাকে উত্তরণের পথে নিয়ে যেতে পারে না, বরং একটা বোধিভাত ও স্বপ্রকাশ উদ্ভাসের প্রযত্ন ও আলো,—একং সৎ, বিশ্বাতীত ঈশ্বর, দিব্য ও বিশ্বগত পুরুষের দিকে হাত বাড়ানো এবং দৃষ্টিপাত, আর বিরাট বিশ্ব বিকাশে তাঁরই সঙ্গে যাবতীয় বস্তু ও সর্বজীবের সম্বন্ধটি আবিষ্কার। প্রবুদ্ধ জ্ঞানের উদ্গীথ তারা সব ময়েরই মতো আধ্যাত্মিক অভীপ্সা ও আনন্দের সুরে বাঁধা, তেমন সংকীর্ণ চড়া স্বরের নয় যা নিম্নতর ধর্মানুভূতির ক্ষেত্রে পাই, যাকে শ্রেণীগত ব্রত ও ভক্তির বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়িয়ে সেই বিশ্বব্যাপী ভাগবত আনন্দে তুলে ধরা যা নিরালম্ব নিখিলব্যাপী আত্মার সঙ্গী ও একান্ত হয়ে পাওয়া সম্ভব প্রধানত আন্তর দৃষ্টির ব্যাপার হয়ে এবং প্রত্যক্ষভাবে বাহ্য মানুষী কর্মের বিষয় না হয়েও, বৌদ্ধধর্মের এবং পরবর্তী হিন্দুধর্মের সকল সর্বোচ্চ ধর্মাচার পর্যন্ত সেই সব সত্যেরই পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান যাদের তারা রূপে রূপে ও বীর্যে প্রকাশ করে ধরেছিল—সেখানে তো ধর্মাচারের অনুশাসন ও গুণপনার মানস নীতির চেয়ে বৃহত্তর কিছু রয়েছেই, ভগবান ও সর্বজীবের সঙ্গে একাত্মতায় প্রতিষ্ঠ আধ্যাত্মিক কর্মের সর্বোত্তম এক আদর্শ। সুতরাং বৈদিক আচারের অনুষ্ঠানগুলির প্রাণ যখন নিঃশেষ হয়ে গেল তখনও উপনিষদগুলি কিন্তু সজীব ও সৃষ্টিশীল হয়ে রইল, সমর্থ থাকল মহান ভক্তিমূলক ধর্মগুলিকে সঞ্জীবিত এবং ধর্মের ভারতীয় অক্ষয় আদর্শকে সচল রাখতে।

উপনিষদগুলি প্রকাশাত্মক বোধিদীপ্ত মন ও তার জ্যোতির্ময় মনের অনুভূতির সৃষ্টি—সেখানে যাবতীয় বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী, ভাষা, রূপক, ভাবস্পর্শ এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই সব পরম ও সর্বব্যাপী সত্য, একাত্মতা আত্মা ও ভুবনব্যাপী দিব্যসত্তার এই সব মহদ্দর্শন এমন কত সংক্ষিপ্ত ও স্মরণীয় বাক্যে গ্রথিত যাতে তারা চকিতে

আত্মার দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে, তার আস্পৃহা ও অনুভূতির কাছে জীবন্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে কিম্বা এমন প্রকাশক্ষম তেজ ও ব্যঞ্জনাময় ভাবরূপে অপূর্ণ ছন্দের বাণীতে প্রমূর্ত হয় যা সসীম রূপের মধ্যে পরিপূর্ণ অসীমকে খুলে দেখায়। একত্ব সেখানে অনাবৃত, সেইসঙ্গে প্রকট নানা বিভাব, প্রত্যেকটি আবার পায় প্রকাশের পরম সৌকর্যে তার সকল তাৎপর্য, এবং যেন একটা স্বতঃস্ফূর্ত আত্মাবিষ্কারের পথে প্রতিটি শব্দও বাক্যের ভাস্বর নিপুণতায় নিজস্ব স্থান ও সম্বন্ধ। বৃহত্তন অতীন্দ্রিয় সত্য এবং মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞার সূক্ষ্মতম সূক্ষ্মতার বরণ চলে একটা অনুপ্রেরিত প্রাণনে এবং তৎক্ষণাৎ দ্রষ্টা মনের কাছে স্বচ্ছ ও সন্ধানী আত্মার কাছে অশেষ ব্যঞ্জনার রাশিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পাওয়া যায় বিক্ষিপ্ত বাক্যাংশ, স্বতন্ত্র শ্লোক, সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ যার প্রত্যেকটির মধ্যে ধরা বিশাল একটা দর্শনের বীজ, অথচ যারা অনন্ত আত্মজ্ঞানের মাত্র একটা অংশ, দিক, অঙ্গ হিসাবে পরিবেশিত। সবই এখানে সংহত অর্থপূর্ণ অথচ একান্ত সুবোধ্য প্রদীপ্ত বাণীসংযম এবং অপরিমেয় পরিপূর্ণতা। এই ধরণের চিন্তা তো ন্যায়াবিষ্ট বুদ্ধির মন্থর সতর্ক জটিল সংবৃদ্ধির ধারায় চলেনা। অনুচ্ছেদ, বাক্য, শ্লোক, চরণ, এবং অর্ধচরণ পর্যন্ত এখানে পূর্বগামীর অনুসরণ করে চলে—অন্তর্বর্তীকাল পরিপূর্ণ একটা অব্যক্তভাবে, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান একটা প্রতিধ্বনিত নীরবতায়, এমন একটা ভাবনায় যা সমগ্রের ব্যঞ্জনা বহন করে চলে, যা এই পদস্থাপনের মধ্যেই উহ্য. কিন্তু নিজের স্বার্থে মনকেই তার চাষ-আবাদ করে তুলতে হবে, আর এই অর্থবহ নীরবতার অন্তর্বর্তী যতি বেশ প্রশস্ত, এই চিন্তার পদক্ষেপ যেন সেই অসুরের এপারের শিলাপৃষ্ঠ থেকে অনন্ত সলিলের ওপারে শিলাপৃষ্ঠে পদস্থাপনের মতো। প্রত্যেক উপনিষদ রচনায় আছে একটা নিকষিত পূর্ণাঙ্গতা, সুসমঞ্জস নানা অংশের নিবিড় সংযোগ, কিন্তু এটি সাধিত এমন মনের ধারায় যে সত্যের সর্বাঙ্গ এক নজরে দেখতে পায় এবং উপস্থিত শুধু পূর্ণকুম্ভ নীরবতা থেকে প্রয়োজনীয় কথাটি তুলে আনতে। কাব্যের ছন্দ বা ছন্দময় গদ্য এখানে ভাব ও বাক্যের ভাস্কর্য অনুযায়ী। উপনিষদের ছন্দরূপ রচনা চারটি সুনির্দিষ্ট অর্ধচরণে, প্রত্যেকটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং ভাবে নিটোল, অর্ধচরণগুলিতে দুটি ভাব বা ভাবের এমন দুটি দিক যারা মিলে পরস্পরের অনুপূরক; ধ্বনির প্রবাহ চলেছে একই সূত্র ধরে—প্রত্যেক পদ সংক্ষিপ্ত এবং প্রত্যক্ষ যতির দ্বারা প্রস্ফুট, সে-যতি সুস্বরের অনুরণনে এমন পূর্ণ যে তা আন্তর শ্রুতিতে বহুক্ষণ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে; প্রত্যেকটি পদ যেন সমুদ্রের আকুল কণ্ঠ ও কলরববাহী অনন্তেরই এক তরঙ্গ। এ জাতের কাব্য—দৃষ্টিবিভোরের ভাষা ও অন্তরাত্মার ছন্দস্পন্দ—আগে কখনো লেখা হয়নি, পরেও হবেনা।

উপনিষদের রূপক অনেকাংশে বৈদিক রূপকেরই পরিণতি এবং যদিও তা একান্ত সাধারণভাবে চেয়েছে সরাসরি জ্যোতির্ময় রূপকের অনাবৃত স্বচ্ছতা তবু প্রায়শ তা চেয়েছে একই সব প্রতীক এমন এক ভাবে প্রয়োগ করতে যা প্রাচীন প্রতীকপদ্ধতির যান্ত্রিক অংশের চেয়ে তারা আত্মার বেশি আত্মীয়। আমাদের চিন্তাধারায় আর স্থান পায়না বলে বিশেষ করে এই জিনিষটা কিছু সংখ্যক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতকে বিভ্রান্ত করেছে এবং তাঁরা তারস্বরে বলেছেন এই সব প্রাচীন শাস্ত্র সর্বোত্তম দার্শনিক গবেষণার সঙ্গে শিশুমানব মনের এস্কটোক্তির একটা পাচন। উপনিষদগুলি বৈদিক মন ও তার মেজাজ ও মূল সব ভাব

থেকে বৈপ্লবিক বিদায় নয়, বরং তারই একটা বেশ ও পরিপূর্ণ এবং কতকাংশে একটা সম্প্রসারী রূপান্তর—এই অর্থে যে বৈদিক রূপকের ভাষায় যা ছিল রহস্য ও কূটত্ব, তা এখন প্রকাশের ভাষায় বের হয়ে পড়ল। তার আরম্ভ বেদ ও ব্রাহ্মণগুলির রূপকোচিত ও ক্রিয়া-প্রতীক গ্রহণ করে তাদের এমন পালটে দেওয়া যাতে ভিতরের সেই নিষ্টক অর্থটি পাওয়া যায় যার থেকে নিজস্ব বহুগুণে পরিণত এবং আরো বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক দর্শনে পৌঁছাবার চৈত্যিক যাত্রারম্ভের যাঁচাটি ধরা যায়। বিশেষ করে গদ্যাশ্রিত উপনিষদ-গুলিতে এমন সব অনুচ্ছেদ আছে যেগুলি সম্পূর্ণ এই ধরণের যেখানে গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে—আধুনিক বুদ্ধির কাছে অবশ্য ধোঁয়াটে এবং দুর্বোধ্য—তখনকার কালে প্রচলিত ভাবধারার চৈত্যিক অর্থ, তিনটি বেদের পার্থক্য, তিনটি জগৎ আর অনুরূপ বিষয়। উপনিষদে যেমন তেমনি গভীরতম আধ্যাত্মিক চিন্তায় পৌঁছে দেবার এই অনুচ্ছেদগুলিকে অর্থহীন অথবা যে উচ্চ চিন্তায় তার পরিণতি সেটির বালসুলভ চিহ্নবিহীন বুদ্ধির কিচিরমিচির বলে উড়িয়ে দেওয়া চলেনা। বরং তার প্রতীকাত্মক অর্থটি ভেদ করতে পারলে দেখব সেখানে কি গভীর তাৎপর্য। চৈত্য-আধ্যাত্মিক জ্ঞানে চৈত্য-দৈহিকের উত্তরণে তা পরিস্ফুট—আজ তার জন্য আমরা আরো বেশি বুদ্ধির ভাষা এবং কম স্থূল ও রূপচিত্রের ভাষা ব্যবহার করব, কিন্তু তা বলে যারা যোগাভ্যাস করছে এবং চৈত্য-দৈহিক ও চৈত্য-আধ্যাত্মিক সত্তার গুপ্তরহস্য পুনরাবিষ্কার করেছে তাদের কাছে সেসব নিরর্থক হয়ে যায়নি। আত্মিক সত্যের এই ধরণে আশ্চর্যকর প্রকাশভঙ্গীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অজাতশত্রুর সুষুপ্তি ও স্বপ্ন ব্যাখ্যা, কিম্বা প্রাণতত্ত্ব ও তার গতিবৃত্তি সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষদের সেই সব অংশ, অথবা এমন অংশ যেখানে দেবাসুরের সংগ্রামের বৈদিক ভাবটি নিয়ে তাতে দেওয়া হয়েছে অন্তরের আধ্যাত্মিক অর্থ এবং যেখানে ঋগ্বেদ ও সামবেদের চেয়েও খোলাখুলি ভাষায় বৈদিক দেবতাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, ডাকা হয়েছে তাদের আন্তর ক্রিয়া সাধন ও আধ্যাত্মিক শক্তির জন্য।

বৈদিক ভাবের ও রূপচিত্রের এই রকম পরিণতির উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করব তৈত্তিরীয় উপনিষদের সেই অংশটি যেখানে ইন্দ্র স্পষ্টত দিব্যাননের দেবতা ও শক্তিরূপে দেখা দিয়েছেন

"যিনি সকল বেদের বিশ্বরূপ বৃষভ, যিনি অমৃতের থেকে পবিত্র ছন্দমালায় জাত,—সেই ইন্দ্র মেধা দিয়ে আমাকে পরিতৃপ্ত করুন। হে দেব, আমি যেন অমৃতের আধার হতে পারি। আমার শরীর যেন বিচক্ষণ দৃষ্টিতে পূর্ণ আমার জিহ্বা যেন মধুমতী হয়, আমার উভয় কর্ণ যেন বৃহতের বহু বাণী শুনতে পায়। তুমি যে ব্রহ্মের কোষস্বরূপ, মেধা দ্বারা আবৃত হয়ে আছ।" ১।৪।১

ঈশ উপনিষদ থেকেও সমগোত্রীয় একটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা যায় যেখানে সেই সূর্যদেবকে ডাকা হয়েছে জ্ঞানের দেবতা বলে যাঁর শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ময় রূপ চিৎপুরুষের একমাত্রতা এবং এখানে মানস স্তরে প্রসারিত রশ্মিমালা তার ভাবনা-মনেরই উজ্জ্বল বিচ্ছুরণ যা তার নিজেরই অসীম অতিমানস সত্যকে, এই সূর্যের দেহ ও আত্মাকে, অন্তরাত্মার ও শাশ্বতের সত্যকে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে :

"সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্র দিয়ে ঢাকা হে পুষণ, সত্যধর্মার্থে দৃষ্টার্থে ওটি অনাবৃত করে দাও। হে অনন্য ঋষি, হে নিয়ন্তা যম, হে সূর্য, হে প্রজাপতিপুত্র, তোমার রশ্মিমালা একত্র ব্যূহবদ্ধ কর তোমার কল্যাণতম রূপ এই তেজ আমি দেখছি, যিনি এই, এই পুরুষ যিনি, তিনিই আমি।" ১৫।১৬

পার্থক্যের মধ্যেও এসব অনুচ্ছেদে রচনারীতি ও রূপকচিত্রে বেদের সঙ্গে যে সাদৃশ্য আছে তা সুস্পষ্ট এবং শেষোক্ত অংশে পরবর্তী আরো অবাধ ভঙ্গিতে বৈদিক অত্রি-মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা ও বিবৃতি—

"তোমার ঋতের দ্বারা সেই ধ্রুব ঋত আচ্ছাদিত সেখানে সূর্যের অশ্বরা বন্ধনবিমুক্ত। সেখানে দশ সহস্র একসঙ্গে উপস্থিত, তিনি সেই এক—সকল প্রবুদ্ধ দেবতাদের শ্রেষ্ঠ দেবতাকে আমি দেখেছি।

এই বৈদিক ও বৈদান্তিক রূপকচিত্র আমাদের আধুনিক মনের অপরিচিত, প্রতীকের জীবন্ত সত্যে তার বিশ্বাস নেই, কারণ বুদ্ধির দাপটে সন্ত্রস্ত সত্যদর্শী কল্পনার এই চৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে গ্রহণ, একাত্মকরণ ও নির্ভয়ে ধারণ করার আর সাহস নেই; কিন্তু ছেলেমানুষী অথবা আদিম ও বর্বর মিস্টিক রহস্যময়তা থেকে এ যে বহু দূরের জিনিস তাতে কোনো সন্দেহ নেই; এই প্রত্যক্ষ জীবন্ত উদ্ভাস কাব্যের বোধিদীপ্ত ভাষা বরং বলা চলে একটা অত্যন্ত পরিণত আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিরই স্বাভাবিক প্রকাশ।

উপনিষদের বোধিদীপ্ত চিন্তা এই প্রকট রূপকচিত্র এবং প্রতীকধারা থেকেই শুরু, প্রথমে বৈদিক ঋষিদের কাছে দৃষ্টিবানের মনের সামনে এসব গোপন পশান্তি বাক্ একান্তই মর্মভেদী অথচ সাধারণ বুদ্ধির সামনে গভীরতম অর্থটির আচ্ছাদন মাত্র, তারা একটা প্রচ্ছন্নভাবে অর্থবহ ভাষায় পৌঁছে দিয়ে আবার ওপারে নিয়ে যায় এমন এক অনির্বচনীয়-ভাবে অবাধ ও অতুলনীয় রূপকচিত্র ও শব্দশিল্পে যে নিমেষে আধ্যাত্মিক সত্য সেখানে তার পূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করে। গদ্যে রচিত উপনিষদগুলিতে উদয়কালের ভারতীয় মনের এই পরিণতি লক্ষণীয়, কী করে প্রতীক ব্যবহার করে তা পার হয়ে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের নির্বাধ প্রকাশে পৌঁছে যায়। এই পরিণতির প্রথম দিকটা ফুটে উঠেছে প্রশ্ন উপনিষদের 'ওম্' শব্দের শক্তি ও তাৎপর্য আলোচনার অনুচ্ছেদে

"সত্যকাম, এই ওঙ্কারই পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম। তাই বিদ্বান ব্রহ্মের এই আয়তনের আশ্রয় গ্রহণ করে একটি কিম্বা অপরটিতে গমন করে। সে যদি মাত্র ওম্ শব্দের ধ্যান করে তবে তার দ্বারা জ্ঞান এবং জগতের সম্পদ লাভ করে। ঋক্‌মন্ত্র তাকে নিয়ে চলে মনুষ্যলোকে, সেখানে তপস্যা ব্রহ্মচর্য শ্রদ্ধায় আপূর্ণ হয়ে আত্মার মহিমা অনুভব করে। তারপর দ্বি-মাত্রার অভিধানে সে যদি মনে সম্পন্ন হয় তবে যজু তাকে উন্নীত করে নিয়ে যায় অন্তরিক্ষলোকে, সোমলোকে। সোমলোকে সে তখন আত্মার বিভূতি অনুভবের পরে পুনরাবর্তন করে। আবার যে ত্রিমাত্রিক ওম্‌মন্ত্রে পরমপুরুষে ধ্যানমগ্ন হয় সে তেজস্বরূপ সূর্যে পূর্ণতা পায়। পাদোদর যেমন নিজের খোলস ছাড়ে সে তেমনি পাপাদি থেকে মুক্ত হয় এবং সামমন্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মলোকে নীত হয়। সে এই জীবন লোক থেকে পুরিশয় পরাৎপর পুরুষকে দর্শন করে। এই তিন অক্ষর মৃত্যুর বিষয়ীভূত;

কিন্তু এখানে তাদের অন্যোন্যসক্ত মনবিপ্রযুক্তভাবে প্রয়োগ, তারপরে আত্মার অন্তরের বাহিরের ও মধ্যমভাবের ক্রিয়াতে সম্যক প্রয়োগে তারা পূর্ণ, আত্মা তা জানে এবং তাই সে অকম্পিত। ঋকের দ্বারা এ-লোক, যজুর দ্বারা অন্তরিক্ললোক এবং সামের দ্বারা দ্রষ্টা কবিদের জ্ঞাত লোকে উপনীত হওয়া যায়; বিদ্বান ব্যক্তি ব্রহ্মের আয়তন ওম্ দ্বারা সেই পরমপুরুষকে লাভ করেন যিনি শান্ত অজর অমর অভয়।" (৪।২।৭)

এই সব প্রতীক আমাদের বুদ্ধির কাছে আজো আবছা, তবে যেসব ইঙ্গিত রয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে পরিস্ফুট যে আত্মিক অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি এরা নিয়ে যায় আধ্যাত্মিক সিদ্ধির নানা স্তরে—দেখতে পাই এরা স্থূলপ্রত্যক্ষ, মানসিক ও অতিমানসিক এই তিন স্তরে—এবং শেষোক্তটির দ্বারা পরম পরিপূর্ণতায়, অমর পুরুষের শান্ত আনন্দে সমগ্র সত্তার সর্বাঙ্গ ক্রিয়ায়। পরবর্তীকালে মাণ্ডুক্যোপনিষদে অন্যান্য প্রতীক ঝেড়ে ফেলা হয়েছে এবং আমরা দেখেছি অনাবৃত রহস্য। তারপরে দেখা দেয় এমন একটা জ্ঞান যার দিকে তার নিজেরই একান্ত পৃথক বুদ্ধিগত যুক্তিগত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আধুনিক চিন্তা ফিরে চলছে, এই জ্ঞান যে আমাদের বাহ্যিক স্থূল চেতনার অন্তরালে সক্রিয় অন্য এক চেতনা, মগ্নচেতনা,—অন্য অথচ সেই একই,—আমাদের জাগ্রত মন তারই চাক্ষুষ ক্রিয়া, আর হয়ত আমরা বলব উপরে সেই আধ্যাত্মিক অতিচেতনা যেখানে সত্যিসত্যিই আমাদের সত্তার উর্ধ্বতন অবস্থা এবং সকল গুপ্তরহস্য। প্রশ্নোপনিষদের অনুচ্ছেদটির দিকে নিবিড় দৃষ্টি দিলেই বুঝতে পারব যে এই জ্ঞানটি ওখানে রয়েছেই, এবং বোধহয় যুক্তিগতভাবে এ সিদ্ধান্তও করা চলে যে প্রাচীন ঋষিদের এইগুলিকে এবং এই রকম অন্যান্য বাক্যগুলিকে যুক্তিসার মনের কাছে তাদের রূপ যতই হেঁয়ালির হোক না, ছেলেমানুষি রিসিটেসিজন্ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আসলে তারা সে যুগের মনোভাবের উপযোগী রূপচিত্রে সেই জিনিসটিরই প্রকাশ যাকে যুক্তি তার নিজের পন্থায় আজ আমাদের কাছে খুলে ধরছে অভ্রান্ত বলে, অতি গভীর এক সত্য, জ্ঞানের বাস্তব সত্যতা বলে।

ছান্দিক উপনিষদগুলি এই দারুণ ভাবগর্ভ প্রতীকধারা রেখেই চলেছে তবে সে ভার বহন করেছে বেশ অনায়াসগতিতে এবং মন্ত্রের অধিকাংশ ভাগে এরকম রূপচিত্র ছাড়িয়ে স্পষ্টোক্তি ধরেছে। যিনি আত্মা, চিন্ময়, যিনি জনে জীবে প্রকৃতিতে এবং এখানকার ও অপরাপর ভুবনে এবং ব্রহ্মাণ্ডে ছাড়িয়েও বিরাজিত ভগবান, যিনি অনৃত একম্ অনন্ত—সকল আবরণ সরিয়ে তাঁকেই স্তব করা হয়েছে তাঁর শাশ্বত তুরীয় পদের বৈভবে এবং বিচিত্র আত্ম-বিকাশের ঐশ্বর্যে। কঠোপনিষদে ধর্ম ও মৃত্যুর অধীশ যম নচিকেতাকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন তার কয়েকটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করলে ওই উপনিষদের চরিত্রটি ফুটে উঠবে:

"ওম্ এই অক্ষর। এই অক্ষর ব্রহ্ম, এই অক্ষর পরাৎপর; যিনি এই ওম্ অক্ষর জানেন তাঁর সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয়। এই আলম্বন শ্রেষ্ঠ, এই আলম্বন পরম; এই আলম্বনকে জেনে ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হওয়া যায়। এই সর্বজ্ঞটির জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তিনি কোনোখান থেকে আসেন নি, তিনি কেউ বা কিছু নন। তিনি অজ নিত্য শাশ্বত পুরাণ, শরীরের হননে তাঁর নাশ হয় না।...(১।১৬।১৮)

"আসীন থেকেও দূরে দূরে তাঁর বিহার, শায়িত থেকেও সর্বত্র তাঁর গমন। আমি ছাড়া আর কে এই আনন্দময় দেবতাকে জানতে পারে? ধীর ব্যক্তি অনিত্য এই শরীরে অবস্থিত অশরীরী মহান বিভু আত্মাকে জেনে আর শোক করেন না। জ্ঞানোপদেশ, মেধা কিম্বা বহুবিদ্যার্জন দিয়ে এই আত্মাকে লাভ করা যায় না যাকে তিনি বরণ করেন সে-ই শুধু তাঁকে জানতে পারে, তারই কাছে এই আত্মা আপন তনু উন্মীলন করে দেন। যে কুকর্মে বিরত, শান্ত ও সমাহিত হয়নি, যে অশান্তমনা রয়ে গিয়েছে, সে এই আত্মাকে প্রজ্ঞান দিয়ে জানতে পারে না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুইই যাঁর অন্ন আর মৃত্যু যার অন্নের উপকরণ সেই তিনি কোথায় তা কে জানতে পারে? (১।২।১।২৫)

"স্বয়ম্ভু দেহের দ্বারগুলি বহির্মুখীরূপে স্থাপন করেছেন, তাই মানুষ বাহিরের দিকে তাকিয়ে অন্তরাত্মাকে দেখে না কচিৎ কেউ ধীর অমৃতের আকিঞ্চনে অন্তরাবৃত্তচক্ষু হয়ে প্রত্যগাত্মাকে দেখে। অন্যরা বালকবৎ কামানুসরণ করে এবং মৃত্যুর বিস্তৃত পাশে পড়ে কিন্তু ধীর যারা তারা অমৃতত্বকে জেনে অধ্রুবের মধ্যে ধ্রুবকে প্রার্থনা করে না। যে-আত্মা জানে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এবং মৈথুন তার কাছে জানবার আর কী থাকতে পারে? ধীর ব্যক্তি মহান্ বিভু আত্মাকে জেনে তার দ্বারা স্বপ্ন-জাগরণে আত্মার মধ্যে যাবতীয় কিছু দেখতে পায়, সে আর শোক করে না। সে আত্মাকে জানে মধুপায়ী জীবের অস্তিকবর্তী বলে, ভূত-ভবিষ্যের ঈশ বলে, সে আর নিন্দাঘৃণা করে না। সে তাঁকেই দেখে যিনি তপঃ-শক্তির ও আদি সলিলের পূর্বেও ছিলেন, যিনি গোপন হৃদয়গুহায় প্রবিষ্ট ও সর্বভূতের সঙ্গে মিলে আছেন। সে জানে সেই প্রাণশক্তিজাত সর্বদেবতাময়ী অদিতিকে যিনি গোপন গুহায় অনুপ্রবিষ্ট থেকে সর্বভূতের সঙ্গে আছেন। ইনিই সেই জাতবেদা অগ্নি, গর্ভিনীর সযত্নে রক্ষিত গর্ভের মতো যিনি অরণিদ্বয়ের মধ্যে গোপনে রক্ষিত, সেই অগ্নি যিনি ঘৃতাদি সোপকরণে জাগ্রত মানুষের কাছে নিত্য পূজিত। যা থেকে সূর্য ওঠে তিনি তা-ই, যাতে অস্ত যায় তিনি তা-ও; তাঁতেই সকল দেবতা অর্পিত, কেউ তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। এখানে যা অন্যালোকেও তা, আবার অন্যালোক যা তা এখানেও তেমনি রয়েছে। যে এখানে শুধু ভেদ দেখে মৃত্যুর পর মৃত্যু তাকে গ্রাস করে। আত্মার মধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এক পুরুষ, তিনি ভূতভব্যের ঈশান, তাঁকে জানলে কোনো কিছুতে বিরাগ থাকে না। অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ জ্যোতিস্বরূপ, তিনি ভূতভব্যের ঈশান, তিনিই আজো আছেন এবং কালও থাকবেন।" (২।১।১০, ১২।১৩)

নানা উপনিষদে এমন অসংখ্য অনুচ্ছেদ আছে যা পরম স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত কাব্য ও আধ্যাত্মিক দর্শনের অতিন্ন অঙ্গ, কিন্তু বাগ্বিনাশূন্য এবং মূল ভাষা ও ছন্দের গম্ভীর সূক্ষ্ম ও উজ্জ্বল অর্থের প্রতিধ্বনি হারিয়ে কোনো অনুবাদ তাদের সেই বীর্য ও চরমোৎকর্ষের ধারণা দিতে পারে না। আবার অন্যত্র সূক্ষ্মতম মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক সত্য সব কাব্যিক প্রকাশের নিখুঁত সৌন্দর্যের একটুও হানি না করে একান্ত সন্তোষজনক-ভাবে উপস্থাপিত যাতে সর্বত্র তারা মন ও আত্মার কাছে উপজীব্য হয়ে উঠেছে, শুধু গ্রহিষ্ণু বুদ্ধির সামনে হাজির করা হয়নি। গদ্যে গাঁথা কোনো কোনো উপনিষদে দেখি জীবন্ত বর্ণনা ও ঐতিহ্যের আর এক বস্তু যা চোখের সামনে তুলে ধরে, চকিত

চিত্রের মতো হলেও, যা উপনিষদের সৃষ্টি সম্ভব করেছিল, সেই আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ও পিপাসার অসাধারণ আলোড়ন ও আন্দোলনের চিত্রটি তুলে ধরে। কয়েক পাতায় প্রাচীন জগতের বিচিত্র চিত্র আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে, আগন্তুক রাজপুত্র ও ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা ও উপদেশ দিতে প্রাকৃতিক পরিবেশে আসন নিয়ে প্রস্তুত মুনিঋষিরা, জ্ঞানের সন্ধানে ভূম্যাধিপতিদের বহুবিহার, রাজার পুত্র তার রথে যেমন তেমনি দাসীর জারজ পুত্র, তাদের চাই সেই লোকটি যিনি ভিতরে বহন করে চলেছেন আলোর চিন্তা ও পরমপ্রকাশের বাণী, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব—জনক, সূক্ষ্মমতি অজাতশত্রু এবং শকটাশ্রিত রৈক্ব, সত্যের জন্য উগ্রচণ্ডী অথচ শান্ত শ্বেতপরায়ণ যাজ্ঞবল্ক্য যিনি দুহাতে নিরাসক্ত হয়ে কুড়িয়েছেন পার্থিব সম্পদ ও আধ্যাত্মিক বৈভব এবং শেষে সব ঐশ্বর্য ফেলে গিয়েছেন গৃহহীন সন্ন্যাসীর মতো পথে পথে চলতে, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ যিনি ঋষি ঘোরের একটি কথা শুনে তৎক্ষণাৎ জেনেছিলেন শাশ্বতকে, কত আশ্রম, কত রাজসভা সেই রাজাদের যাঁরা আবার ছিলেন আধ্যাত্মিক আবিষ্কারক ও ভাবুক, যাগযজ্ঞের মহাসভা যেখানে বহু ঋষিরা মিলিত হয়ে জ্ঞানের আদান-প্রদান করতেন। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কী করে ভারত-আত্মার জন্ম হল, যে জন্মগাথার পাখায় সে মর্ত থেকে আত্মার পরম ধামে উড়ে উঠেছিল কী করে বা তার সৃষ্টি হল। বেদ-উপনিষদ শুধু ভারতীয় দর্শন ও ধর্মেরই পর্যাপ্ত উৎস নয়, সমস্ত ভারতীয় চারুশিল্প কাব্য সাহিত্যেরও। এসবের মধ্যে দিয়ে আত্মা, মতিগতি ও আদর্শ মনের গঠন ও প্রকাশই পরে গড়ে তুলেছে বিরাট দর্শন, ধর্মের সৌধ, রামায়ণ মহাভারতে লিপিবদ্ধ করেছে তার বীর যৌবন, পরিণত বয়সের ক্লাসিকাল যুগে অক্লান্ত চালিয়েছে বুদ্ধি, দিয়েছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কত মৌলিক ভাবোদ্ভাস, সৃষ্টি করেছে রূপরুচির প্রাণের ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার এমন সমৃদ্ধ বর্ণালি, পরে তন্ত্র ও পুরাণে পুনর্জীবিত করেছে তার আধ্যাত্মিক ও চৈত্যিক অভিজ্ঞতা, নিজেকে ঢেলে দিয়েছে বর্ণ ও রেখার রূপ ও মহিমার, শিলাখণ্ডে ও তাম্রপাটে কেটে তুলেছে তার স্বপ্নভাবনা, পরবর্তী ভাষার নবপ্রকাশের ধারায় বয়ে চলেছে নিজে, আর আজ অন্ধকার রাহুগ্রাসের শেষে আবার উঠেছে পার্থক্যের মধ্যেও সেই অবিকল এক, নবজীবন ও নবসৃষ্টির জন্য প্রস্তুত।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা বসু

(২০)

কর্মযোগ সম্বন্ধে প্রায় সব কথাই আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করলাম। গীতার আদর্শ নিয়ে কর্মযোগের কর্ম করা থেকে আরম্ভ করে দিব্যকর্ম পর্যন্ত আমাদের আলোচনার বিষয় ও লক্ষ্য ছিল। তা যেখানে শেষ পর্যন্ত পরিনিষ্ঠিত, সেই অতিমানসই দিব্যকর্ম-যোগের উৎস ও পরিণাম—এটা আমরা শ্রীঅরবিন্দের বাণী থেকেই জানতে ও বুঝতে পারলাম। অতিমানস কর্মকে কর্মযোগের গোড়া থেকেই আদর্শ ও লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হতে হবে এ কথা ঠিক, কিন্তু অতিমানসকে নিয়ে এক উদ্ভট কল্পনা করে গোড়াতেই তাকে কর্মে নামাতে চেষ্টা করলে, সেটা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে। সাধক দুরাগ্রহবশত যেন সেদিক দিয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে বিপথে না পড়েন, সেদিকে শ্রীঅরবিন্দ বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়েছেন। দিব্যকর্মের ভাব সহজ হলে তার পরিপাকে অতিমানস কর্ম সাধিত হতে পারবে, সেই দুর্লক্ষ্যের অভিসারে শক্তিপাত হতে হতে অতিমানসের আবেশে এক দিব্য পরিমণ্ডল গঠিত হবে। তা বুঝতে ও ধরতে পারার সাধনায় একেবারে গোড়ার কথা হল সুসমঞ্জস হওয়া চাই। পূর্ণযোগ সর্বাঙ্গীণ যোগ, তার প্রতিটি অঙ্গই এক সুষম সমতায় বিধৃত থাকবে। কোন একটি অঙ্গকে অধিক পরিপুষ্ট করতে গিয়ে যোগের সর্ব অবয়বের পবিত্র তন্তুতে চাপ পড়ে বদ্ধ আবর্ত তৈরী হয়ে শক্তিপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই ঐকান্তিক আত্মসমর্পণের ভূমিকায় সাধনার প্রারম্ভেই "ব্যাপ্তি-রূপেণ সংস্থিতা" ঈশ্বর-শক্তিতে আবিষ্ট হলে সাধকের স্বধর্ম ও স্বকর্ম সহজ হয়ে আসবে। বৃহতের সঙ্গে আত্মার ব্যাপ্তির বোধ যতই নিবিড় ও লঘু হয়ে আসবে, ঊর্ধ্ব লোকের শক্তিধারা ততই কার্যকরী ও সহজ হতে পারবে। সাধারণত মন দিয়েই আমরা সাধনা করতে যাই, আর তাতে রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী একদিকে ঝোঁক পড়ে ও সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলি। অথচ একটা শক্তির সাক্ষাৎ পরিচয় পাই বলে নিজের অসম্পূর্ণ দর্শন ও অসংযত আবেগকে তাঁর ইচ্ছা বা ব্রহ্ম-সঙ্কল্প বলেও ভুল করতে পারি। জ্ঞান ভক্তি ইচ্ছা সবই একসঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থাকবে সাধন কর্মে। পাখির দুটি ডানার মত জ্ঞান ভক্তিকে সমভাবে বিধূনিত করে স্বচ্ছন্দে আকাশবিহার—এই হল দিব্যকর্মযোগের গতির স্বরূপ ভাবনা। তাই আধার ও শক্তির বিভেদ অনুসারে কর্মফল বা কর্মপন্থা সকলের সমান না হলেও কোন একদিক নিয়ে মত্ত হতে গেলেই ডানা-ভাঙা পাখির অবস্থা দাঁড়াবে। তা আমাদের পরম লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারবেনা। তাই অতিমানস শব্দের মোহে শক্তিলাভের

দিকে ঝোঁক না দিয়ে, দিব্য ভাব বা ভগবত্তাই হবে আমাদের আধার গতি সহায় ও লক্ষ্য। সর্বার্থসাধিকা মায়ের চেতনার মধ্যে আমাদের সর্বাংশে নিমজ্জিত হতে হবে। সেই অখণ্ড সমগ্র চেতনায় জেনে বা না জেনে সব কিছুই বিধৃত হয়ে আছে। সে মহিমার পারে যাওয়া যায়না। তাঁকে আশ্রয় করেই পরম পুরুষের পরমার্থ। তাই মায়ের শিশু হয়ে চলাই সাধারণভাবে সকলের পক্ষে সহজ পথ আর সেই পথে আমাদের জীবনেরও তো পরমার্থ।

অতিমানস অনেক দূরের কথা, তাকে সামনে পেলেও চেনা ও ধরা আমাদের পক্ষে এখনও সহজ নয়। তাই Higher mind বা উত্তর মানসের বোধ গোড়ায় থাকলে সেটাই বড় কথা। এই যে আমাদের সাধারণ দেহ-প্রাণ-মন, একে অতিক্রম করে যে এক বৃহত্তের বোধ আমাদের ঘিরে রয়েছে, তাতে আবিষ্ট হতে পারলে মানসোত্তর ভূমির কাজ সহজ হবে, তাঁর ইচ্ছামত তিনি শক্তিপাত করে করে অতিমানসের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন। তাই মনে হয়, অতিমানস কর্ম নিয়ে গোড়ায় মাথা ঘামিয়ে শব্দ নিয়ে টানাটানি করতে গেলে কর্মযোগই পণ্ড করে ফেলব। রূপান্তর যোগের প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি যে চৈত্য-রূপান্তর চাই সবার আগে। তাঁর সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগটি নিবিড় প্রত্যক্ষ হওয়া চাই।

আমাদের মধ্যে যে ভক্ত, সেই তো চৈত্যপুরুষ। বৈষ্ণব বলেছেন ভক্তিই জীবের স্বভাব। শিব হয়েও ভক্তির ভাব নিয়ে জগৎ-সংসারে যে বিচরণ করা যায়, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি এ যুগের রামকৃষ্ণদেবের আচরণে। তাঁরই কথায় জেনেছি যে বাপ যদি ছেলের হাত ধরে থাকে, সে ছেলে পড়ে যেতে পারেনা কিন্তু ছেলে বাপের হাত ধরে চললে পড়ে যেতে পারে। এই যে তিনি এসে হাত ধরেছেন—এই ভাব নিয়ে কর্ম করাই হল "মৎকর্মপরমো ভব"। তোমারই কর্ম, এই ভাবের প্রতিষ্ঠা হয় ভক্তিতে ভালবাসায়। ভগবানের জন্য যে তৃষ্ণা, সে তো ভালবাসারই কাঙালপনা। "দরদী নৈলে প্রাণ বাঁচেনা"—এই তীব্র অভাববোধই তো পাগল করে তোলে। আর তখনই নকল আমির মুখোস খসে যায়, চৈত্যপুরুষ তাঁর নিজের আসনে বসতে পারেন। ঐ নকল আমি তখন রূপান্তরিত হতে থাকে; তাকে বিসর্জন দিয়ে "আমি নিঃশেষে তোমার," ভালবাসায় এই রকম আত্মোৎসর্গের পরিণামে আসে চৈত্যরূপান্তর। জীবন তখন সরস ও মধুর হয়। অজানা দীর্ঘ পথ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই বালিকা বধূর সহজ নির্ভরতা নিয়ে সাধক তখন পথ চলে। ছোট মেয়ে, সে তার বরকে ভাল করে চেনে না। তার নিজের মত ছোট করেই সে তাকে দেখে; তাতে গুরুজনের চোখে তার বরের কাছে হয়তো কত অপরাধই করে বসে। কিন্তু তার বঁধু তার বর, সে তো হৃদয়ভরা প্রেম নিয়ে তারই জন্য অপেক্ষা করে আছে যে, তার বালিকা বধূর হৃদয়ে সেই প্রেম জাগবে কবে, তার হৃদয় দিয়ে বঁধুর হৃদয় চিনবে কত দিনে? কত রাতই বিফলে চলে যায়; কিন্তু যেদিন দুঃখ-রাতের ঝড় এসে সব কিছু চলিয়ে দেয়, তখন ঐ বালিকা বধূটি তার বরকেই সর্বশক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তখনও সে জানেনা যে তুমি তার জন্য নন্দনবনের মধুও সংগ্রহ করে রেখেছ। সেই রকম চৈত্যসত্তার স্ফুরণে

চিদাবেশে সাধক তার পথ চলা শুরু করে। পথ অজানা, আলো আঁধারের বেষ ও রৌদ্র পেরিয়ে যেতে তার হৃদয়ের সহজ ভালবাসাই হয় দিশারী। চৈত্যপুরুষের স্থান হল হৃদয়ে আর চৈত্যপুরুষ তো তাঁকে ছাড়া আর কিছু জানেন না। তাই তাঁরই শক্তিতে চৈত্য রূপান্তরের ফলে সেই সহজ রসের ধারাটিই পুষ্ট হয়। তখন জীবনের সব কিছু মধুময় হয়ে ওঠে। আকাশ বাতাস আলো প্রাণী সারা জগৎ অন্তরের ঐ রসের প্রবাহে ভেসে চলে। শ্রুতির সেই বিখ্যাত মন্ত্র "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ....." চৈত্য রূপান্তরের মধুময় অনুভব। জীবভাব সম্পূর্ণ বজায় থেকেও সব কিছু তুমিময় মধুময় হয়ে ওঠে। বাউল গেয়েছেন—

"কানে শোন চোখে দেখ ধুলা আর মাটি
প্রাণ রসনায় চাইখ্যা দেখ রসের সাঁই খাঁটি।"

এই বুদ্ধি এলে হয় জীবভাবের সিদ্ধি। চৈত্যরূপান্তরের আত্মপ্রকৃতি জীবভূতা সনাতনী পরা প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। তখন অপরা প্রকৃতির পঞ্চভূতের বিকার আর মন বুদ্ধি অহঙ্কার সবই তাঁর হয়ে গেল। বৈষ্ণব ভক্তের পরিভাষায় সাধক তখন হয় গোপী। গোপী কৃষ্ণের নাগাল পায় না, তিনি অনেক দূরে। তাঁর আবেশে গোপী কৃষ্ণময় হয়ে যায়। আবার জ্ঞানের দিক প্রবল যেখানে, সেখানে সাধক পুরুষের মত বিবিক্ত থেকেও দেখে যান, সেই দ্বিদল চণকের মত পুরুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থান—সম্পরিষ্বক্ত অবস্থা। এই ভাবের ওপর নিমিত্ত কর্ম দিব্য কর্ম হয়ে ওঠে, তিনিই আছেন আমি নেই।

চৈত্যপুরুষের প্রকৃতিতে পুরুষ নেমে এলে হয় পুরুষের রূপান্তর। গোপীদের নিয়ে রাসলীলাবিলাসের পর শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন, কেননা ভক্তির অহঙ্কারে গোপী তাঁকে বাঁধতে চেয়েছিল, কিন্তু তাঁকে বাঁধবে কে? ভাগবত বলেছেন, তিনি যখন চলে গেলেন তখন সবই শূন্য। সেই বিরহের শূন্যতাই কৃষ্ণ। গোপীগণ নিজেদেরই কৃষ্ণ মনে করে তাঁর লীলানুসরণ করছে; এই ভাবে গোপী স্বয়ং কৃষ্ণই হয়ে যায়। প্রকৃতি পুরুষে উঠে যাচ্ছে, ব্যষ্টি-চৈতন্য সমষ্টি-চৈতন্যে একাকার—"মদাত্মা সর্বভূতাত্মা"। তখনই আসে চিন্ময় রূপান্তর। আর তারপর ধীরে ধীরে সমগ্র চৈতন্যের রূপান্তরের অভিযানে, এই এক একটি লক্ষণে ভূমির পর ভূমি অধিগত হতে থাকে অতিমানস রূপান্তরের পথে। শ্রীঅরবিন্দ সেখানে একটা গভীর কথা বলেছেন spiritual positivism—অস্তিত্বের প্রত্যয়টি গাঢ় নিবিড় সর্বগ্রাসী হবে। চৈত্যপুরুষই চিন্ময় পুরুষে পরিণতি লাভ করেন। এক সাযুজ্যের ফলে অদ্বৈত চেতনায় গোপীর মত তিনি ও আমি এই উল্লাসের রসবিলাস চলতে থাকে। কিন্তু সে পর্যন্তও সূক্ষ্ম অহং অনেক সময় ছায়ার মত থাকে, যা থাকলে অতিমানস রূপান্তরের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই তথাকথিত সিদ্ধ চেতনাতেও অহং সম্পূর্ণ নির্গলিত না হলে রূপান্তরের যোগ সম্পূর্ণ হতে পারবে না। আধারে তাঁর মহাশক্তির অবতরণে যে প্রভূত বীর্য বা বলের আধান হয়, সে শক্তিবলে নিজের হাত দিয়েই নিজের মাথা কাটতে হয়। না-হলে ঐ অহং (ego) থাকলে সেই ছিদ্রপথেই

শক্তিপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। শক্ত হতে গিয়ে সাধক তখন স্তব্ধ হয়ে যায়। দেবীকে বাহন মধ্যে পেলেও সে নাব খেয়ে নীচে পড়ে যায়। এই কারণেই শক্তির প্রকাশে বিভূতির দিকে ঝোঁক গেলে বিরাট বাধা এসে পড়ে, যাতে প্রভূত আলোড়নের সৃষ্টি হয়। চিন্ময় রূপান্তর সর্বাঙ্গীণ ও সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করাই হল spiritual positivism।

পূর্ণব্রহ্ম তাঁর পূর্ণশক্তিতে প্রকাশিত—সেই ব্রহ্মকে এই পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়েও যদি অনুভব করতে পারি। অথচ চিন্ময় আবেশ পুরোপুরিই আছে। ব্রহ্মশক্তির সেই আনন্দের ভার বহন করা প্রকৃতির লক্ষ লক্ষ যুগের তপস্যায় সিদ্ধ হতে চলেছে। সেই সহজ ভাবের ওপরেই বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। সেখানে যেন লীলাচ্ছলেই যত কিছু সাধন সম্পদ সব সহজ ভাবেই অধিগত হচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আধারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতরণে তাঁর সাধনার সিদ্ধি বলে ঘোষণা করেছিলেন। আবার সেই সিদ্ধ বিষ্ণুচৈতন্য নিয়েই তিনি আরও গভীরে সে সিদ্ধিকে টেনে নিয়ে গেছেন এই জগৎকে তুলে ধরার জন্য। কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রয়ী যোগের কথা বিশেষভাবে বলে তিনি আত্মসিদ্ধিযোগের কথা সর্বশেষে বলেছেন। আসলে সহজ যোগ বলার অর্থই হল যে কর্ম জ্ঞান ভক্তি সবই পরিপূর্ণ আত্মসিদ্ধির উপায় এবং সেই কর্ম যোগকর্ম হলে সিদ্ধিও তখন সহজ হয়ে যায়। জ্ঞান ও ভক্তি যে কর্মের সহচরিত, তা নিয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করে ধরতে পেরেছি। কিন্তু তবুও সে সহজ সিদ্ধি লোকের পক্ষে সহজ হয় না। তাই মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি অনুযায়ী ত্রয়ীকে আলাদা করে করে অনুশীলন করে পূর্ণকে আমাদের বুঝতে হবে এবং সাধনায় তাদের মিলিয়ে নিতে হবে। কর্মযোগের পর এবার আমরা জ্ঞানযোগের আলোচনায় জ্ঞানের সম্যক পথটি ধরে চলার চেষ্টা করব।

* * *

যোগের প্রথম কথাই হল একাগ্রতা। একাগ্রতা নিয়ে অন্তর্মুখীন হয়ে পথ চলা শুরু করলে তবে যোগের পথ খুলে যেতে থাকে। না হলে বকের মাছ ধরার বা শিকারী বিড়ালের উপায় কৌশল্যে যে একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে চিত্ত অন্তর্মুখীন হয় না। সমাধি হলেই যোগ হয় না। তাই প্রথমেই চিত্তবৃত্তিগুলি বহির্মুখ না থেকে অন্তর্মুখ হতে থাকে। যোগের শুরুতে এইভাবে জ্ঞানের ধারা উলটে যায়। আমি কে, আমাকে জানব কি করে, ইত্যাদি আত্মজিজ্ঞাসা নিয়ে যে ব্যাকুলতা বেড়ে চলে, তা বাড়তে বাড়তে আত্মাকে জানতে গিয়ে বিরাট ভূমাকে জানতে চায় ও সেই বৃহত্তের মধ্যে ডুবে যায়। তারপর জানতে হয় জগৎকে—দুনিয়ার দিকে আবার দৃষ্টি ফেরাতে হয়। ত্রিগুণের ভিতর দিয়ে বিশ্বে যে কালের পরিক্রমা চলছে, তার ভিতরে অণুরও অণু আবার মহানেরও মহান্ দুভাবেই তাঁকে পেতে হবে, জানতে হবে, এই হল যোগ। তখন দেখি প্রকৃতিতেই তো যোগ চলেছে। তাই আত্মসচেতন হয়ে হুঁশে থাকা যোগের প্রাথমিক লক্ষণ। গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের ভূমিকা নিয়ে সব কিছু কর্মই করা যেতে পারে। তার জন্য সর্বাবস্থায় সর্বভাবেই

আত্মসংযমের অনুশীলনটি চাই। সব কিছুই বুঝে করতে হবে, কোন মতেই প্রমত্ত হয়ে সংযম থেকে ভ্রষ্ট হতে নেই। All life is Yoga-এর এই হল প্রধান কথা।

অতিমানস রূপান্তর পর্যন্ত লক্ষ্য রেখে আমাদের যোগপথে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু আগে থেকে অতিমানস শব্দ নিয়ে প্রমাদের সৃষ্টি করে লাভ তো নেই-ই, বরং ক্ষতি আছে। চৈত্য রূপান্তর ও চিন্ময় রূপান্তরের পরিপাকে যথা সময়ে অতিমানস রূপান্তর সম্ভাবিত হবে। এক হিসাবে তাই হল শেষ কথা। তাই তাঁর প্রসাদে যোগক্ষেম বজায় রেখে চলতে হবে। অপ্রাপ্ত বস্তুকে লাভ করা যায় যোগের ফলে, আর সেই প্রাপ্ত বস্তুকে রক্ষা করাই হল ক্ষেম। যা পাওয়া যায়, তাকে আত্মসাৎ করতে হবে, হজম করতে হবে। ধমনিতে সিরায় চিদ্‌বিভূতি সব ঝরে ঝরে পড়ে, মহাশক্তি উদ্দীপ্ত হয়ে সব কিছু ঢেলে দিতে চাইছেন পার্থিব চেতনার 'পরেই। এই বিরাট শক্তি আধারে সহজ হয়ে আসন গ্রহণ করতে পারলে তবেই না রূপান্তরের যোগ সফল হবে।

অতিমানসের পথে আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য যে মানস বা মন সর্বদাই সঙ্গে রয়েছে। মন আলোময় হতে হতে শেষ পর্যন্ত অতিমানসে রূপান্তরিত হচ্ছে লোকোত্তর অতিমানসের আবেশেই। শ্রীঅরবিন্দ যোগের প্রভাবে মনকে নিশ্চল করার সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছেন। মন শূন্য হয়ে যায়। অমনীভাব (land of no mind) মনেরই অন্য দিক। সেখানে মন কাজ করে না কিন্তু পূর্ণ বোধ থাকে। ঐ শূন্যতা বা অমনীভাব পিছনে থেকে কাজ করে। উত্তর মানস প্রভাস মানস বোধিমানস অধিমানস এই ক্রমে সাধক পূর্ণযোগে আরূঢ় হলে অতিমানস তাঁর স্বীয়া শক্তিতে সক্রিয় হতে পারেন। অদ্বৈত অনুভূতির চরম কথাও হল তাই।

ঈশোপনিষদের মন্ত্রগুলিতে অতিমানসের আভাস পাওয়া যায়। আত্মাতে সর্বভূত, সর্বভূতে আত্মা ও আত্মাই সর্বভূত। এইভাবে আত্মা ব্রহ্ম ও জগৎ ত্রয়ীর অদ্বৈতানুভব। আত্মদীপ অন্তরে আর বাহিরে সর্বব্যাপী তুরীয় যে ব্রহ্মজ্যোতি, সে-ই এক। অদ্বৈতানুভূতির চরম কথা হল সর্বভূত—জীব জগৎ ব্রহ্ম সব একাকার। অনন্ত আলোর পরিধি, কিন্তু কেন্দ্র হল আত্মবিন্দু। তাই আত্মভাব থেকেই সব কিছু দেখা যায়, যেন ঘরভরা আলো আবার মানুষগুলিও আলো। ক্ষুদ্র অহংএর ক্ষুদ্রতা ভাঙে ভালবাসায়, কিন্তু সে ভালবাসা কোথায়? সেই ভালবাসায় বেঁচে থাকা, জীবন্ত প্রেমনুতি হয়ে বিশ্বব্যাপ্ত হওয়া, এই তো সার কথা। নির্বাণের পর যে শ্রীঅরবিন্দযোগের সত্যিকার আরম্ভ বলা হয়েছে, তার সূত্র হল ওই। বিজ্ঞান ভূমিতে অনন্তের পথে (Infinity) যাত্রা, অনন্তে প্রসারিত চিত্ত আর আলোর মতই সেই চেতনার ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিদেবীই অতিমানসের কাজ শুরু করেন। বৈদিক ঋষির মন্ত্র "উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম" জীবনে জীবন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বাইরের মাটিতেও 'মা'টি দেখা দেন। বস্তুজগৎ ভাবজগৎকে প্রকাশ করে দেয়। সেই ভাবের পরিপাকে ভাবই আবার জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। ভাবের জ্যোৎস্নালোকের আবেশে স্বপ্নময় এক অবস্থা প্রথমে আসে, তা কিন্তু সূর্যের আলোর মত অত স্বচ্ছ নয়। কিন্তু ঐ

স্বপ্নালোকেই শক্তির পলিমাটি পড়ে পড়ে চিৎসূর্য উদিত হবেন। তখন হয় ভাবেরই জাগ্রত জগৎ। স্বপ্নাবস্থায় বা অন্তর্দশায় চিজ্জ্যোতির প্লাবন বিদ্যুতের মত ঝলকে ঝলকে আসে। একপ্রত্যয়সার প্রভাসে ভিতরে অন্তর্জ্যোতি অন্তরে চিৎসূর্য ও জাগ্রত ভাবের ইন্দ্রিয় সব একরসে ঝলমলিয়ে ওঠে। তখন তো সৃষ্টিধারাই উল্টে যায়। বোধির আলোয় দিব্য আবেশে প্রাতিভ-সংবিৎ থেকে ইন্দ্রিয়-সংবিৎ ও তা থেকে জগৎ পরিবেশ সবই যেন রূপ ধরে। এইভাবে বিষয় বিষয়ীর ভিতরে আগে সৃষ্ট হয়, তার বহির্মুখ প্রকাশ আত্মচৈতন্যেরই বিকিরণ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখিয়ে দিলেন "ময়ৈব নিহতা পূর্বমেব" —আগে থেকেই তাঁর নিধন-যজ্ঞ হয়ে আছে। কালের নিয়মে যথাসময়ে তাকে এই বস্তু জগতে প্রতিফলিত কর, নিমিত্ত হয়ে কর্ম কর। এই ভাবেই বুঝতে পারা যায় যে তখন শ্রবণ (শ্রবঃ) দর্শন (চক্ষু) ব্রহ্মসংস্পর্শে সবই দিব্য হয়ে যাবে। "মহেরণায় চক্ষসে" এই মন্ত্রে শ্রুতি বলছেন, এই চোখ দিয়েই সেই মহান্ বিপুল আনন্দকে দেখব, এই সমস্ত জগটাই দিব্য দেখতে পাচ্ছি। বাহিরের চেতনার এই অনিবার্য বৈপুল্য আত্মারই আত্মপ্রসারণ। এই রকম করে বিশ্বচৈতন্যে নিমজ্জিত হয়ে উজ্জ্বল রসে জারিত হয়ে ব্যক্তিচৈতন্য ভগবৎ-চৈতন্যকে আত্মসাৎ করে। সেই মহাপ্লাবনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব শেষ পর্যন্ত একেবারে নিঃশেষিত হয়ে গলে যাবে। আর তখনই অতিমানসের মহা বিস্ফারণ সঙ্ঘটিত হবে। রূপান্তর যোগের কাজ তখনই সম্পূর্ণ হতে পারবে, তার পূর্বে নয়। অতিমানস কালশক্তিকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, সে সম্বন্ধেও শ্রীঅরবিন্দ শেষের দিকে সূত্র ধরিয়ে দেবেন। কালাতীত অধিষ্ঠানে মহাকাল ও ত্রিকাল সেখানে একাকার, কালের প্রবাহে সেই মহাবিন্দু-কণাটি চেতনায় ধরতে শিখতে হবে। সেই মহান আবিষ্কারে চেতনার রূপান্তরে পূর্ণযোগের পরমা সিদ্ধি পর্যন্ত সম্ভাবিত হতে পারবে।

★ ★ ★

দিব্যকর্মযোগের আলোচনায় আমরা বরাবর দেখেছি, কর্ম জ্ঞানে পরিপক্ক হয়, কর্মের ফলে জ্ঞান লাভ হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আত্মজ্ঞানের কথায় বলেছেন যে আত্মাকে আগে জান। আত্মাকে জানতে গিয়ে প্রথমে যে আত্মবোধকে আমরা আবিষ্কার করি, সেতো বৃহৎ বোধের একটা অংশ মাত্র। অংশ অর্থে কিন্তু খণ্ডিত বা টুকরো নয়। বৃহৎ ঐ ভূমাকে জানতে হলে তার অংশ এই ক্ষুদ্র জগৎকে জেনেই জানতে হয়। আমার আত্মা পরমাত্মারই বিভাস। সেই পরমাত্মার সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক যোগের সম্পর্ক, বিয়োগের নয়। গীতায় আগে বলেছেন আত্মচেষ্টার কথা "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ"। আত্মাকে আত্মাদ্বারাই অবসাদ হতে উদ্ধার করতে হবে, ওপরে তুলে ধরতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন অভীপ্সার আত্মচেষ্টার কথা (self-effort)। ভগবৎপ্রসাদই (Grace) সে চেষ্টাকে প্রচোদিত করে। এই ভাবে আমার আত্মজ্ঞান তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানে নিয়ে যায়। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের পর থেকে সেই রকম সাজানো হয়েছে, সেখানে কর্মযোগের পর জ্ঞানযোগের কথা। শ্রীঅরবিন্দ জ্ঞানযোগের প্রারম্ভে ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই আগে বলেছেন, তা থেকে আসে

আত্মজ্ঞান। এই দিক দিয়ে দেখলে গীতা ও উপনিষৎ থেকে তাঁর বলবার প্রকৃতি বিভিন্ন। ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মযোগ থেকেই জ্ঞানের শুরু, সেটা গোড়ায় ধরিয়ে দিয়ে উপনিষদের ধারা অনুসরণ করে মানুষের আত্মজিজ্ঞাসায় কি ভাবে যোগ শুরু হয় তা বলেছেন। সব মানুষই জানতে চায়, কিন্তু সে নিজেকে যখন জানতে চায়, তখনই যোগ আরম্ভ হয়। অধিকাংশ মানুষই এ ব্যাপারে নাস্তিক, নিজেকে সে একেবারেই জানে না। বিষয়কে বাইরে রেখে তারা অনেক জানে, যেমন করে আধুনিক বিজ্ঞান জানছে। কিন্তু যোগের জ্ঞান এই বহির্বিজ্ঞানের জ্ঞান নয়। আর এক রকম ভাবে দর্শনের জ্ঞান লাভ হয়। সেখানে হেতু প্রশ্ন ওঠে—কেন? স্মরণাতীত কালে আদিম মানবের মনেও এই হেতু প্রশ্ন ও দর্শন ছিল। বলা যেতে পারে যে প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব দর্শন আছে, তা থেকে আত্মজিজ্ঞাসা জাগতে পারে। এই হল জ্ঞানের দ্বিতীয় পর্ব, যেখানে বিষয়ীর ভিতরেই বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছে। তা থেকে যে জ্ঞান সে জানায় তার প্রাণের তাগিদ রয়েছে, তা দর্শন বিদ্যা, কিন্তু তবুও তা যোগ নয়। এরপর এমন সময় আসে, যখন জ্ঞানযোগের জন্যই জ্ঞানের পিপাসা জাগে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সেই অবস্থার কথা সুন্দরভাবেই বর্ণিত হয়েছে। আমরা কি? কোথা থেকে এসেছি, কি দিয়ে জীবিত আছি আর শেষে যাব কোথায়? কে আমাদের সুখদুঃখ ভোগের ব্যবস্থা পরিচালিত করছেন? এই রকম ধরনের আত্মজিজ্ঞাসা আসে সমগ্র সত্তা মন্থন করে এবং এরই কারণ অনুসন্ধানে কে যেন কূল থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়? কোন শোনা কথায় আমার আর তখন শান্তি থাকে না, আমার জিজ্ঞাসার উত্তর বাইরে কোথাও পাই না। কিন্তু আমার সব জিজ্ঞাসা আকূতির রূপ ধরে যখন আমার জানার পথ ভিতরে ঘুরিয়ে দিল, জানার বিষয় ও বিষয়ী একযোগে যখন জানার পথে আলোর সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে পড়ল, তখনই যোগ আরম্ভ হয়ে গেল। বাহ্যসংস্পর্শ থেকে যে অস্থিরতা আসে, তাও শান্ত হয়ে যায়। আর সেই আত্মস্থ হওয়ার ফলে জ্ঞানের পথও ভিতরে খুলে যায়। আসল যে জিজ্ঞাসা যে আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি, এটা জানতে গেলেই বৃহৎকে বা ব্রহ্মকে জানতে হবে, অর্থাৎ আত্মচেতনাকে শান্ত প্রদীপ্ত ও বিস্ফারিত করতে হবে। এই আত্মস্থ হওয়ার জন্যই জ্ঞানের সাধনা। আত্মস্থ ও আত্মসচেতন হলে চেতনার মোড় ঘুরে যায়, আত্মপ্রকৃতি নন্দিত হয়ে শক্তিতে টলমল করে ভরা ঘটের মত। এই সহজ অনুভব স্বভাবের বশেই হয়, কিন্তু তাকে ভাল করে জানতে হবে; শুধু মন দিয়ে নয়, মনীষা এবং হৃদয় দিয়েও এই ধরনের যে জানা, তাই যোগ।

বহু প্রাচীন যুগ থেকে সেই আদিম মানবের মনস্তত্ত্ব বিচার ও বিশ্লেষণ করে আজও আমরা অনেক জিনিষ ধরতে পারি। যেমন, এক বৃহত্তের আবেশ তাদের 'পরে যেন ভর হত। তা তাদের কাছে এত প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত ছিল যে, আজও তা অস্বীকার করা যায় না। সেই আবেশের ফলেই জানার চাহিদা আসে যে কাকে জানব, কি জানব? বিশ্বমূল যে সত্তা, যা সবারই নিয়ন্তা আমারও নিয়ন্তা তা থেকেই জানার শক্তি আহরণ করি, আবার তাকেই জানতে চাই। এই ভাবেই আমরা ঈশ্বরকে জানতে চাই, ব্রহ্মকে জানতে চাই।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে জানা ও সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই আমাদের জ্ঞানের মূল অন্বেষা—জানবার ইচ্ছা। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ব্রহ্মই এই ভাবে হলেন আমাদের জ্ঞানের বিষয়। এই ব্রহ্ম নির্বিশেষ অনন্ত ও শাশ্বত। অনন্ত বলতে তাঁর বিস্তার ও ব্যাপ্তির দিক অর্থাৎ দেশের দিক বোঝায় আর শাশ্বত বলতে তাঁর কালের দিক প্রকাশের দিকও বোঝায়। অনাদি অনন্ত বিরাট যা কিনা বিস্তারের বোধ থেকে আসে, তা হল ব্রহ্মের শুদ্ধ সৎ নির্বিশেষ লক্ষণ, কিন্তু কালও সেখানে আছে কালাতীত সত্তায় সম্বর্ধিত মহাবিষ্ণু হয়ে। তা থেকে কালপ্রবাহে যে লক্ষণ এসে পড়ে, তখনই আপেক্ষিক জগতের কথা আসে, যা হল আমাদের বোধগোচর বিশ্বজগৎ। এই বিশ্ববোধকে যদি ঐ তুরীয় নির্বিশেষ সত্তার নিয়ে যাই, তখন জগতের লক্ষণগুলিও পরিমার্জিত হয়ে যাবে। নির্বিশেষ (Absolute) অদ্বৈত জগতেও দ্বৈত নাই, সেখানেও ঐ ব্রহ্মসদ্ভাব—ব্রহ্মের পারনা, পরম সত্তা। তিনি আছেন এই হল সবচেয়ে বড় কথা। এমন এক তত্ত্ব হয়ে আছেন যার কোন উপাধি নেই, যাকে কোনমতেই বিশেষিত করা যায় না এবং যা কোনমতেই সীমিত নয়। ঐ অনন্ত সনাতন নির্বিশেষ সৎ ব্রহ্মই বিশ্বমূল। যা বিশ্বমূল তা যুগপৎ বিশ্বোত্তীর্ণ আবার বিশ্বাত্মক। বিশ্বের তত্ত্ব বিশ্বকে ছাপিয়ে গিয়েও তাতে অনুস্যূত, তেমনি ব্রহ্মচৈতন্যও বিশ্বাতীত চৈতন্য হয়েও আবার বিশ্বচৈতন্যও।

জ্ঞানযোগের লক্ষ্য ও বিষয় হল ঐ অনন্ত নির্বিশেষ তুরীয় ব্রহ্ম। এইবার বেদান্তের কথা ও বিচারের কথা তুলতে হয়। শঙ্কর ব্রহ্মকে জেনে বললেন প্রজ্ঞান—সেই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। বুদ্ধ তাকে বলেছেন শূন্য, তা আছে এ কথা বলা যায় না। তাঁর জ্ঞান শেষ পর্যন্ত যেখানে পৌঁছান, সেই নির্বিশেষ তুরীয় অসৎবোধে বিশুদ্ধ অস্তিতার বোধও ডুবে গেল। সেই ব্রহ্মনির্বাণকে সব দিক দিয়ে জেনে তার নাম দিলেন শূন্য। তাই বুদ্ধদেবকেই বলা যায় জ্ঞানের চরম ও শেষ প্রবক্তা। শঙ্করাচার্য সেই তুরীয় নির্বিশেষ ব্রহ্মকে স্বীকার করলেন, কিন্তু তিনি বললেন তা শূন্য নয়। তা হল এক বিশুদ্ধ অস্তিতারূপে চৈতন্যের পরম প্রকাশ। এই দুরকম বোধের কথা কি রকম করে সম্ভব হল? প্রাচীন যুগে বেদে আমরা পেয়েছি আকাশ-ভাবনা ও আদিত্য-ভাবনা। ঐ আদিত্যকে বলতে পারি তৎস্বরূপ, সেই সূর্যে বা আদিত্যে পৌঁছানোই ব্রহ্মে সমাপত্তি। আদি বেদান্তের সেই আদেশ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।" বুদ্ধ এসে যা বলেছিলেন তা হল ঐ আদিত্যকে ধরে আছে আদিত্যের ওপারে যে আকাশ অপ্রবর্তি, সেখানে না গেলে নির্বিশেষ হওয়া যায় না। শুধু আদিত্যের জ্যোতিতে সমাপত্তি হলে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল না। তারও ওপারে গিয়ে পেতে হবে ঐ পরম অব্যক্তের অন্ধকারকে, যা কিনা ঐ পূর্ণজ্যোতির প্রকাশক।

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্তমনুভাতি সবং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।"

সেই ব্রহ্মকে সূর্য চন্দ্র তারকা অগ্নি কেউই প্রকাশ করতে পারেনা, কিন্তু সেই ব্রহ্ম-জ্যোতিতেই সব কিছু ভাসিত। এই রকম করে একটি ব্রাহ্মণ্যধারা ও একটি বৌদ্ধধারা

জ্ঞানের এই দুটি ধারাই ভারতবর্ষের উচ্চতন চিন্তাধারাকে চিরকাল ধরে রেখেছে: বৈদান্তিকেরা অদ্বৈতবাদের দুধারাই নিয়েছিলেন, সবিশেষ ও নির্বিশেষ।

বৌদ্ধেরা ঐ পরম প্রকাশকে রূপাবচর ভূমির প্রত্যন্তে আভাস্বর ব্রহ্ম নাম দিয়েছিলেন। রূপাবচর ভূমি ছাড়িয়ে গিয়েও তাঁরা পেয়েছিলেন অরূপাবচর ভূমি—নির্বিশেষ অনন্তকে। সেই অরূপাবচর ভূমির প্রত্যন্তে হল বুদ্ধের নির্বাণ, আর তাই হল বৌদ্ধদের জ্ঞানেরও পরম লক্ষ্য। জ্ঞান বা জানা বিশ্বোত্তীর্ণ চৈতন্যে উত্তীর্ণ হলে নিবর্তনের তীব্র সংবেগে এক মহাপ্রলয়ে যেন একাকার হয়ে যায়। তাকে তখন জ্ঞানও বলা যায় না, তাই বলে তা অজ্ঞান নয়—"নৈব সংজ্ঞানাসংজ্ঞা", যাকে যাজ্ঞবল্ক্য অসংজ্ঞা নাম দিয়েছেন বৃহদারণ্যকে। সেখানে কিছুই নেই, না আমি না জগৎ; তাই বলা হয় শূন্য। জ্ঞানেরও যেন নির্বাণ ঘটে ঐ তুরীয় সর্বনাশা অসতে। কাজেই কোন বস্তুরই শাশ্বত সত্তা নেই, নিজস্ব স্বরূপ বলেও কিছু নেই—সব শূন্য। এই মতে বাহ্যজগতের কোনও শাশ্বত সত্তা থাকতে পারে না, একে অসৎব্রহ্মবাদ বলতে পারি।

কিন্তু শঙ্করাচার্য এটা স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন জগতের মূল অসৎ বা শূন্য নয়। জগতের মূলে যে সদ্বস্তু, সে বস্তু আমার আত্মচৈতন্যের স্বরূপ। সমস্ত জগৎ বিলুপ্ত হয়ে গেলেও অস্তি রূপে আমি আছি, আমার চেতনাও আছে। অতএব এক সত্যচৈতন্যই জগতের মূল, সেটা অসৎ নয়, শূন্য নয়। তবু বলতে হয়, শঙ্কর ঐ সত্যচৈতন্যকে এমন নির্বিশেষ রূপ দিয়েছিলেন যে তাকে বৌদ্ধ শূন্যবাদের থেকে তফাৎ করে বুঝতে পারা কঠিন।

চিৎপ্রকাশ—সূর্যের মত ঝলমল করা; বৌদ্ধেরা বলতেন সেটা যেন সগুণ ঘেঁষা। একেবারে নির্গুণ ব্রহ্মকে ইতি করে জানা হল সৎ চিৎ আনন্দ লক্ষণে জানা। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ঐ যে সদ্ব্রহ্ম বিশুদ্ধ অস্তিতার বোধ, তাকে ছাপিয়ে ব্রহ্ম অসৎ হয়েও আছেন। শঙ্কর ঝোঁক দিয়েছেন নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের ওপর। গুণাতীত ভূমির কথায় শঙ্কর বলেন তা হল অনির্বচনীয়, মুখে বলা যায় না তা কি। আর বুদ্ধ বলেন গুণাতীত বললে বুঝতে হয় কিছুই নেই।

এখন, গুণ বলতে আমরা জানি প্রকৃতিরই গুণ, সত্ত্ব রজ তম। সত্ত্বের আলোয় জ্ঞান হয়, সবই প্রকাশ। কিন্তু তাতেই আসে আবরণ ও বিক্ষেপ, তমোগুণ ও রজোগুণের ক্রিয়া। তখন প্রশ্ন ওঠে, আবরণ ও বিক্ষেপ নেই এমন হতে পারে না। গীতায় আমরা পেয়েছি শুদ্ধ সত্ত্বের কথা, কিন্তু বেদান্ত দর্শনে ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্বের দিকটা দেখা হয়নি। সত্ত্বের শুদ্ধিতে বিশুদ্ধ সত্ত্বই যে শুধু উদ্ভিত হয়, তা নয়; সেই সঙ্গে যে শক্তির বিস্ফারিত প্রকাশ হয়, তাতে রজ ও তম দুই গুণই রূপান্তরিত হয় দেবগুণে। তত্ত্বের প্রকাশ রজের বীর্য ও তমের স্থৈর্য এই তিন গুণই দৈবী সম্পৎ। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ব্রহ্ম এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব, তিনি অশেষ কল্যাণগুণের আকর ঈশ্বর, তিনিই জ্ঞানযোগের লক্ষ্য বস্তু। এবার শ্রীঅরবিন্দের সম্যক্ জ্ঞানযোগে এগুলি সব মিলিয়ে নিয়ে দেখি, বুদ্ধের অসৎ ব্রহ্ম শঙ্করের সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম যেমন আছে, তেমনি এর পরও আছে ঈশ্বর ও তাঁর শক্তির জ্ঞান—যা কিনা শ্রীঅরবিন্দ

দর্শনের শ্রেষ্ঠ দান। শ্রীঅরবিন্দ জ্ঞানের লক্ষ্য বলতে ব্রহ্মশক্তির জ্ঞান পর্যন্ত জ্ঞানযোগকে নিয়ে গেছেন, না হলে জ্ঞান সম্যক হয় না। বলা বাহুল্য যে জ্ঞান ও শক্তি নিয়ে আমাদের শাস্ত্রীয় মতগুলির মধ্যে অনেক বাদানুবাদ তর্ক বিতর্ক আছে সে সবের মধ্যেও দৃষ্টিপাত করে আলোচনা করে, বিচার ও বিশ্লেষণের পথেও শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সম্যক্ জ্ঞানের পথটি কেটে দেখিয়ে দিয়েছেন।

ব্রহ্মের বিভাব সৎ চিৎ আনন্দ ও শক্তি। আবার এই চারিটি বিভাব ছাড়িয়েও ব্রহ্ম অসৎ। ব্রহ্মের সত্তা ও চৈতন্য এবং তাও ছাপিয়ে ব্রহ্ম যে অসৎ—এই হল অতিষ্ঠার (Transcendence) দিক। এই তিন নিয়ে যে ব্রহ্ম তাঁকেই জ্ঞানযোগের বিষয় বলা যায়। সম্যক্ জ্ঞানযোগে শ্রীঅরবিন্দ জানার বিষয় যে লক্ষণ দিয়েছেন, তা হল অনন্ত শাশ্বত (Infinite Eternal) ও নির্বিশেষ (Absolute) তত্ত্ব। এ ছাড়াও ব্রহ্মের আনন্দ ও শক্তি হল তাঁর প্রতিষ্ঠার দিক। আত্মস্থ আর আত্মসচেতন হয়ে যে জানা, সে জানায় চেতনায় আনন্দের ভোগ ও শক্তির ঐশ্বর্য রসে টলমল করে। তাই আত্মস্থিতি সহজ হয়ে গেলে অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠ হলে ভোগ আর ঐশ্বর্যের প্রকাশে কোন ঝামেলায় পড়তে হয় না, বাইরে তাকে কোথাও খুঁজতে হয় না। চিন্ময় আত্মসত্তার সহজ প্রকাশরূপে আনন্দ আর শক্তি দেখা দেয়। যোগের ফল তখন পূর্ণ হয়।

পূর্ণযোগে তাহলে আত্মস্থিতি জ্ঞানযোগের, আনন্দ ভক্তিযোগের আর শক্তি কর্মযোগের এই ভাবে আলোচনা করে ত্রয়ীকে মিলিয়ে নিতে পারি। কিন্তু তিনটি যোগই অন্যোন্য-সঙ্গত ও পরস্পর ওতপ্রোত হয়ে আছে, কেননা সর্বত্রই লক্ষ্য হল জীবনের দিব্য রূপায়ণ। আমাদের চেতনার ভাবনা বেদনা ও সঙ্কল্প রূপ স্বাভাবিক বৃত্তির উৎকর্ষণই পূর্ণযোগে ঐ ত্রয়ী যোগের মিলিত সাধন। শ্রীঅরবিন্দ জ্ঞানযোগের জানাকে বলেছেন জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে একাকার হয়ে জানতে হয় (Knowledge by Identity)। আমরা তো এই সীমিত দেহ প্রাণ মন নিয়ে পরিমিত আয়ুষ্কালের মধ্যে নিমিত্ত ও ঘটনার জগতে দোল খেয়ে চলেছি। এই সব সীমা ছাড়িয়ে অসীম অনন্ত নিথর নিস্তব্ধ শাশ্বত নিষ্ক্রিয় নির্গুণ সুদূর হয়েও আকর্ষণ করে যাচ্ছে; আমাদের সীমার কাছেই ঐ অসীম নিজেকে যেন মেলে দিতে চাইছে। তাই তাকে জানবার জন্য আমাদের মধ্যে দুরন্ত পিপাসা দেখা দেয়। "হেথা নয় অন্য কোনখানে" ছুটে যেতে চাই, এই সীমার মধ্য থেকে মুক্তি পেতে চাই। কিন্তু বাহির থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না, মুক্তি খুঁজতে হয় অন্তরে গভীরের পথে। উপনিষদের আকাশ-শরীর ভাবনা তখন আমাদের সাধনের মস্ত সহায় হয়। স্থূল দেহবোধ শুধু নয় সূক্ষ্মশরীর কারণশরীর এসবও আছে। তাই সমগ্র দেহবোধ হালকা হয়ে অনন্তে ব্যাপ্ত হয়ে যায়, এই ভাবে পৃথিবীনয় শরীর কল্পনা করা যায়। সুষুপ্তিতে যদি যোগনিদ্রা হয়, তাহলেও ঐ ব্যাপ্তির বোধ দেখা দেবে। একটি জলন্ত চুল্লী যদি একটা ঘরের মধ্যে রাখা যায়, তাহলে তার তাপ বিকীর্ণ হয়ে সমস্ত ঘরকে উত্তাপে ভরে দেবে। সেই রকম করেই শরীর যোগাগ্নিময় হলে আকাশ-শরীর ব্রহ্মের অনুভব হয়। সেই আকাশ-শরীরেরই লীলা-

পরিণাম ঘটে চলেছে, তারও শেষ নেই। সেই চলা কক্ষরেখায় এক আবর্ত গতিতে চলতে চলতেই সাঁৎ করে (shoot) যেন স্পর্শকের (tangent) মত ছুটে অনন্তের দিকে চলে যায়। এই ধরনের বোধ মিলেই চেতনার প্রতিষ্ঠা। শ্রীঅরবিন্দ যেক্ষেত্রে বলেছেন, যেখানে কিছুই ঘটছে না—নিষ্ক্রিয় অবস্থা, সেখান থেকেই যে সব কিছু ঘটে যাচ্ছে, এই বোধ হওয়া চাই। এই যে ক্ষুদ্র আমি, সে তো ঐ বৃহতেরই অংশ। সেই বৃহৎই আমি হয়ে সবার মাঝে সে আমির তো ক্ষয় নেই। এই বোধ থেকে শাশ্বতের বোধ আসে। আর ঐ দুই বোধ যেখানে নিয়ে যায়, মহাকরণের কারণ যেখানে, সেখানে যখন প্রতিষ্ঠার বোধ লাভ করে, সেটাই হল নির্বিশেষ তত্ত্ব (Absolute)। ঐ পর্যন্ত জানতে পারা জ্ঞানযোগের লক্ষ্য।

শ্রীঅরবিন্দ যে ভাবে জ্ঞানলাভের ধারা ধরিয়ে দিয়েছেন, প্রচলিত জ্ঞানযোগের ধারার সঙ্গে তুলনা করলে শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞানযোগের ধারাকে বৈদিক চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদ দিয়ে বুঝতে পারা যায়। তার মূল তত্ত্ব হল আবেশ, আর তার মুখ্য সাধন হল বোধি; উপনিষৎ যাকে বলেছেন প্রতিরোধ। তিনি বলেছেন, I never close my eyes in meditation। সদাজাগ্রত অনিমেষ তাঁর সমাধিযোগ—"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবিতিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।" সহস্রবল্শা বনস্পতি যেন তার শতসহস্র ডালপালা মেলে দিয়ে অসীম ও অনন্তে নিমজ্জিত হয়ে তাকে শোষণ করে নিচ্ছে। সেই নিশ্চল স্বপ্রকাশ পুরুষ স্বরূপে বর্তমান আর তাইতে এই সমস্ত পরিব্যাপ্ত। গীতার সেই "অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং" যেমন, চারিদিক থেকে জ্ঞান এসে যেন প্লাবনে বইয়ে দিচ্ছে। এই হল আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ। এই ভূমাই তো সর্বত্র, তারই মধ্যে তুমি আমি সবই নিমজ্জিত।

জ্ঞানযোগের প্রচলিত ধারা যাকে সাংখ্যদর্শন-সম্মত বলে ধরা হয়, তার সাধন হল বুদ্ধি আর তার বৃত্তি হচ্ছে ভাবনা (thought)। জ্ঞানযোগের সাধক ভক্তি ও কর্মের সাধনা এড়িয়ে চলেন। ব্রহ্ম মনের অগোচর, সুতরাং ব্রহ্মকে পেতে হলে মনকে নিরুদ্ধ করতে হবে। মন না থাকলে জগৎও থাকে না, প্রপঞ্চের উপশমে শূন্যতা নয়তো সন্মাত্রের অনুভব হয়। তাই সেখানে পৌঁছানো যদি লক্ষ্য হয়, ঐকান্তিক একাগ্রতার সাধনায় সেখানে সর্বনিরোধের পথ ধরতে হয়। জ্ঞানযোগীর কাছে বাইরের জগৎ মুছে গেলে কর্ম শেষ পর্যন্ত আর থাকে না। চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমটায় কিছু কর্ম থাকলেও নৈষ্কর্ম্যের নিস্তরঙ্গতাই যোগীর অভীষ্ট লক্ষ্য। কর্মে দ্বৈতবুদ্ধি থাকেই, কাজেই বিশুদ্ধ অদ্বৈত জ্ঞানের সঙ্গে তার সমুচ্চয় সম্ভব নয়।

এই ভাবে জ্ঞানের পথ নেতি নেতি করে উড়িয়ে যায়, আর যা কিছু বাঁধতে চায়, বিবেক বিচার করে তাদের সব নেতি নেতি করে চলতে হয়। তাতে চরমে শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ভোক্তৃত্বে ও কর্তৃত্বে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে যেতে হবে, তাই পুরুষের সাধ্য হল বিবিক্ত হয়ে বিশুদ্ধ হয়ে দ্রষ্টা হওয়া। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা এই দ্রষ্টৃত্বের সাধন অনুশীলন করতে হবে। ভোগ এবং কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে শেষ

পর্যন্ত ঐ শূন্যতা বা সন্মাত্রের বোধ পাকা করে জ্ঞানী যদি জগতে ফিরেও আসেন, তিনি শুধু মাত্র সাক্ষী হয়ে থাকেন, তখন তাঁর কর্ম নেই, ভোগও নেই। এই নেতিবাদ থেকেই বিভিন্ন দর্শনে জ্ঞানের পথ সব বলা হয়েছে। তা থেকেই দুঃখবাদী দর্শনসমূহ যেমন, বৌদ্ধ জৈন সাংখ্য বা তর্কের ধারাগুলি সব দেখা দিয়েছে। দুঃখের অভাবকেই নেতিমূলক করে শেষ পর্যন্ত নির্বাণে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নির্বাণকেও রসিয়ে তুলে বলেছেন, আত্যন্তিক ব্রহ্মনির্বাণের কথা। শ্রীঅরবিন্দ নির্বাণ বা শূন্যতাকে জীবনের মূলে যেমন স্বীকার করেছেন, তেমন তাঁর যোগ-সাধনায় নির্বাণকে বা শূন্যতাকে অধিগত—জয় করতে হবে, তবে তার ওপর পড়বে রস আলো জ্যোতি। এ জ্ঞান ধারণায় আনা খুবই শক্ত, শিশু মন নিয়ে বুঝলে আভাসে যেটুকু ধরা যায়। শাঙ্কর বেদান্তের সৎব্রহ্মবাদ নেতিবাদের অর্থরূপে ইতিবাদ উদ্ভাসিত হয়েছে। আর উপনিষদের বা আদি বেদান্তের অস্তি ভাব আছে, কিন্তু কোন গোঁড়ামি নেই।

শ্রীঅরবিন্দ সেই দিকে অন্তরাবৃত্তিকে নিয়ে যেতে বোধিকে ধরতে বলেছেন, বুদ্ধিকে যা ছাপিয়ে আছে। বুদ্ধিরও আগে আছে হৃদয়, শ্রুতি বলেছেন যেমন "হৃদি প্রতীষ্যা করয়ো মনীষা"। জ্ঞানীরা হৃদয়ের বুদ্ধি মনীষার দ্বারা খাঁতি পাঁতি করে দেখলেন যে, যা কিছু আছে সৎ (অস্তি) হয়ে, আর বৃন্ত বা মূল জগতে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন Spiritual Intuition—তা হল ঐ হৃদয়ের প্রদ্যোতে রসান্বিত মনীষা। অপরোক্ষ জ্ঞানকে পাওয়া চাই সমস্ত সত্তা দিয়ে 'হৃদয়ঙ্গম' করে। বুদ্ধিতে পেয়ে থাকলে চলবে না, আরও আগে যেতে হবে।*

(ক্রমশ)

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

গীতিগুঞ্জ

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

আহ্বান

(বাউলের সুর)

কবে তুই নন্দ-ভালো আঁধার-আলো বুঝ্‌বি ওরে।
ফেলে ঘরের রতন খ্যাপার মতন কোথায় কি ধন খুঁজ্‌বি ওরে :
মেলে চোখ দ্যাখ্ রে খানিক,
ঘরে তোর জ্বল্‌ছে মানিক,
তবু তুই রইবি ব'সে বাহির-দোরে ;
অন্ধকারে অন্ধ সেজে চোখের পাতা বুঁজ্‌বি ওরে !

ওরে তোর ঘরের সুধা
ঘুচাবে সকল ক্ষুধা,
পরাণে পরম পুলক উঠবে ভ'রে ,
তুই খেয়ে গরল কেমনে বল্ মরণ সাপে যুঝ্‌বি ওরে !

ঘরে তোর আয় রে চ'লে,
নে রে ঠাঁই মায়ের কোলে,
মিছে তোর দিন গেল রে মোহের ঘোরে ;
ছেড়ে আপন গৃহদেবতাটি পরকে কেন পূজ্‌বি ওরে !

২

ছাত্রদের প্রতি

(শ্রীঅরবিন্দের To the Students অবলম্বনে)

কান পেতে শোন্, প্রাণ পেতে শোন্
জন্মভূমি মায়ের ডাক,
জাগ্ রে তরুণ সন্তানেরা
সময় হ'লো জাগ্ রে জাগ্।

বক্ষে জ্বেলে আশার মশাল
একটি দিকে লক্ষ্য রাখ্,
আপ্নাকে আর টুক্রো ক'রে
করিস্‌নিকো নানান্ ভাগ।

তোদের শিক্ষা-দীক্ষা সবই
মায়ের পূজার থালায় থাক্ ;
শাঁখের ধ্বনি তুলুক রণি'
তোদের শুভ সত্যবাক্।

ভয় ভাবনা চিন্তা এ-সব
চলার পথে জলের দাগ ;
মায়ের কৃপায় মিলিয়ে যাবে
যতই আসুক দুর্বিপাক।

মায়ের দেওয়া নতুন জীবন
মায়ের পায়ে ঠাঁইটি পাক ;
মায়ের কাজে, মায়ের সেবায়
থাক্ থাকে প্রাণ, যায় তো যাক্॥

———

৩

মহাবির্ভাব

(বাউলের সুর)

তুই চিনবি কবে তারে ?
দৈত্যবধে জন্ম যে নেয় দৈত্য-কারাগারে।
এক হাতে শঙ্খ নিয়ে
রণে যায় রথ চালিয়ে
মরবে সেথায় যারা, তাদের মরার আগেই মারে ॥

আঙুলের ডগার 'পরে
পুরো এক পাহাড় ধরে,
নদী সে উজান বহায় বাঁশরি-ফুৎকারে ;
নাচে সে সাপের ফণায়,
সাপের তায় মরণ ঘনায়।
সাপ হ'য়ে দংশিয়ে সে যে ওঝা হ'য়ে ঝাড়ে ॥

নিভে যায় যখন আলো,
এ-ভুবন নিবিড় কালো,
প্রকৃতির নয়ন ঝরে অঝোর অশ্রুধারে ;
সে চরন দুখের নাশে
আসে সে আসেই আসে
জ্বালতে নূতন যুগের আলো হেথায় বারেবারে ॥

এ নূতন করতে সৃজন
তোরে আজ তার প্রয়োজন,
কেন তুই বন্ধ থাকিস্ মিথ্যা অহঙ্কারে ?
বাজে তার আগমনী,
শোনা যায় পদধ্বনি,
আসনটি তার রাখ্ রে পেতে, খিল্ খুলে দে প্রবেশ-দ্বারে ॥

———

৪

উত্তিষ্ঠত

(লঘুগুরু বর্ণের উচ্চারণ অনুসারে গেয়)

রাগ—ভৈরব

ঘোর তিমির ঘন শঙ্কিল রাত্রি,
সুস্বাগত দুর্গম-পথ-যাত্রী,
তন্দ্রানুক্ত নিমীলিত নেত্রে
উত্তিষ্ঠত সব আজি রে।

ঊর্ধ্বে নিম্নে দক্ষিণ-বামে
উজ্জ্বল ইঙ্গিত বিদ্যুদ্দামে
গভীর মন্দ্রে বজ্র-নিনাদন
দুন্দুভি-রব সব বাজি রে।

সাধকবৃন্দ সনুদ্যত বক্ষে
সংহত ঐক্যে চল থির লক্ষ্যে,
নিশাবসানে নব অভিযাত্রী
শঙ্কা-সংশয় ত্যজি রে।

শুভ প্রত্যূষে রক্তিম সূর্যে
কর আবাহন মঙ্গল-তূর্যে
তমস-বিদারণ ভাস্বর দিবসে
সৈনিক সজ্জায় সাজি রে।

অমরা-আগম এ মর মর্ত্যে
উদ্বিত ভারত কাল-বিবর্তে,
সৃজিবে শোভা শত মন্দারে
নন্দনকাননরাজি রে।

বিজয়ার পত্র

নিশিকান্ত

প্রীতিভাজনেষু, মর্তে বিজয়াবায়ের
আশীর্বাদে আজো আমি বেঁচে আছি ভাই
'আশোক'। যদিও ধন্বন্তরীনগরের*
আয়ুর্বেদীবৃন্দ মোরে বলিয়াছে: নাই
শোণিতে জীবনীশক্তি, কারণ আমার
দেহের পিঞ্জরখানি দুরারোগ্য যত
ব্যাধির সঙ্ঘাত বহি' নাহি পারে আর
ধারণ করিতে আত্ম-বিহঙ্গে। বিকত
হৃদ্‌পিণ্ড-প্রাণপিণ্ড, হাঁটিতে হাঁপাই,
নাটিতে পড়িলে আমি পারি না উঠিতে:
অতীষ্ট-পন্থার 'পরে তবু যে সদাই
রাখি মোর অভিযান। আমি ধরণীতে

অবতীর্ণ বিজয়ার পেয়েছি আশ্রয়,
মর্তের জীবনে তাই করি নৃত্যজয়।

স্মরিয়া তোমায় আর তব অনুজায়,
বিজয়ার প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা আমার
সঁপিলাম চতুর্দশপদী কবিতায়
অন্তর্দেশী-পত্রপুটে। শুধাই এবার,
ভগ্নী-'মায়া' অবিরাম অগ্নিমান্দ্যরোগে
এখনো কি ভোগে? নিত্য করিয়া সেবন
অনুস্বজনের বটী অতীর্ণ দুর্যোগে
পায়না কি কোনো ফল? অগ্নি-উত্তাপন
লভে না কি অক্ষুধার অনুরাগে? হায়,
অবিরত তপ্ত অনুরাগির উত্তাপে
আমার অন্নের কত ক্ষুধার জ্বালায়
মুহুর্মুহু: খাদ্য চায়, যন্ত্রণায় কাঁপে

সর্বাঙ্গ! তবু মোর বিকম্পিত করে
বিজয়ার বৈজয়ন্তী দুলাই অকরে।

ইতি—

তোমাদের প্রীতিমুগ্ধ নিশিকান্ত

---

* পণ্ডিচেরীতে ভারত-সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালসমন্বিত বৃহদায়তন এলাকার নাম 'ধন্বন্তরী নগর'।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা

পবিত্র

সোমবার, ১৯ এপ্রিল, ১৯২৬

প্রশ্ন পুরো সপ্তাহটাই আমি চেষ্টা করেছি নীরব মনের অবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু তাতে বিফল হয়েছি। X আসবার আগে যে অবস্থা ছিল তা এখনও ফিরে আসেনি। এক বিরাট শান্তি রয়েছে অন্তরালে, আমি তার অতিস্বচ্ছ পরিবেশের, আভাস মাত্র পাই। ক্রিশ্চান গুহ্য সাধকেরা যাকে বলেন কাচের মতো স্বচ্ছ মহাসাগর, জাপানীরা বলে ক্রিষ্ট্যাল প্যালেস, ও কি সেই জিনিস?

শ্রীঅরবিন্দের উত্তর প্রধানত দুই রকম প্রকারে তা অনুভব করা যায়: এক হলো স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ সমুদ্রবৎ, আর এক হলো অনন্ত বিস্তারী আকাশবৎ।

প্রশ্ন: গত বারে আপনি বলেছিলেন চৈত্যজ্ঞানের সত্যতার কথা। সে জ্ঞান কি জগতে প্রত্যক্ষ অভিব্যক্ত যা কিছু নিয়ে, অথবা তা শুধু মেটাফিজিক্যাল তত্ত্ব জ্ঞান মাত্র?

উত্তর মেটাফিজিক্যাল যে জ্ঞান তা কেবল মনেরই জিনিস, আর চৈত্যের ভিতরকার যে জ্ঞান তা পুরো বাস্তবেরই মতো, বুদ্ধিজনিত ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

ওতে বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান মিলবে বললে ভুল বলা হবে, সেরূপ তার ক্ষেত্রই নয়। ওতে সত্তাকে পরিণত করে এক সত্যপূর্ণ সত্তাতে, সত্যেরই আস্পৃহাশিখাতে রূপান্তরের দ্বারা। চৈত্যের জ্ঞানে আসবে একটা প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাবার মতো অনুভূতি। যখন বলি যে হৃদয় মস্তিষ্কের চেয়ে ভালোরকম জানে, তখন তা কতকটা ওরই কাছাকাছি বলা হলো, যদিও হৃদয়ের ভাবানুভূতির থেকে চৈত্যের সত্যানুভূতির অনেক পার্থক্য। চৈত্যসত্তা গ্রহণ করে সত্যকে কিন্তু তাকে সৃষ্টি করেনা, তার সৃষ্টি করে অতিমানস। দুইএর মধ্যে এই তফাৎ রয়েছে।

সত্যকে দেখেই চিনে নেওয়া আসে স্ফুরিত বোধির দ্বারা, সেই বোধি অতিমানস জ্ঞানের একটা নিম্নতর সংস্করণ। পুরো সত্য জ্ঞান আসে কেবল একাত্ম হয়ে।

প্রশ্ন: ষ্টীনার বলেছেন তিন রকম গুহ্য জ্ঞানের কথা কল্পনাগত, অনুপ্রেরণাগত ও তাদাত্ম্যগত; শেষেরটি পুরো অভ্রান্ত। তাই কি একাত্মতার জ্ঞান?

উত্তর: বোধির প্রথম অবস্থাতে মনের তরফের জিনিস মিশে থাকে, কাজেই তা হয় বিকৃত। মন তাকে পেয়ে খুশি হয় না তাই তাকে ঘিরে নিজের দানা বাঁধে। তাতে খানিকটা সত্য থাকলেও অনেকখানি মিথ্যা মিশে যায়।

আর মন তার নিজের জিনিসকে বোধি বলে চালিয়ে দিতে শেখে। সত্তা যখন চাইছে বোধিমূলক জ্ঞান, ব্যক্তিসত্তাটি তখন নিজের কামনা ও সংস্কারগুলিকে বোধির ছদ্মবেশে তুলে ধরে। তাই প্রথম অবস্থায় বোধি ঠিক খাঁটি হয় না। পরে অবশ্য তার সঠিক স্ফুরণ হয়; কিন্তু তা পুরোপুরি আসার আগে আরো অন্যরূপ জ্ঞানের ধারা চলে আসে।

অতিমানস সত্যের প্রাথমিক যে বোধি তার চার রকম অবস্থা-ভেদ আছে—

Intuition (বোধি)—যাতে হঠাৎ একটা জ্ঞান আসে অনিয়মিত ভাবে, আলাদা কিছু মতো। মনে হয় যেন প্রসুপ্ত বা বহুঅতীত বা অবচেতন কিছু স্মরণ হচ্ছে।

Discernment (সুনিরূপণ)—বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে একরূপ প্রক্রিয়া যাতে আপনা হতেই কতক জিনিস বাদ দিয়ে কতকটাকে বেছে নেওয়া হয়।

Inspiration (অনুপ্রেরণা)—এতে বাইরের থেকে কোনো প্রেরণা এসে ভিতরে সম্যক প্রকাশিত হয়। যেন ভিতরে এসে তোমাকে কিছু বলছে।

Revelation (দিব্যদর্শন)—এতে ভিতরকার দৃষ্টিতে স্পষ্ট কিছু দেখতে পাও।

আমার মনে হচ্ছে যে তুমি আমাদের সান্ধ্য আসরে সপ্তাহে দুই একদিন আসতে ইচ্ছা করেছ। কোন দিন তোমার আসার সুবিধা হবে?

প্রশ্ন: অতি আনন্দের সঙ্গেই আসব, সব দিনই আসা আমার পক্ষে সুবিধা।

উত্তর: আচ্ছা তোমাকে পরে জানাবো, কোন দিন তুমি আসবে।

সোমবার, ২৬ এপ্রিল, ১৯২৬

প্রশ্ন: গত সপ্তাহে আমার ধ্যান বেশ ভালই হয়েছে আর গভীরও হয়েছে। কেন্দ্রে শক্তি নামছে অনুভব করতে পেরেছি, অনাহত ও মূলাধার কেন্দ্রে, আর এমন কি পায়ের দিকেও। সে সময়ে আমার পা দুটো শক্ত কাঠের মতো হয়ে গেল। আর এমন এক গভীর প্রশান্তি এলো যা মনের মধ্যে প্রয়োগ করাতে সমগ্র মনটাকে এককালে পুরো শান্ত ও নীরব ক'রে দিলে। সে সময়ে জ্যোতির বিকাশও লক্ষ্য করেছি।

উত্তর: তোমার পা দুটি শক্ত হয়েছিল যখন, তখন কি শক্তি নামছে বোধ করেছিলে?

প্রশ্ন: বস্তুত পায়ের সম্বন্ধে ঐরূপ ভাবেই চেতন হয়েছিলাম, নিশ্চয় তাতে শক্তির কিছু কাজ হচ্ছিল।

উত্তর: এমন হতে পারে যে শক্তি এসে না নামলেও পায়ের সম্বন্ধে তুমি ঐরূপ চেতন হলে, অর্থাৎ শক্তি নেমে আসতে বাধা পাবার ফলেই পা দুটো অমন কাঠের মতো শক্ত হলো। শক্তি নেমে এসে যদি তার চাপ প্রয়োগ করে তখন ধ্যানের পরেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত নড়াচড়া করা যায় না। সে চাপ এমনই জোরালো হয়। কিন্তু তুমি সেই শক্তিকেই কাজে লাগিয়ে

আপন অক্ষমতা দূর করতে পারো। কিন্তু যদি তার বদলে তোমার পা কাঠের মতো শক্ত হয়ে থাকে তাহলে ওখানে নিশ্চয় কিছু সংঘর্ষ ঘটেছে।

আর তুমি যে নীরব শান্তির কথা বলছিলে তা কেমন জিনিস?

প্রশ্ন সে অনুভূতিটা পুরোপুরি হয়নি; এই পর্যন্ত জানি যে তাকে আমি মনের উপর প্রয়োগ করতে পেরেছি মনকে নীরব ও শান্ত করতে; কিন্তু তা পুরোপুরি জিনিস নয়।

উত্তর ঐরূপ কাজ সকল স্তরে হওয়া চাই, তবেই উন্মীলন হয়ে পুরোপুরি টের পাবে।

প্রশ্ন একটা কথা, ধূমপান সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আমি আগে ধূমপান করেছি, এখানে এসে তা ছেড়ে দিই। কিন্তু—এখানে আসার পর থেকে আবার অল্প অল্প তা শুরু হচ্ছে, অবশ্য মাঝে মাঝে করছি। তার পর আবার ছেড়ে দিচ্ছি। গত দশ দিন মোটে ধূমপান করিনি। কিন্তু ইচ্ছাটা খুব জোর করে। অভ্যাসটা ছাড়তেই চাই, তবু ইচ্ছা সহজে বাগ মানেনা।

উত্তর: ও ইচ্ছা স্নায়বিক ছাড়া অন্য কিছু নয়, ওকে অনায়াসে থামানো যায়; কিন্তু সে ইচ্ছা যদি মন ও প্রাণের সমর্থন পায় তখন খুব কঠিন হয়ে ওঠে।

ওর দুই রকম উপায় আছে। এক হলো, হঠাৎ একদম সম্পূর্ণ কেটে বাদ দেওয়া। মনের ইচ্ছার জোরে দৃঢ় সংকল্প করা যে ঐ ইচ্ছার কথা কোনোমতেই আর শোনা হবেনা। সে ইচ্ছা যদি জাগে তাহলে নিজেকে তার থেকে সরিয়ে রাখবে, যদি নিচের অংশ থেকে তাকে তাড়াতে না পারো তাহলে সেখানে সে যা করবার করুক। এতে সেই ইচ্ছার জোর ক্রমশ শিথিল হয়ে আসবে। আর এক উপায় হলো, ইচ্ছা জেগে উঠলে তখন তাকে একটু-মাত্র খুশি ক'রে দিয়েই তার পর প্রত্যাখ্যান করা। অর্থাৎ তাকে মাত্র অল্প কিছু ভোগ করতে দিলে। কিন্তু সেটা অতঃপর তাকে প্রত্যাখ্যান করবারই জন্য। ওর চেয়ে বেশি প্রশ্রয় দেবেনা, নতুবা তাকে ফেরানো অসম্ভব। যোগীরা এই দুই উপায়ই প্রয়োগ ক'রে থাকে।

প্রশ্ন এ নিয়ে আমি অনেক বছর চেষ্টা করেছি, কিন্তু বিশেষ ফল পাইনি। আমি কিন্তু কামনামুক্ত হতেই চাই। এমন চাই যে ধূমপান করা বা না করাতে তফাৎ থাকবে না।

যৌন ব্যাপারেও সেই কথা। ওটা ছাড়তে অনেক বছর যাবৎ চেষ্টা করেছি, তারপর ও-ইচ্ছা এখন হঠাৎ একেবারে চলে গেছে, ও-বিষয়ে এখন নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু এটা জানি যে ও-ইচ্ছা একেবারে মরেনি, তেমন অনুকূল অবস্থায় পড়লে আবার হয়তো হঠাৎ সেটা জেগে উঠতে পারে।

উত্তর: তাড়াবার চেষ্টা করতে গেলে ঐ রকমই হয়। আমি নিজে কিছু ধূমপান ক'রে থাকি, কিন্তু আমার পক্ষে তা করা বা না করা সমান, না করলেও কোনো তাগিদ হয়না।

প্রশ্ন কিন্তু আমি যেন ওর দাস হয়ে পড়ি, তাই ছেড়ে দিতে চাই। যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

সোমবার, ৩ মে, ১৯২৬

প্রশ্ন আমার সাধনা সম্বন্ধে নতুন কিছু বলবার নেই। মন পুরোপুরি নীরব হয়না, যদিও উপরের শক্তির নেমে আসা বুঝতে পারি। আগে যেমন হতো যে তার স্পন্দন-তরঙ্গ এসে সরাসরি মূলাধারে যেতো তেমন আর হয়না। এখন আসে একটা প্রশান্ত শক্তি, ধীরে ধীরে আমার মধ্যে প্রবেশ করে।

উত্তর কোথা থেকে আসে? উপরের দিক থেকে?

প্রশ্ন সঠিক স্থানের কথা বলতে গেলে বলতে হয় মাথার উপর থেকে। আর সেইখানেই আমিও তার সঙ্গে মিলিত হতে চেষ্টা করি।

উত্তর তোমার চেতনা তখন কোথায় থাকে?

প্রশ্ন মাথাতেই।

উত্তর মাথার চাঁদির ঠিক উপরে?

প্রশ্ন যখন নিজের দেহ ও দেহানুভূতি বিস্মৃত হয়ে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হই তখন চেতনা দেহের বাইরে ঐ উপরে কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু তা করা খুব কঠিন।

উত্তর : দেহকে বিস্মৃত হবার দরকার হয়না। চেতনা ঐখানে স্থায়ী হতে পারলে দেহানুভূতি উপস্থিত হলেও তুমি ওখান থেকে তাকে দেখতে পারো।

প্রশ্ন : আমি কি দেখব যে তা আমার বাইরের জিনিস হচ্ছে?

উত্তর : অন্ততপক্ষে সেই নীরবতর থেকে দেখবে যেন তোমার চেতনার বাহ্য অংশে তা হচ্ছে।

প্রশ্ন : আপাতত নিজে সেই বাহ্য স্তরেই আছি, সেখান থেকেই দেখতে পাই নীরব আভ্যন্তর স্তরকে। কিন্তু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি ঐ শক্তির দিকে নিজেকে খুলে ধরতে। কিন্তু বাধা কোথা থেকে আসে? মন থেকে না দেহের দিক থেকে?

উত্তর মনেরই বাধা। তবে প্রথম ফল পাবার আগে পর্যন্ত বেশ খানিকটা সময় লাগে। সে স্থলে অবিরাম চেষ্টা ক'রে যাওয়া ভিন্ন আর কোনো উপায় নেই।

প্রশ্ন : নিজেকে তফাৎ করতে চেষ্টা করার ফলে স্নায়বিক গোলমাল ঘটে, স্নায়ুপীড়া এসে পড়ে।

উত্তর : ওরূপ চেষ্টায় কোনো লাভ হয়না। অবিরাম শান্ত ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই তা আসবে। জোর করতে গেলেই শির:পীড়া বা অন্য কিছু এসে পড়বে। মন যে সব সময় নীরব শান্ত থাকবে তা নয়, কিন্তু তার একটা অংশ সর্বদাই শান্ত থাকবে. বাইরের চাঞ্চল্য সেখানে ঢুকবেনা।

সোমবার, ১০ মে, ১৯২৬

প্রশ্ন আর পরিবর্তন কিছু হয়নি। মন উত্তরোত্তর যেন আমার নিজের বাইরে আছে, আমি অচঞ্চল হয়ে তার ক্রিয়াকলাপ দেখছি। সে যেন আগেকার মত সব অনুভূতি ও অভ্যস্ত ক্রিয়াকে আঁকড়ে থেকে সুখ পায় ; কিন্তু যদিও সে হঠাৎ কিছু ক'রে বসে, তার দ্বারা আমাকে সে বিচলিত করতে পারেনা।

উত্তর : ওরূপ শান্ত থাকা নির্ভর করে ভিতরের অটল পুরুষের উপর, ওতেই প্রথম উপলব্ধির শুরু।

প্রশ্ন একদিন রাত্রে একটা ঘটনা হলো। মাঝ রাতের আধ ঘণ্টা পরে ঘুম ভেঙে বাহ্য চেতনাতে আসার আগে স্মৃতিতে এক স্বপ্ন দেখলাম। যেন আমি এক চওড়া রাস্তায় মোটর চালাচ্ছি, গাড়িতে রয়েছেন অনেকের মধ্যে শ্রীমা ও X। মা আমাকে জঙ্গলগুলো বাঁচিয়ে পথ দেখাচ্ছেন, সেই জঙ্গলে শত্রু লুকিয়ে আছে গুলি নিয়ে। মা বলছেন, "এখানে ছঁশিয়ার"। "ঐদিক বাঁচিয়ে" ইত্যাদি। আমার হাতের কাছে রিভলবার আছে।...হয়তো ওগুলো বিরোধী শক্তির প্রতীক। হঠাৎ X বললে "ডুবে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে", আমার মনে হলো যে ওরা নিচে আমাকে টানছে। তখন ভগবৎ শক্তিকে ডাকবামাত্র তা সহস্রারের ভিতর দিয়ে দুটি চক্রে প্রবেশ করল, তাতেই শত্রুদের ঠেলে আমি ভেসে উঠলাম। পরে ঘুম ভাঙল। মনে হতে লাগল যে বিরোধী শক্তিরা আমার দেয়াল ভাঙতে আসছে, আমি তাদের হটিয়ে দিচ্ছি। কেন্দ্রে তখন দ্রুত স্পন্দন হচ্ছিল।

উত্তর : গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি হলো গতিশীল বিবর্তনের প্রতীক। ওটা হয়েছে প্রাণের স্তরে।

প্রশ্ন : আমি জেগে ওঠাতে কি সেই ক্রিয়া থেমে গেল?

উত্তর : মোটেই না। না জাগলে এ জিনিসগুলো তোমার স্মরণেই আসত না।

প্রশ্ন : তা ঠিক। (অন্য প্রসঙ্গে) সান্ধ্য বৈঠকের বিজ্ঞান ও গুহ্যবিদ্যা নিয়ে আলোচনা আমার খুব ভালো লাগে। আমার বহুকালের আদর্শই তাই, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকের মিলন। কিন্তু পরে সকল আদর্শ ছেড়ে ঝুঁকলাম যোগের দিকে। পরে হয়তো আবার ঐ নিয়ে কাজ করব।

উত্তর হাঁ, যোগের পক্ষে অন্য সব আদর্শ ও কামনাকে বর্জন করতে হবে। এতে একটা সময় আসবে যখন সত্তার ভিতরকার নূল সত্য, মনের জিনিসের চেয়েও যা গভীর ও ভগবৎ উদ্দেশ্যে যার প্রয়োজন, তা জেগে উঠবে। দৈহিক স্তরেও তখন শক্তি নামবে। মন ও প্রাণের সব কিছু ব্যাপার ছেড়ে গিয়ে কেবল তারই ক্রিয়া তখন চলতে থাকবে। *

---

* BULLETIN OF S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

(Thoughts and Aphorisms)

(মায়ের ব্যাখ্যা সহ)

[মা এরূপ ব্যাখ্যা করা ছেড়েছেন ১৯৬৬ থেকে, কিন্তু পুনরায় তিনি এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিচ্ছেন।]

১২৬—"প্রকৃতির অমোঘ নিয়মধারা বেঁধে দিয়েছেন প্রকৃতির যিনি মালিক, আর সেই অনুযায়ী তার কাজ হয়ে চলেছে : কিন্তু নিয়ম যিনি বেঁধেছেন সেই আত্মা তাকে ছাড়িয়ে যেতেও পারেন, যিনি আছেন আমাদের মধ্যে, কিন্তু প্রকৃতিকে ছাড়াতে হলে আগে আমাদের ভিতরকার কারাগারের দরজা খুলে দিতে হবে, আর শিখতে হবে প্রকৃতির বদলে সেই আত্মারই মধ্যে বেশি সময় অবস্থান করতে।"

মা প্রকৃতির মধ্যে এমন কোনো দুর্নিবার নিয়ম নেই যা কোনোমতে অতিক্রম করা বা বদলানো যায়না যদি সর্বক্ষণ এই বিশ্বাস মনে রাখি যে পরম প্রভুই সব কিছুর মালিক আর তাঁর সঙ্গে আমাদের সরাসরি সংস্পর্শ ঘটতে পারে, যদি শিখে নিতে পারি যে হাজার বছরের অভ্যাসের কারাগার খুলে কেমন ক'রে তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেদের সমর্পণ করা যেতে পারে, তবে সবই হতে পারে।

বস্তুত চিরস্থায়ী বাঁধা নিয়ম কিছু নেই, সবই হচ্ছে নিত্যকার পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে ; আর এই ভাবে উচ্চমুখী রূপান্তর নিয়ে যাবে (ধাপে ধাপে) এই নিশ্চেতন ও নশ্বর সৃষ্টিকে ভগবানের সর্বশক্তিময় ও শাশ্বত চেতনার অভিমুখে। ৩, ৮, ১৯৬৯

১২৭—"নিয়ম হলো বেঁধে দেওয়া ফর্মুলা, কিন্তু আত্মার দ্বারাই সে চালিত আর আত্মাই তাকে অতিক্রমও করতে পারে।"

মা স্থূল দেহপ্রকৃতির পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি অলঙ্ঘনীয়, যখন সেখানে চৈত্যের (আত্মার) কোনো হাত নেই ; কিন্তু ভিতরকার চৈত্যের এমন দিব্যশক্তি আছে যাতে সে ঐ নিয়মকে ইচ্ছামত আপন কাজে লাগাতেও পারে কিংবা বদ্‌লে দিতেও পারে।

৩, ৮, ১৯৬৯

১২৮—"পাশ্চাত্য বলে, প্রকৃতি অনুযায়ী জীবন যাপন করো। কিন্তু সে কোন প্রকৃতি, দেহপ্রকৃতি না দেহোত্তর ? আগে তাই স্থির ক'রে নেওয়া চাই।"

১২৯—"হে অমৃতের পুত্র, ভগবানের পথে চলো, প্রকৃতির পথে নয়, আর তোমার প্রকৃতিকে বাধ্য করো, আপন অন্তর্যামী ভগবানকে মেনে চলতে।"

মা, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন "দেহোত্তর প্রকৃতি" তার অর্থ কি?

মা দেহোত্তর প্রকৃতি মানে দেহের বিলোপ হবার পরেও যা বেঁচে থাকে, অর্থাৎ চৈত্য প্রকৃতি, যা অমর ও ভগবৎ অংশ। এই দিব্য সত্তা তার কেন্দ্রস্থ ভগবান সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারে। ৭, ৮, ১৯৬৯

১৩০—"ভাগ্য হলো ভগবানের কাছে পূর্বজ্ঞাত স্থানকালাতীত জিনিস, যা অতঃপর স্থানকালের মধ্যে সংঘটিত হয়; তিনি যা দেখে রেখেছেন তাই নানা শক্তির সংঘর্ষের দ্বারা তার ক্রিয়াফল ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সংসাধিত হয়।"

মা, সবই যদি আগের থেকে জানা আছে, তবে মানুষের এত চেষ্টা ও আস্পৃহার দাম কি?

মা এখানকার প্রত্যেক রাজ্যের (দেহ প্রাণ ও মনের) সব কিছুই জানা কিন্তু তারও উপরকার রাজ্য থেকে (অধিমানস এবং তারও উপরের) নিচেকার ধার্য ঘটনার উপর এসে চোকে অন্য এক নিয়তি, যা সব কিছুকে বদলাতে পারে। আস্পৃহাই তাকে ডেকে আনতে পারে। আর মানুষের চেষ্টা, তাও সেই নিয়তির অন্তর্ভুক্ত, নানারূপ শক্তি সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে তার কি কাজ হবে তাও পূর্বদৃষ্ট। ৯, ৮, ১৯৬৯

১৩১—"ভগবানের ইচ্ছাতেই সব কিছু আর সব কিছুই তাঁর পূর্বজ্ঞানিত, তথাপি তুমি কিন্তু নিষ্ক্রিয় হয়ে কেবল তাঁর মুখ চেয়ে বসে থাকবে না, কারণ তোমার তরফের কাজ-গুলিও তাঁরই শক্তি বিকাশের প্রধান যন্ত্রস্বরূপ। অতএব সক্রিয় হয়ে কাজে লেগে থাকো, কিন্তু অহংবোধ নিয়ে নয়, কেবল তাঁর যন্ত্রস্বরূপ হয়ে এবং তিনি যা ঘটাতে চান তারই নৈমিত্তিক মাত্র হয়ে।"

১৩২—"যখন কিছু জানতাম না তখন ঘৃণা করতাম অপরাধীকে, পাপীকে, অশুচিকে, কারণ নিজের মধ্যেও ছিল অপরাধ, পাপ ও অশুচি; কিন্তু যখন শুদ্ধি এসে চোখ খুলে গেল, তখন চোর খুনী ও পতিতার পায়ে মাথা নোয়ালাম অন্তরে; কারণ দেখলাম যে ওদের আত্মা জগৎ মহাসাগরের মন্থিত যত কিছু বিষকে অধিকাংশই তারা আমাদের হয়ে নিজেদের ঘাড় পেতে গ্রহণ করেছে।"

মা: গোটা জগৎটা যে ভগবানের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়, এ কথা যিনি সম্যক উপলব্ধি করেছেন তাঁর কাছে মানবীয় নৈতিক বিচার সমস্তই ঘুচে যায়, তার স্থানে এমন এক ব্যাপক দৃষ্টি আসে যাতে সকল কিছুরই মূল্য একেবারে উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। ১৪, ৮, ১৯৬৯

১৩৩—"দেবতাদের চেয়ে অসুরেরা বেশি বলবান, কারণ তারা ভগবানের ক্রোধ ও বৈরিতা অংশের সমস্ত গুরুভার নিয়ে মোকাবিলা করতে সম্মত হয়েছিল ; আর দেবতারা কেবল তাঁর প্রেম ও করুণার দিকটাই গ্রহণ করতে পেরেছিল।"

১৩৪—"যখন তুমি দেখতে পাবে যে পরে সুখ পাবার জন্য আগে দুঃখ পাওয়া কতখানি দরকার, সার্থকতা পেতে ব্যর্থতা আসার, তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পিছনে বাধা থাকার কি জন্য দরকার, তখন তুমি কিছু কিছু বুঝতে শুরু করবে, যতই অস্পষ্ট আভাসে হোক, যে ভগবানের পদ্ধতি কেমনতরো।"

১৩৫—"রোগ মাত্রই নিয়ে যায় নতুন স্বাস্থ্যলাভের আনন্দের দিকে, ক্ষতি ও দুঃখ ও ব্যথার ধারাই প্রকৃতি গভীর আনন্দের ও মঙ্গলের সুর বেঁধে দেয়, আর মৃত্যুই নিয়ে যায় উদার অমরত্বের দিকে। কেন ও কেমন ক'রে এমন হয়, সেটি হলো ভগবানের এক গুপ্ত রহস্য, যাকে ভেদ করতে পারে কেবল অহংমুক্ত আত্মা।"

১৩৬—"তোমার মন ও দেহ এত ব্যাকুলতর কেন? এর কারণ তোমার ভিতরকার আত্মা যিনি পর্দার অন্তরালে থাকেন তিনি তাই চান, ওতেই তিনি খুশি হন ; কিন্তু তোমার নিজের যদি তেমন ইচ্ছা থাকে আর অটুট অধ্যবসায়ের সঙ্গে সেই ইচ্ছাকে লালন করো—তাহলে তোমার নিম্ন সত্তাকেও আত্মার অমিশ্র আনন্দে নিষিক্ত করতে পারো।"

মা এটি পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারো অধ্যবসায় সহকারে আপন প্রচেষ্টার দ্বারা, তখন দেখবে যে এখানে যা বলা হয়েছে তা পুরোপুরি সত্য। ১৯, ৮, ১৯৬৯

১৩৭—"এমন কোনো নির্ধার্য নিয়ম নেই যে অমুক অমুক রকমের সংস্পর্শ থেকে ব্যথা পাবে কিংবা সুখ পাবে ; বাইরের থেকে তোমার যন্ত্রগুলির উপর ব্রহ্মশক্তির চাপকে তোমার আত্মা যে ভাবে নেবে তেমনই তার প্রতিক্রিয়া হবে।"

মা অর্থাৎ একই ঘটনা বা একই রকম সংস্পর্শ কারো পক্ষে সুখের ও কারো পক্ষে দুঃখের হয়, তারই আপন আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুযায়ী।

এর থেকে তুমি আরো বৃহত্তর উপলব্ধির দিকে যেতে পারো ; কারণ যখন কেবল মনে বোঝাই নয়, কিন্তু অন্তরে মালুম করবে যে পরমপ্রভুই তাবৎ সকল কিছুর একমাত্র হর্তাকর্তা আর যখন সকল বিষয়ে তাঁরই নিত্য সংস্পর্শ পাবে, যখন দেখবে যে সকল কিছু তাঁরই কৃপাতে হচ্ছে, আর তখন সকল জিনিসেই পাবে নীরব আনন্দ ও আলো।

১৩৮—"তোমার আত্মার তেজ যখন অন্যের আত্মার তেজের সম্মুখীন হয় তখন মনের ও দেহের অনুভবের দানে তার পরিমাপের সমুচিত সামঞ্জস্য করে নিতে পারোনা, তাই সেখানে পাও ব্যথা বা আঘাত বা অস্বস্তি। যদি জগৎশক্তির সকল প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তার সঙ্গে নিজের শক্তির একটা আপস ক'রে নিতে শেখো, তাহলে দেখবে যে ব্যথাও সুখের

বা আনন্দের হয়ে আসছে। সম্পর্ক সঠিক রাখতে পারাই হলো প্রকৃত আনন্দের অবস্থা, আনন্দের মূল হলো ঋতম্।"

মা মানুষ পরস্পরের সংস্পর্শে আসে দৈহিক প্রাণিক বা মানসিক সংঘর্ষের ভিত্তিতে, তাতেই আসে বেসুর ও ব্যথাবেদনা। কিন্তু যদি আত্মার সঙ্গে আত্মার সংস্পর্শের ভিত্তি সেখানে থাকে তাহলে দেখা যাবে যে সংঘর্ষেরও পিছনে আছে একটা স্থায়ী সঙ্গতি যা সকল কাজেই বজায় থেকে অসঙ্গতির বদলে আনবে শান্তি ও আনন্দ।

২৮. ৮. ১৯৬৯

১৩৯—"অতিমানব কে হতে পারে? যে এই বস্তুমুখী ও ভাঙা-চোরা মনওয়ালা মানবীয়তার উপরে উঠে নিজেকে বিশ্বগত ক'রে নিয়ে দিব্যশক্তিসমৃদ্ধ দিব্যত্বে পৌঁছে দিব্য প্রেম ও আনন্দ ও প্রজ্ঞার অধিকারী হতে পারে।"

মা অতিমানব এখন গড়ে ওঠার পথে, সম্প্রতি এক নবচেতনা পৃথিবীতে অভিব্যক্ত হয়েছে সেই গঠন সম্পূর্ণ ক'রে তোলার জন্য। কিন্তু এখনও কেউ তা হয়েছে এমন বলা যায়না, কারণ তাতে দেহেরও রূপান্তর চাই, যা এখনও হয়নি। ৩০. ৮. ১৯৬৯

১৪০—"নিজের সংকীর্ণ মানব-অহংকে বজায় রেখে যদি তুমি ভাবো যে আমি অতিমানব বনে গেছি, তাহলে কেবল আত্মগর্বে নির্বোধ হয়ে নিজেরই শক্তির ক্রীড়নকরূপে নিজেরই মোহের একটা যন্ত্র হয়ে থাকবে।"

মা অর্থাৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা হতে যারা নিজেকে অতিমানব বলতে যায় তারা প্রবঞ্চক বা গর্বান্ধ হয়ে নিজেকেও ঠকায় আর অন্যকেও ঠকায়। ৩০. ৮. ১৯৬৯

১৪১—"নীটসে বলেছেন যে অতিমানব হবে উটের ভিতর থেকে সিংহ আসার মতো, কিন্তু অতিমানবের প্রকৃত নিদর্শন হবে কামধেনুর উপর যে উট রয়েছে তাতেই আরূঢ় সিংহের মতো। সমগ্র মানবের দাস হতে যদি তুমি না পারো তাহলে তুমি তাদের উপরওয়ালা হবারও উপযুক্ত হতে পারলে না; বশিষ্ঠের কামধেনুর মতো সকলকেই তাদের ইচ্ছামত দোহন করতে দেবার মতো প্রকৃতি যদি তোমার না হয়, তবে কেবল সিংহের মতো অতিমানব হয়ে কি লাভ আছে?"

মা: সকল মানবের দাস হওয়া মানে তাদের সেবক হতে প্রস্তুত থাকা; আর কামধেনু হওয়ার মানে মানুষকে অজ্ঞতা ও অক্ষমতা হতে মুক্তি দেবার জন্য যে শক্তি ও আলোর দরকার তা মুক্তহস্তে বিতরণ করতে পারা। এমন যদি না হয় তাহলে তেমন অতিমানব পৃথিবীর উপকারী না হয়ে গুরুভার বোঝা-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

১৪২—"অকুতোভয় মহিমাতে জগতের কাছে হও সিংহের মতো, ধৈর্যে ও সেবাতে হও উটের মতো, শান্ত সহনীয়তাতে ও উদার দাক্ষিণ্যে হও পয়স্বিনী ধেনুর মতো। ভগবানের সবরকম আনন্দের আস্বাদ পেতে বদ্ধপরিকর হও যেমন সিংহ হয়ে থাকে তার শিকারের জন্য,—কিন্তু সেই পরমানন্দের আনন্ত্যের মধ্যেও যেন তোমার মানবোচিত গুণগুলি ঠিক থাকে, তবেই ওর মাধুর্য উপভোগ করবে।"

মা সত্তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির শেষ পর্যন্ত দিব্যত্ব লাভের জন্য সেই সব গুণ থাকা খুবই দরকার; এতে আরো স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে মানবীয় গুণের আরো উন্নয়ন ব্যতীত রূপান্তর সম্পূর্ণ হবেনা। * ১, ৯, ১৯৬৯

—শ্রীমা

---

* অনুবাদক : পশুপতি ভট্টাচার্য

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩

প্রশ্ন : মায়ের "কথাবার্তা" থেকে—"সকল ধর্ম সম্বন্ধে একই কাহিনী। জগতে কোনো মহৎ গুরুর আবির্ভাব থেকেই এক একটি ধর্ম জন্মেছে। তিনি আসেন কোনো ভগবৎ সত্যের বার্তাবহ হয়ে এবং সেই সত্যটিকে তিনি প্রচার করেন। কিন্তু লোকে তাকে স্থূলভাবে আঁকড়ে ধরে তাই নিয়ে কারবার শুরু ক'রে দেয়, তাকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মতো দাঁড় করায়। সেই ধর্মের মধ্যে নির্দিষ্ট রকমের আইন কানুন ও শাসনরীতি, একটা দলীয় ভাব ও গোঁড়ামি, আচার-অনুষ্ঠানাদির প্রবর্তন করে, আর দলভুক্তদের তা পালন ক'রে চলতে হয়। ধর্মনিষ্ঠ অনুগতদের তারা পুরস্কৃত করে, অনাচারীদের শাস্তিবিধান করে। এই সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রথম কথাই হলো "আমাদের ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ, এর কথাগুলিই খাঁটি সত্য, বাকী অন্যান্য সবই নিকৃষ্ট ও ভ্রান্ত।"...ধর্মপালকের পক্ষে এই জিনিসটাই স্বাভাবিক, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে তা বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মের ভিতরকার যে সব রীতিনীতি ও গোঁড়ামি আছে সবই মনের গড়া জিনিস, তাকেই যদি জীবনের লক্ষ্য বলে আঁকড়ে থাকো তাহলে সকল নীতির বাইরে যে উদার ও বৃহৎ ও মুক্ত আত্মার মূল সত্য আছে তাকে তুমি জানতেই পারবেনা। যদি কোনো ধর্মের অনুজ্ঞার সঙ্গে নিজেকে শৃঙ্খলিত ক'রে তাকেই জগতের একমাত্র সত্য বলে জ্ঞান করো, তাতে তোমার আত্মার প্রগতি ব্যাহত হবে।"

কেউ যদি তার ধর্মকে শ্রদ্ধায় অনুসরণ করে এবং সকল সদ্‌গুণের অধিকারী হয়, তাহলে কি সে উন্নতির পথে চলে ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবেনা ?

উত্তর : তা হওয়া অসম্ভব। কারণ ধর্মানুষ্ঠান মাত্রই আত্মাকে সীমিত করে।

কারো যদি জীবন পরিস্থিতির মধ্যে মনের গঠনের বাইরে স্বতন্ত্র প্রকারের একটা আধ্যাত্মিক জীবন থাকে তাহলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ভিতর দিয়েও সেই জীবনকে অনুসরণ ক'রে সে উপরে উঠে যেতে পারে। কিন্তু তার ভিতরের দিক থেকে তেমন গভীর আত্ম-নিবেদন থাকা চাই, বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে নয়। আর শুধু সেগুলি নিয়ে থাকলে জীবন এমন সীমান্বিত হবে যে আর কোনো অগ্রগতিই হবেনা।

অনেক মানুষ আছে যাদের অগ্রগতির জন্য ধর্মের গণ্ডী হতে বেরিয়ে আসার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যাদের মধ্যে মনের দিক থেকে কোন চাঞ্চল্য নেই, যারা অবথা শুধু প্রশ্ন করতে চায়না, হৃদয়ে শুধু গভীর ভক্তি নিয়ে কোনো বৃহতের কাছে আত্মনিবেদন করে, তাদের

বেলাতে কোনো ধর্মানুগতা থাক বা নাই থাক তাতে কিছু যায় আসেনা। তাদের পক্ষে দুই-ই সমান। কিন্তু যদি কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদি নিয়েই লেগে থাকো তাহলে ওর চেয়ে আর এগোবেনা। মন যদি বন্ধনমুক্ত হয়ে আলোর দিকে এগিয়ে না যায় তাহলে অধিক অগ্রসর হওয়া খুবই কঠিন, কারণ ওটা অপরিহার্য (পুরোপুরি না হলেও)। আবার এমন লোক আছে যাদের মনের দিকে জোর নেই, যা সত্য ধরিয়ে দেবে তাই বিনা তর্কে গ্রহণ করবে, কেবল এই কথা নিশ্চিত জেনে যে ভিতরে আকুতি ও আগ্রহ থাকলে ভগবৎ সান্নিধ্য কোনো কিছুতেই ঠেকাতে পারবেনা। তবে সেখানে তাদের মানসিক জীবন বলে কিছু থাকেনা, যা থাকে তা অল্প ও সীমাবদ্ধ।

প্রশ্ন আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে জাতিভেদের কোনো দাম আছে?

উত্তর : জাতি? আধ্যাত্মিক জীবনে তার কি সম্পর্ক? ও তো একটা সামাজিক জিনিস।

প্রশ্ন : শোনা যায় যে ভগবৎ সেবাতে ব্রাহ্মণরাই সকলের চেয়ে প্রধান।

উত্তর অমন অনেক রকমই শোনা যায়। আধ্যাত্মিক জীবন প্রকৃতপক্ষে ঐ সবের উপর আদৌ নির্ভর করেনা। কতকগুলি সামাজিক নীতি ওর উপরে আরোপ করা হয়, তার মানে বিশেষ পরিবেশের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের একটা ঐতিহ্য বজায় রাখা যা অন্যদের অপেক্ষা বিশিষ্ট ও উন্নত। তফাৎ কেবল এই মাত্র।

কিন্তু যেখানে রক্তের মিশ্রণ নিয়ে প্রশ্ন সেখানে অন্যরূপ তর্কের অবকাশ আছে। যেমন মনে করো কুকুরদের বেলাতে (কাউকে অসম্মান করার উদ্দেশ্যে এ তুলনা করছি না), যদি কোনো বিশেষ এক জাতের কুকুরের বংশধারা অমিশ্র ও খাঁটি রাখতে অতিরিক্ত সতর্কতা আনো, সেটা বোকামি করা হয় অপরপক্ষে যে সব রাস্তার কুকুর মিশ্রিত জাতের হয়, কতই রকমের মিশ্রণের ফলে দেখতে কদাকার হয়তো হয়ে থাকে, তারা কিন্তু বুদ্ধিতে খুব প্রখর হয়। সুতরাং জাতিতে খাঁটি বা মিশ্রিত, সেদিক দিয়ে কিছু বলা যায়না। ছোটো ছোটো বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে যেখানে জাতিবৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে কোনো মিশ্রণ ঘটতে দেওয়া হয়না, সেখানে প্রায়ই দেখা যায় যে বুদ্ধির ধার ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। ওতে জাতির গুণগুলি তেমন বিশিষ্ট থাকেনা বরং তার উল্টো হয়। নতুন মানুষদের মধ্যে নতুন রকম উন্নতি আনবার জন্য মিশ্রণ দরকার।...সামাজিক ব্যবস্থার পক্ষেও সেটা সহজ ও সুবিধাজনক ; সামাজিক সমস্যা তাতে অনেকটা সহজ হয়ে আসে ; তার একটা মূল্য আছে।

আর আমার মনে হয় যে দেশ সম্বন্ধে যে কথা জাতি সম্বন্ধেও তাই। প্রত্যেকেই ভাবে যে আমার জাতটাই সব চেয়ে উন্নত। এমন কি যারা জাতিচ্যুত তারাও ভাবে যে আমরা উপরে আছি—অন্যান্য নিম্ন জাতিদের তারা হেয় মনে করে।

প্রশ্ন মায়ের "কথাবার্তা" থেকে—"যে ব্যক্তি কোনো ধর্মে বিশ্বাসী থেকে তার সাধনাতে সত্যের কিছু সন্ধান পেয়েছে, সে মনে করে যে পুরো সত্যটাই সে জেনে ফেলেছে। মানব প্রকৃতি এই রকমই। নিজের পায়ের জোরে দাঁড়িয়ে নিজের পথে চলতে গেলে সেখানে কিছু মিথ্যার নিষ্ক্রমণ দরকার। হঠাৎ খাঁটি সত্যের সাক্ষাৎ পেলে তার ভারে তারা পিষ্ট হয়ে যাবে।"

বা, মানুষ কি ক্রমে ক্রমে ভগবানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে?

উত্তর সে কথা বলা কঠিন। ন্যায্য হিসাবে বলতে গেলে সমগ্র সৃষ্টিটাই ক্রমশ ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবে, কারণ সৃষ্টির লক্ষ্যই তাই। কিন্তু এ চলার গতি বড় বিচিত্র, কেউ তিন পা এগোলেই তাকে দুই পা পিছোতে হয়, দুই পা গোজা এগোলে এক পা বাঁকা দিকে চলে যায়; এরই জন্য লক্ষ্যে পৌঁছতে অনেক বিলম্ব হচ্ছে দেখা যায়।

একটা সাধারণ সূত্র বা থিওরি যা সানথ্রিক ভাবে চলেছে হাজার হাজার বছর ধরে (বছর নয়, হাজার হাজার শতাব্দী ধরে), তার সঙ্গে বাস্তব জগতে বাস্তবিক যেমন ঘটে চলেছে তার বিস্তর তফাৎ। সাধারণভাবে বলতে পারি যে সৃষ্টি এগিয়ে চলেছে তার স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হতে, কিন্তু বাস্তবে দেখি এই যে প্রথমত সমগ্র বিবর্তন-ক্রিয়াটি চলেছে পাঁচের মতো পাক দিয়ে ঘুরে ঘুরে ওঠার মতো। সেই সব পাঁচের মধ্যে আছে অসংখ্য ছেদ, তার প্রত্যেকটি পার হয়ে তবে ঊর্ধ্বমুখে একটুখানি উত্তরণ। কিন্তু তোমাকে সেই পাঁচের সবটা পাক ঘুরে আবার ছেদে আসতে হবে কিন্তু এবার আগেকার চেয়ে একটু উপরের স্তরে...কিন্তু যতক্ষণে তুমি অন্যান্য ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে অন্য ছেদে পৌঁছেচ ততক্ষণে আগেকার ছেদগুলির কথা ভুলে গেছ। মানুষের ইতিহাস এইভাবে এগিয়ে চলেছে।

এখন তোমরা পেয়েছ আশ্চর্য এক সভ্যতা, বিজ্ঞানের ও চারুকলার ও রাজনীতির ও সমাজনীতির দিক দিয়ে কতই কিছু গড়ে উঠেছে। কিন্তু এমনি আরো কত সূক্ষ্মতর ও মার্জিত রকমের সভ্যতা অতীতে ছিল যার গুপ্ত স্মৃতি রয়ে গেছে কোনো মহাদেশে যেখানে হয়তো ভারতের সঙ্গে আফ্রিকা একজোটে ছিল, তার কোনো চিহ্নমাত্র এখন নেই (যদিও কোনো কোনো মানব জাতির ঐতিহ্যে তার কিছু প্রাচীন রেশ থাকতে পারে)। এমনি কত সভ্যতাই লুপ্ত হয়ে যায় তার ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে...তারপরে আবার আসে অন্ধকার, অচেতনা, অজ্ঞানতা, আবার সেই আদিম মানবের আচরণাদি দেখে মনে হয় যে পশুদের সঙ্গে মানুষের বিশেষ কিছু তফাৎ নেই। সেই অন্ধকারের মধ্যে থাকে এমন এক গহ্বরের ছেদ যার ফলে মানুষ এগিয়ে চলে নানা বিশৃঙ্খলা ও বিকারের ভিতর দিয়ে। তারপরে হঠাৎ উপরে উঠে দেখা দেয় আরো উচ্চতর বিবর্তন, উচ্চতর বিকাশ, উচ্চতর উপলব্ধি।... সেই রাত্রির অন্ধকারের তলে তলে যেন এমন কোনো আলোর ক্রিয়া ঘটে গেছে যাতে জড়ের মধ্যে ফুটে ওঠে আরো উচ্চতর উপলব্ধি। কিন্তু তার পরে আবারও অন্ধকার, আবারও বিলুপ্তি। পৃথিবী হয়ে ওঠে আবার তেমনি ক্রূর যন্ত্র, বেদনাপূর্ণ। কয়েক হাজার বছর কেটে গেলে আবার আসে নূতনতর সভ্যতা।...

অতএব নিচের দিক থেকে দেখে তুমি এখন ভাবছ "কোথায় উন্নতি?" সবই তো মুছে গেছে, ঘুচে গেছে, লুপ্ত বিস্মৃত হয়ে গেছে। মানুষ আবার অতি সাধারণ অবস্থাতে আধা অন্ধকারের মধ্যে ওঁতোওঁতি করছে। তবু হঠাৎ এর পর আসবে আলো। তখন তুমি বলবে, এই তো আলো পেয়েছি, অতঃপর আর পতন নেই।

উপস্থিত তো দেখছি কেবল পতনই ঘটছে। এর পর দেখা যাক কি হয়।

প্রশ্ন এরপর আবার তাহলে পতন ফিরে আসবে?

উত্তর না গো ছেলে, তা তো বললাম না। আমি বললাম "এরপর দেখা যাক কি হয়।" বস্তুত আমার এই বিশ্বাস যে সবই নির্ভর করে আমাদের নিজেদের প্রত্যেকের উপর এবং প্রত্যেকের আস্পৃহার উপর। যা কিছু করা দরকার তা প্রত্যেকেই যদি তার যথাসাধ্য করে তাহলে এমন এক স্থায়ী উচ্চাবস্থায় পৌঁছান যাবে যাতে পুনরায় ধ্বংসের দ্বারা নতুন জিনিস আনার দরকার হবেনা, বরং আরো ঊর্ধ্বগতি হতে থাকবে। 'ওরূপ উত্থানপতন যে ঠিক অপরিহার্য তা নয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই রকম হয়ে এসেছে, আর প্রকৃতি যে তাতে আনন্দ পাচ্ছে কিনা সে কথা জানিনা।

এখন পর্যন্ত প্রকৃতি যা করছে তার উপর নির্ভর করতেই আমরা বাধ্য, কারণ এখন পর্যন্ত প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব চলেছে। তবে আমরা তার কাজগুলো পছন্দ করছি না। তাই ভিতরে বাধছে দ্বন্দ্ব (যেমন সংসার হয়), কিন্তু তাতে ব্যাপারটা আরো জটিল হচ্ছে, কারণ প্রকৃতি তার কাজে বাধা পেতে চায়না। অথচ প্রকৃতির ইচ্ছানুযায়ী চললে সেই একই জিনিস হতে থাকবে, একবার ক'রে মুছে ফেলা আবার নতুন করে শুরু করা, এইই তার লীলা। সুতরাং যদি তার ধ্বংসের কাজটা থামিয়ে দেওয়া যায় আর এমন কিছু রাস্তা নেওয়া যায় যাতে তাকে উপরে ওঠানোর দিকেই উন্মুখ ক'রে তোলা যায়, তাহলে সে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতাই করবে, আর তাতে সাফল্য আনা সম্ভব ও সহজ হবে।

অতএব প্রকৃতিকে এটা বোঝানো দরকার যে ও রাস্তার বদলে অন্য রাস্তাতেও কাজ হতে পারে।

প্রকৃতির যে কতখানি আশ্চর্য দক্ষতা ও অভাবনীয় কল্পনা নৈপুণ্য আছে সে তো আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই...নানারকমে পশুদের লক্ষ্য করলে এবং তাদের ফটো নিলেও তা দেখা যায়। ক্ষুদ্র একটা ইঁদুরের সঙ্গে লম্বা একটা জিরাফের, বা হাতীর সঙ্গে বিড়ালের তুলনা ক'রে দেখ, তাদের আকৃতিতে কতখানি বৈচিত্র্য—তাতেই বুঝবে প্রকৃতির কল্পনার কি কারিগরি! পৃথিবীতে যত রকমের প্রাণী আছে, তোমাকে যদি তাদের সৃষ্টি করতে বলা হতো তাহলে তুমি নহা মুশকিলে পড়তে। এখন তার ব্যবস্থা দেখে তোমার মনে হচ্ছে যে তা কতই সহজ। সেদিন একটা ছবি দেখলাম, একটা জিরাফ তার লম্বা গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে গাছের সর্বোচ্চ ডাল থেকে ফল পেড়ে খাচ্ছে। আমি বললাম, "কতখানি কল্পনা থাকলে তবে একটা প্রাণীকে এমন লম্বগ্রীব করা যায় যাতে সে কত উঁচু থেকে ফল

পেড়ে খেতে পারে। এমনি সবই খুব আশ্চর্যের কথা। আমরা বরাবর দেখেছি বলেই আমাদের চোখে খুব স্বাভাবিক ঠেকছে, কিন্তু এর জন্য অপরিসীম প্রতিভার দরকার— সুতরাং এমন যার প্রতিভা ও আপন কল্পনাকে সফল করার শক্তি, সে নিশ্চয় চাইবে না যে অন্য কেউ তার কাজে হস্তক্ষেপ করে! সে বলবে, আমি যা করি তা কি তুমি পারো হে?

অতএব তাকে বোঝাতে হবে যে তুমি আর তা চাইছ না, তুমি চাইছ যে এর চেয়ে আরো কিছু ভালো জিনিস হোক, এবং তাই তুমি নিজে ক'রে দেখিয়ে দেবে। নতুবা শুধুই যদি আস্পৃহা করো তাহলে সে হেসে বলবে, "আচ্ছা দেখা তো যাক কতখানি তোমার মুরদ।"

কিন্তু যদি নিজে ক'রে দেখাতে পারো তো সে বলবে "তাই তো"। এই একমাত্র উপায়।

৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩

প্রশ্ন মায়ের "কথাবার্তা" থেকে—"ভগবানের সত্য ও তাঁর দিব্যশক্তি যতবারই পৃথিবীতে নেবে আসে বিশেষ অভিব্যক্তির জন্য, ততবারই পৃথিবীর আবহাওয়াতে কিছু পরিবর্তন ঘটে। তখন যারা যথেষ্ট গ্রহিষ্ণু থাকে তাদের মধ্যে ওতে নতুন কিছু প্রেরণা জাগে, বিশেষ কিছু স্পর্শ তারা পায়, কিছু নবদৃষ্টি লাভ করে। সে জিনিস যদি তারা ঠিক ভাবে ধারণ ক'রে নিয়ে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়, তখন তারা প্রচার ক'রে বলে 'এক মহাশক্তি এখানে অবতরণ করেছে তার স্পর্শ আমি পাচ্ছি, যতটা আমি জেনেছি তাই তোমাদের বুঝিয়ে বলতে চাই। কিন্তু যাদের মন সংকীর্ণ হয়ে আছে তারা সেটা পারেনা, আলোর কিছু স্পর্শ পেয়েই চেঁচিয়ে বলে বেড়ায় 'দিব্য সত্যকে আমি জেনে গেছি, তাকে পুরোপুরি দখল ক'রে নিয়েছি'।...এক দিব্য চেতনা এখন এসেছে এবং সকলের মধ্যে তা কাজ করছে, এর দ্বারা তা অভিব্যক্ত হতে চাইছে। তার শক্তি এখনকার দিনে এমন প্রবল ভাবে কাজ করছে যা ইতিপূর্বে কখনো করেনি। কেউ কেউ কোনো না কোনোভাবে তার অল্পবিস্তর স্পর্শও পাচ্ছে; কিন্তু অনেকে তাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে আপন স্বার্থের কাজে লাগাচ্ছে। আবার কেউ কেউ অত চাপ সহ্য করতে না পেরে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটাচ্ছে। তবে এমনও কেউ কেউ আছে যারা তাকে ঠিকভাবে গ্রহণ ক'রে সহ্য ক'রে নিতে পারে, তারাই হবে সেই নবজ্ঞানের উপযুক্ত আধার বা যন্ত্র ও প্রতিনিধিস্বরূপ।"

সেই দিব্যশক্তি কেমনভাবে বেছে নেবে তার অভিব্যক্তির উপযুক্ত পাত্র বা যন্ত্রকে?

উত্তর নেবে একটা স্বাভাবিক আসক্তির টানে। দিব্যের রাজ্যে কোনো চেতনার কেমন প্রকৃতি ও গুণ তা স্পষ্ট দেখা ও চেনা যায়। সেখানে বিশেষ এক রকমের স্পন্দন ও আলো থাকে যা সুস্পষ্ট। তাই যেখানে তেমন অনুকূল আসক্তির মিল আছে (ব্যক্তি বিশেষের পরিণতি বা কোথাও একাত্মতা অনুযায়ী), সেখানে দিব্যশক্তি আপনি গিয়ে হাজির.

হয়। যারা এখনও প্রস্তুতির পথে কিন্তু চৈত্যসত্তা কতকটা প্রস্ফুটিত তাদের দিকেও ওর লক্ষ্য যায়, তাদের স্পন্দনগুলিকে দেখা হতে থাকে, সত্তার অবস্থা অনুযায়ী তাদের মধ্যে অভিব্যক্তির সম্ভাবনা নিরূপিত হয়, অর্থাৎ কোন সূত্রে কি ভাবে কতটা অভিব্যক্তি হতে পারবে ও তা কিরূপ ধরনের হবে, এ সমস্তই সেই আভ্যন্তর দৃষ্টির অন্তর্গত।

প্রশ্ন : প্রাণসত্তা ও মনঃসত্তা এই দুইএর মধ্যে কোনটি শীঘ্র অগ্রসর হতে পারে?

উত্তর তা নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের উপর। প্রাণশক্তি যার বেশি সতেজ তার বেলা সেটাই অগ্রগামী, মনঃসত্তা যার বেশি সতেজ তার বেলা সেটাই। একই ব্যক্তির পক্ষে কেমন হবে? তার মধ্যেও যেটি বেশি সক্রিয় ও সতেজ তদনুযায়ী কাজ হবে। তা কেমনভাবে? প্রত্যেকের বেলাতেই এর কমবেশি যোগাযোগ স্বতন্ত্র, সুতরাং কার বেলা কেমন হবে তা হিসেব ক'রে বলা যায় না। শুধু এই বলা যায় যে এক ধাতের লোকের বেলাতে একরূপ, অন্য ধাতের লোকের বেলাতে অন্যরূপ।

কিন্তু আমার মনে হয় যে দুই সত্তাতে যদি মিল থাকে, একটি যদি টানে এক দিকে তখন অন্যটি টানে অপর দিকে, সেখানে বিশেষ কাজ হয় না, ব্যাপারটা কঠিন হয়ে ওঠে। তাই বরং মনকে আগে ঐদিকে আনিয়ে বশ করা ভালো, কারণ মনই অন্য সব অংশকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

(যা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে শ্রোতাদের দিকে চাইলেন) তোমাদের মধ্যে কে একজন এইমাত্র মন থেকে বার্তা পাঠিয়েছে...যেন নীল কাগজে কিছু লেখা। সেটি ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল একজনের মাথায়। কেউ তেমন কিছু বার্তা পেয়েছ কি?... কেউ না?...তোমাদের মধ্যে কে সে তা আমি দেখিনি, কিন্তু সেই বার্তা ঘুরতে ঘুরতে এসে একজনের মাথায় পড়ল। নীল কাগজে আশ্চর্য কিছু লেখা ছিল। কেউ তা পাওনি? কারো মাথাতে হঠাৎ কোনো ভাব এসে ঢোকেনি? কেউ না?

(সকলেই নীরব রইল)

প্রশ্ন : আর মনের তরফে খুব আগ্রহ থাকলেও প্রাণ যদি তাতে রাজী না হয়?

উত্তর : তাহলে সারা জীবনই নিজের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে। প্রাণ টানছে যেদিকে, মন কোনোমতেই তার সে টানকে খামাতে পারছে না। চতুর্দিক থেকে ভিতরে একটা টানাটানি চলতে থাকবে। যা করা উচিত জেনেও তা করতে পারবে না। যা করা উচিত নয়, জেনেও তাই করবে। আবার অন্যায় করলে তাই ভেবে অনুতাপ করতে থাকবে। তাতে দুই দিক থেকেই অসুখী হবে : প্রথমত অন্যায় করেছ বলে, দ্বিতীয়ত অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছ বলে। খুবই কষ্টদায়ক অবস্থা...

প্রশ্ন প্রাণসত্তাকে কি বশে আনা যায়না ?

উত্তর প্রাণসত্তাকে বশে আনা ? নিশ্চয়ই যায়। কঠিন হলেও তা সাধ্য। তা না করতে পারলে আশার কিছু থাকে না। তবে ওতে কেবল মনের দ্বারাই যথেষ্ট কাজ হয় না। এমন অনেককে জানি যারা স্পষ্টই সব কিছু জানে, স্পষ্টই মন থেকে বোঝে এবং সুন্দর ভাবে তোমাকে বুঝিয়েও দিতে পারে, সকলকে শিক্ষাও দিতে পারে, কিন্তু ওদিকে তাদের নিজেদের প্রাণসত্তা ও-কথা আদৌ না মেনে কাজ করতে থাকে আপন খেয়ালে। সে বলে, "তুমি বুঝে যাই কেন বলো, আমি কিন্তু চলব আমার আপন পথে।"

কেবল চৈত্যের স্পর্শ যদি সেখানে এসে যায় তাহলে সবই পাল্টে যায়, এমন কি মহা পাপিষ্ঠও এক মুহূর্তে ভালো হয়ে যায়। এমনই "আলোকপ্রাপ্তি" অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যেখানে সেই মুহূর্ত থেকেই সমস্ত ওলটপালট হয়ে গেছে। তখন সব কিছুই ঠিক রাস্তায় চলে। কিছু শোধন হয়তো বাকী থাকে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসেনা।

মন হলো এক মহা প্রচারকারক, তার প্রকৃতিই তাই। সে নানা বাণী দেবে, ভালো উপদেশ দেবে, অনুশাসন দেবে, যেমন গির্জাতে হয়ে থাকে। এদিকে প্রাণসত্তা তাতে অধৈর্য হয়ে ধমক দিয়ে বলে : "তুমি একটা অপদার্থ। নিজের দিকের কথাই বলে বাহাদুরি করা হচ্ছে, এদিকে আবার ওতে কিছু লাভ হচ্ছে না।" কিংবা মনের যদি একটু জোর থাকে আর প্রাণসত্তা একটু উঁচুদরের হয় তো সে বলবে "কথা তো বেশ ভালোই বললে, কিন্তু কাজে আমি যে তা পারিনা ! তুমি যা বলছ তা আমার ক্ষমতার বাইরে।"

আর এই প্রাণসত্তা হলো এক অদ্ভুত জীব। অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ, উত্তেজনাপূর্ণ, কামনাপূর্ণ, আর উৎসাহপূর্ণ ; যদি এমন কাউকে দেখে যে অনুপম সুন্দর ও বরেণ্য এবং নিজের চেয়ে তাকে খুব মহৎ ও বৃহৎ বলে বোধ হয়, তাহলে সেখানে সে চমৎকৃত হয়ে তার গোলাম হয়ে ওঠে। আর তেমন সুন্দর কিছু যদি আপন সত্তার মধ্যে জেগে ওঠে, এমন কিছু যা প্রায় অমূল্য, তাহলে সে এমন গভীর উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাকে লালন করবে যা মন বা দেহসত্তার পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো কাজে ওর মধ্যে উৎসাহ ধরিয়ে দিতে পারলেই হলো, সে তখন বিনা হিসাবে নিজেকে তার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় উৎসর্গ ক'রে বসবে। যারা বীরপুরুষ তাদের প্রাণসত্তা খুব জোরালো, আর সেই প্রাণসত্তা যখন চাঙ্গা হয়ে ওঠে তখন আর কোনো বিচার আচারের প্রশ্ন থাকেনা, সে নির্বিচারে যুদ্ধে নেমে পড়ে, আর তখন মরিয়া হয়ে সে কাজ করে। একবারও তার সেই প্রাণসত্তা বলেনা যে সতর্ক হও, অতটা বাড়াবাড়ি কোরোনা, কাজটা ঠিক হচ্ছেনা, কিছুই না ভেবেচিন্তে সে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রূপান্তরপ্রাপ্ত প্রাণসত্তা যেন এক সর্বশক্তির যন্ত্রস্বরূপ ; তার এমন বিশেষ রূপান্তরও ঘটতে পারে, কোনো নৈতিক বা বাস্তবে দেখা কোনো অনন্যসুন্দর ও অসাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা। যেমন, যদি সে চোখের সামনে দেখে কারো পূর্ণ আত্মত্যাগ বা আত্মদান—যা খুবই সুন্দর কিন্তু জগতে অতি বিরল—তাহলে সে উদ্দীপিত ও মোহিত হয়ে নিজেকে ভুলে যায়,

আন্তরিক ও একান্তভাবে চায় যাতে নিজেও তেমন হতে পারে। এমনি উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে সে পূর্ণ আত্মনিবেদনে পৌঁছে যায়।

একটা জিনিস প্রাণসত্তা খুবই অপছন্দ করে—বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে নীরস ও নিরাস্বাদ মূল্যহীন জীবন। এরূপ জীবন তার মধ্যে জড়ত্ব আনে। সে একটু বেশি কিছু বিশেষ কিছু করতে চায় সে কথা ঠিকই হয় খুবই দুর্দান্ত, নতুবা নিষ্ঠুর, অথবা খুবই বদান্য, খুবই উত্তম ও বীরত্বপূর্ণ। যেদিকে তাকে কোনো স্রোতে টানবে সেই দিকেই সে অতিরিক্ত মাত্রায় ছুটবে।

আর এই প্রাণসত্তাকে যদি তুমি মন্দের পরিবেশে রাখো, তাহলে তারই ধারা নিয়ে সে মন্দ কাজগুলোই করতে থাকবে অতিরিক্তভাবেই। আবার যদি খুব ভালো পরিবেশে, যা উদার ও সুন্দর, মহৎ ও দিব্য, তেমন পরিবেশে রাখো তাহলে সব কিছু ভুলে সে তারই ধারাতে নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ করবে। সত্তার অন্য সকল অংশের চেয়ে তার আত্মদান হবে পুরোপুরিভাবে, কারণ সে হিসাব ক'রে কোনো কাজ করেনা। যা করবে তা মহা উদ্দীপনা সহকারে। তার মধ্যে যদি কোনো ইচ্ছা জাগে, সে ইচ্ছা হবে সতেজ ও একাগ্র, তাতে কারো ভালো কিংবা মন্দ হচ্ছে সেদিকে দৃকপাত নেই। আর নিজেকে যেখানে সে দিয়ে ফেলে সেখানেও কোনো হিসাব নিকাশ নেই, তাতে ভালো হবে কি মন্দ হবে তা জানতেও চায়না। এ যন্ত্রের এমনই মূল্যবান গুণ। ঠিক যেমন খাঁটি জাতের রেসের ঘোড়ার মতো, যে ভালো শিক্ষা পেলে প্রত্যেক দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। আবার খারাপ শিক্ষা পেলে সওয়ারকে পায়ের তলায় ফেলে বা নিজেরই কোমর কি ঠ্যাং ভাঙে।

এই প্রাণসত্তাও তাই। কেবল দেখতে হয় যে কোনদিকে সে ঝাঁক নিচ্ছে। অসাধারণ কিছু তার করাই চাই, ভালো অথবা মন্দ, কারণ নামুলী জীবনে সে খুশি নয়। তাতে সে আধা জড়বৎ বিমূঢ় হয়ে পড়ে। যদি ওকে এক কোণে ঠেলে দিয়ে বলো, "চুপচাপ এখানে বসে থাকো," তাহলে শুকিয়ে শুকিয়ে সে নড়ার মতো হয়ে যাবে, প্রাণহীন একটা মৃতদেহের সমান। তখন আর ওর দ্বারা কিছু করাও যাবেনা। তোমার মনে হয়তো অনেক ভালো কল্পনা ও শুভ মতলব এসে গেছে, কিন্তু তাকে সার্থক করবার মতো উদ্যম পাবেনা। সুতরাং যদি তোমার প্রাণসত্তা খুব তেজালো হয় তাতে যেন বিভ্রান্ত হয়োনা, কেবল শক্ত হাতে তার লাগাম ধরে থাকবে। তাহলে সে চলবে সোজা পথে।

প্রশ্ন প্রাণসত্তার দ্বারা কি অবসাদও আসতে পারে?

উত্তর: হাঁ নিশ্চয়। অবসাদ, নিরুৎসাহ, বিরাগ, বিপত্তি, ক্রোধ, এ সবই আসে প্রাণসত্তা থেকেই। ওতে প্রেমকে পরিণত করে ঘৃণাতে, আর হিংসা, প্রতিহিংসা, দ্বেষ, অনিষ্ট চিন্তা, জিঘাংসার কামনা প্রভৃতি অনেক কিছুই আসে। কোনো শক্ত কাজ যা তোমার মনঃপূত নয়, তেমন কিছু করতে চাইলে ওই তোমাকে নিরুৎসাহ করে। কাজ বন্ধ ক'রে বসবার ইচ্ছা জাগাতে ও খুবই ওস্তাদ! অথুনী হলেই এক পাশে বসে থাকবে, কিছুতে ওকে

নড়ানো যাবেনা। আর তোমার মধ্যে তখন শক্তিও থাকবেনা, সাহসও থাকবেনা, কিংবা উদ্যমও থাকবেনা। তোমার ভিতরকার ইচ্ছা হয়ে যাবে যেন...নেতিয়ে পড়া গাছের মতো। যত কিছু খুঁৎ খুঁৎ, বিরক্তি, হতাশা, রাগ, দুঃখ, সে সবই এই ভদ্রলোকের জিনিস। তখন সেদিকেই সে ঝোঁকে।

সুতরাং কখন কোন দিকে সে ঝুঁকছে তাই নিয়ে কথা। আর হঠাৎ কাজ বন্ধ করার অভ্যাসটি ওর বিলক্ষণ আছে। "আমি যেমন চাই তা তুমি করলেনা, বেশ তাহলে আমি এই হাত গুটিয়ে নড়ার মতো পড়ে রইলাম, আর নড়ছিনা।" একটা কিছু ছুতো পেলেই সে তাই করবে। স্বভাবটা এমনি গোলমেলে, একটুতেই আড়ি ক'রে বসে। অথচ আপন শক্তি সম্বন্ধে বেশ সজাগ, খুশি হয়ে যদি কোনো কাজে লেগে যায় তাহলে কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারেনা। তাই সে তোমার সঙ্গে কড়ার ক'রে নেয় "আমার সমস্ত শক্তি দিতে রাজী আছি, কিন্তু আমি যা চাই তা তোমাকে দিতে হবে। না দিলে নিজেকে গুটিয়ে নেবো" তুমি তখন হার মানো। এই হয়।

ওকে শাসনে রাখা খুবই কঠিন। তবে যদি ওকে পোষ মানিয়ে নিতে পারো, তাহলে তোমার কর্মসাফল্যের পক্ষে একটি মোক্ষম অস্ত্র পাবে। এর দ্বারা তুমি বৃহৎ বৃহৎ বাধাকে অনায়াসে হটিয়ে দিতে পারবে। এর তেজ এমন যে বোকাকেও সুচতুর ক'রে দিতে পারে। অগ্রগতির জন্য যদি তোমার আগ্রহ থাকে আর তোমার প্রাণসত্তার যদি সেই দিকে উৎসাহ আসে, তখন তার ফলে অতি বড় মূর্খও বুদ্ধিমন্ত হয়ে ওঠে, এ আমি নিজেই দেখেছি, কানে শুনে বলা নয়। চোখেই দেখেছি। এমন লোক দেখেছি যে ভোঁতা, অবুঝ, অর্বাচীন মাসের পর মাস তাকে কিছু বোঝাতে থাকলেও কোনো কথা মাথায় ঢোকেনা, মনে হয় যেন একটা কাঠকে বলছ—তার পর হঠাৎ একদিন তার প্রাণশক্তি কিছু একটা ঝোঁকের মাথায় জেগে উঠল; হয়ত কোনো ব্যক্তিকে খুশি ক'রে দিতে কিংবা নতুন কোনো কিছুকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে তার বিশেষ কিছু জানতে পারা ও বুঝতে পারা দরকার। তখন মনের তন্দ্রা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে, শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে নিজের ভিতরকার আনাচে কানাচে সর্বত্র নিয়োগ করতে থাকে, তখন সে বোঝা হয়, বুদ্ধি খুলে যায়। একজনকে জানতাম যার কোনো গুণই ছিলনা, কিন্তু যেমনি উন্নতির দিকে তার মনের ইচ্ছা উন্মুখ হয়ে উঠল, তখন তারই প্রেরণাতে সে অনেক আশ্চর্য লেখা লিখতে শুরু করলে। সে লেখাগুলো আমার কাছেই আছে। আবার যখন ঝোঁক থেমে গেল (অর্থাৎ তার প্রাণসত্তা ঠাণ্ডা হয়ে বসল) তখন সে আগের মতোই নির্বোধ হয়ে গেল।

কেবল অবশ বাহ্য দেহচেতনার পক্ষে চৈত্যের সঙ্গে নিত্য সংযোগ রাখা খুবই কঠিন। স্থূল দৈহিক চেতনার বেশ শুভ ইচ্ছাই থাকে, বেশ নিয়মিতভাবে সে নিজের কাজ করে, চেষ্টাও তার যথেষ্ট আছে, কিন্তু সে বড় মন্থর ও দীর্ঘসূত্রী, তার বিলম্বিত গতিকে ত্বরান্বিত করা যায়না। শীঘ্র সে ক্লান্ত হয়না, কিন্তু তাড়াহুড়াও করতে পারেনা, সে ধীরগতিতে চলে। তাই স্থূল দৈহিক চেতনার সঙ্গে চৈত্যের সংস্পর্শ ঘটাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগে যায়।

কিন্তু যেমন ক'রে হোক এই প্রাণসত্তা এসে ওর মধ্যে যোগ দেয়। সে চায় ঐরূপ একটা সংস্পর্শ ঘটিয়ে দিতে (আধ্যাত্মিক কারণে নাও হতে পারে), আর সে ঐরূপ ইচ্ছা করলে তার সমস্ত শক্তি ও উদ্যম সেখানে প্রয়োগ করে, তখন তিন মাসের মধ্যেই কাজটা হয়ে যায়।

তাই আমি বলি, প্রাণসত্তার দিকে বিশেষ যত্ন নেবে, কিন্তু তার বশে কোনোমতে যাবে না। কারণ তাহলে তোমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে সে নানা গণ্ডগোল ও পরীক্ষার মধ্যে আর যদি তাকে তোমার মতে চলতেই রাজী করাতে পারো তাহলে লম্বা লম্বা পা ফেলে সটান এগিয়ে যেতে পারবে।

শ্রীমা

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

পথের কথা

২৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৯

ভক্ত এমন বোধ হয় যেন জড়ের মধ্যেই নিমজ্জিত হয়ে আছি...এই রকম নানা বাস্তব সমস্যা ও ব্যবহারিক ক্রিয়ার মধ্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও কি যোগ বা ঐ ধরনের আধ্যাত্মিক কাজ কিছু হতে পারে, এমন কি যখন বাহ্য ব্যাপারে এতই লিপ্ত আছি যে অন্য কিছু করা হচ্ছে বলে ধারণাই আসে না?

না ও। কিন্তু সমগ্র সত্তাই যে এখন জানে (দেহ তো খুব ভালো রকমই জানে), যা কিছু কেন আসুক, তোমাকে যত শীঘ্র সম্ভব এগিয়ে দিতেই তা আসে, সমস্ত কিছুই বাধা বিঘ্নই বলো, আর প্রতিবন্ধকই, ভুল বোঝা, ভুল কাজ করা প্রভৃতি সব কিছু, সকল কিছুই হয় ঐ একমাত্র কারণে; কেবল তোমাকে অগ্রসর ক'রে দিতে; এখন যদি এক জায়গাতে চেপে ধরলে, তো সেটা ছেড়ে অন্য জায়গাতে ধরলে, ফের আবার অন্য কোথাও ধরলে, এ সবই হয় তোমাকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিতে। এগুলোতে না জড়ালে তোমার জড়ের পরিবর্তন আসবে কি করে?

আর এতেও কোনো ভুল নেই যে তোমার যত কিছু নালিশ ও আপত্তি সমস্তই তোমার বাহ্য মন থেকে, সে কেবল বাইরেটাই দেখতে পায়। তা তোমার চেতনাকে তার সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতেই, যাতে তুমি স্পষ্ট দেখতে পাও যে সেটা বাহ্য জিনিস, তার পিছনে এমন কিছু আছে যাতে তুমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও...রূপান্তরের দিকে।

(অনেকক্ষণ নীরব থেকে)

প্রখর বুদ্ধি সহজেই বুঝে নেয় যে সে জানেনা কিছু, তাই উন্নতির উপলক্ষে সমুচিত গ্রহিষ্ণুতা সে সহজেই আনতে পারে, কিন্তু স্থূল জিনিসগুলির ব্যাপারে সে ধরে নেয় যে সবই তার জানা আছে, তার আপন নির্বিশেষ অভিজ্ঞতা থেকে সবই বোঝা আছে। আর সেখানেই তুমি মার খেয়ে যেতে পারো; দেহকে তাই সেই কথাটাই শেখানো হচ্ছে যে তোমার ঐ দেখার ও বোঝার প্রণালী একেবারে মূল্যহীন, যার ভিত্তি কেবল এইগুলি নিয়ে—ভালো আর মন্দ, উচিত আর অনুচিত, আলো আর আপসা...অর্থাৎ যত কিছু বিপরীত দিক নিয়ে: বাস্তব জীবনের সম্পর্কে যে ধারণা ও বিচার পুরোপুরিভাবে করা হয় তা যে কত অকেজো সেই শিক্ষা দেবার জন্য। এ আমি দেখতেই পাই। তার ক্রিয়া চলেছে খুব জোরের সঙ্গে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার জ্ঞান করাতে।

এমন কি তোমার কর্মরত জীবনের যে দিকটা মনে করতো যে কেমন ক'রে বাঁচতে হবে আর কোন কাজটা কি ভাবে করতে হবে তা ওর বিলক্ষণ জানা আছে, তাকেই জানতে হবে যে তার সেই জানা ঠিক নয়, বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধে কি করা উচিত তা নিয়ে জানাও ঠিক নয়।

(নীরব থেকে)

আর এর মধ্যে মজার কথাও আছে...এ চেতনা সব সময়ে কাজ করছে আর দেহকে "খোঁচা" দিয়ে বলছে : "এই এটা যে তুমি বোধ করলে এর মূলটা কোথায় ? তুমি ভাবছ যে তুমি সবই জানো, কিন্তু ওর পিছনে কি আছে তা কি জানো ?" জীবনের প্রতি মিনিটের প্রতি ছোটো ছোটো ব্যাপারেও এই কথা। আর দেহ তাতে অবাক হয়ে এমনি ক'রে (বা চক্ষু বিস্ফারিত করলেন) চেয়ে নিজে নিজে বলে : "তাই তো আমি যে কিছুই জানিনা।" কিন্তু আবার তারও জবাব দেয় এই রকম "আমি যে জানি তা একবারও বলছি না, সবই প্রভু জানেন, তাঁর যা খুশি তিনিই করুন।" তার পর তখন এসে পড়ে এই কথা (যা ধরে রাখলে ভাল হতো) "প্রভুর কোনো কাজে আমার আদৌ নাক গলানো নয়" (অতি সরলভাবে এটি বলা)।

(নীরব থেকে)

বাস্তব ঘটনা থেকে ও প্রতি মিনিটের অনুভূতি থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা বা বুদ্ধিবিচারের দ্বারা বা জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা প্রভৃতির দ্বারা যে সব কাজ করা হয় তা কতখানি বেঠিক (বা ভ্রান্ত), তার পিছনে থাকে যে আরো একটা-কিছু, সেই কাজ করায় (সব কিছুর বেলাতেই), কিন্তু এই জ্ঞান বা বোধ জীবনের অভিজ্ঞতা প্রভৃতির কোনো কিছুর সঙ্গেই গ্রন্থিবদ্ধ নয়। এর যা দৃষ্টি তা আরো প্রত্যক্ষ ও প্রগাঢ়, আরো সুদূরব্যাপী, অর্থাৎ তা অনেকটা এগিয়ে গিয়ে ব্যাপকভাবে আরো অনেকখানি দেখে, যা কোনো বাহ্য অভিজ্ঞতাতে দেখা যায় না।...এ বোধ ধীর ধীরে জন্মায়, কোনো বাহ্য আড়ম্বর না করে : প্রতি মিনিটের প্রতি সেকেণ্ডের অল্প একটু জিনিস। যেন সর্বক্ষণ তুমি দেখেছিলে মানুষী জীবনের দেখা ও করার পদ্ধতিতে তার মধ্যেই দেখলে—যা সত্যের পদ্ধতিতে। দুই রকমই সকল বিষয়ে।

এমন জিনিস হয় যে কতকগুলি স্পন্দনে আনে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য আর কতকগুলি স্পন্দনে অস্থির ক'রে দিলে ! অথচ একই জিনিসের স্পন্দন। প্রতি মিনিটেই তাই, সকল বিষয়ে।

তবে এখানকার চেতনা একটা পরিপূর্ণ আনন্দ ও সদ্গতির অবস্থাতেই আছে সেটা ঠিকই থাকে, তবে যেননি একটু (বা অল্প বাঁদিকে হেলে দেখালেন) চেতনার নড়াচড়া হলো অমনি তখন একেবারে অসহ্য। এই রকম অনুভূতি বরাবরই চলছে...কেবল এই দেখিয়ে দিচ্ছে যে আসলে একটা জিনিসই প্রধান জরুরী তা হলো চেতনার অবস্থা : সেই পূর্বের দিনের ব্যক্তিগত সত্তার চেতনার অবস্থা (নিজেকে সংকুচিত ক'রে দেখালেন) কিংবা এখনকার এই অবস্থা (প্রসারিত ক'রে দেখালেন)। অথবা (যদি বুঝিয়ে বলতে হয়) সংকীর্ণ অহংএর উপস্থিতি অথবা অহং বর্জিত। এই হলো আসল কথা।

তারপর, যেমন পূর্বেও বলেছি, জীবনের প্রত্যেক কাজে, এমন কি অতি সাধারণ বিষয়ে পর্যন্ত, যদি অহং লেগে থাকে (বোঝাবার জন্য বলছি), তাহলে তোমার স্বাস্থ্যেরও সামঞ্জস্য নষ্ট হবে, আর এ সব সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হলো অহংকে বাদ দেওয়া—তার

সঙ্গে অস্বাস্থ্যও দূর হবে। যে-সব জিনিসকে আমরা তুচ্ছ বিষয় বলি তার পক্ষেও তাই,—সকল বিষয়ে, সকল সময়ে, দিনে বা রাত্রে।

এবং ওটা আবার ভুল বোঝা ও না-বোঝার ভাবে এমন ভারী হয়ে ওঠে যেন হুড়মুড় ক'রে ঘাড়ে এসে পড়ল (অনুরূপ ভঙ্গী করলেন), সমস্তই যেন তৈরী ছিল ঘাড়ে পড়বার জন্য...যাতে সকল দিক দিয়ে অভিজ্ঞতা আসে।

যেন প্রতি মুহূর্তে বাস্তবরূপে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হচ্ছে, এই দেখ এই মৃত্যুও রয়েছে আর অমরত্বও রয়েছে (ডাইনে আর বাঁয়ে হাত নেড়ে দেখালেন), সকল কিছুরই মধ্যে, নিতান্ত ক্ষুদ্রেরও মধ্যে আবার অত্যন্ত বৃহতেরও মধ্যে আর নিত্যই তুমি তা দেখতে পাচ্ছ...যেখানেই তুমি থাকো, এখানে কিংবা ওখানে (পুনরায় ঐরূপ হাত নেড়ে দেখালেন), যেন প্রতি মুহূর্তে তোমাকে বলছে, যেটা খুশি বেছে নাও,—মৃত্যু অথবা অমরত্ব।

সেইজন্যই আমি দেখতে পাচ্ছি যে একান্তভাবে দেহের পুরোপুরি প্রস্তুতি হওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে, যাতে সে এই অনুভূতির চাপ বহন করতে পারে—কোনো উদ্বেগ বা সংকোচের স্পন্দনকে আসতে না দিয়ে—খুব শান্তভাবে হাসিমুখ বজায় রেখে।

(অনেকক্ষণ নীরব থেকে)

অনেক কিছু—যার সঙ্গতি নেই। যেন সকল কিছুতেই দুই রকমের বিপরীত আমাদের দেখে যেতে হচ্ছে—দুই বিপরীত যখন একত্রে জুড়ে যাবে তখন কি হবে তাই জানতে, সে সময়ে তার থেকে পালাতে নয়। তাতে একটা ফল মিলবে, ব্যবহারিক জীবনে।

৩১ জানুয়ারি, ১৯৭০

ভক্ত : আমি ঠিক বুঝতে পারিনা যে কেমন ধারণা রাখা উচিত। এই সমস্যা সম্বন্ধে একটা প্রশ্নের দ্বারা তা ব্যক্ত করতে পারি—যা হচ্ছে তা সবই কি নিয়ন্ত্রিত?

উত্তর হাঁ গো ছেলে, আমি উত্তরোত্তর তাই তো দেখি পুরোদস্তুর ভাবে ; হাঁ, স্পষ্টই তাই দেখছি, অনুভব করছি : সবই নির্ধারিত হয়ে আছে।

ভক্ত : আগের থেকে নির্ধারিত সব কিছুই?

মা তা ছাড়া প্রত্যেক কিছুরই অস্তিত্বের হেতু আছে, যা আমাদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায়, কারণ আমাদের দৃষ্টি ততখানি ব্যাপক নয়। তা যদি না হতো তাহলে এই জীবন, এই অস্তিত্ব, এই সমগ্র জগতেরই কোনো মানে হতো না।

ভক্ত হাঁ।

মা : হাঁ, এ এক রকম ধ্রুব বিশ্বাস। যা আমি নিজে দেখতে পাই।

কেমন করেই বা বলি?...এই বিশ্বাসের দাম দিতে হচ্ছে। এই দেহ যখন এর কর্তৃত্বভারকে বদল করে (বদল করাই বলি) তখন তার বিপত্তির মুহূর্ত আসে, যা সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হবে অর্থহীন, কিন্তু···যখন সত্যদৃষ্টির মধ্যে আছি তখন দেখি যে এ যন্ত্রণাগুলো হলো অসত্যেরই অবশিষ্ট (তার বিস্রণ এখনও আছে)। এটা কেবল বস্তুর দিক থেকে। (ভাবের দিক থেকে অনেক কাল আগেই জয় হয়ে গেছে ; কামনা গেলেই বিপত্তি গেল ; তার বদলে রইল অকপট হাসি বা আপনা হতে ও বিনা চেষ্টাতে রইল) কিন্তু আমি বলছি স্থূল দেহের দিক থেকে রোগভোগ ও কষ্টভোগ। অর্থাৎ...এর প্রস্তুতি হয় কম মাত্রাতে, জড়ের রূপান্তর আসার গতি খুব মন্থর, তাই এই সব প্রতিবন্ধক। এর একমাত্র প্রতিকার, সকল স্থলে ও প্রতি মুহূর্তে এই (আত্মনিবেদনের ভঙ্গী) "তোমার যেমন ইচ্ছা", নিজের কোনো ইচ্ছা বা পছন্দ অপছন্দ নেই। এমন কি ব্যথাবেদনা সম্বন্ধেও।

ভক্ত একথা বোঝা কঠিন যে সেই এক চেতনা...যে নাকি চিরন্তনভাবে সমগ্র বিরাটকে নিয়ন্ত্রিত করছে, সেই আবার যত কিছু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু আছে তারও ভিতরকার প্রতিটি খুঁটিনাটিকেও নিয়ন্ত্রিত করছে।

মা হাঁ, অণুবীক্ষণিকের মধ্যেও।

ভক্ত অণুবীক্ষণিকের...

মা তাই তো আমি দেখছি, আর কেন তা জানি। এই ব্যক্তিগত চেতনা আজ সকালে একটা ধাঁধা বোধ করলে যে খুব ব্যাপক হলেও সে বুঝতে পারছে না যে একই কালে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ চেতনা হওয়া কেমন ক'রে সম্ভব হচ্ছে। কারণ সে তেমন জিনিস নয়। তাই বোঝা মুশকিল হচ্ছিল যে সকল কিছুর ভিতরকার ঐ একই চেতনা সর্বত: একই কালে কেমন ক'রে চেতন হয় সামগ্রিক ও একত্রিত ব্যাপারে আর ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটিতেও। এই কথা...

ভক্ত : হাঁ, তা বোঝা শক্ত...কিন্তু ওতে একটা সান্ত্বনা মেলে।

মা হাঁ, ওতে শান্ত ও সুস্থির করে...সেদিন তাই বলেছি যে এই দেহ না মরেও মৃত্যুর অনুভূতি পেয়েছে, তাই সে বলতে পারলে, "ভালোই তো...বিনা প্রয়াসেই (তা ছাড়া কি বলি?) মেনে নেওয়া হবে"। তারপর সেটা চলে গেল। আগে আগে যে ভুল ধারণা ছিল যে দেহ গেলে সবই যাবে...তা আর অনেক কালই নেই, এখন দেহ নিশ্চিত-ভাবে জেনেছে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও তার চেতনার ক্ষেত্র বেড়েই যাবে।...কেমন ক'রে বোঝাবো জানিনা, তবে ব্যক্তিচেতনার এবং চেতনার জন্য ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় আদৌ নেই।

আর এও দেখছি যে দেহ এটা জেনেছে, প্রতিবন্ধক আছে বলেই—অর্থাৎ সত্যের প্রতিবন্ধক—তাই তাকে ভুগতে হয়। যেখানে ঐরূপ সংযোগ হবে সেখানে কষ্টভোগ তখনই ঘুচে যাবে।

(নীরব থেকে)

আর দেশ বা রাজ্য সম্বন্ধেও তাই কেবল কর্তৃত্বভাবের অদলবদল। ব্যক্তি-কর্তৃত্বের স্থানে ভগবৎ-কর্তৃত্ব এখনকার মানুষ নানারূপ অনিশ্চয়তা ভোগ করছে—ঐ প্রতিবন্ধক থেকে।

(অনেকক্ষণ নীরব থেকে)

সত্তার কোনো অংশ (যাই কেন হোক) যতই অগ্রসর হয় পরিবর্তনের সূচনার দিকে, অর্থাৎ তার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে, ততই সেগুলি অতিরিক্ত অনুভবপ্রবণ হয়ে পড়ে। তাই যখন সমস্যার প্রশ্ন ছাড়িয়ে বিশ্বের দৃষ্টিতে দেখার সময় আসে তখন ব্যক্তিগত সচেতনতা তীব্র হয়ে ওঠে। এ আমি আগেও দেখেছি, আর এখন দেখছি দেহের বেলাতেও। এই সচেতনতা হয়ে দাঁড়ায়...ভয়ানক। যারা জানে না যে এমন কেন হচ্ছে তারা সত্যই খুব ভয় পেয়ে যায়।...রোগপ্রবণতা...আর সমস্যার জটিলতার ব্যাপারেও। কেবল যারা জানে ও বোঝে তাদের পক্ষে তা এমনি এগিয়ে যাবার সুযোগ (হাত খুলে দেখালেন)।

অর্থাৎ এখনও যা স্বাতন্ত্র্যবোধের মোহে আচ্ছন্ন তার বিলুপ্তি হওয়া চাই। তাকে বলতে হবে, এ আমার কিছু নয়, আমার আমির কোনো অস্তিত্ব নেই। সর্বোত্তম উপায় হলো এই মনোভাব নেওয়া। তাহলে বিরাট বিশ্বছন্দের মধ্যে তার স্থান হবে।*

—শ্রীমা

---

* অনুবাদক : পশুপতি ভট্টাচার্য

কঠিন ডানায় ওড়া

বীরবাহু

পেশাবরে পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গেই নূতন বিমানে শিক্ষার কাজ আমাদের পুরাদমে শুরু হইল। এতদিন পর্যন্ত আমাদের কোয়াড্রন হয় বোমারু বিমান অথবা স্থল-সৈন্যের সাহায্যকারী বিমান উড়াইবার কাজে ব্যাপৃত ছিল। বোমারু বিমানে বা স্থল-সৈন্যের সাহায্যকারী বিমান উড়াইবার জন্য দুইজন বা বিমান বড় হইলে দুইজন হইতে বেশি সংখ্যক বৈমানিক প্রয়োজন হইত। হাড্‌সন্ বোমারু বিমানে বোমা বর্ষণে যাইবার সময় প্রত্যেক বিমানে সাতজন করিয়া বৈমানিক প্রয়োজন হইত। দুইজন বিমানচালক, একজন নেভিগেটর বেতারবার্তা-পরিবেশনকারী, আর চারজন গানার। গানারদের কাজ শুধু নিশানা তাক করিয়া বন্দুকের গুলি নিক্ষেপ করা। ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স বিমানে দুইজন প্রয়োজন হইত। একজন বিমান চালক আর একজন নেভিগেটর বেতার-বার্তা পরিবেশন-কারী। প্রয়োজন অনুসারে দ্বিতীয় জন পশ্চাৎ দিক হইতে আগত আক্রমণকারী শত্রু বিমানের উপর গুলি নিক্ষেপ করিত। আর বিমান চালক, বিমানের সম্মুখ দিকে ডানার মধ্যে যে চারিটি মেসিনগান সন্নিবিষ্ট ছিল, সেইগুলি হইতে গুলি নিক্ষেপ করিতে পারিত। ভল্টি ভেন্‌জিয়ান্স বিমান চালকের এই দুই কাজ ছাড়া আরও একটি প্রধান কাজ ছিল। বোমা নিক্ষেপের সময় বিমান সোজা নিচের দিকে নামাইয়া লইয়া নিশানার দিকে তাক করিয়া বিমান অবতরণ করিবার সময়, যখন দুই হাজার ফিটের মত ব্যবধান, তখন বিমানের পেটের খোল খুলিয়া যেখান হইতে বোমা ছাড়িয়া দেওয়া। একাজগুলি বিমান চালককে নানা যন্ত্রের সাহায্যে করিতে হইত। কিন্তু এইসব কাজের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং পরম্পরা আছে। বিমান চালককে সেই শৃঙ্খলা এবং পৌর্বাপর্য মানিয়া চলিতে হইত। শৃঙ্খলা এবং পরম্পরা মত কাজ না করিলে, বোমা হয়ত নিশানা হইতে দুই মাইল তফাতে পড়িবে,—সেখানে হয়ত দূষণনদের কোন কিছুই নাই, আছে শুধু ধানক্ষেত বা মাঠ।

আমাদের নূতন বিমানে শুধু একজন বৈমানিকের স্থান ছিল। তাহাকে একাধারে বিমান চালনা, বেতার-বার্তা পরিবেশন, নেভিগেশন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আটটি ব্রাউনিং মেশিন গান হইতে এক সঙ্গে গুলি বর্ষণ, সব কাজ করিতে হইত। শত্রুবিমান বা শত্রুসৈন্য অথবা শত্রুর কোনরূপ সংকেত পাইলেই বিমান চালক তৎক্ষণাৎ তাহার বাহন, হকার-সিড্‌লী বিলাতি কম্পানী-নির্মিত হারিকেন বিমান, সোজা নিশানার দিকে ঝড়ের বেগে চালাইয়া দিত, এবং কিছুটা অর্থাৎ কয়েক শত গজ, নিকটবর্তী হইলেই তাহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া ক্ষুদ্র একটি বোতাম টিপিয়া ধরিত। বোতাম যতক্ষণ পর্যন্ত টেপা অবস্থায় ততক্ষণ পর্যন্ত বিমানের আটটি মেশিন গান হইতে অজস্র সংখ্যক গুলি নিক্ষিপ্ত হইত। অজস্র সংখ্যক বলিলাম কেননা হারিকেন বিমানে প্রত্যেক ডানায় চারটি করিয়া দুই ডানায়

আটটি ব্রাউনিং মেশিনগান সন্নিবেশ করা ছিল। আর প্রত্যেক ব্রাউনিং মেশিন গান হইতে প্রতি মিনিটে প্রায় এক হাজার গুলি নিক্ষিপ্ত হইত। এক মিনিট যোতাম টিপিয়া রাখিলে আট মেশিনগান হইতে আটহাজার গুলি নিক্ষিপ্ত হইত। এক মিনিটে আট হাজার গুলির মধ্যে কিন্তু একটি গুলিই যথেষ্ট যদি সেই গুলি বিমানের শত্রুটির কোন মোক্ষন অংশে আঘাত হানে।

গুলি চালাইবার সময় বিমান চালকের বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কেননা তখন তাহার সমগ্র মন সম্মুখে স্থিত শত্রুর উপর নিবদ্ধ। আকাশের অন্য কোথাও কি হইতেছে সে দিকে তাহার মোটেই কোন হুঁশ নাই। পারিপার্শ্বিকের উপর বেহুঁশ অবস্থা বড়ই মারাত্মক। শত্রুপক্ষের কোন জঙ্গী বিমান যদি তখন নিকটে থাকে, এবং তাহার দৃষ্টিতে আসে, তাহা হইলে এই সুবর্ণ সুযোগ সে হারায় না। এই প্রকার অবস্থার জন্য জঙ্গী বিমান চালক সর্বদাই নিজেকে প্রস্তুত রাখে। যে মুহূর্তে সে দেখিতে পাইল কোন দুশমনের বৈমানিক, তাহার বিমান লইয়া কোন নিশানার দিকে লক্ষভেদের জন্য ছমড়াইয়া পড়িতেছে, সেই মুহূর্তেই সে তাহার পশ্চাদ্ধাবনে রত হইল, এবং সময় বুঝিয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া গুলি বর্ষণে নিপাত করিল। লক্ষভেদে ব্যস্ত বৈমানিক কিছু বুঝিবার পূর্বেই বিমানের গুলির আঘাতে ভূপাতিত হইল।

হকার হারিকেন জঙ্গী বিমান-চালকের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সহজ ছিলনা। বিমান চালনা করা এবং সেই সঙ্গে কোন অঞ্চল দিয়া গমন করিতেছি, তাহা পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ পুরাদমে নেভিগেশনের সব খুঁটিনাটি কাজ, এবং আকাশের সব দিকেই প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া চলা, যাহাতে আকাশের কোথাও যদি শত্রুবিমান উড়িতে থাকে, তাহা হইলে, বৈমানিক এক দৃষ্টিতেই দেখিয়াই সেই ব্যাপার বুঝিতে পারিবে।

যে কোন বিমান যে কোন ভঙ্গিতে উড়িয়া চলুক না কেন, বিমান-চালক একবার দেখিলেই চিনিয়া ফেলিবে। নিজ পক্ষের বিমান ভ্রম করিয়া শত্রু-পক্ষের বিমান বলিয়া যেন তাহার মনে না হয়। অথবা শত্রুপক্ষের বিমান স্বপক্ষের বলিয়া ভ্রম না হয়। বিমান-চালককে এত প্রকার কাজ নিজের আয়ত্তাধীনে আনিতে হইবে। একটা একটা করিয়া উল্লেখ করিলে হকার হারিকেন জঙ্গী বিমান-চালকের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

প্রথম: নূতন প্রকার বিমান চালনা শিক্ষা। দ্বিতীয়: নেভিগেশন শিক্ষা। এতদিন পর্যন্ত বিমান-চালকের একজন অন্তত: সাথী ছিল নেভিগেশন অর্থাৎ পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য। নূতন বিমানে চালক সাথী-হারা হইল।

তৃতীয়: আকাশের যে কোন দিকে একবার তাকাইয়া দেখিলেই সেই দিকের সমস্ত ব্যাপার ছবির মত মনের মধ্যে গাঁথিয়া থাকা। তিন শত মাইল বেগে উড়িয়া যাওয়ার সময় প্রথম দৃষ্টিতেই যদি দুশমনদের বিমান বা অন্য কিছু ধরা না পড়িল, তবে পরে বিবেচনা করিয়া সেই বিষয় বুঝিয়া কাজ করিলে সে কাজ অনেক বিলম্বে করা হইবে। শত্রু পক্ষের বিমান হয়ত তখন দুইশত মাইল বেগে উড়িয়া যাইতেছিল। তিনশত মাইল বেগের বিমানে উড়িয়া গেলে তখন তাহাকে হয়ত ধরা সম্ভব, কিন্তু ১০ মিনিট পরে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির

করাও অসম্ভব। চতুর্থ : গানারী অর্থাৎ বন্দুক চালনা এবং নিশানা তাক করার প্রণালী। নিশানা আকাশচারী শত্রুবিমান হইতে পারে, আবার স্থল-সৈন্য বা অন্য কিছু বা অতি ক্ষুদ্র বস্তুটিও হইতে পারে। স্থলসৈন্য বা তাহাদের যুদ্ধোপকরণ অথবা সরঞ্জাম স্থির অচঞ্চল অবস্থায় রহিয়াছে, আবার এমনও হইতে পারে যখন সেগুলি দ্রুতগতি যানে স্থানান্তরিত হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য নিশানা তাক করার ব্যবস্থাও ভিন্ন। উড়ন্ত শত্রুবিমানের উপর তাক করিয়া গুলি নিক্ষেপের কায়দা মাটির উপর অচঞ্চল অবস্থায় স্থিত যান-বাহনের উপর গুলি নিক্ষেপের কায়দা হইতে ভিন্ন। গানারী শিক্ষায় এই সমস্ত বিষয় হইল শিক্ষণীয়।

নিশানা মাফিক বন্দুক চালনা ছাড়া গানারী শিক্ষার আরও একটি শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। হকার হারিকেন বিমানের পেটের তলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি বোমা ঝুলাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেইগুলি সুযোগ মত ব্যবহার করিবার পন্থাও গানারী শিক্ষার অন্তর্গত ছিল।

পঞ্চম : আকাশে উড়ন্ত বিমান দেখামাত্র সে বিমান শত্রুপক্ষীয় না মিত্রপক্ষীয় তাহা চিনিয়া লওয়া। শত্রু পক্ষের কতকগুলি বিমান দেখিতে অনেকটা মিত্রপক্ষের বিমানের মত ছিল। বিশেষত: উড়িয়া যাওয়ার সময় শত্রুপক্ষের সেই বিমানগুলি মিত্র পক্ষের বিমান বলিয়া ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আবার মিত্রপক্ষের বিমানগুলিও ভ্রমবশত: শত্রুপক্ষের বলিয়া মনে হইত। হকার হারিকেন বিমান-চালককে সেইজন্য বিমান দেখা মাত্র যাহাতে সেই বিমান শত্রুপক্ষের না মিত্রপক্ষের, তাহা চিনিতে পারে, তাহার সহজ উপায় শিখান হইত (Aircraft recognition) আবার অনেক সময় উড্ডীন অবস্থার কোন বিশেষ ভঙ্গিতে এই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ঘটিত। সেইজন্য বিমান-চালককে শত্রু এবং মিত্র পক্ষের সমস্ত বিমানগুলির নানা ভঙ্গিতে উড্ডীন অবস্থার সাথে পরিচয় যাহাতে থাকিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইত। সব সময় যাহাতে দেখা মাত্র পরিচয়ে ভুল না হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া বিমান পরিচয়ের শিক্ষা হইত। ভুল করিলে ভুলের মাসুল দেওয়ার সুযোগ হয়ত বিমান-চালকদের একেবারে মিলিত না।

যন্ত্রবিৎ বৈমানিকদের বেলায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলিও কম ছিল না। সাধারণত: বোমারু বিমানের এঞ্জিন হাওয়া দ্বারা ঠাণ্ডা করা হয়। আর এঞ্জিনের সম্মুখভাগ হয় প্রকাণ্ড চওড়া। কিন্তু জঙ্গী বিমানের বেলায় এঞ্জিন জলীয় পদার্থ দ্বারা ঠাণ্ডা করা হয় এবং এঞ্জিনের সম্মুখভাগ হয় খুব ছুঁচালো। জঙ্গী বিমানের বেলায় বিমানের একেবারে সম্মুখ ভাগে এঞ্জিন লাগান থাকে। সম্মুখে এঞ্জিন থাকার দরুন বিমানের সম্মুখভাগ খুব ছুঁচালো করিয়া নির্ম্মাণ করা সম্ভব হয়। এঞ্জিনের সম্মুখভাগ ছুঁচালো থাকার জন্য বিমানের গতিবেগ আপনা হইতেই বর্দ্ধিত হয়। এর কারণ খুব সহজেই বোঝা যায়। পারিপার্শ্বিক হাওয়া বিমানের গতিবেগে বাধার সৃষ্টি করে। গতিবেগ যত বেশি হইবে হাওয়ার চাপে সৃষ্ট বাধাও সেই অনুপাতে বর্দ্ধিত হয়। বিমানের সম্মুখের অংশ একেবারে ছুঁচালো থাকার দরুন হাওয়ার চাপে সৃষ্ট বাধার পরিমাণ কম হয়, এবং এই কারণে বিমানের গতিবেগ বর্দ্ধিত হয়। ছুঁচালো এঞ্জিনের গঠন অন্য এঞ্জিন হইতে একেবারে ভিন্ন প্রকার ; এবং গঠন-কৌশল অনেক কঠিন। নানা

কারণে এই প্রকার (in-line) এঞ্জিনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সংখ্যা অনেক বেশী এবং এঞ্জিন মেরামতের কাজও অনেক দুরূহ।

যন্ত্রবিৎ ছাড়া আজকার দুনিয়া অচল। রেলভ্রমণে যাওয়া অথবা বেতার হইতে গান শোনা, যন্ত্রবিদের প্রয়োজন। সে রেলের এঞ্জিন হইতে শুরু করিয়া অতি সামান্য কাজও যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থা সব সময় করিতেছে। কিন্তু তাহার একটা সুবিধা আছে। যন্ত্রে কোন ত্রুটি দেখা দিলে, যন্ত্রবিৎ সেই ত্রুটি মেরামত মাটির উপর বসিয়া-দাঁড়াইয়া ধীরে-সুস্থে করিতে পারে। সময় তাহার সহায়। ভীষণ আকার হইলেও ভীত হইবার কোন কারণ নাই। যন্ত্র বিকল হইতে পারে কিন্তু আকাশ হইতে ধপাস করিয়া পড়িয়া যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। যন্ত্রবিৎ ধীরে-সুস্থে ভাবিয়া-চিন্তিয়া যন্ত্রের মেরামতীর কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারে। তাছাড়া যন্ত্র সম্বন্ধে যত পুস্তক আছে সবগুলিই, যন্ত্র বিকল হওয়ার সাথে সাথেই, যন্ত্রবিৎ সংগ্রহ করিতে পারে। তাহার কাজে সুবিধার তালিকা বিরাট— শুধু তাহাকে জানিতে হইবে, কোন সুবিধা কতটা ফলপ্রসূ হইবে। যন্ত্র সম্বন্ধে নানা প্রকার পুস্তক সব সময়ে সংগ্রহ হইতে পারে বলিয়া যন্ত্রবিদের সব বিষয়ে সমস্ত প্রশ্নগুলির জবাব জানার প্রয়োজন নাই।

বিমানের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। আকাশে উড়িবার সময়, যদি কোন অংশ বিকল হইল, তবে যন্ত্রবিৎকে সেই বিকল হওয়া কোন উপায়ে মেরামত করা যায় তাহা জানিতেই হইবে। যে প্রশ্নের উত্তর তাহার জানা নাই, বিমানে উড়িবার সময় যদি ঠিক সেই প্রশ্নের উদয় হয়, অর্থাৎ সেই অংশ বিকল হয়, তবে বেশীর ভাগ সময়ই যন্ত্রবিদের এই কাঠামোতে সেই প্রশ্নের উত্তর মেলা কঠিন হইয়া পড়ে, সেই সাথে বিমানে অন্য আরোহীদের অবস্থাও সাংঘাতিক কঠিন হয়।

সমস্ত বৈমানিকদের মধ্যে সব হইতে কঠিনতর কাজ হইল আয়ুধ-কারবারী (armourer) বৈমানিকদের। হকার হারিকেন বিমানের ডানায় সন্নিবেশিত আটটি ব্রাউনিং মেশিন গান হইতে গুলি বর্ষণ করিতে প্রায় শত পাউণ্ড চাপযুক্ত হাওয়ার প্রয়োজন হইত। হাওয়ার চাপ প্রস্তুত হইত এঞ্জিন-চালিত একটি ক্ষুদ্র পাম্প দ্বারা। এবং খুব সরু ধাতব নল মারফৎ হাওয়ার চাপ বিমান চালকের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পিষ্ট বোতামের মধ্য দিয়া আসিয়া প্রত্যেক বন্দুকের মধ্যে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা ছিল। বিমান চালক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া বোতাম টিপিয়া ধরিলে হাওয়ার পাম্প হইতে বন্দুকে হাওয়া যাওয়ার পথ খুলিত। পাম্প হইতে সুরু করিয়া বন্দুক পর্যন্ত হাওয়ার চাপ পৌঁছাইতে পথে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইত। সব হইতে বড় বিঘ্ন ছিল হাওয়ার চাপ পথে কোথাও হারাইয়া যাওয়া। তখন বিমান চালক যতই বোতাম টিপুক না কেন, সেই বন্দুক হইতে আর গুলি নিক্ষিপ্ত হইবে না ; সেই বন্দুক তখনকার মত অকেজো হইয়া পড়িল। কোন বন্দুক অকেজো হওয়া মানে আয়ুধকারবারী বৈমানিকের তলব করা।

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

Cable

24-3146
24-6280

UMA ENGINEERING WORKS

70A, Dharamtala Street

CALCUTTA-13

MARINE AND INDUSTRIAL ENGINEERS

Factories At :

7/3, Chaulpatty Road, Calcutta-10 (Phone: 35-6113)
20, Chaulpatty Road, Calcutta-10 (Phone: 35-5311)

Dock Office :

115, Circular Garden Reach Road, Calcutta-23 (Phone: 45-8249)

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্তিকা

২৪শে নভেম্বর, ১৯৭০

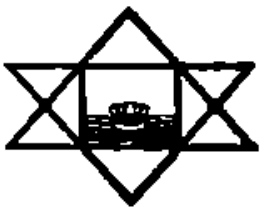

নভেম্বর ২৪, ১৯৭০

আলোর দিকে নিরন্তর মুখ রেখে চলতে হবে, এই হল অপরিহার্য প্রয়োজন। আলো যে আমাদের কত নিকটে তা আমরা ধারণা করতে পারি না। যে কোন মুহূর্তেই তার সমর এসে যেতে পারে।

—শ্রীঅরবিন্দ

৯-৯-৪০

মাতৃবাণী

জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে।

সেই উদ্দেশ্য হ'ল ভগবৎ-সাক্ষাৎকার, ভগবৎ-সেবা।

ভগবান দূরে নয়, তিনি আমাদের মধ্যেই রয়েছেন, অন্তরের গভীরে, আবেগের চিন্তাবৃত্তির উর্দ্ধে। ভগবানের কাছেই শান্তি আর নিশ্চয়তা, এমন কি সকল বাধা-বিপত্তির মীমাংসা।

*

তোমার সকল সমস্যা ভগবানের কাছে ধরে দাও, তিনি তোমাকে তোমার সকল বিপত্তির মধ্যে থেকে টেনে তুলবেন।

গোলাপ ফুল

লাল গোলাপ একটা শক্তির ভাব এনে দেয় আর সাদা গোলাপ এনে দেয় লাবণ্যের মাধুর্য্যের ভাব।

২৯-৬-৭০

মানুষ তার সকল হৃদয়াবেগ পরিবর্ত্তিত করে ভগবানের জন্য প্রেমরূপে। আর ভগবান সাড়া দেন তাঁর অনির্ব্বচনীয় ভালবাসা দিয়ে।

৩০-৬-৭০

সব গোলাপই আকার ও রং অনুসারে বলা যেতে পারে হ'ল ভগবানের জন্য ভালবাসা। একটি গোলাপ আছে যা হ'ল ভগবানের প্রেম।

৩০-৬-৭০

যখন আমি বলি ভাগবত-প্রেম তার অর্থ সেই প্রেম-স্পন্দন যারা যা সকল প্রেমের উৎস, যা বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছে। আমি যখন বলি ভগবানের প্রেম তার অর্থ সেই প্রেম-স্পন্দন যারা যা ভগবান একটা বিশেষ বিশ্বের উপর সংহত করে ধরেন (ব্যক্তি হোক বা বস্তু হোক)।

অরোভিল

অরোভিলের আত্মা ঐক্যের জন্য।

১৯৭০

প্রশ্ন বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মূল্যবোধ নিয়ে কি করবে একসঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারে আর কাজ করতে পারে?

উত্তর সমস্যার নীমাংসা হ'ল নিজের ভিতরে গভীরে চলে যাও। সেখানে আবিষ্কার কর সেই স্থানটি যেখানে সকল পার্থক্য মিশে গিয়ে সৃষ্টি করেছে সেই মূল শাশ্বত একত্বকে। ৪-৫-৬৯

*

প্রশ্ন অরোভিলের জন্ম কি ভগবানের ইচ্ছা? না, অরোভিল গঠনের প্রচেষ্টাকে ভগবান দেখেন একটা পরীক্ষণ হিসাবে?

উত্তর অরোভিলের পরিকল্পনা সর্ব্বতোভাবে ভাগবত-পরিকল্পনা এবং তা গঠন-প্রয়াসের বহু বৎসর পূর্ব্ব হতেই ছিল। অবশ্য গঠন-প্রক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ স্থানে মানুষী চেতনা এসে হস্তক্ষেপ করে। ১৭-৪-৬৯

অরোভিল-কর্ম্মীদের প্রতি

সকলের জন্য সদিচ্ছা, সকলের কাছে থেকে সদিচ্ছা, এই হ'ল শান্তির ও সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা।

সত্যকার অরোভিল-নিবাসী হতে হ'লে

(১)

প্রথম প্রয়োজন অন্তরকে আবিষ্কার, জানবার জন্যে সত্যসত্যই তুমি কি বস্তু, তোমার সমাজগত, নীতিগত, শিক্ষাগত, জাতিগত এবং জন্মসূত্রগত বাহ্য রূপাবলীর পশ্চাতে।

মূলকেন্দ্রস্থলে রয়েছে যে এক মুক্ত বৃহৎ জ্ঞানময় সত্তা তাই হল আমাদের আবিষ্কারের বিষয়, তাই হয়ে উঠবে আমাদের আপন সত্তার, আর অরোভিলে আমাদের জীবনযাত্রার সক্রিয় উৎস।

(২)

অরোভিলে বাস করা অর্থ নীতিগত সমাজগত সকল সংস্কার হতে মুক্তিলাভ ; কিন্তু এই মুক্তি অর্থ নয় আপন অহংকারের, আপন বাসনার, আপনার দুরাকাঙ্ক্ষার একটা নূতন দাসত্ব।

বাসনা চরিতার্থ করার অর্থ আন্তর আবিষ্কারের পথ অবরুদ্ধ করা। সে আবিষ্কার সংসিদ্ধ হতে পারে অখণ্ড নিঃস্বার্থতার শান্তির ও স্বচ্ছতার আশ্রয়ে।

(৩)

অরোভিল-নিবাসীকে সকল ব্যক্তিগত সম্পদের বোধ হারাতে হবে। স্থূলজগতের মধ্যে চলাফেরার জন্য আমাদের জীবনের পক্ষে আমাদের কর্ম্মের পক্ষে যা কিছু অপরিহার্য্য তা আমাদের ব্যবহারের জন্য এনে দেওয়া হবে, আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে।

আমাদের আন্তরসত্তার সঙ্গে যতই আমরা সচেতন সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারব ততই আমাদের জন্য কৃত ব্যবস্থা সব সুষ্ঠু হয়ে উঠবে।

(৪)

কর্ম্ম, শারীর কর্ম্ম অবধি আন্তর আবিষ্কারের পক্ষে অপরিহার্য্য। কর্ম্ম যদি না করা হয়, জড়ের মধ্যে যদি আপন চেতনাকে প্রবেশ করান না হয় তবে জড়ের কখনও কোন উন্নতি হবে না। শরীরকে আশ্রয় করে চেতনা যদি জড়ের একটুখানি সংগঠন করতে পারা যায় তবে তা খুবই ভাল। নিজের চারদিকে সাজিয়ে গুছিয়ে ধরা সাহায্য করে নিজের ভিতর সাজিয়ে গুছিয়ে ধরার পক্ষে।

জীবনকে সংগঠিত করে ধরতে হবে বাহ্যিক ও কৃত্রিম নিয়ম অনুসারে নয় কিন্তু অন্তরের সুগঠিত চেতনা অনুসারে. কারণ জীবনকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় যথেচ্ছ চলতে, তার উপর ঊর্দ্ধতন চেতনা ফেলে তাকে সংযত না করে, তবে একটা নির্দ্দিষ্ট আকার ও যথাযথ প্রকাশ তার হয় না, আর সময়ের অপচয় হয় অন্তত এই অর্থে যে জড় সচেতন ব্যবহারে আসে না।

(৫)

সমস্ত পৃথিবী আপনাকে প্রস্তুত করে চলবে নূতন জাতির আগমনের জন্য—এই আগমনের সম্ভব সিদ্ধির জন্য অরোভিল সচেতনভাবে কাজ করে চলতে চায়।

*

বিবাদ-কলহ অরোভিল-মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত।

অরোভিলে যে স্বাতন্ত্র্য আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই তার অর্থ স্বেচ্ছাবৃত্তি নয়, যে আপন খুসীমত কাজ করে চলবে সকলে, সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির কোন রকম কুশল-চিন্তা না করে।

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্ত্তিকা

প্রত্যেক অরোভিলবাসীর চেষ্টা হবে সকল বাসনা থেকে, সকল অনুরাগ থেকে, সকল বিরাগ থেকে নিজেকে মুক্ত করা।

অরোভিলে বাস করতে হ'লে মুখ্য সাধনা হবে সকল রকম অবস্থার মধ্যে সমত্ববোধ।

অরোভিল এবং ধর্ম্মমত

ধর্ম্মমত বলতে আমরা বুঝি জগৎ সম্বন্ধে বিশ্ব সম্বন্ধে এমন এক ধারণা যাকে একমাত্র সত্য বলে দেখান হয় আর তার উপর থাকবে অখণ্ড নিষ্ঠা, কারণ সাধারণতঃ বলা হয় এই সত্য হ'ল দৈব-উপলব্ধির ফল।

অধিকাংশ ধর্ম্মমত ঘোষণা করে ভগবানের অস্তিত্ব এবং সেই সব বিধি-নিষেধ যা মেনে চলতে হয় তার অনুগত হবার জন্য ; কিন্তু এমন সব ধর্ম্মমতও আছে যার মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব নেই, যেমন সেই সব সামাজিক তথা রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান যারা একটা আদর্শের বা একটি রাষ্ট্রের নামে দাবী করে একান্ত আনুগত্য।

মানুষের অধিকার রয়েছে সত্যকে সে স্বাধীনভাবে অনুসরণ করবে এবং স্বাধীনভাবে তার দিকে এগিয়ে চলবে, প্রত্যেকে নিজস্ব পথ ধরে। কিন্তু প্রত্যেকেরই জেনে রাখা দরকার যে প্রত্যেকের আবিষ্কার সুষ্ঠু শ্রেয়স্কর কেবল তারই জন্যে, অন্যের উপর তা চাপিয়ে দেওয়া চলে না।

আমরা চাই সত্যকে।

অধিকাংশ মানুষ, তারা যে জিনিষ চায় তাকেই বলে সত্য।

অরোভিলবাসীরা চাইবে সত্যকে তা যাই হোক।

অরোভিল হ'ল তাদের জন্যে যারা মূলতঃ ভাগবত জীবন যাপন করতে চায়, যারা সকল ধর্ম্মমত বর্জন করেছে, সে সব পুরাতন হোক, আধুনিক হোক, অভিনব হোক বা ভবিষ্যতের হোক।

সত্যের জ্ঞান আসে ক্রম-অভিজ্ঞতার ফলে।

ভগবানের অভিজ্ঞতা যার হয়নি, ভগবানের নাম করবার অধিকার তার নেই।

ভগবানকে জেনেছ যখন তখনই তোমার অধিকার হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে কথা বলার।

*

ধর্ম্মমত সম্বন্ধে জ্ঞানচর্চা হ'ল মানবচেতনার ঐতিহাসিক ক্রম-পরিণতির জ্ঞানচর্চা।

ধর্ম্মমত সব হ'ল মানুষের জীবন-ইতিহাসের অন্তর্গত। এইদিক দিয়েই তাদের চর্চা করা হবে অরোভিলে, ধর্ম্মবিশ্বাস হিসাবে নয় যে তাদের মানতে হবে কি মানতে হবে না,

কিন্তু মানবচেতনার একটা ক্রমগতির ধারা হিসাবে, মানুষকে নিয়ে চলবে যা, যা অনুসরণ করে মানবচেতনা পৌঁছবে গিয়ে তার সর্বোচ্চ সিদ্ধির দিকে।

*

কর্ম্মসূচী হ'ল পরমসত্যের অনুসন্ধান অভিজ্ঞতার আশ্রয়ে।

দিব্যজীবন কিন্তু ধর্ম্মমত নয়। আমাদের অনুসন্ধান হবে অতীন্দ্রিয়ের পথ ধরে নয়, আমরা ভগবানকে আবিষ্কার করতে চাই জীবনের ক্ষেত্রে। এই আবিষ্কারের কল্যাণেই জীবন সত্যসত্যই রূপান্তরিত হয়ে উঠবে।

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

(দ্বিতীয় পর্ব—সপ্তম সর্গ)

রাত্রিগর্ভে অবতরণ

(৪)

একটা ভূতাবিষ্ট জাতি এই সব রাজ্যে বাস করে,
একটা আসুরিক শক্তি লুকিয়ে রয়েছে মানুষের গভীর তলদেশে,
অবদমিত রয়েছে তা হৃদয়ের মানুষী বিধানের বশে,
স্তম্ভিত সে বুদ্ধির প্রশান্ত অধীশ্বর দৃষ্টিতলে,
গোপনে সঞ্চীত হয়ে চলে, অকস্মাৎ অন্তরাত্মার সন্নিদ্ধ বহ্নি আর ভূমিকম্প নিয়ে
জেগে উঠতে পারে, সঙ্গে ডেকে আনতে পারে তা সহজাত রজনীর ভার,
বিচার-বুদ্ধিকে সিংহাসনচ্যুত করে জীবনকে অধিকার করতে পারে,
প্রকৃতির, কম্পান্বিত ধরণীর পরে রেখে যেতে পারে বন্যপশুর তার ক্ষুরধার চিহ্ন ;
এই ত' এখানে তাদের সত্তার প্রদীপ্ত হৃদ্-গহ্বর।
বিপুল বীর্য্য এক, আসুরী দেবতা এক, কঠোর যে সবলের কাছে,
দুর্ব্বলের কাছে নির্ম্মম,
নির্নিমেষ সে চেয়ে রয় কঠিন নির্দ্দয় জগতের দিকে,
যাকে সে নিজে গড়ে তুলেছে, দিয়েছে তাকে পাথরের চক্ষু-তারকা,
বিরাজে যেখানে একমাত্র নিশ্চল চিন্তা ;
হৃদয় তার মাতাল রাক্ষসী ক্ষুধার সুরাপানে,
অপরের যন্ত্রণায় আনন্দ-শিহরণ তার,
শোনে সে মৃত্যুর আর বিনষ্টির সঙ্গীত মহান্ :
শক্তিলাভ প্রভুত্বলাভ একমাত্র ধর্ম্ম ও কল্যাণ এখানে ;
দাবী তার বিশ্বজগৎ হবে পাপের আপন নীড়,
আপন গোষ্ঠির কঠোর একচ্ছত্র শাসন
হবে সকল জীবন্ত জিনিষের নির্ম্মম নিয়তি ;
বিশ্বসত্ত্ব নিয়েছে একই রূপ, একই ছাঁচে ঢালা সব,
স্তব্ধ শ্বাসে বহন করে এক অদ্বিতীয় প্রভুত্বের আঁধার গুরুভার ;

পথে ও গৃহে, সমিতি ও সভায়
সাক্ষাৎ করে সে যাদের মনে হয় মানুষী জীব,
বাক্যে সে উড়ে চলে চিন্তার উত্তুঙ্গ পাখা মেলে
কিন্তু অন্তরে পুষে রাখে যা কিছু মানুষেরও অধম, যা কিছু হীন,
হীনতম সরীসৃপের ভূলুণ্ঠন হতেও নিম্নতর,
বুদ্ধি যে নিয়ে যাবে দেবতাদের পাশে,
তুলে ধরবে মানস স্পর্শের স্বর্গ শিখরে,
সে শুধু বৃদ্ধি করে তার আলোকের রেখায়
অধস্তন প্রকৃতির কুটিল বিকৃতি।
প্রায়ই পরিচিত মুখ এক দেখে সে চেয়ে চেয়ে,
পুলকিত সে সাক্ষাৎ পেয়ে তারে, পথে বিপদের বাঁকে
আশা তার দেখবে আবার আলোকের নয়ন এক,
আত্মার আন্তর নয়ন কিন্তু দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তারে সাবধান করে
সহসা সে আবিষ্কার করে নরক সর্ব্বত্র রেখেছে সেখানে পদচিহ্ন তার
অথবা ভ্রান্তিমুক্ত অন্তরের ইন্দ্রিয়ে দেখে সে
সুন্দর অথবা সবল আকারের মাঝে
অসুর আর রাক্ষস আর পিশাচ,
ধৃষ্টতা বিরাজে এক পাথর-গড়া, হৃদয়ে তার হিমকঠোর শক্তি,
বিরাট সে, তার বাধ্য তার অনুগত হ'ল অসুরের বিধান,
রাক্ষসী নিষ্ঠুরতার বিকট অট্টহাস্য সে,
ক্ষুদ্র বুভুক্ষার প্রীতিকর হিংস্র কর্ম্মরাজি,
চিন্তাশীল পশুদের ঐ বিশাল নাস্তিক্যের গুহাতলে
প্রীতির করুণার চিহ্ন কোন বৃথা খুঁজে ফিরি,
কোথা নাই মাধুর্য্যের স্পর্শমাত্র,
আছে শুধু পশুবল আর তার অনুগামী লোভ আর ঘৃণা,
বেদনায় সহায় নেই, কেহ নাই নিজেরও উদ্ধার চায় যে,
সাহস নাই কারও বাধাদান করে বা মুখে বলে মহান বাক্য কোন,
একচ্ছত্র মহাশক্তির রক্ষাকবচ পরিধান করে সে,
আপনি স্বাক্ষর করে সে আপনার কালান্তক শাসনের আদেশ সব,
রক্তপাত আর উৎপীড়ন হুকুম-নামা তার,
অন্ধকার ঘোষণা করে বাণী তার জগতের কাছে,
দাসানুদাস আবৃত নয়ন নীরবতা মনকে স্তব্ধ করে রাখে,
অথবা পুনরুক্তি করে সে শুধু অধিগত পাঠ;

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বত্তিক।

মুকুট মস্তকে, হাতে অধিকর্ত্তার দণ্ড,
বিধাতা আসীন সিংহাসনে—ভীত অবনত হৃদয় সব ;
শাস্ত্র তার অনুষ্ঠান তার ব্যবস্থা দিয়েছে জীবন্ত মৃত্যুর,
অসত্যের বেদী পরে হত্যা করে অন্তর-আত্মাকে,
সকলেই প্রতারিত অথবা প্রত্যেকে তার প্রতারণার সেবায় রত ;
শ্বাস-নিরোধী সেই পরিবেশে হয় না জীবনধারণ সত্যের,
দুর্গতি সেখানে আপনার আনন্দে আত্মবান,
ভীতি আর দুর্ব্বলতা আলিঙ্গনে ধরে রাখে আপনাদের অতল,
যা কিছু হেয় যা কিছু অপচিন্তা যা কিছু নিম্নতন
যা কিছু মলিন দুঃস্থ দুর্গত
আরামে নিঃশ্বাস ফেলে সেখানে, সুখী আপন হাওয়ার কোলে,
দিব্য মুক্তি কোন আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে না,
আত্মম্ভরী তারা শ্লেষ হানে উজ্জ্বলতর অবস্থার পরে,
গুহাগত লোকেরা সূর্য্যেরে ঘৃণা করে,
আত্মবিক্রয়ের ফলে লভেছে ইচ্ছা-কর্ত্তৃত্ব, আলোকেরে দিয়ে বিসর্জ্জন ;
অটল সংকল্প তার চিরকাল রয়ে যাবে সে আপনার মত মলিন আপনি,
সদর্পে প্রচার করে সে তার অদ্বিতীয় আদর্শ আর ঐশ্বর্য্যময় সত্তা ;
তার ক্ষুধা সে নিবৃত্ত করে লুঠেরার স্বপ্ন দিয়ে।
দাসত্বের শৃঙ্খল সে তুলে ধরে সম্মুখে রাজার মুকুট যেন,
দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরে রাখে তার দুঃস্থ রূঢ় স্বাতন্ত্র্যকে,
গর্জ্জে বৃষভকণ্ঠে সংযম-হারা জিহ্বার সহারে,
কর্কশ লজ্জাহীন উচ্চারণে আকাশ পূর্ণ করেছে,
যারা সাহস করে মানতে চায় সত্যকে, শাসায় তাদের,
ভীতি-বিহ্বল শ্রুতি যত তাদের একমাত্র অধিকারী সে,
বধির অনুগমন দেয় তার অনুমোদন,
শাস্ত্রের দর্প চিৎকার করে রাত্রির আঁধারে,
অধঃপতিত আত্মা একদিন ছিল যে দেবতা,
তার জন্য এখন শুধু রয়েছে শেষ রসাতলের আসন-মহিমা।

খামারের মেয়ে

শ্রীঅরবিন্দ

প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

ইসমেনিয়ার কক্ষ

ইসমেনিয়া

ব্রিগিদা দেরী করছে। উঃ, আমাকে নিশ্চয় তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই ত' ও আসতে চায় না, ও জানে তা হ'লে নিয়ে আসবে আমার মৃত্যু। না:। তা নয়, ওকে ধরে রেখেছে উত্তর পাঠানর জন্য। কিন্তু আমি ত' কোন উত্তর চাইনি, ভয়ে আমি মরে গেলাম; প্রাণ আমার, তোমাকে আমি পণ করেছি একটা হতাশ আশায়; আমি যদি জয়ী না হই তবে যে আমার দুঃখের শেষ থাকবে না, চিরদুঃখিনী হয়ে থাকব। ঐ যে, আসছে ও, আমার উৎকণ্ঠার ডানায় ভর করে সশরীরে জানলার ভিতর দিয়ে উড়ে যেন আসে; দীর্ঘ যে এক যুগ ধরে অপেক্ষায় রয়েছি, কমিয়ে দেওয়া যায় না তা? তার মুখ আমার নজরে পড়ছে না, তবে পায়ের শব্দ যেন আশা বহন করে নিয়ে আসছে। (ব্রিগিদার প্রবেশ) ব্রিগিদা, বোনটি, এলে শেষে? কি বললে আন্তোনিও? বল, বল শিগ্‌গীর করে। হা ভগবান, তোমাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

ব্রিগিদা

উঃ। কি শ্রান্ত হয়ে গিয়েছি। আমার কান দুটিও—তাদের এই স্বাভাবিক আঠার বৎসর ধরে যা শোনেনি তার চের বেশি বাজে কথা শুনেছে এই বিশ মিনিট ধরে। বাছা, নিশ্চয় তুমি ঘোর পাপ কিছু করেছ যার ফলে এই আন্তোনিওর মত প্রেমোন্মাদকে ভালবেসে ফেলেছ।

ইসমেনিয়া

কিন্তু ব্রিগিদা।

ব্রিগিদা

আর তার ছায়ানুচরটিও ওই ধরণের, যিনি যক্ষের মত আগলে আছেন তাঁর এই কবিত্বময় রত্নটিকে। আমাকে নিশ্চয় খেয়ে ফেলত যদি না তার তিনগুণ মুখের মত মশলা পুরে ঠেসে দিয়ে মুখটি তার না বন্ধ করে দিতাম।

ইসবোনিয়া

কেন ? কেন ? ব্রিগিদা।

ব্রিগিদা

উঃ। পুরুষেরা কি পরিমাণ মিথ্যাই না চালায়। শুনেছি এই যে বাজিল, যাকে জোর গলায় রসিকের রাজা বলে ঘোষণা করা হয়, যিনি হ'লেন এ যুগের হাস্যের ও ভাষণের অবতার—তবে বলি শোন বাছা, বিশ্বাস কর বা না কর আমি তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছি দু'চারটে বস্তাপচা রসিকতা দিয়ে, বাজারের মেয়েরা যেমন তৈরী করে থাকে তাদের লোক ধরবার জন্যে। রসিকজন ? ছাই ! মুখে তার একটি কথাও জোটেনি, যে কোন বোকচন্দ্র তার চেয়ে ভাল বলতে পারে।

ইসবেনিয়া

কি বাজে সব বকছ ? অন্তোনিওর সঙ্গে এসবের কি সম্বন্ধ ? নিশ্চয় তোমার বুদ্ধিটা ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে, ব্রিগিদা। বল এখন, আন্তোনিও কি বললে ? আমার যে আর তর সয় না ভাই।

ব্রিগিদা

বলছি, বলছি, দাঁড়াও না ! যত শিগ্‌গীর পারি বলছি। ভগবান, কি তাড়া না তোমার ! বাছা, তোমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। দাঁড়াও, ভিস্কটা নিয়ে আসি আমার ঘর থেকে। কি চমৎকার তিনকোণা শিশি, এক এক দিকে এক এক রং। ওটা চুরি করে এনেছি কুমারী ক্লারার ঘর থেকে তিনি যখন চার্চে গিয়েছিলেন সকালের অর্চনায়।

ইসবেনিয়া

বল না ! বল না ! বাজে বকছ খালি।

ব্রিগিদা

বলছি না ত' কি করছি ? শোন তবে। আন্তোনিওকে পেলাম তাঁর বাগানে। ভাল কথা, ইসবেনিয়া, তোমাকে বলছি কি, কুমারী ক্লারা এই নরশুয়োর জন্য নিজে বীজ বেছে রেখেছেন আমাকে দেবেন বলে। আমার মনে হয় এ বিষয়ে তাঁর মত বুদ্ধি কোন মেয়েরই মাথায় খেলবে না। পেদ্রোকে তাই বলছিলাম কাল আমাদের বাগান ঘরে—তোমার মনে আছে কি—কি প্রচণ্ড মেঘগর্জন হচ্ছিল, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, বোঝাই যাচ্ছিল না কোথায় আলো কোথায় অন্ধকার। আমি তখন দাঁড়িয়ে বাগানের দরজা থেকে বহু বহু দূরে—

ইসবেনিয়া

ব্রিগিদা, ব্রিগিদা, পায়ে ধরি তোমার ভাই—

ব্রিগিদা

উঃ। কি না তাড়া করছ আমায়। যখন আন্তোনিওর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম তার বাগানে—সত্যি ইসবেনিয়া, বাগানটি কি সুন্দর। আমি ভাবছি সামন্তরাজ বেলট্রানের মালী কোথা থেকে যোগাড় করল এমন জবাগুলি!

ইসবেনিয়া

উঃ! উঃ!

ব্রিগিদা

হাঁ কি বলছিলাম? হাঁ হাঁ, চিঠিখানা দিচ্ছিলাম আন্তোনিওকে। বুঝলে? বিশ্বাস করবে না বললে—কথার তোড়ে, রসরাজ মহাশয়, পুরন্দরীরাজ মহাশয়, সূক্ষ্মবুদ্ধিজিহ্ব মহাশয়—

ইসবেনিয়া

বলবে না? বলবে না? রাক্ষুসী, ডাইনী, ডাকিনী, মেয়ে-শয়তান তুমি! অসম্ভব সব নিষ্ঠুরতার নির্য্যাস তুমি।

ব্রিগিদা

হায়, কি করেছি আমি? এমন গালাগালি করছ আমায়! কথাটায় আসছিলাম আমি ছুটে, ডাকগাড়ীর চেয়েও বেগে—তুমি নিশ্চয় এমন নির্বোধ নও যে গল্পটায় চাও তুমি মুড়োটা আর ল্যাজটা—ঝুলিয়ে রাখবার মত কিছু নেই। সে যা হোক, আন্তোনিও চিঠিখানা হাতে নিলে—

ইসবেনিয়া

তারপর? তারপর! কি উত্তর দিলে?

ব্রিগিদা

তারপর খানখানা ঘুরিয়ে চারদিক বেশ করে দেখলে কোথা থেকে আসছে। এই কূট প্রশ্নটি নিয়ে পাণ্ডিত্বপূর্ণ আলোচনা করলে। তোমার হাতের লেখার জন্যে আমায় দিলে বিশ্রী গালাগাল।

ইসমেনিয়া

বোনটি, ভাইটি, লক্ষ্মীটি, প্রাণের ব্রিগিদা ! পায়ে পড়ি তোমার, মিনতি করি তোমায়, আমাকে নিয়ে আর খেলা ক'র না। আমি জানি তুমি তা কখনও করবে না যদি সব ঠিক-মত না চলত ; কিন্তু জান ত' তুমি কি দুর্ব্বল, ভীরু হয়ে ওঠে মেয়েদের হৃদয় যখন তারা ভালবাসায় পড়ে যায়। সুতরাং দয়া কর আমায়। এই যে পায়ে পড়ি তোমার লক্ষ্মীটি।

ব্রিগিদা

ও কি কর ইসমেনিয়া ? সারাজীবন আমি ত' দেখিনি এমন নরম তুমি, একমাত্র তোমার ভাইএর বেলায় ছাড়া। তবে তাকে আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। আমার উপরও সে শাসন চালাবে, আমি যদি ছেড়ে দিই। পায়ে পড়া পর্য্যন্ত ! চমৎকার। উঃ, আমার কি লোভটাই না হচ্ছে কতক্ষণ তোমাকে এভাবে রেখে দিতে পারি। নাঃ, আমিও নরম হব, শোন তবে, তোমার লেখাটা সে দেখলে খুঁটিনাটি করে, গালাগাল দিয়ে বললে লেখাটা এক কুঁদুলে নয় ত' লড়ায়ে মেয়ের হাতের।

ইসমেনিয়া

ব্রিগিদা, তুমি যদি সোজা কথায় আমায় না বল কোন বাগাড়ম্বর না করে সরল ভাষায় আমি যা জানতে চাই ঠিক সেই কথাটি, অতিরিক্ত কিছু নয়, নতুবা দোহাই ভগবানের, এই মারব তোমাকে।

ব্রিগিদা

এই যে, অপকর্ম্মে তুমি নেবে যাচ্ছ। তুমি কি তোমার ভাল মেজাজটা গুণে পঞ্চাশ সেকেণ্ডের জন্যও রাখতে পার না ? রাগ আর রাগ ! আচ্ছা, আচ্ছা, কি বলছিলাম যেন, হাঁ, হাঁ, তোমার হাতের লেখা, উঃ ! উঃ। উঃ। কি করছ তুমি ভাই। ভগবান রক্ষা করুন, ভাইটি ! বোনটি ! হাঁ, সে আসবে, সে আসবে, সে আসবে।

ইসমেনিয়া

আমাকে সে ভালবাসে ত ?

ব্রিগিদা

পাগলের মত। উন্মাদের মত। জন্ম হতে চক্রাহতের মত। ভগবান ! ভগবান।

ইসমেনিয়া

লক্ষ্মীটি, বোনটি, ব্রিগিদা, দেবী তুমি। কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব।

ব্রিগিদা

বাছা, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তুমি এরই মধ্যে হাঁফিয়ে উঠেছ। কাঁধটা আমার ঝাঁকিয়ে অর্দ্ধেক খসিয়ে দিয়েছ, আর চুলগুলিও অর্দ্ধেক উড়ে গিয়েছে তোমার কৃপায়—

ইসমেনিয়া

শোন না নাস্তিকের কথাটা। শরীরটা পেয়েছে একটু মোলায়েম নাড়াচাড়া আর চুলের গোছাও একটু নূতন করে সাজান হয়েছে—তোমার পাওনা এর চেয়ে ঢের বেশী। ঐ তোমার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত। এখন ঠাণ্ডা হও ত' বাছা শোন, কি বললে আন্তোনিও তবে? এস, বল, বল এখন। আমার তর সয় না আর।

ব্রিগিদা

হাঁ, বলছি তোমায় এই ত'। কিন্তু ইচ্ছা করলেও তা যে পারছি না। সে ত' বলছিল কাব্য।

ইসমেনিয়া

কিন্তু বল ত' আমার দুঃসাহস দেখে সে কি আমায় ঘৃণা করেনি?

ব্রিগিদা

চুপ! তুমি ত' দেখছি ন্যাকা! কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ইসমেনিয়া, সে তোমার প্রেমে পড়েছে ভয়ঙ্কর কাব্যিকরূপে—তোমার নামটা শুনেছে কি না শুনেছে অমনি মূর্চ্ছার তোড়জোড়। কিন্তু ঐটুকুই আমার সম্বল নয়, আরও কথা আছে। অনেক লোক রসুনের একটু গন্ধ পেলেই কিংবা একটা আরশোলা দৃষ্টিপথে এলেই যাবে মূর্চ্ছা কিন্তু তোমার ভদ্রলোক মিনিট দশেক ধরে তোমার চিঠিখানা নকল করে নিচ্ছিল তার নিজের বুকের মধ্যে বা ঐ রকম একটা কিছু প্রেমলীলার নোটবইতে। কিন্তু তাও কিছু নয়, তোমার নিজেরও স্থান ওখানে ছিল কিনা সন্দেহ, ছিল বোধ হয় পাতার আশেপাশে কোথাও; তারপর হুকুম করলে দেবলোকের কাছ থেকে ধার করতে উপমার জন্যে, ওটাও তক্ষুনি আবার ছেড়ে দিলে পুরাণ বাতিল বস্তু বলে, তেমনি সমান তোড়ে নস্যাৎ করে দিলে প্রাচীন কবির কামসূত্রাবলী। সেটাও ফেলে দিলে মধ্যযুগীয় ব'লে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চললে আলোর দিকে, উত্তাপের দিকে, কিন্তু তবুও আধুনিক বৈদ্যুৎশক্তি পর্য্যন্ত জের টানতে পারলে না। ভগবান, ভগবান! কি ছোড়দৌড় তার! উঃ, আমি যখন তাকে থামিয়ে দিলাম, মনে হ'ল তার বিশ্বাস হয়েছিল সে অন্ধ হয়ে গিয়েছে, রুদ্ধশ্বাস হয়ে গিয়েছে। উঃ, এখনও শরীর আমার কাঁপছে। কি মহা বিপর্য্যয়ই না ঘটত, যদি না আমি ঝাঁপিয়ে পড়তাম তার উপযাচক্রের নীচে। যাক

ভাই, মোদ্দা কথাটা হ'ল তোমাকে সে ভালবাসে, তোমাকে পুজো করে, এই এসে পড়বে এক্ষুনি তোমার কাছে।

ইসমেনিয়া

ব্রিগিদা, ব্রিগিদা, আমায় যেমন তুমি সুখী করেছ তেমনি সুখী তুমিও হয়ো নিজে।

ব্রিগিদা

সত্যি কথা বলতে কি, প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসা হ'ল যেন শিশুদের নূতন খেলনার মত, হাতে পেলে পাগল হয়ে যায় কিন্তু খেলায় যখন শ্রান্তি এসে যায়, তখন—না, আমি কিন্তু ও জিনিসের মধ্যে যাব না, কিছুতেই না। আমি হব চিরকুমারীদের আদর্শ নেত্রী—চিরকুমারীদের মহান শোভাযাত্রা আমার সমাধির পাশে এসে পুজো দেবে।

ইসমেনিয়া

এই রাতেই আসবে ত?

ব্রিগিদা

হাঁ, নিশ্চয়—যদি তার ভালবাসা এতক্ষণ টিঁকে থাকে।

ইসমেনিয়া

থাকবে ত'—হাজার বছর। এসো ব্রিগিদা, আমার সঙ্গে, এসো আমার সুখের ভাগ নাও এসে। আচ্ছা, এসো তবে।*

---

* অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রলয়পয়োধিজলে
ধৃতবানসি বেদম্

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আজকালকার পৃথিবী যে প্রলয়পয়োধি তা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। স্ফীত উদ্দাম উন্মত্ত জলরাশি গর্জন করে ছুটেছে, ভাসিয়ে ডুবিয়ে নিয়ে চলেছে মানুষকে মানুষের সৃষ্টিকে, আর সে জলোচ্ছ্বাস সমাকীর্ণ যত বিকট ক্ষুধার্ত জন্তুর দলবলে—হাঙ্গর, কুমীর, অনাম্না অদৃশ্য মূর্ত্ত অমূর্ত্ত আরও কত বিরাট বীভৎস দুর্ব্বার বুভুক্ষা যত।

আজ মানুষ এই যে বিপুল বিভ্রান্তি উদ্বেলতা উদ্‌ভ্রান্ততার মধ্যে পড়ে গিয়েছে এ তার কৃতকর্ম্মের ফল বটে কিন্তু সমূহ বিপদের কথা এই, বর্ত্তমান ধ্বংসযজ্ঞ কেবল মানুষী আতিশয্যের কল্যাণে সম্পন্ন হয়ে চলছে না। ভয়াবহ জিনিষটি হ'ল মানুষের মানুষী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে ফুটে উঠেছে—দেখা দিয়েছে—নেমে এসেছে রাজসিক আসুরিক এমন কি পৈশাচিক তামসিক শক্তিসব—সেই সব আবেগ ও বৃত্তি যারা চায় না মানুষের কল্যাণ, পৃথিবীর উন্নতি, যারা চায়না ভিতরের দেবতাকে, ভিতরের ভগবানকে, ভিতরের আলো ও জ্ঞানকে, চায় না মর্ত্ত্য স্বর্গের মত কিছু হয়ে উঠুক, চায় সৃষ্টি রয়ে যাক যাদিন সৃষ্টির মতই—যাদিন তামস মাধ্যাকর্ষণের বশীভূত, যেমন চিরকাল—

> Earth wheeled abandoned in the hollow gulfs
> Forgetful of her spirit and her fate.
> পৃথিবী ঘুরে চলেছে শূন্যগর্ভ গহ্বরের তলে পরিত্যক্ত হয়ে
> ভুলে সে গিয়েছে তার অন্তশ্চেতনা, তার ভাবী নিয়তি।

এই কি তবে শেষ? মানুষের, মানুষজাতির অন্তিম দশা? সৃষ্টির এক অঙ্কে আমাদের যেখানে অভিনয় করবার ভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়েছিল এই তার উপরে কৃষ্ণ যবনিকা?

অতীতের ইতিহাসে প্রলয় বা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অনেক হয়ে গিয়েছে, পণ্ডিতেরা, জ্ঞানীরা বলেছেন মানবজাতিরই সুদীর্ঘ পথযাত্রায় প্রলয় ঘটেছে, এক একটা সমগ্র সভ্যতা শিক্ষাদীক্ষা, হয় ত' যা সহস্র সহস্র বৎসর ধরে গড়ে উঠেছিল তা তলিয়ে গিয়েছে—অনেক ক্ষেত্রে চিহ্নমাত্র রেখে যায়নি। সমগ্র পৃথিবী না হোক, বিপুল ভূখণ্ড একটা সত্যসত্যই সমগ্রভাবে জলের তলে হারিয়ে গিয়েছে। বর্ত্তমানে যেখানে অতলান্তিক মহাসাগর আপনাকে বিস্তার করে রয়েছে সেখানে ছিল না কি এক বিপুল শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা, নাম দেওয়া হয়েছে তার আতলান্তিস। তারও পূর্ব্বে তার চেয়ে বিপুলতর সভ্যতা ও সাম্রাজ্য ছিল

প্রশান্ত মহাসাগরের কোলে যার ডুব্যাবশেষ পোলিনেশিয় দ্বীপপুঞ্জ—ভারতেরও দক্ষিণখণ্ড। বাইবেলও বিবরণ দিয়েছে এক বিরাট জলপ্লাবনের—নোয়া (Noah) ছিল তার সাক্ষী ভুক্তভোগী। বর্ত্তমান আর্য্যসভ্যতাও কি ওই রকমেই লুপ্ত হয়ে যাবে? সময় হয়েছে আজ? আমাদের কবিও বলে গিয়েছেন—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত
না তুয়া আদি অবসানা।"

কবি বলছেন সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মই কত উঠেছে, চলে গিয়েছে। তবে কবি ভরসা দিয়েছেন প্রলয়, মহাপ্রলয় ঘটলেও ভগবান নিজেকে তারই মধ্যে আটুট অক্ষত রেখেছেন, সৃষ্টির বীজরূপে, চিদ্‌ঘন মূল বিদ্যারূপে—বেদম্—এই হিরণ্ময় বীজ হ'তেই আবার নবসৃষ্টি। এই যে অমর চিরজীবী ভাগবত সত্তা—প্রকৃতির কর্ত্তা যে অধিপুরুষ—মানুষের মধ্যে সেই বস্তুই হ'ল তার অন্তরাত্মা। মানুষ, মানুষ অর্থাৎ ক্রমপ্রগতিশীল সত্তা তার এই অন্তরাত্মার কল্যাণে, মানুষের ভবিষ্যৎ তার এই অন্তরাত্মার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহিমায়। মানুষের মন, মানুষের প্রাণ বা দেহ তার প্রয়োজনীয় কিন্তু গৌণ অঙ্গ—এসব বাহ্য করণকে মানুষ যদি একান্ত আশ্রয় করে চলে তবে সে হয়ে ওঠে অসুর, দানব, রাক্ষস, পিশাচ পর্য্যন্ত কিন্তু দেবত্ব সে লাভ করে অন্তরাত্মাকে আশ্রয় ক'রে। সামাজিক জীবনেও এইসব গৌণ করণকে ধরে মানুষ লাভ করে ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য, বৈশ্যের ঐশ্বর্য্য, শূদ্রের শ্রমসামর্থ্য; কিন্তু এ সকলের শ্রেষ্ঠ পরম সুষ্ঠু প্রয়োগ ও সার্থকতা হতে পারে তাদের গোড়ায় ও প্রতিষ্ঠায় যদি থাকে ব্রহ্মতেজ—ব্রাহ্মণের দিব্যজ্ঞান। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মীস্থিতি—চিদ্‌ঘন জ্ঞানই হ'ল সৃষ্টির মানুষের শীর্ষ—এই উত্তম অঙ্গ যেখানে নাই তার আর যত অঙ্গই পরিপুষ্ট বা সমৃদ্ধ হোক না, তারই নাম হ'ল কবন্ধ—দৃষ্টিহীন ধড়মাত্র। কোথায় এই অন্তরাত্মা তবে? কোথায়, কি রকমে সাক্ষাৎ হবে তার? তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো...হে শুভ্র চিন্ময় জীব, তুমি নিজে সেই বস্তু। আপনাকে জান, আপনাকে পাও, তোমারই মধ্যে অন্তরে রয়েছে সেই অগ্নির শিখা, সূর্য্যের রেখা।

আমাদের ঘরের কবিও জিজ্ঞাসা করে গিয়েছেন

"কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো?"

উত্তরে বলছেন—

"বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।"

বিরহানল অর্থ একাগ্র আকুতি, অবিচলিত আকাঙ্ক্ষা, চিরজাগ্রত আস্পৃহা।

সৃষ্টির এই যে অন্তরস্থ অন্তরতম দৃঢ় কঠিন শাঁসটি (hard core) তাই থাকে বেঁচে বর্ত্তে; আর সব যায় ঘুয়ে গলে—এরই উদ্বর্ত্তন ঘটে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এরই ঘটে নবোন্মেষ। এই হৃৎকন্দরটিতে যারা আশ্রয়লাভ করেছে, তারই সঙ্গে সংযুক্ত, তারই অন্তর্ভুক্ত, সেই সব সত্তাই রয়ে যায় জীবিত জীবন্ত, মহাপ্রাণে প্রাণবন্ত। সেই চিরঞ্জীব বীজ থেকে ক্রমেই প্রকাশ পায় নব জীবনের পল্লবিত কুসুমিত মহিমা। বাইবেলের

শেষমানুষ নোয়ার যে নৌকা বা ভেলা (Noah's Ark) তা এই রকম একটা নবসৃষ্টির বীজাধাররূপে প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।*

আজকাল হ'ল ধ্বংসের জগৎ। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন decomposition-এর কথা। অর্থাৎ সব ধ্বংস পেয়ে চূর্ণ হয়ে পচে গলে চলেছে।

আজকালকার মানুষও শুধু যে বাধ্য হয়ে অসহায় হয়ে এই ভাঙনের স্রোতে পড়ে গিয়েছে তা নয়, সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় তাতে হাত লাগিয়েছে। ভাঙবার জন্য যত রকম বিভীষণ কৌশল সে আবিষ্কার করেছে তার পরিমাণের সীমা নেই, কূট-চাতুর্য্যেরও অন্ত নেই। তা ছাড়া এই ধ্বংসলীলায় অপরের সঙ্গে নিজেরও ধ্বংসসাধন হ'ল অপরিহার্য্য এবং স্বীকৃত অঙ্গ। অপরকে বিনাশ করতেও ইতস্ততঃ নেই, নিজের বিনষ্টিতেও সমান উদগ্রীব। বর্ত্তমান মানবসমাজেও নানা রকমে, নানা উপায়ে আত্মহত্যা হ'ল একটা নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান।

এই পরিস্থিতির মূল অর্থ চারদিকের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার, এগিয়ে চলবার অবকাশ আর নাই ; ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন দেয়াল-ঘেরা অচলায়তন হয়ে গিয়েছে, প্রতি পদক্ষেপে মাথা ঠুকছি দেয়ালে, তাই ত' এই ভাঙনের উদ্যোগ। কিন্তু অতীতকে, অতীতের বাধাকে যদি ভাঙতেই হয় তবে তার পদ্ধতি-প্রক্রিয়া কি হবে? জোর করে চাপ দিয়ে, ধাক্কা দিয়ে, বাহির থেকে—শুধু বলাৎকারের সহায়ে জিনিষকে ভেঙে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু লোপ করে দেওয়া যায় কি? বাহিরের আকারটি ভাঙবে হয় ত কিন্তু জীবন্ত মূল রয়ে যাবে, একটা রূপ নষ্ট হয়ে নূতন রূপ দেখা দিতে পারে, যদি অন্তরের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত না হয়। রূপ বদলালেও স্বভাব বদলায় না। ফরাসী বিপ্লবে তাই নিরন্তর পরিবর্ত্তন দেখে দেখে মনীষী এক বলে উঠেছিলেন, "Plus ça change plus ça reste le même।" আসল কথাটি তবে এই, ভাঙন লক্ষ্য নয়, তা আনুষঙ্গিক ফল হতে পারে মাত্র, আসল লক্ষ্য হ'ল স্বভাবের পরিবর্ত্তন—রূপ নয়, স্বরূপ বদলাতে হবে, স্বভাব বদলাতে হবে, শুধু বাইরের ভাবটি নয়। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টির এবং কর্ম্মগতির মুখ ফিরিয়ে ধরতে হবে। বাহিরের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু এ হ'ল সুযোগ, তাতে দেখিয়ে দিয়েছে অন্তরের পথ। অন্তরের পথ উন্মুক্ত চিরকাল, সেদিক দিয়ে যেখানে যথেচ্ছ অবাধে চলে যেতে পারি। শুধু তাই নয়, এই অন্তরের পথে যত এগিয়ে চলব দেখব আমাদের বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রও সেই অনুপাতে পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে।

---

* এই অংশটি কলিকাতার বেতার জগতের জন্য লিখিত—এখানে কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশিত হল।

সুতরাং বাহিরের অভিযানের চেয়ে এই অন্তরের অভিযান আরও আশু প্রয়োজন। আমাদের শক্তি, আমাদের বীর্য্য, আমাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, একাগ্র জীবনীশক্তি সব আমরা প্রয়োগ করব এই আন্তর-জগৎ জয় করবার জন্যে, তাহবার যে প্রলোভন ও প্রবেগ তাকে ঘুরিয়ে প্রচালিত করব এই আন্তর গঠনের গরীয়ান কর্ম্মে। আমরা যে সত্য প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই বাহিরের জগতে, প্রথমে তাকে প্রতিষ্ঠিত করি আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যে, নিজের চেতনায়, নিজের ধর্ম্মে-কর্ম্মে। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা আমরা চেয়েছি যাহা জগতে, কার্য্যতঃ তা সত্য হয়ে ওঠেনি এজন্য যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনধারায় তা সত্য হয়নি। সমাজের সমবেত জীবনে সে সত্যই বাস্তব হয়ে দেখা দেবে যে সত্য সমাজের অন্তর্গত প্রতি ব্যক্তির চেতনায় ও জীবনে বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধি আত্মোন্নতি হ'ল সামাজিক সিদ্ধিরও গোড়ার কথা—আদি পর্ব্ব। এ হ'ল ইংরাজীতে যাকে বলে একটা must, একটা absolute; কিন্তু এর অর্থ নয় আত্মার খোঁজে তুমি কারাগারকে স্বীকার করে সেখানে গর্ত্ত খুঁড়ে ধ্যানস্থ হয়ে নিমগ্ন থাকবে অর্থাৎ বাহিরের জীবন ত্যাগ করে এড়িয়ে চলে যাবে পর্ব্বত-শিখরে, বনে-জঙ্গলে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে যতদিন না পূর্ণসিদ্ধি লাভ কর—যতদিন না চাপরাশ তোমার হাতে এসে যায়; অবশ্য মানবসমাজের নেতা দিশারী যাঁরা হয়েছেন তাঁদের অনেকে এ পথ গ্রহণ করেছেন—বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, বিবেকানন্দ। তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে এ পথ সহজ নয়—কিন্তু একান্ত সহজ না হ'লেও কিছুদূর অবধি এপথেই চলতে হবে; কারণ লক্ষ্য আমাদের সহজ নয়, এ হবে কারাগার অচলায়তন স্বীকার করলেও তার ঘের, তার প্রাচীরের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে বের হওয়ার পথ—এই সুড়ঙ্গ করাই হ'ল বর্ত্তমানের কর্ম্মযজ্ঞ।

নূতন সত্য নূতন গুণ আমাদের অর্জ্জন করতে হবে সাধারণ জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে, তার সহায়ে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন—অর্জুন সাধারণ মানুষের প্রতীক। অর্জুনকে যোগস্থ হতে হয়েছে যুদ্ধ করতে করতেই—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা বসু

(২১)

সম্যক জ্ঞানযোগের জ্ঞেয় বস্তু হলেন শাশ্বত নির্বিশেষ অনন্ত যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তিনিই। নেতি নেতি করে শেষ পর্যন্ত উত্তিরে গিয়ে যেমন তাঁকে জানতে হবে, আবার সেই জানাই ইতি হয়ে বিশুদ্ধ বোধে পর্যবসিত হবে। জ্ঞানের প্রধান সাধন যে বুদ্ধিযোগ, তা হৃদয়ের প্রদ্যোতে রসান্বিত মনীষায় যেমন পরিপক্ক হবে, তেমনি বলতে পারি বোধি বুদ্ধিকে সর্বতোভাবে আলোকিত করবে। শিবশক্তির সামরস্যে সত্তা যেমন আপ্লুত হবে, সম্যক জ্ঞানের সেই প্লাবনে সত্তার গহন গভীর কোনও স্তরে কোন ফাঁক আর অজানা থাকবে না। তার অর্থ কিন্তু এ নয় যে জানা ফুরিয়ে যাবে। পরবার আবেশে পরা বিদ্যার আলোকে অপরা বিদ্যারও সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটানো যাবে, সম্যক জ্ঞানযোগের এই এক অপরাজিতা শক্তি।

মন শাণিত হলে হয় বুদ্ধি। মন ইন্দ্রিয়নির্ভর, আর বুদ্ধি মনোনির্ভর। বুদ্ধি নিয়েই জ্ঞানের পথে চলতে হয়, কিন্তু পরম জ্ঞানকে বলা হয়েছে "যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।" সেখানে পৌঁছলে বুদ্ধিও পূর্ণতা লাভ করে। বোধির সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়ে তখন সে বোধিরই চিরসঙ্গী হয়ে যায়। রূপান্তরিত ঐ শুদ্ধ বুদ্ধি জগতের মূল ভ্রান্তি নিরসন করে। তখন সব কিছুই চৈতন্যময় হয়ে দেখা দেয়, জড়ের মূলে চৈতন্যের আলো পড়ে তাকে রূপান্তরিত করে।

সহসা জ্ঞেয় বস্তু যেন চোখের সামনে খুলে গেল, দিব্য শ্রুতির সাক্ষাৎকার হল, এই ভাবে বোধিকে বোঝানো হয়েছে। উপনিষৎ তাকে বলেছেন প্রতিবোধ, বৌদ্ধেরা বলেছেন সম্যক্ সম্বোধি। আবার বুদ্ধির সাধন হল মনন ভাবনা ইত্যাদি। সাধকদের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করে চলতে হয়। কিন্তু শ্রবণেই যদি বোধ এসে যায়? উত্তম অধিকারীর যেমন হয়ে থাকে যে, মহাবাক্য বা মন্ত্র শোনা মাত্রই সবটা একসঙ্গে খুলে যায়, আর জানবার বা প্রমাণের কিছু বাকি থাকেনা। সেই আলো সঙ্গে থাকলে যার ওপর পড়ে, সেও আলো হয়ে যায়। নিশ্চলদাস বিচারসাগরে বলছেন যে, উত্তম অধিকারীর শুনলেই জ্ঞান হয়। কিন্তু সকলের তা হওয়া সম্ভব নয়। তাই শ্রবণের পর মনন চলে। মন পরিষ্কার হয়ে গেল, কিন্তু থাকল না। মনোজ্যোতি ফুটল, আবার নিভে গেল, সব ভুলে গেলাম। তখন গভীরে ধ্যানের আসনটি পেতে বারবার ধ্যান জমাতে হয়, আর ধ্যানচিত্ত দিয়ে তাকে ধরে রাখতে হয়। এই রকম করে অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তরঙ্গ যোগে যেমন ধারণা ধ্যান ও সমাধি আসা পর্যন্ত দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে তারপরে বস্তু লাভ হল, তাতে একাকার হয়ে পরম জ্ঞান লাভ হল। এই হল এক ধারা।

কিন্তু কারও এমন হয় যে, মনোজ্যোতি এসে এমনভাবে তার চিত্ত প্লাবিত করে ব্যাপ্ত করে দিল যে যেখানেই মনের সেই জ্যোতি পড়ছে, তাতেই সম্যক ধ্যান লেগে যাচ্ছে—সে এক লাগ্রত সমাধির অবস্থা। আমরা বলে থাকি, মনন নিদিধ্যাসন ইত্যাদি ক্রমে ব্রাহ্মীদীক্ষা, কিন্তু কারও কারও ক্ষেত্রে এই মনোজ্যোতি আলো ফেলে ফেলে বোধকে জাগিয়ে দেয়, যাতে চিকিত্বিন্ মন বা বোধিমননের স্ফুরণ হয়। সেখানে হঠাৎ সব আবরণ সরে গিয়ে এক প্রবল শক্তিপাতে সবটা খুলে গেল, এরকমও হয়—উত্তম অধিকারীর মহাবাক্য শ্রবণে যে রকম ধারা হয়ে থাকে বলে শোনা যায়। একে শাম্ভবী দীক্ষা বলা হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই শাম্ভবী দীক্ষার ধারাই ধরিয়ে দিয়েছেন। বেদের সেই চিন্ময় প্রত্যক্ষবাদের ভূমিকায় আমরা যে মন্ত্র শুনেছি "ভদ্রং কর্ণেভি শৃণুয়াম দেবা...স্থিরৈরঙ্গৈ স্তুষ্টুবাংস স্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ" ইত্যাদি। স্থির অঙ্গে দেহটি হয়ে গেছে স্তবের শিখা এবং নম্র শুশ্রূষণে স্থিতি এই শরীরকে করছে ব্রাহ্মীতনুতে রূপায়িত, আর Spiritual Intuition বা প্রাতিভসংবিৎ নিয়ে সব কিছুর মধ্যে আলোর পর আলোকপাত করে চলছে। ঐ বৈদিক চিন্ময় প্রত্যক্ষবাদে সাধনার যে সহজ ধারার কথা আমরা শুনি, সেই সহজভাবে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে চলাই হল শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের প্রাথমিক ভূমি লাভ করা।

বুদ্ধি দিয়ে যতক্ষণ আমরা জানার চেষ্টা করি সেটা যেন ওপরে ভাসা, তাকে হৃদয় দিয়ে বুঝলে তখন আর কোনও বাধা থাকে না। যে জানায় দরজা জানালা হাট করে আলো এসে পড়ার মত জানা যায়, কোন আড়াল থাকে না। মানুষ যেমন শৈশবে ও কৈশোরে থাকে, তাদের চোখের আলোয় তখনও কোন বাধা এসে পড়েনি। তারুণ্যে এলে মানুষের বাইরের দৃষ্টি পরিণত হয়, তখন আর ঐ সহজ-বোধ ঠিক থাকে না। তখন বুদ্ধির জোর ধরে। মনের জানা হল যে খণ্ড করে জানা, সেগুলিকে এক করে জানা যাকে বলে—সামান্য জ্ঞান, তাই হল বুদ্ধির ধর্ম। তাতে চিত্ত উদার হয়, তত্ত্বজ্ঞানকে আভাসে পাওয়া যায়, কিন্তু সম্যক্ হয় না। বুদ্ধিকে বড় করতে গিয়ে আমরা যদি হৃদয়কে ভুলে যাই, তখনই একদিকে ঝোঁক পড়ে যায়, সমতা হারিয়ে ফেলি।

বেদের যুগকে মানবজাতির বাল্য ও কৈশোর বলা যায়। সেখানে তত্ত্বজ্ঞান অনায়াসে প্রত্যক্ষ-গোচর হয়, অপরোক্ষ অনুভব সর্বসত্তা দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তারপর মানবজাতির তারুণ্যে বুদ্ধির যুগ ক্রমশ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য যতই না কেন চোখ ধাঁধিয়ে দিক, তাকে হৃদয়ের উজ্জ্বল রসে জারিত করে নিতে হয়, না হলে পূর্ণতা আসে না। উপনিষদের পরবর্তী যুগেও মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের উভয়ের ভারসাম্য বজায় ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য নেতি নেতি করে জ্ঞানের চরমে গিয়েও শেষে হৃদয় খুলে যাবার কথা বলেছেন। আর তখনই সাধক হয় কবি। সাবালক হলে বুদ্ধি যে পরিণতি লাভ করে, তাতে সম্যক্ দর্শনকেও যেন যাচাই করতে মননের ক্ষেত্রে নাবাতে হয়। এই রকম করে এদেশে বিভিন্ন দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলতে পারি, বুদ্ধিযোগই মনীষার সন্ধান দেয়। পরম পুরুষ ষোড়শ বর্ষীয় কিশোর যাবার তিনি কবি ও তারপর

মনীষী। কবি ক্রান্তদর্শী। তাঁর দর্শন গ্রহণ করে মনীষার সঙ্গে হৃদয়কে, আর তাই দিয়েই কাব্য সৃষ্টি হয় "দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি"—দেবতার সে কাব্য দেখবার মত, যা কখনও মৃত্যুগ্রস্তও হয় না, জীর্ণও হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য জ্ঞানীর লক্ষণ দিয়েছেন "জ্ঞানেন নির্বিদ্য বালোন তিষ্ঠাসেৎ"। জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানী বালকের মত হয়ে যাবেন। ঐ শৈশব ও কৈশোর আবার ফিরে আসে, তিনি সহজ হয়ে অবস্থান করেন। এই রকম করেই সাংখ্যজ্ঞান ও বেদান্তজ্ঞান নিলিয়ে সহজ হতে পারলে সমাক জ্ঞান লাভ হয়।

মোক্ষোলজাতির মধ্যে ঐ শৈশব ও কৈশোর অবস্থা এখনও আছে, তাই তারা ভগবান বুদ্ধকে সহজ ভাবে ধরতে ও বুঝতে পারে। নাগার্জুনের দুরূহ সুকঠিন তত্ত্ব তাদের মেয়ে পুরুষ অশিক্ষিত হয়েও সহজে ধারণা করতে পারে। এই ভাবে বোধির আলোয় জ্ঞান লাভ হয়। আমরা এখন বুদ্ধি দিয়ে তর্ক করে অনেক কসরৎ করে যখন তা বুঝতে চাই, তখনই সেটা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে। তাই বলে বুদ্ধির ঐশ্বর্য মানতে হবে বৈকি! শুদ্ধবুদ্ধি বুদ্ধিযোগ সব বুদ্ধিমানেরই লভ্য, সেই সঙ্গে হৃদয়ও খুলে যায়। বুদ্ধদেব বলেছেন, জ্ঞানের পথে আমি ভাঙতে-ভাঙতে চলি। ঋষির দৃষ্টি হল, এক নজরেই সবটা দেখা। এই হল মোটামুটি দুই ধারার কথা। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে এগুলির প্রয়োগে এত সমালোচনা, এত বিরোধ দেখা দেয় কেন?

আমরা আগেই দেখেছি যে সাংখ্যের মূল কথা দুঃখবাদ আর বেদান্তের আনন্দবাদ। মানুষের শৈশবে ও কৈশোরে সহজ যে আনন্দ থাকে, পরিণত জীবনে ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে হিসাবী বুদ্ধির কাছে তা যেন বিকৃত হয়ে যায়। সারা জীবন ধরে শৈশবের ঐ সহজ আনন্দ-বোধ নির্মল থাকে, এরকম অধিকারী খুব কম দেখা যায়। রবীন্দ্রকাব্যে আমরা ঐ কৈশোরের সহজ আনন্দ-ধারার সন্ধান পাই, তাঁর সমগ্র কবিজীবন ঐ সহজ আনন্দের পরিচয় দেয়। অধিকাংশ মানুষই পৃথিবীর দুঃখভারে প্রপীড়িত, দুঃখ থেকে তারা মুক্তি চায়। যদি তখনও আনন্দবাদ তাদের জীবনে টিকে থাকে, তাহলে তার পরিণাম হয় ব্যাকুলতা। দুঃখবাদ থেকেই প্রয়াস ও বিচারবুদ্ধি আসে। আঘাত খেয়ে খেয়ে আমরা তত্ত্বদর্শীর দিকে ফিরি তত্ত্বলাভের জন্য; তখন ব্যাকুলতা সহজ হয়। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে মোক্ষবাদ যেন পেয়ে বসেছে, তাই জগৎ সংসার জন্ম মৃত্যু জরা এ সবের থেকেই আমরা মুক্তি চাই, আর দুঃখভোগের জন্য দায়ী করতে চাই শুধু পারিপার্শ্বিককে। সাংখ্যদর্শন বলেন, তা ঠিক নয়, তোমার দৃষ্টির মোড় ঘুরিয়ে দাও, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা বাইরের অভিঘাত থেকে নিজেকে তুলে ধর। এই দৃষ্টি থেকেই বিবেকজ্ঞান লাভ হয়। পুরুষকে অপরা প্রকৃতির কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দদর্শনেও এই দৃষ্টি গ্রহণ করা হয়েছে, সাধনার শুরুতে এটা করতে হয়, কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। মুক্তির (liberation) পরের কথা হল স্বাতন্ত্র্য (freedom), এই স্বাতন্ত্র্য চাই। শৈবদর্শনে ঐ স্বাতন্ত্র্যের কথা আছে। সেখানে বলা হয়েছে শিবই স্বয়ং পঞ্চকৃত্যকারী। তিনিই স্বেচ্ছায় জীব হয়ে যেমন বন্ধন গ্রহণ করেছেন, আবার তাঁরই অনুগ্রহ-শক্তিতে জীবের বন্ধন থেকে মুক্তি ও স্বাতন্ত্র্য

লাভ হয়। তাই তাঁর পঞ্চকৃত্যের মধ্যে সৃষ্টি স্থিতি লয় ছাড়াও রয়েছে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ শক্তি। যুক্তি চাইতে গেলে আমরা বুঝি যে, সব কিছু থেকে দূরে সরে যাওয়াটাই বুঝি বড় কথা, যাতে বাহিরের বস্তু ত্যাগ করাটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। দুঃখবাদ আমাদের এমন ভাবেই পেয়ে বসেছে যে মোক্ষ বলতে শূন্যতা বা একটা শুধুই ফাঁকা নিষ্প্রাণ অবস্থা বুঝি যেটা জীবন থেকে দূরে সরেই থাকে। কিন্তু যিনি বাঁধেন, সেই প্রকৃতিই দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি সবই, আত্মার তো কোন বন্ধন নেই, তিনি এ সবের উর্ধ্বে। নির্বাণঘটকে নেতি নেতি করে সেটা দেখানো হয়েছে : মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত ইন্দ্রিয়সকল নেতি করে পঞ্চভূত পর্যন্ত সব ছাড়িয়ে যথার্থ অহং বা আত্মা। তিনিই শিবোহম্ চিদানন্দরূপ।

কিন্তু গীতা এর পরের কথা বলেছেন যে, দ্বন্দ্বাতীত অবস্থার নেতিকে পেরিয়ে যে অস্তিতার বোধ, যেখানে প্রসাদ প্রসন্নতা আসে, তখনই সত্যকার দুঃখবোধ চলে যায়। এই হল যথার্থ অস্তিভাব আর তখনই ঠিক ঠিক দুঃখ নাশ সম্ভব হবে। এটা ঠিক সাংখ্য-দর্শনের কথা নয়, বেদান্তদর্শনের আনন্দবাদের কথা। গীতার প্রথমেই উপদেশ "তিতিক্ষস্ব", সাংখ্য-বাদী এই তিতিক্ষার সহায়েই আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন। প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত হওয়া আত্মার স্বধর্ম। সুখ দুঃখ ভাল মন্দ ইত্যাদি দ্বৈত-বোধ সব প্রকৃতির এলাকায়। তাই তাতে ঐরকম শান্ত "উদাসীনবদাসীন" থাকার উপায়ই হল দ্রষ্টৃস্বরূপে বিবেকবান পুরুষের অবস্থান। কিন্তু এই ভাবেই শেষ করলে অখণ্ড দর্শন হয় কি করে? দ্রষ্টা কি তাহলে প্রকৃতির ভর্তা অনুমন্তা ও ভোক্তা নন? কট্টর সাংখ্যবাদী সেক্ষেত্রে বলতে পারেন যে ভোগ সমূলে উৎখাত করতে হবে বৈরাগ্যের সহায়ে। কেননা কর্তা ও ভোক্তা হতে গেলেই জড়িয়ে পড়ব। তবেই তাই শেষ পর্যন্ত নৈষ্কর্ম্য দিয়ে কর্তৃত্বও নাকচ করে দাও। তবেই যুক্তি পাবে আর প্রশান্তি তোমার অধিগত হবে। দুঃখের বিষয়, বৌদ্ধ যুগের পর থেকে এই সাংখ্যবাদই ভারতের সাধনায় একেবারে চেপে বসেছিল।

কিন্তু বুদ্ধদেবের পূর্বেও সাংখ্যদর্শন সম্প্রদায় পরম্পরা ক্রমে ভারতের সাধনায় চিরকাল অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণীয় ছিল। বেদের সময় থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতায় আমরা সেই আদি সাংখ্যের স্বরূপ দেখতে পাই। যদি প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে প্রকৃতি চৈতন্যেরই শক্তি। প্রকৃতি পরিণামিনী, গুণক্ষোভ তার পরিণাম। গুণের কারণা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত থেকেই যে তাঁরা পেয়েছিলেন, এরকম চিত্র বেদে পাওয়া যায়। সূর্যোদয়ের পূর্বে যে আঁধার তা তমোগুণেরই মূঢ় অবস্থার প্রতীক, আর সত্ত্ব বা সূর্যের উদয়—আলো হল প্রকাশধর্মী। রজোগুণ উষার রক্তচ্ছটা যার পরিচয়, তা থাকে ঐ দুই গুণের মাঝখানে আঁধার থেকে যেমন আলো হয় আবার ঐ আঁধারের কোলেই আলো চলে পড়ে। সাধনা করতে গেলে প্রথমে আমাদের যে অবস্থা হয়, এই আলো একটু পেলাম আবার হারিয়ে গেল। এই উঠি এই পড়ি, হাহাকার। এ সবই গুণক্ষোভের পরিণাম। তাই পরবর্তী সাংখ্যদর্শনে তিন গুণেরই মূলোচ্ছেদ করার প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু বেদে ও পুরাণে সাংখ্য এতটা একদেশী ছিল

না। গুণাতীত দশার ওপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে এঁরা বলছেন যে তিন গুণ এমনভাবে মেশানো রয়েছে যে, জীবনের মধ্যে সত্ত্বগুণকে শুদ্ধ রূপে পাওয়া যায় না। সেই রামকৃষ্ণদেবের তিন ডাকাতের গল্প এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সংসার-অরণ্যে সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন ডাকাতের হাতে পড়ে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাই। সত্ত্বগুণে আমাদের জ্ঞান আসে, কিন্তু সংসার-অরণ্যের মধ্যে থেকে মিশ্রিত গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ জোর ধরতে পারে না, শুদ্ধ থাকে না। তাই এঁরা বলেন তিনগুণই উপড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হও। গীতার কিন্তু এর পূরণ আছে। তাঁর নিজস্ব প্রকৃতি হলেন পরা প্রকৃতি, শ্রীঅরবিন্দ দর্শনে তিনিই চৈত্যপুরুষ। শ্রীঅরবিন্দ গুণের রূপান্তরিত অবস্থা দেখিয়ে এই সমস্যার সমাধান করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের এই হল একটা বড় স্তম্ভ। আত্মবিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আমিই বাঁধা পড়ি আবার আমিই মুক্ত হই। "মমৈবাংশ জীবভূতা সনাতনী" আমারই গভীরে —"যয়েদং ধার্যতে জগৎ"। জীবের দেহের মধ্যে গভীরে নিহিত সেই তাঁর একটি অংশু, একটি কিরণ হয়ে (ray divine) ব্রহ্মরন্ধ্রভেদ করে তাঁরই প্রতিভূ হয়ে বিরাজিত। সেই চৈত্যসত্ত্বকে জ্ঞানের সাধনায় দোসর করে নিলে সাধনা সহজ হয়। কিন্তু সেই চৈত্য সত্ত্বকেই যে আমরা ভুলে থাকি। পরাপ্রকৃতি স্বরূপে হলেন শুদ্ধসত্ত্ব, গীতার ভাষায় নিত্যসত্ত্ব "রজস্তমোলেশ" বর্জিত প্রকৃতির উচ্চতর স্তর। প্রচলিত সাংখ্য দর্শনে তিন গুণের মিশ্রণের কথা আছে, কিন্তু শুদ্ধ গুণগুলির কথা সেখানে পাই না। এই মতে প্রকৃতির গুণসাম্য অব্যক্ত দশায়, সেটা প্রলয় আর পুরুষ তো নির্গুণ, তাঁর কোনও গুণের বালাই নেই।

কিন্তু যোগীর মতে পুরুষের অব্যক্ত দশায় গুণগুলি এক শুদ্ধ অবস্থায় থাকে। পুরুষের গুণসাম্য, বলতে তাহলে রূপান্তরিত গুণ বা শুদ্ধ গুণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেখানে তমোগুণ স্থৈর্যে পরিণতি লাভ করে, রজোগুণ শক্তি বা বীর্যে প্রকাশ—ব্রহ্মকোভ, আর সত্ত্ব গুণে উজ্জ্বল প্রকাশ সূচিত হয়। আদিত্যবিম্ব থেকেই আমরা সেটা ধরতে পারি যে বাইরে রশ্মিসমূহ বিকীর্ণ পরিকীর্ণ, কিন্তু বিচ্ছুরিত সমস্ত সেই জ্যোতিঃপুঞ্জের রাস টানা রয়েছে ভেতরে। সেই রসজ্যোতি টলমল টলমল করছে যেন ব্রহ্মক্ষোভ। এই ভাবে সত্ত্ব রজ ও তম তিন গুণ শুদ্ধ ভাবে থাকলে পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির উচ্চতর ভাব ঠিক মত বজায় থাকে। শ্রীঅরবিন্দের যোগ সাধনায় এই পুরুষের গুণসাম্যের অবস্থায় পৌঁছানো একটা বড় খুঁটি—যোগের ভাষায় মুক্তভূমিক হওয়া।

সাংখ্যের ঐ প্রকৃতিবাদই পরবর্তী বেদান্ত দর্শনে মায়াবাদে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। উপনিষদের দুই স্থানে মাত্র "মায়া" শব্দটি পাওয়া যায় সেখানে মায়া ও প্রকৃতি এক অর্থে ব্যবহৃত। সেখানে সাংখ্যপ্রভাবিত অর্থ এসে পড়েছে বলে মনে করা হয়। কেননা বেদে মায়া শব্দটি প্রজ্ঞা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, একথা আগে আমরা আলোচনা করেছি। মায়া সেখানে বরুণের শক্তি। জগৎ যাতে রয়েছে, আবার জগৎ ছাপিয়েও তাঁর দুরধিগম্যা প্রজ্ঞাই মায়া, তাই অনির্বচনীয়া। সেই মায়াই সৃষ্টি করবার বা গড়ে

তোলবার শক্তি (creative force) পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্যও অবিদ্যা ও মায়াকে পৃথক করে দেখিয়ে বুঝিয়ে গেছেন। মলিন সত্ত্ব প্রধানা হল অবিদ্যা যা জীবের আশ্রিত আর শুদ্ধসত্ত্ব প্রধানা মায়া ঈশ্বরাশ্রিত। এই বিচারটুকু ভুলে গিয়ে আমরা অবিদ্যাকে কাঁপিয়ে তুলি, তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে সাধনা করতে যাই, আর শেষ পর্যন্ত তাকে এড়িয়ে যাওয়াই চরম লক্ষ্য হয়ে পড়ে। জীবনকে একদেশী দর্শন দিয়ে দেখলে পরেই তিন গুণের বন্ধন থেকে একেবারে মুক্তি নিয়ে জগৎ ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত এসে পড়ে। শুধু কি তাই! এই দৃষ্টিতে ঐ ভ্রান্তি বা মায়াকে আমরা পরম পুরুষে পর্যন্ত উপচরিত করে তুলেছি, যেন এই মায়া তাঁর একটা ভুল। সে পর্যন্ত পুরুষ কেবল দ্রষ্টা হয়েই রইলেন, ভোগে আর কর্তৃত্বে তাঁকে আর যেন আনাই গেল না।

শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু গীতার ব্যাখ্যায়ও দেখিয়েছেন যে পুরুষ তো শুধু নির্বিকার দ্রষ্টা মাত্র নন, উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর। তিনি নিষ্ক্রিয় হলেও কোন সময়েই নিঃশক্তিক নন। তিনি প্রকৃতির ভর্তা হয়ে তাকে বুকে ধরে রেখেছেন, প্রকৃতির সব কিছু ভোগ তাঁরই বুকে। তার খেলায় তিনি সময় দিয়েছেন বলেই না সেটা অনুষ্ঠিত হতে পারে। তিনি তার ঈশ্বর। গীতায় এই ভাবে সাংখ্য জ্ঞান উপদেশ করা হয়েছে, তা জগৎ-বিমুখ নয়। সোহহং ভাব রেখেও শান্ত থাকতে হবে, "প্রধ্বস্ত বিগতস্পৃহ" হতে হবে। এই ভাবে গুণক্ষোভের উর্ধ্বে থেকে কর্ম করতে হবে। স্বদেশী যুগে শ্রীঅরবিন্দ সক্রিয় ভাবেই সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বৈপ্লবিক কর্মপন্থা অনুমোদন করেছিলেন, কিন্তু নিজে অবিক্ষুব্ধ ছিলেন। ঐ রকম বিগতস্পৃহ হয়ে প্রকৃতির উপদ্রষ্টা হয়ে প্রকৃতির কর্মের অনুমন্তা হয়ে তাকে কর্ম করতে দিলে, তার নিজের পথে চলে প্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটে। গীতার ঐ সাংখ্য জ্ঞানই আদি সাংখ্য ও বেদমূল। আদি বেদান্ত ও আদি সাংখ্য পরস্পরের পরিপূরক হয়ে জ্ঞানযোগের পূর্ণ সহায় হয়। শ্রীঅরবিন্দ ঐ আদি সাংখ্যের ধারা ধরেই সম্যক জ্ঞান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। গীতায় ও ভাগবত পুরাণে এই ধারার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে মিলিয়ে নিলে সেই সম্যক সম্যক জ্ঞানযোগের ধারণা সহজ হতে পারবে।

তাহলে জ্ঞানযোগীর করণীয় পেলাম ঐ গীতা প্রবক্তার সাংখ্যজ্ঞান অবলম্বন করে চলা। প্রথমে বিবেকবাদের প্রভাবে সেখানে 'নেতি' করেই অপরা প্রকৃতিকে বর্জন (rejection) করতে হয়। কেননা আমার মধ্যে প্রকৃতির যে মালিন্য রয়েছে, তা থেকে মুক্তি চাই। শুদ্ধ নির্গুণ তুরীয় অবস্থায়, যেখানে মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত সবই নাহং করে শিবোঽহম্ হতে হবে, সেখানে প্রকৃতির গুণক্ষোভের কোন ছায়াই নেই। ঐ ভাবে দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থান প্রকৃতির গুণলীলার বাইরের অবস্থা—খুবই উচ্চ অবস্থা। ঐ অবস্থাটি পেতে হবে। কিন্তু গীতার লক্ষ্য যেদিকে শ্রীঅরবিন্দ সেটাই ধরিয়ে দিয়েছেন যে সর্বতোভাবে পরম পুরুষকেই পেতে হবে, সব জেনে বুঝে তদ্ভাবে ভাবিত হয়ে "তৎকর্মপরম" হওয়া। পরমপুরুষ যেমন দ্রষ্টা তেমন তিনিই অধ্যক্ষ। বিশ্বাতীত

তুরীয়ে নিজের অমূর্ত রূপকে যেমন দেখেন, তেমনি দেখেন বিশ্বে নিজেরই আত্মরূপায়ণকে, মূর্তকে। এই দেখায় তাঁর স্বসংবিত এক আনন্দ রয়েছে। এমনি করে দ্রষ্টৃত্বের সঙ্গে ভোক্তৃত্ব জড়িয়ে আছে এক বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সুখের আস্বাদনে। নীচে থেকে দেখে থাকে মনে করি দুঃখাভাব, উচ্চে থেকে সেই আবার আত্যন্তিক সুখ। দ্রষ্টার কাছে তখন এক অপ্রাকৃত কর্তৃত্বের বোধ স্ফুরিত হয়। তখন পুরুষ প্রকৃতির খেলায় স্বচ্ছন্দে যোগ দিতে পারেন, প্রকৃতির লীলায় যে স্বাতন্ত্র্যবোধ, তাতে তাঁর পূর্ণ অনুমোদন থাকতে পারে। এই ভাবেই উপদ্রষ্টা পুরুষ হন অনুমন্তা। নীচের প্রকৃতিতে জড়িয়ে থাকাকালীন এ বোধ অনুভবগম্য হয় না। প্রকৃতির সমস্ত কর্মই যখন চলছে তাঁর অনুমোদনে ও বিবৃতিতে, তখন প্রকৃতি পরম পুরুষেরই স্বার্থসাধিকা। সুতরাং প্রকৃতি তো তখন আর অপরা প্রকৃতি মাত্র নয়, তাঁরই পরা এবং পরমা বা স্বীয়া প্রকৃতি। তার সঙ্গে অবিবেকের কোন কথাই তখন আর ওঠে না। ভোক্তৃত্বে তাঁর আনন্দ আর ঐশ্বর্যে তাঁরই শক্তির প্রকাশ। শ্রীঅরবিন্দ এই পূর্ণ দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে গ্রহণ করে প্রথমে অপরা প্রকৃতির অবিদ্যাকে বর্জন করে আবার তাঁরই কর্তৃত্বের শক্তিতে আবার তার রূপান্তর ঘটাতে বলেছেন, তবেই সম্যক জ্ঞানলাভ হবে।

হৃদয় যেমন পথ ভোলায়, তেমনি সেটাই যে চৈত্যপুরুষের স্থান, তাকে বন্ধ রাখব কি করে? মন গোলমাল করে, কিন্তু মন যদি দিব্য হয়, তখন কি হবে? এমনি করে ইন্দ্রিয়ের শক্তির বিচারও চলতে পারে। জীবনে দুঃখভোগ আছে বলে উল্লাসকে বার্থ মনে করলে চলবে না। তাঁরই মত করে কুরুক্ষেত্র ও বৃন্দাবন একসঙ্গে পেতে পারি না? তাঁর দিব্য সঙ্কল্পকে বহন করতে পারি না? শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বাণীতে আমাদের চিন্তাজগতের প্রাথমিক জট খুলতে সাংখ্য জ্ঞান প্রয়োগ করতে শিখিয়েছেন। নেতিবাদের সহায়ে সব নস্যাৎ করে তার ওপরে সার্থক ইতিবাদের প্রতিষ্ঠা। বেদান্তের আনন্দমীমাংসা তখনই তা হলে উপলব্ধিতে সার্থক বোধ হবে, জীবনের দিব্য ভাবগুলি সত্যপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তা হলে দেখলাম পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা সাধিত হলে প্রকৃতির উর্ধ্বে অবস্থিত থেকে প্রাণের ভাবসত্তা (emotional being) থেকে মুক্তি নেলে। তাকেই আমরা বলেছি গুণক্ষোভের উর্ধ্বে থেকে মুক্ত হওয়া। অতপর আসে মানস-ভাবনা থেকে শুদ্ধ ভাবনায় অবস্থান, তাতে কোন প্রক্ষোভ নেই, প্রশান্ত বিরাট সেই শুদ্ধ ভাব—সেখানে কর্তাও নই, ভোক্তাও নই। এই নেতিভাবের পরিণামই হল যোগসূত্রাকারের দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান। আদর্শ হিসাবে এটা খুব বড় কথা, সাধনার প্রথম বড় স্তম্ভ-স্বরূপ।

আমরা "অব্যাপারেষু ব্যাপারং" করে সবের মধ্যে নাক গলাতে যাই। এটা বর্জন করে ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু দেখে যাওয়ার প্রয়াস করতে হয়, এই হল প্রথম দিকের কথা। তবে সেটাই শুধু একান্ত করে ধরলে ভারসাম্য যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই রকম প্রত্যাহার করে শেষ পর্যন্ত শুদ্ধ ভাবমাত্র থাকে, আর অন্তরঙ্গ যোগের সাধন যে ধারণা ও ধ্যান, তাও ঐখান থেকেই শুরু হয় ও পরিণতি লাভ করে সমাধিতে।

চিত্ত অন্তর্মুখ করে নিশ্চিন্ত হতে পারলে যা ভাসে, সেই শুদ্ধ ভাবনাই আত্মার স্বরূপ। শ্রীঅরবিন্দ ঐ শুদ্ধ ভাবনাকে খুব উচ্চ স্থান দিয়েছেন, বলেছেন—**Thought the paraclete**। মনকে একেবারে নীরব শূন্য করে যে প্রশমের অবস্থা (**Yogic process of stilling the mind**), সেখানে না পৌঁছালে উচ্চতর ভাব শুদ্ধ ভাবে প্রকাশ পেতে পারে না। ঐ উচ্চতর ভাবনাই আমার যোগ সাধনার নায়ক পরিচালক, আর আমার সংকল্প বা সম্যক রূপে ভাবনার শক্তি যে যোগশক্তি, সে তো তাঁরই ইচ্ছাশক্তি (will-power)। আমার যে যোগের প্রবৃত্তি, তা তাঁরই ইচ্ছা। এই খানেই পতঞ্জলির যোগসাধনার সঙ্গে তাঁর যোগসাধানার পথ একটু ভিন্ন প্রকৃতির মনে হয়। সেখানে আমার ভাবনাই প্রধান, আর এখানে তাঁরই ইচ্ছায় সমর্পিত আমার ভাবনা, তাঁর ইচ্ছাই আমার শরণাগতি—**whoever chooses the Divine, has already been chosen by the Divine**। এই জন্য প্রপত্তি বা শরণাগতি দিয়েই শ্রীঅরবিন্দযোগের শুরু, এটাই সব চেয়ে বড় খুঁটি: এই আত্মসমর্পণের শক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি, আর এই দিয়ে যোগের পূর্ণতাও। আমরা দেখেছি যে নিত্য জীবসত্বের (**Psychic being**) স্বভাব ও স্বধর্মই হল এই শরণাগতি (**surrender**)। সমষ্টি রূপে যে পরাপ্রকৃতি তিনিই জীবভূতা সনাতনী—"যয়েদং ধার্যতে জগৎ।" আর ব্যষ্টি জীব তাঁরই অংশ বা অংশু—মমৈবাংশঃ। ব্রহ্ম হলেন নির্বিশেষ ঔপনিষদ পুরুষ ঈশ্বর, আর আমি সে ব্যক্তি পুরুষ (**Individual**) জীব, এই উভয়ের মধ্যে উভয়কেই ধরে আছেন ঈশ্বরের শক্তি। তাই সেই শক্তির কাছেই আমার আত্মসমর্পণের সম্পর্ক। তা থেকে যা আমাকে ভুলিয়ে রেখেছে, তাই হল অপরার মায়া; কিন্তু আলোর পিপাসা এসেছে ঐ আলোকজননী পরা প্রকৃতি থেকেই। এই বিশ্লেষণ দৃষ্টিটি তন্ত্র সুন্দর করে দেখিয়েছেন শিব শক্তি কুমার এই ত্রয়ী রূপে। কুমারই জীব। জীব বা কুমার শক্তির আশ্রিত আর শক্তি তো শিবেরই। বেদে অদিতি পিতা অদিতি মাতা অদিতি পুত্র একাধারে। আমরা তো ঐ অদিতি মায়েরই সন্তান।

এই যে মাতৃশক্তি বা পরম পুরুষের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে, এই স্বীকৃতিতে সাধনায় জোর পাওয়া যায়, যাঁড়ছানার মত নাকে দৃঢ়ভাবে ধরবার শক্তি লাভ হয়। আমরা যদি সেই মহাশক্তিকে বুঝতে চাই, তার দুদিকই দেখতে পাই। একদিকে তিনি পরম পুরুষের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, তাঁরই আত্মমায়া ও যোগমায়া—"প্রকৃতিং স্বাম্"। আবার জীবের জীবত্বও তাঁর সৃষ্টি, সেই ভাবে, জীবের সঙ্গেও তিনি নিত্যযুক্ত। এই রকম করে সাজিয়ে দেখলে তবে বুঝতে পারা যায় যে পরাৎপর পুরুষ বিশ্বোত্তীর্ণ পরম শিব, তাঁরই শক্তি জগতী বিশ্বশক্তি, আর তা হতেই জগৎ ব্যষ্টি জীব, এই তিন ভাবনার বাইরে আর কিছু থাকতে পারে না। "আমি" রূপে একটা আয়তন নিয়ে চেতনার যে প্রথম উন্মেষ, তাকে কেন্দ্র করে যে শক্তি সংহত ও আবৃত তিনিই মহাশক্তি মা। এই আমিতে আত্মার বোধ এলে কাঁচা আমি আর থাকে না। পাকা আমি তো একটা

নয়, দুনিয়া ভরে সেই আমি। এই আমি তাঁরই একটা অংশ—এই ব্যাপারই জগৎ জুড়ে রয়েছে। তাই ব্যক্তিগত আমি বা ব্যষ্টি জীবত্ব থেকে যখন সমষ্টিবোধে সচেতন হতে পারি, তখনই ঐ "আমি"র অতিরিক্ত বিরাট শক্তিকে ধরতে পারি। তিনিই জীবধাত্রী জননী মাতা আধুনিক বেদান্তমতে অবিদ্যাত্মিকা মায়াই সৃষ্টির উপাদান, আবরণ ও বিক্ষেপ তার স্বভাব। কিন্তু শুধু এই দৃষ্টিতে অবিদ্যা বা মায়ারও পরিচয় বোঝা যায় না। শ্রীঅরবিন্দ সেখানে অবিদ্যাকে দেখিয়েছেন যে সেটা আলো আঁধারির একটা মিশ্র অবস্থা, সেটা পরিণামিনী প্রতিনিয়তই তা বিদ্যার অভিমুখে বিদ্যা হয়ে চলেছে। মানুষের নিয়তিও দিব্য, যা তাকে দেবত্বের পথে নিয়ে চলেছে ঐ অবিদ্যার মধ্য দিয়েই। দেবতা শব্দটির অর্থ দ্যোতনশীল, এসেছে দিব্ ধাতু থেকে তার অর্থ দ্যুতিতে দীপ্ত হওয়া—এক কথায় আমরা যাকে বলি আলো। তাই মানুষের পক্ষে এই দেবতা হওয়ার আদর্শ এক নতুন দর্শন। দিব্য জীবনের সন্ধানে সে পথিক, দেবযানই তার পথ, প্রচণ্ড বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাই তার পুঁজি। অধ্যাত্মজীবনে জনতার চাপে একা নিঃসঙ্গ বোধও ঘিরে ধরে, কিন্তু ডাক শুনে পথ চলা শুরু করেছি যে: দিব্য ঐ নিয়তিই আমার পরিচালিকা। তিনি ঈশ্বরেরই ইচ্ছাশক্তি। পরিবেশে বাধা থাকেই। জগৎজোড়া অনেক আমি নিয়ে কারবার। সমাজে রাষ্ট্রে মানবতার আদর্শ গড়ে উঠেছে নানা দিক দিয়ে। ঝামেলা বলে সব কিছু পাশ কাটিয়ে ব্যবহার চলে না। সমষ্টিগত ভাবে আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। কোন ইষ্টার্থ নিজের মধ্যে পেলে শুধু হয় না, ব্যক্তির চিন্তা ভাবনাও তার একার নয়। একের মধ্যে যা ঘনীভূত হয়, তা আবার সব দিক দিয়ে পরিব্যাপ্ত হয় সবার মধ্যে, এই হল মাতৃশক্তির কাজ। এই রকম করেই সেই সর্বার্থসাধিকা জগতে কল্যাণ গুণের বিস্তার সাধন করেন। এই সমগ্রভাবের ওপরে সব ছাপিয়ে তিনিই আবার সাক্ষী হয়ে আছেন—এই অদ্বৈত সমগ্র বোধে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তবেই এক নিশ্চিন্ত ভাব আসে। মনে শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া যায় আর মুক্তির আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কর্মেও। "হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।"

সৎ চিৎ আনন্দ শক্তি ও অসৎ—আমরা বিশ্লেষণে এই পেয়েছি। মূলে ব্রহ্মের আনন্দই জীবের আত্মা (Soul), জীবের সত্ত্ব। দেহ প্রাণ মন চলেছে যান্ত্রিক ভাবে ঠিকই, কিন্তু জীবনের রসের রসিক হলেন চৈত্যপুরুষ। তাই রসাস্বাদন না হলে সাধনাও নীরস ও শুধুই কৃচ্ছ্রসাধন হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই দেবতার সঙ্গে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠা চাই। আমি তাঁর তিনি আমার, এই বোধে সেটা হয়। ওপরে পরম পুরুষ পরম পিতা অসৎ সৎ ও চিৎ তাঁর লক্ষণ, চৈত্য পুরুষ আনন্দের, আর মাঝখানে রয়েছেন শক্তি, পরম পুরুষের ইচ্ছা, প্রস্তুতা পুরাণী প্রজ্ঞা—উথলে উথলে পড়ছে, ঐ প্রচোদিকা শক্তিই জীবকে যেন ঠেলে দিচ্ছে অজ্ঞান থেকে প্রজ্ঞানের দিকে। তিনিই দিব্য নিয়তি। এই ভাবে প্রজ্ঞানের শক্তিই হলেন নিয়ন্তা আর আমাদের মধ্যে রসচেতনা সক্রিয় রয়েছেন এই নিয়ন্তার অপরার্ধে তাই বাধা বেদনাও তাঁরই হাতের দান। তাকে

মাথার ভূষণ করে নিয়ে ছোট্ট শিশুর মতই মাকে জড়িয়ে ধরে চলতে পারলে এই নির্ভরশীলতাই অধ্যাত্ম জীবনের বড় সহায়। সেই সঙ্গে তাঁর ইচ্ছায় বিশ্বাস রাখা চাই, ভাবনা বেদনা সব বিলিয়ে দিতে হবে সেখানেই।

ভাবনা (Thought) কে সাধনায় মুখ্য স্থান দিতে হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু মনে রাখতে হবে দিব্যজীবন তারও ওপরে। মহাপুরুষের ভাবনা নিয়ে মনের গোঁড়ামি সাধনার পথ আটকে দিতে পারে। তা ছাড়া মহাপুরুষের বাণী ও জীবনেও অনেক সময় আপাত বিরোধ মনে হয়। তাই শুধু ভাবনাকে মনের দর্শন দিয়ে গড়ন দিতে গেলে একদেশী দর্শন হয়ে যায়, তাই পরিপূর্ণ জীবনের সত্যকে দেখতে হয়। রামকৃষ্ণদেব যেমন বলতেন যো-সো করে বুড়ি ছুঁয়ে নিতে হয়, তারপর জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম তো আছেই। ঐ তুরীয় অনন্ত নির্বিশেষ সত্তা প্রতিষ্ঠা চাই, তবেই শক্তি ও আনন্দের প্রকাশে জোর ধরবে। নির্বিশেষ তুরীয় ব্রহ্মের উপলব্ধির পরে তারই বিশেষকে জানতে পারলে আর বিরোধ বা মিথ্যা থাকতে পারেনা। ঈশ্বরের সঙ্গে চিৎ ও জড় দুইএরই সম্পর্ক রয়েছে, তাই তার সেই নিরাবরণ নির্বিশেষ তত্ত্বে গিয়ে এক হয়ে জেনে সবিশেষে হতে হয়। রামকৃষ্ণদেব যেমন বলতেন বেলের সবটা নিতে হয় খোসা বীচি সমস্তই, তবেই গোটা বেলটা জানা ও বোঝা যায়। শুধু শাঁসটুকু গ্রহণ করলে সবটা জানা যায় না। তেমনি বুদ্ধির জানার পরেও গভীরে আর একটা জানা রয়েছে, যেখানে বীজের মধ্যেই রয়েছে সম্ভূতির উল্লাস। জীবে নেমে এসে ব্রহ্মের প্রকাশে সেই উল্লাসই প্রকটিত হয়।

শ্রীঅরবিন্দ ঐ তুরীয় বিশ্বগত ব্রহ্মকে বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বগত দু ভাবেই জানতে বলেন। বিশ্ব বা জগৎ ব্রহ্মেরই শক্তি তাই ব্রহ্ম যেমন ভাবে নির্বিশেষ তুরীয় অসৎ হয়েও সচ্চিদানন্দ হতে পারেন, তেমনি জগৎ ও জীব হয়ে নেমে আসতে পারেন তাঁর স্বশক্তিতে। সেই কারণেই সম্যক জ্ঞানী হওয়ার অর্থ শুধু মাত্র নির্বিশেষ তুরীয় তত্ত্বকে জানা নয়, সেই অনন্তে অবগাহন করে মৃত্যুকে জেনে অমৃত হয়ে ব্রহ্মের মতই জগতে ও জীবে নেমে আসতে হবে। জীব ও জগৎ যে ব্রহ্মই, সেই সত্য পরিচয় সর্বতোভাবে তখনই জানা হবে। এই রকম করেই জগৎ-সত্তায় জীবসত্তায় এক সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ চলেছে তাঁরই, তিনিই জীব তিনিই জগৎ।

আমাদের যে জীবসত্তা তা হল দেহ প্রাণ মনের ত্রিপুটি। কিন্তু এ তিনের একটাতে যদি আসক্তি বেশী হয় আর সেটা একান্ত হয়ে ওঠে, তখনই ঐ নির্বিশেষ তুরীয় অনন্তকে ভুলতে বসি। দেহসর্বস্ব প্রাণসর্বস্ব বা মনসর্বস্ব না হয়ে পড়তে হয়, এই জন্য এই প্রাকৃত দেহ প্রাণমনের দাবীতে সর্বহারা না হয়ে তাদের কিছুটা ছাঁটাই করতে হয়। আবার ছাঁটাই করতে গিয়ে একেবারে কেটে বাদ দেওয়াও চলবে না, তাদের শুদ্ধ সত্তাগুলি চিনে তাদের দাবী মেনে চলতে হবে উর্ধ্বতর সত্যের চৈতন্যের ধারক ও বাহক হবার জন্য। যে ভাবে দেহসর্বস্ব অর্থকাম ও জড়দর্শন সব দেখা দিয়েছে

সেখানে জড়ই প্রধান ধর্ম, চৈতন্যকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, না হলে অনেক তো পরের কথা বলে তাকে দূরেই রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জড়ই যে ভিত্তি, সেটা ঠিকই কিন্তু মূল্য বা প্রয়োজন দেখে কোনটা শ্রেয়, সেটা বুঝতে হবে, সে গরজ আমাদেরই বাঁচার বা জীবনের তাগিদেই দেখা দেয়। আমরা নির্বোধ জড় চাই না, চাই বুদ্ধির জননী বলে বুদ্ধিমান জড়চৈতন্যকে। চৈতন্যই নায়ক, জড়ের সে নিয়ন্তা, সেই ইষ্টার্থের বোধ না থাকলে অগ্রগতি থেমে যাবে, ক্রমবিবর্তনও লুপ্ত হয়ে যাবে। বেদবক্তা বলেছেন "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্তাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।" জগৎপ্রপঞ্চের স্রষ্টা প্রজাপতি, তিনিই প্রথমজাত, তিনিই অদ্বিতীয় জগৎপতি হয়ে আছেন; তিনি ঈশ্বর, তিনি চৈতন্য। জীবনে জগতে এই সত্যের প্রয়োগ দেখা যায়। সমাজের সর্বস্তরেই ব্যক্তি বা ব্যষ্টিই সমষ্টির নায়ক। অন্তর্মুখীন হয়ে ঐ চৈতন্যকে বুঝতে হবে, এই সচেতন অন্তর্মুখীনতা না আসা পর্যন্ত জীবনের জয়যাত্রা শুরু হতে পারবে না। মানুষের চিন্তায় ও জীবনযাত্রায় জড়তারই প্রাধান্য, তাই জীবনও সর্বক্ষেত্রে ক্ষয়গ্রস্ত।

প্রধান বা অপ্রধানের কথাও শেষ পর্যন্ত অবান্তর। বেদের সময় থেকে অর্থাৎ প্রাচীনতম যুগের উচ্চতর ভাবনা থেকে আরম্ভ করে শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনা পর্যন্ত যোগাগ্নিময় শরীরের (Divine Body) ভাবনা প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। দিব্যতনুর সম্ভাবনার, কথায় মনু বলেছেন "ব্রাহ্মী ইয়ং ক্রিয়তে তনূ"। জড়দেহ বা আয়তন তো সৃষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে চৈতন্যের ক্রমবিকাশের ফলে চৈতন্যের পূর্ণ প্রকাশেই সেই দেহের সার্থকতা। তাই চৈতন্যকেই দিশারী না করে দেহসর্বস্ব হয়ে পড়লে মস্ত ভুল করা হবে। বর্তমান মানবসভ্যতার জগতে দেখা যায় জাগ্রতের জীবন নিয়েই তার মনের কারবার। মন তাকে কেন্দ্র করে যন্ত্রের মতই ঘুরে চলেছে। ঘুমের সময় সে মন ছেড়ে কোথায় যাচ্ছে, তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। পাশ্চাত্য দর্শনে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন চিন্তা বা গবেষণা ঠিক পথে চালানো হয়নি। কিন্তু আমরা জানি সুষুপ্তিতে মানুষ প্রত্যহই ব্রহ্মপুরে যায়। অন্তর্মুখীনতার ফলে আমরা গভীরে একেবারে ঐ নির্বিশেষ চৈতন্যেই সুপ্তিমগ্ন অবস্থায় চলে যাই। তাই যখন আবার জেগে উঠি, তখন এক শান্ত মূক সুখ আস্বাদনের সুখে ভরে থাকি। ঐখানে ঐ গভীরে যদি সচেতন থাকি, তাহলে নিদ্রার যে সম্প্রসাদ লাভ করি, জাগ্রত চেতনায় তাকে সঞ্চারিত করতে পারলে যোগসাধনাও পূর্ণাঙ্গ হবে। ঘুমের ঐ প্রশান্তি প্রপঞ্চোপশম শান্ত শিব, এই শান্ত আধারে দেহে প্রাণে মনেও ব্যাপ্ত হয়ে শান্তি হয়ে নেমে আসে, আর তখনই সেই নির্বিশেষ তুরীয়ের সম্ভোগ সম্ভবপর হয় ব্যক্তিগত সাধনায়। মন শান্ত থাকে, দেহের স্থৈর্য দৃঢ় হয় আর উদ্দীপ্ত প্রাণকে ধরে থাকে ঐ প্রশান্তি। নির্বিশেষ তুরীয় এই রকম করেই বিশেষে বা ব্যক্তিতে নেমে আসেন। জাগ্রতে এই সাধনা চলতে থাকলে বিজ্ঞানরূপে স্বপ্ন-চেতনা আর আনন্দরূপে সুষুপ্তির চৈতন্য নিয়েই মন জাগ্রত থাকে। মনোময় প্রাণ-শরীর নেতারূপে এই পুরুষকেই শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন বিজ্ঞানঘন পুরুষরূপে যিনি এই মনোজ্যোতি বা বিজ্ঞানের আবেশযুক্ত মনোময় পুরুষ প্রাণ ও শরীর নিয়ে বিচরণ করছেন।

ওহাচর সিদ্ধ পুরুষের এই ভাবে একা থাকা যে সম্ভব, তা বোঝা গেল। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সকলের সঙ্গে সমাজে চলতে গেলে যে প্রতিবন্ধক আসে, যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তার সমাধান কি ভাবে হবে, এ প্রশ্ন সাধন-জীবনের গভীর এক জিজ্ঞাসা। জীবনের কর্মে ও উপলব্ধিতে তার উত্তর পেতে হয়, কেননা তাঁরই শক্তি ও আনন্দ জীবে জীবে প্রকাশিত। তিনিই বহু হয়েছেন, ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্তরে কত বিচিত্র হয়ে নেমে এসেছেন। এই বৈচিত্র্য তাঁর সুখ, তাঁর সম্ভোগ তাঁর লীলা। বৈষ্ণব দর্শনে দেখি, তরুলতা পশুপক্ষী অরণ্য নদী সব চিন্ময় হয়ে গেছে বৃন্দাবন-লীলায়। শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনিতে কালের ধারা উজানে বয়ে হয়ে যায় রাধা। তাই গোপগোপী গোবৃন্দ তরুরাজি পর্বত পর্বন্ত আনন্দে রোমাঞ্চিত বিগলিত উন্মত্ত হয়ে ওঠে আনন্দে, সে আনন্দ চিন্ময় আবেশের আনন্দ, ব্রহ্মের আনন্দ। ব্রহ্মগোপালের বংশীরব জড়ের আবরণ বিদীর্ণ করে আনন্দময় সত্তাকে জাগিয়ে দেয়, এই দুই যদি একবার খুলে যায়, তবেই জগতের মধ্যে থেকে বলতে পারব, "নির্দো-ষং হি সমং ব্রহ্ম"—গীতার এই মহাবাক্য। স্থূলে এই রকম ব্যাপার ঘটতে থাকলে জড়ের চিন্ময় রূপান্তর সম্ভবপর হবে। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যেখানে এক হয়ে যায়, সেখানে ওদিক থেকে যা বিচ্ছুরিত হবে, পিণ্ডে তার বৈদ্যুতী শক্তি সঞ্চারিত হবে। বাহিরে তার বিচিত্র রূপ যেমন, তেমন থেকেও সুখী দুঃখী রোগী ভোগী সকলেই ব্রহ্মের আনন্দে সম্পৃক্ত হচ্ছে, ব্রহ্মানন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রাণে বেঁচে উঠছে, এই ভাবে এক ভোগসাম্য আসে। কিন্তু তাই বলে শক্তি-সাম্য হয়না, শক্তির তারতম্য আছে। শক্তির তারতম্য আছে বলে বাহিরের বৈষম্য ও সংঘাত থাকলেও আনন্দের শক্তিতে সবই আনন্দব্রহ্ম হয়ে নিজেকে জানতে পারে। ব্যক্তিগত চেতনা নিয়েই তো বিশ্বচেতনা! তাই নিজের মধ্যে তাঁকে বা আত্মাকে জানতে হবে ও পেতে হবে ঐ ব্রহ্মানন্দেরই শক্তিতে। একের অতিমানস প্রভাব থেকেই অতিমানস পরিবর্তন হবার শক্তি রয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ বিজ্ঞানময় পুরুষকে দেখিয়েছেন যে, তিনি যে আত্মজ্ঞান লাভ করলেন, তারপরে করবার আগুন হয়ে যাবার মতই সেই তপের শক্তি সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। "সাবিত্রী"তে অশ্বপতির যোগসাধনায় এই দ্বিমুখী ক্রিয়ার পরিচয় পাই। নির্বিশেষ আত্মজ্ঞান প্রথমে চাই, এটা কোন "বাদ"-এর কথা নয়। কিন্তু সেই আত্মজ্ঞান লাভ করলে আত্মার মুক্তি ঘটে ও সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তিলাভ হয়। নিজের মুক্তি হলেও তখন আবার অপরকে মুক্ত করবার এক দায়ও এসে পড়ে। ঈশ্বরের সঙ্কল্প-শক্তির সঙ্গে এক হয়ে যেতে হয়, এই হল দিব্যকর্ম। কবি বলেছেন "মোর জীবনের বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে"। তারপর সবার মধ্যেই সেই ইচ্ছার প্রকাশ দেখা যায়। সেই ইচ্ছার প্রকাশে যা পেয়েছি তার সবটাই দিয়ে যাব জগতের কল্যাণে, "বসন্তবৎ লোকহিতাং চরন্তি"—এই হল জীবন্মুক্তের দায়। নির্বিশেষকে অধিগত করা একান্ত প্রয়োজন, সেই জ্ঞান সম্যক না হলে সর্বগ্রন্থিমুক্ত হওয়া যায় না, ব্যক্তিগত যজনে অনেক ভ্রান্ত দর্শন অনেক দূর পর্যন্ত থাকতে পারে। একেবারে নীরব সেই মহাশূন্যে অবগাহন

করে শূন্য চিত্ত নিয়ে শান্ত হয়ে প্রতীক্ষা করতে হয়, তবেই সেই শান্ত মহাকাশ তার নীরব বাণী শোনাতে পারেন, তার পূর্বে নয়। এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দের যোগ যে নির্বাণের পরের অবস্থায়, তাই বলা হয়েছে। ঐ নীরব শূন্যতাই সর্বশক্তির উৎস, তা বুঝতে হবে। মহাশূন্যের গহন হতেই অগণ্য জ্যোতির উৎসারণ। জ্ঞান থেকে শক্তিকে বিচ্ছিন্ন না করলে এই বোধ হয়।

এই ভাবে ব্রহ্মচৈতন্যই বিশ্বাতীত আবার বিশ্বচৈতন্যও। ব্যক্তিচৈতন্যের অপরোক্ষ অনুভবের চরম কোটিতে ঐ তিনটি অনুভবই পরপর সিদ্ধ হতে পারে। গুটিয়ে যাবার পর ব্যাপ্ত হওয়া স্বভাবেই ঘটবে যদি না বিনাশ বা প্রলয়ের সংস্কার একান্ত হয়ে তার প্রতিবন্ধক না হয়। বিশ্বঘন যে ব্যক্তিচৈতন্য, সেই বিশ্বব্যাপ্ত আবার বিশ্বাতীত তুরীয় এমন কি অসৎও। মহাশূন্যে মহাপরিনির্বাণ ঘটলেও শক্তি যাবে কোথায়? নির্বিশেষে পরিসমাপ্ত হতে ইচ্ছা করলেও মহাশূন্যে তাই সার হয়ে ক্রিয়া করবে। এটা মহাপুরুষেরা সকলেই উপলব্ধি করেন যে, গোড়া থেকেই তাঁর ইচ্ছা জগতে প্রকটিত। বুদ্ধের নির্বাণ কত গভীরে সঞ্চারিত হয়েছিল যে আজ পর্যন্ত সেই মহাশূন্যের শক্তিসঞ্চার অব্যাহত রয়ে গেছে, থাকবেও চিরকাল। বৈদান্তিক শঙ্কর মোক্ষ ও জগন্মিথ্যার বেদান্তের প্রচার কর্ম সমানে রেখে গেছেন। নিবর্তনের তীব্র সংবেগে চেতনা যখন বিশ্বোত্তীর্ণ তখন সেখানে কিছুই নেই, না আমি না জগৎ। অথচ ঐ অব্যক্তের শূন্যতার শক্তিই জগৎ-প্রসূতি সাবিত্রী শক্তি, ব্যক্তের উৎস। মন এই দুয়ের মাঝে বিরোধ দেখে কিন্তু অব্যক্তেরও বোধ আছে। অতিমানস দর্শনে ব্যক্তি চৈতন্যের আভাস মাত্র নয়, প্রতিরূপ। সবই সত্য সবই ব্রহ্ম। এই রকম করে Absolute Transcendent related to universal-এর বোধ হয় Individual-এর চেতনায়। ঐ অসীম অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হলে সবই এ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় সত্য রূপে, কিছুই বৃথা নয়। তাই প্রজ্ঞান ও আনন্দ নিয়ে ওতপ্রোত হয়ে শক্তি বিচ্ছুরিত করা যেমন আছে, তেমনি আছে সেই প্রজ্ঞান ও আনন্দের শক্তিতে ঘটে ঘটে অবতরণ করে সংঘর্ষের তিক্ত দিয়েও স্থূল জড়ের গভীরতম প্রদেশ যে নিবৃত্তি কলা, সে পর্যন্ত বৈদ্যুতি শক্তি সঞ্চারিত করে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া। চিন্তা করলে কথাটা সাঙ্ঘাতিক মনে হয়, কিন্তু সত্যের এই ভবিষ্য স্বপ্ন সত্য। তাই পরম আশ্বাসের এই বাণীও সত্য। নির্বিশেষ অনন্ত তুরীয় জ্ঞানের ওপর এই বিশ্বব্যাপ্ত অনন্ত পূর্ণতা এলে তবেই তা সম্যক হবে।*

(ক্রমশ)

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

তীর্থসলিল

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

আদি শিলার লৌহকঠিন বুক
দুঃখ দিনের অশ্রু জমাট হয়ে
নির্মম মর্মর—
আলোর দিকে বৃথা কেরাই মুখ
আদিম দাহ দগ্ধ করে তারে
নিরুদ্ধ নির্ঝর।

তৃষ্ণাকাতর পথিক পথহারা
জলধ্বনি কঠিন শিলাতলে
কোন অতলে গোপন হয়ে রয়—

তীরের মত মর্মভেদী চাপে
বিদ্ধ যখন শেষ অতলে
অঞ্জলি মোর তীর্থসলিল হয়।

আমার বুকের জমাট কঠিন ভার
মিলিয়ে যায় আলোর অন্ধকার।

ভালোবাসা

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

ভালোবাসা শরৎ আকাশ
নির্মোহ নির্মল
বিলীন হল নিরর্থ নিঃশ্বাস
কাতর আঁখি জল।

এখন শুধু শিউলি ফুলে ভরা
ভুবন মন্দির
শুভ্র সাজে শুভ্রা বসুন্ধরা
ভরে হৃদয়তীর।

সকল গ্লানি নিমেষে তাই হারায়
আনন্দ ভাস্বর
সব চেওয়া যে সহজ হয়ে যায়
প্রেমে যখন ভরেছে অন্তর।

ভালোবাসা যখন হল নির্মোহ নির্মল
তখন ফোটে অকলঙ্ক হৃদয় পদ্মদল।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা

পবিত্র

সোমবার, ১৭ই মে ১৯২৬

পবিত্র এবারকার সপ্তাহটা আগের চেয়ে একটু ভালো গেছে মন ও প্রাণ অনেকটা বাধা হয়ে থাকাতে ধ্যান করা যথেষ্ট সহজ হয়েছে। এ ছাড়া প্রায় নতুন কিছু নয়। সময় সময় মন এমন সুস্থির ও স্বচ্ছ হয়ে যায়, যেন...জেলির মতো।

শ্রীঅরবিন্দ : জেলি?

পবিত্র : হাঁ, তখনকার ভাবটা ঐ কথা দিয়েই আমি ভাল বোঝাতে পারি।

শ্রীঅরবিন্দ কোনো চাপ না দিয়ে মন কি এমনিতেই স্থির নিশ্চল হয়ে যায়?

পবিত্র যতটা এখনো হয়নি। কিন্তু ভিতরকার একরূপ ক্রিয়ার দ্বারা আমি মনের কাজের পর্যবেক্ষক হয়ে দেখতে পারি।

শ্রীঅরবিন্দ উপরের জিনিসকে নামিয়ে আনতে হলে ঐরকম স্থিরতার দরকার, যেন চিন্তার কোনো তরঙ্গ এসে তাকে একটুও বিক্ষুব্ধ করতে না পারে।

সোমবার, ২৪শে ১৯২৬

প্রশ্ন বাধা পাই মনেরই যান্ত্রিক ক্রিয়ার অংশ থেকে। ঐ অংশ হাতের কাছে যা-ই আসে তাকেই আঁকড়ে ধরে : দৈনন্দিন জীবনের যত টুকিটাকি তুচ্ছ জিনিসকে, বইটই, বাজারে কিছু কেনাকাটা ইত্যাদি, সেইগুলোকে নিয়েই অনর্থক জাল বুনতে লেগে যায়; তবে ও জিনিসকে লক্ষ্যের মধ্যে রেখে কিছু এগিয়েছি; জানি যে ওগুলো বাহ্য ক্রিয়া।

উত্তর : ওর থেকে সম্পূর্ণ রেহাই তুমি পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দৈহিকের রূপান্তর না হচ্ছে। ততকাল পর্যন্ত ইচ্ছার জোরে ওকে থামিয়ে রাখতে পারো, যেমন ধ্যানের সময়। ওগুলোকে দেখবে বাইরের জিনিস হিসাবে, ওর ক্রিয়ার উপরে নিজের কিছু প্রভাবও এনে ফেলতে পারবে, কিন্তু ওর থেকে মুক্ত একেবারে হবেনা।

প্রশ্ন হয়তো ওগুলোকে আমি কিছু গুরুত্ব দিয়ে ফেলি, তাই আমার মন ঐ নিয়ে প্রায় লেগে থাকে। মনের উচ্চ দিকের অংশ নীরব হয়েছে। আধ্যাত্মিক পুস্তকাদি পড়া,

যেমন ভগবদ্‌গীতা ইত্যাদি, সেদিকে আর ঝোঁক নেই। কিন্তু কেবল ঐ মানসিক অংশটাই সক্রিয় হয়ে ওঠে।

উত্তর তার কারণ ঐ অংশটিকেই বশে আনা সবচেয়ে কঠিন। আর দেহগত চেতনা ঐগুলি নিয়েই থাকতে চায়। তোমার ভিতরে না থাকলেও ওসব জিনিস পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াতে থাকে। সন্ন্যাসীর পথে না গেলে সকলকেই তোমার মতো ওর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কিন্তু এ সব হলো নেতিবাচক ক্রিয়া, ওকে খুব বেশি গুরুত্ব দিও না। ইতিবাচক অনুভূতি পাওয়াই হলো আসল কথা যাতে মেলে গভীর প্রশান্তি ও উপরের আলো। তার দ্বারাই ঐ সকল ক্রিয়া দূর হয়ে যাবে। অতএব ঐদিকেই চেষ্টা রাখো।

প্রশ্ন হৃৎপিণ্ডের কাছে কি কোনো কেন্দ্র থাকে?

উত্তর: না। কেন্দ্রগুলি থাকে একটা লাইন ধরে। যাকে হৃদয়কেন্দ্র বলা হয় সেটা সোলার প্লেক্সাসের মধ্যে। মণিপুরা আছে নাভির পিছনে। এরা মেরুদণ্ডের মধ্যে নিলিত হয়।

প্রশ্ন স্টাইনার বলেছেন যে সোলার প্লেক্সাস ছাড়াও আলাদা হৃদয়কেন্দ্র আছে।

উত্তর সেটা ভুল কথা।

প্রশ্ন এখানকার গরমে দেহটা স্থির হয়। ক্লান্তি বোধ করাতে এ কয়দিন শুয়ে শুয়ে ধ্যান করছি। তাতে কোনো আপত্তি আছে কি?

উত্তর যে কোনো অবস্থাতেই ধ্যান করা যায়। আমি প্রায়ই চলে চলে ধ্যান করি।

প্রশ্ন আপনি বলেছেন "প্রাণময় সত্তা" ও "মনোময় সত্তা"র দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাবার কথা। তার অর্থ কি?

উত্তর: প্রাণময় সত্তা বেরিয়ে গেলে দেহ সমাধির হয়, কিন্তু মনের বেলাতে তা হয়না। মন এমনিতেই অনেক জায়গায় চলে যেতে পারে, যেমন ধ্যানের সময়। সেখানে চলে গিয়ে সে অনেক কিছু লক্ষ্যও করতে পারে, নিজেকে সেখানে জানান দেওয়াতেও পারে। এমন কি সম্পূর্ণ মনটাও যায়না, যায় কেবল কেন্দ্রীয় অংশটা। এতে সমাধির অবস্থার মতো কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। তুমি জেগে ওঠা মাত্রই মন তখনই ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু প্রাণসত্তার বেলাতে তা হয়না। সে দেহের সঙ্গে একটা সূত্রবন্ধনে থাকে, সেই সূত্র ছিন্ন হলেই মৃত্যু। আর হঠাৎ তাকে ফিরিয়ে আনাও বিপজ্জনক।

আগে মনের বেরিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে এবং তার দ্বারা অন্যান্য স্তরের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি পাওয়া সম্বন্ধে জানাই উচিত, পরে প্রাণসত্তার বিষয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রশ্ন তাহলে এই যোগে আগে মনোময় সত্তার বাইরে যেতে পারা সম্ভব হবে, তারপরে প্রাণসত্তার কথা ?

উত্তর : হাঁ, কিন্তু এগুলো অধ্যাত্ম অনুভূতির নিচেকার জিনিস, সেটাই সব চেয়ে কাম্য।

প্রশ্ন তাহলে আমি এই কথা জানলাম যে অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ করাই প্রধান কথা, অন্য যা কিছু তা অন্যান্য স্তরের সিদ্ধির জন্য।

সোমবার, ৩১ মে ১৯২৬

প্রশ্ন আমার ধ্যান এবার ক্রমশ গভীর হচ্ছে আর বাহ্য জগৎ থেকে নির্লিপ্ত হচ্ছে। সময় সময় আমি চিন্তা করছি বলে নিজেকে লক্ষ্য করি। চিন্তা যে বাইরের জিনিস তা অবশ্য এখনো বুঝিনি, তবে এটা বুঝি যে চিন্তার কাজ একটা ভাসা-ভাসা ক্রিয়া, উপরের দিকেই ভেসে ওঠে, তাতে সত্তার গভীরতর স্তরকে প্রভাবিত করেনা।

আর একটি কথা, ধ্যান গভীর হলেই তখন পা ব্যথা করতে থাকে।

উত্তর কেমন ধরনের ব্যথা অনুভব করো ?

প্রশ্ন যেন চাপ দিচ্ছে আবার টেনেও ধরেছে। প্রাণসত্তা কি তফাৎ হয়ে যেতে চায় ?

উত্তর : তাও হতে পারে, কিংবা দিব্যশক্তি দেহসত্তাতে রূপান্তর আনতে চেষ্টা করছে, তাতেও অমন হতে পারে। দেহসত্তাতে অনেক অশুদ্ধতা থাকে তাকে আগে রূপান্তরিত ও বিশুদ্ধ ক'রে না নিলে সে দিব্য তেজকে গ্রহণ করতে পারেনা।

প্রশ্ন পরিবর্তন কি দেহবস্তুতেই আসে, অথবা প্রাণসত্তাতে আসে ?

উত্তর দেহকোষের ভিতরকার প্রাণে ও মনে আসে, দেহবস্তুরও তাতে অংশ থাকে।

প্রশ্ন : ধ্যানের মধ্যে নানারূপ ভাব আসে, তাতে নানারূপ প্রাণতরঙ্গ দেখা দেয়।

উত্তর : কেমন রকমের ভাব ?

প্রশ্ন : মনের মধ্যে যা হচ্ছে তার যেন আমি সাক্ষী হতে পারি ; আর আবার সত্তার সর্বোচ্চে উঠে গিয়ে সেখানেই নিজেকে ধরে রাখতে পারি। আর উপরের শক্তিকে ডেকে নামিয়ে আনতে পারি। এই শেষকালের ধ্যানটিতে আমি মাথার উপরের দিকে কেন্দ্রীভূত না হয়ে হয়েছিলাম সোলার প্লেক্সাসের পিছনে, অর্থাৎ উপরে নয়, ভিতরের দিকে।

উত্তর : ঐখানে চৈত্যের স্থান, হৃদয়দেশের পিছনে (Solar plexus)। ওখানে একটি গুহ্য কেন্দ্র থাকে যার দ্বারা সাধারণ মানুষরা পরিচালিত হয়। ও-ছাড়াও তোমাকে মাথার উপরকার কেন্দ্র সম্বন্ধেও চেতনা পেতে হবে, যেখান থেকে সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রশ্ন কিন্তু ঐরূপ ভাবলে কি পরস্পরবিরোধী? না ভেবে আমি মনের মতো সবই হতে দিই। ওর মধ্যে কোন ভাবটি আসা ভালো?

উত্তর সবই, সব ভালো। কেবল তুমি লক্ষ্য ক'রে যাবে যে কি হচ্ছে। হৃদয়কেন্দ্র ও মাথার কেন্দ্র পরস্পর সহযোগিতা ক'রে যন্ত্রগুলি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রত্যেকটির ওতে অংশ থাকে।

প্রশ্ন মনের ক্রিয়ার উপর সাক্ষী হয়ে থেকে কি সাধারণ জীবনেও সকল ব্যাপারেই চলবে? আপাতত এই দৃষ্টি বজায় রাখতে পারি যত যান্ত্রিক ও আধা-অভ্যস্ত ক্রিয়াগুলিতেও। কিন্তু যখন কোনো কাজে বিশেষ মনোযোগ লাগে তখন তার মধ্যে হারিয়ে যেতে হয়।

উত্তর কিন্তু তা অপরিহার্য নয়। এ কেবল অভ্যাসের ব্যাপার। তুমিই যে কর্ম-কর্তা এই মোহকে এখনও ক্ষয় করা হয়নি। সর্বদা ঐ সাক্ষী ভাব থাকা দরকার, এই হল প্রথম ধাপ। মনের সকল অংশকেই তার কাজ করতে দেবে আর উপর থেকে তুমি সেটা লক্ষ্য করবে, দরকার হলে তাকে থামাতে কিংবা বদলে দিতে পারবে।

প্রশ্ন : তাহলে যন্ত্রগুলিকে শাসনে আনা চাই। কিন্তু এখনও আমার অতটা অভ্যাস আসেনি, কেবল মামুলী কাজগুলিতেই ও ভাব ঠিক রাখতে পারি। তবে উন্নতি কিছু হয়েছে এ সম্বন্ধে।

সোমবার, ৭ জুন ১৯২৬

প্রশ্ন : আমার ধ্যানের ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে কখনো ভালো কখনো মন্দ সময় আসে। তবে এখন মনকে আমি নীরব রাখতে পারি, ওর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপরের স্তরে উঠে যাবার চেষ্টা করতে পারি। এখন মনকে আমার সমগ্র সত্তার একটা ক্ষুদ্র অংশ বলে মনে হয়। কিন্তু উপরে উঠে এমন কিছু পর্দার আড়াল থাকে যা আমাকে ভেদ ক'রে যেতে দেয় না। যখন মনকে নীরব রেখে সেটা ভেদ করতে চাই তখন পায়ে বেশ যন্ত্রণা পেতে থাকি, যাতে মনোযোগ ঐদিকেই আকৃষ্ট হয়। ওর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারি না, কারণ সে চেষ্টা করতে গেলেই যন্ত্রণা আরো বেশি বেড়ে যায়।

উত্তর : তোমার দেহচেতনার অংশই তোমাকে পিছনে টানে, তুমি তা জানতে পারো কিংবা নাই পারো। যখনই তুমি ভেদ করতে যাও তখনই সে তোমাকে টেনে রাখে।

তার মানে এখনও তুমি প্রস্তুত হওনি। তোমার নিম্ন চেতনাকে প্রস্তুত করার জন্য উপর থেকে ওর মধ্যে শক্তি নেমে আসা দরকার। ঐ পর্দার আড়ালকে নিচের দিকের চেষ্টাতেও ভেদ করা যায়, কিন্তু সকলে তা পারেনা। কিন্তু উপরের শক্তি নেমে এলে ঐ পর্দা আপনি সরে যায়। সুতরাং তোমার পক্ষে প্রথমেই দরকার সেই উচ্চশক্তির দিকে নিজেকে খুলে ধরা।

প্রশ্ন তাহলে ও-বিষয়ে আমাকে নিষ্ক্রিয় হতে হবে, ওদিকে কেন্দ্রীভূত হতে যাব না।

উত্তর লক্ষ্য থাকবে অবশ্য মনের উপরে উঠে যাবার দিকে, কিন্তু উপরের শক্তিকে কাজ করতে দিতে হবে প্রশান্তি আনতে। মনকে নীরব রাখলেও বাধাগুলি তোমাকে টেনে ধরে।

প্রশ্ন হৃদয়কেন্দ্রের পিছনে যে চৈত্যসত্তা, আর মাথার উপরে যে কেন্দ্রসত্তা, এ দুইএর মধ্যে প্রভেদ কি? ও কি দুই স্বতন্ত্র জিনিস না একটাই?

উত্তর এক দিক থেকে দেখলে দুইই এক। কিন্তু, তুমি একক সত্তা হলেও তোমার মধ্যে অনেকগুলি সত্তা নিহিত রয়েছে। যেমন মনঃসত্তা হলো প্রাণসত্তা ও দেহসত্তা থেকে স্বতন্ত্র, তেমনি চৈত্যসত্তা, যাকে আত্মা বলো, তা কেন্দ্র-আত্মার থেকে স্বতন্ত্র। এই চৈত্যই উপরের আলোকে গ্রহণ করে এবং তা নিম্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে সঞ্চারিত করে। কেন্দ্র-সত্তা তা করেনা, সে থাকে এখানকার বিবর্তনক্রিয়ার উপরে। এই চৈত্যই বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ক্রমশ অধ্যাত্মপূর্ণতায় বিকশিত হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন তাহলে কেন্দ্র-সত্তা আছে স্থান কালের উপরে, আর এখানে যা বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়ে পরে পরে বিবর্তিত হয়ে চলেছে তারও উপরে?

উত্তর হাঁ, চৈত্যই হলো বিকাশোন্মুখ আত্মা, ব্যক্তিকে সেই প্রস্তুত ক'রে তোলে। কেন্দ্র-সত্তার কোনো প্রত্যক্ষ ক্রিয়া নেই, সে কেবল কর্তা হয়ে লক্ষ্য করতে থাকে।

প্রশ্ন কাল সন্ধ্যাতে X-এর ওখানে ডিনার ছিল। সেখানে আমি বলছিলাম C. S.এর বাড়িটা কেমন ক'রে পুড়ল। শ্রীমতী X এই দুর্ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখলে একটা বীভৎস ছায়ামূর্ত্তি, বাদামী লাল রংএর এবং ন্যক্কারজনক। আমারও কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। বাড়ি ফিরে যখন সমুদ্রের ধারে গেলাম তখন আবার তেমনি অস্বস্তি বোধ হতে থাকল, যেন কোনো অশুভ আত্মার স্পর্শের মতো। তখন মনে হলো যে আমার সতর্ক থাকা দরকার। ভিতরকার সত্তার মধ্যে প্রবেশ ক'রে আমি ও-ভাবকে তাড়াতে পারলাম।

উত্তর হাঁ, তিনিও তাই লিখেছেন আমাকে আজ সকালে। শ্রীমতী X এ-সকল

বিষয়ে বড়ো স্পর্শকাতর। কিন্তু তোমার পক্ষে তেমন হবার কোনো কারণ নেই. তুমি স্থূলের স্তরে কাজ করবার জন্য এখনও তৈরি হতে পারোনি। ঐ সকলের সঙ্গে কোনো সংস্পর্শ ঘটতে না দিয়ে ওদের প্রত্যাখ্যান করাই ভালো।

হয়তো শ্রীমতী X-এর সঙ্গে ঐ C.S.এর ঘটনার কোনো সম্পর্কই নেই। কিন্তু একটার প্রভাব অন্য একটাকে ডেকে নিয়ে আসে।

প্রশ্ন তাহলে ওটা কি কল্পনা মাত্র নয়?

উত্তর : না, হয়তো ওর মধ্যে কল্পনার কাজ কিছু ছিল না। কিন্তু তুমি ঐ সব শক্তিকে আদৌ কাছে ঘেঁসতে দিওনা, এলেই তৎক্ষণাৎ দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে।

প্রশ্ন আমি ওর সংস্পর্শে যেতে চাইনি।

স্বপ্নে দেখলাম কয়েক দিন আগে কে একজন লাঠিতে একটা সাপ ঝুলিয়ে এনে আমাকে বলছে সাবধান, তুমি নড়ো না. এটা বিষাক্ত সাপ। আমি স্থির হয়ে থাকলাম. সাপটা আমার পাশ দিয়ে চলে গেল।

উত্তর ওতে তোমাকে সতর্ক করা হলো। কিন্তু লাঠি দিয়ে সাপ নিয়ে ধাঁচাধাঁচি করবার কিছু দরকার নেই।*

---

* অনুবাদক : পশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

Thoughts and Aphorisms

(মায়ের মন্তব্য সহ)

১৪৩—আর্টের কাজ যদি হয় কেবল প্রকৃতিকে নকল করা, তাহলে যত সব বড়ো বড়ো আর্ট-গ্যালারিগুলি পুড়িয়ে দিয়ে সেখানে কেবল ফটোগ্রাফের ষ্টুডিও খোলা হোক। প্রকৃতি যা লুকিয়ে রাখে আর্ট তাকেই বিকাশ করে, সেইজন্য ছোটো একটি ছবির যা দাম তা ক্রোরপতির মণিমাণিক্য ও রাজার ধনরত্নের চেয়ে অনেক বেশি।

১৪৪—প্রকৃতিতে যেমন দেখছ তারই যদি নকল করতে যাও, তাহলে তাতে যা দাঁড়াবে তা মরা জিনিস কিংবা কিম্ভূত কিছু। যা চোখে দেখা যায় ও জানা যায় তার পিছনে যা রয়েছে তারই মধ্যে থাকে সত্য।

প্রশ্ন মা, ফটোগ্রাফিকে আজকাল আর্টের সাধারণ বলা হয়। এতে আপনি কি বলেন?

মা সবই নির্ভর করবে তুমি ফটোগ্রাফিকে যেমন কাজে লাগাবে তারই উপর। আজকাল তা নিদর্শন চিত্র হিসাবে (documentary) কাজে লাগানো হচ্ছে সেটা যতই নিখুঁত জিনিস হবে ততই তার ভালো কাজ হবে।

কিন্তু এমন বলা ঠিক হবেনা যে অনেক আর্টিষ্ট ফটোর ভিতর দিয়ে আর্ট ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। যারা তেমন কিছু করতে চাইছে তারা ঠিক প্রকৃতির নকল করছে না, দেখা জিনিসের পিছনে যা আরো কিছু লুকিয়ে থাকে তাকেই রূপ ও রঙের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। ৪-৯-১৯৬৯

১৪৫—হে কবি, হে শিল্পী, প্রকৃতিকে যদি তুমি তোমার আয়নাতে তুলে ধরো তাহলে সে কি খুশি হবে মনে করো? সে তখন তার মুখ ফিরিয়ে নেবে। তুমি কি স্বয়ং প্রকৃতিকেই আয়নাতে ধরতে পারলে? না, যা ধরেছ তার প্রাণ নেই, রেখাচিত্র মাত্র, নকল ছায়া মাত্র। ওর ভিতরের গোপন আত্মাটি ধরা চাই, শাশ্বত প্রতীকের মধ্যে যে শাশ্বত রয়েছে তার সন্ধান পাওয়া চাই, যা আয়নাতে ধরা পড়েনা, আর ওতে যাকে ধরতে চাইছ সেও ধরা পড়ে না।

প্রশ্ন: মা, শ্রীঅরবিন্দ যে 'শাশ্বত প্রতীকের' কথা বলেছেন তা কোন জিনিস?

মা প্রকৃতির ভিতরকার যে গোপন আত্মা বা চেতনা তাই হলো শাশ্বতের প্রতীক, তারই সত্যের সন্ধান পাওয়া ও তাকে প্রকাশ করা হলো কবি ও শিল্পীর কাজ।

৭-৯-১৯৬৯

১৪৬—গ্রীক কবিদের চেয়ে শেক্‌সপিয়রকে আমি অনেক বড়ো দ্রষ্টা বলে মনে করি। তার সব চরিত্রগুলি, ল্যান্‌সিলট গোবো ও তার কুকুরটি থেকে শুরু ক'রে রাজা লিয়র ও হ্যামলেট পর্যন্ত সবই বিশ্বচরিত্রের নমুনা।

১৪৭—গ্রীকরা চেয়েছিলেন ব্যক্তি-চরিত্রের খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে বিশ্বচরিত্র আঁকতে; কিন্তু শেক্‌সপিয়র বাছা বাছা ব্যক্তিচরিত্র নিয়ে নিখুঁত ছবি আঁকতে পেরেছেন। অনন্তকে আড়াল করতে প্রকৃতি যে-সব জিনিস কাজে লাগায়, শেক্‌সপিয়র মানুষের সেই অনন্ত-গুণকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।

১৪৮—যদিও শেক্‌সপিয়র প্রকৃতির সামনে আয়না ধরে দেখাবার কৌশল আবিষ্কার করেছেন, তবু তিনিই একমাত্র কবি যিনি কখনো নকল বা ফটোগ্রাফ বা ছায়া আঁকেননি। তাঁর ফলষ্টাফ, ম্যাকবেথ, লিয়র বা হ্যামলেটের মধ্যে যে পাঠক নকল করা হয়েছে বলবে, তার আভ্যন্তরীণ আত্মিক দৃষ্টি নেই অথবা সে কোনো ফর্মুলার মোহে রয়েছে।

১৪৯—বাস্তব প্রকৃতির মধ্যে ফলষ্টাফ বা ম্যাকবেথ বা লিয়রের দেখা তুমি কোথায় পাবে? আভাসে ইঙ্গিতে পেতে পারো, কিন্তু এরা প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে গেছে।

১৫০—এদের দুজনেরই বেলাতে কিছু আশা আছে একজন যে ভগবৎ স্পর্শ পেয়ে সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছে, আর একজন যে অবিশ্বাসের ফলে নাস্তিক হয়েছে, কিন্তু আর যারা কেবল নানা ধর্মের ফর্মুলা মানে ও তোতাপাখির মতো চিন্তাগুলিকে শুধু কপ্‌চায়, তারা হলো মৃত আত্মা, আর মৃতবৎ চলতে থাকাকেই বলে বাঁচা।

প্রশ্ন মা, যারা ধর্মের ফর্মুলাগুলি বলতে থাকে, তারা কি সাধারণ লোকের কাছে ভগবানের কিছু প্রতিবিম্ব দিয়ে খানিক উপকার করেনা? ধর্মের দ্বারা কি সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো কাজ হয়না?

মা যা কিছু হয় সবই ভগবানের ইচ্ছাতে, যাতে সমগ্র সৃষ্টি ক্রমে ভগবৎ জ্ঞান পেতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ কাজ হয় তুলনা ও বর্জনের ভিতর দিয়ে। সেই প্রকারেই ধর্ম কাজ করে অধিকাংশ বিশ্বাসীর মধ্যে, যারা আত্মা ও অনুভূতি ছেড়ে কেবল ধর্মটাই মানে।

১৪-৯-১৯৬৯

১৫১—এক ব্যক্তি কোনো বিজ্ঞানীর কাছে শিক্ষা পেতে চাইলে; বিজ্ঞানী তাকে অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে অনেক কিছুই দেখালে, কিন্তু সেই ব্যক্তি হেসে বললে "এ তো পরকলার ভিতর দিয়ে কি সব দেখিয়ে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে; খোলা চোখে না দেখে ও-সব বিশ্বাস করতে পারি না।" বিজ্ঞানী তখন নানা

এক্সপেরিমেন্টের দ্বারা তার জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণ করতে থাকল, কিন্তু সেই ব্যক্তি আবার হেসে বললে : "তুমি যাকে প্রমাণ বলছ আমি তাকে ঘটিয়ে দেওয়া বলব, ওতে জিনিসটা সত্য বলে প্রমাণ হয়না ; তুমি কতকগুলো কৃত্রিম এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে যা ঘটছে দেখালে তাতে প্রকৃতির সামগ্রিক খানখেয়ালই প্রমাণ হয়।" যখন তাকে অঙ্ক কষে দেখানো হলো তার ফলাফল কি দাঁড়াচ্ছে তখন সে রেগে উঠে বললে "এ তো কেবল ঠকানি আর তোমার মনের কুসংস্কার, অদ্ভুত কতকগুলো সংখ্যার ছক এঁকে দিয়ে তুমি কি কোনো শক্তির পরিমাপ করবে ও তার মানে নিজের তরফেও ঐ রকম অস্বীকৃতি বুঝিয়ে দেবে?" তখন বিজ্ঞানী তাকে অবুঝ পাগল বলে দূর ক'রে দিলে ; অথচ সে তার ও নেগেটিভ যুক্তির দিকটা দেখলে না। যদি কোনো নিরপেক্ষ ও খোলা মনের জিজ্ঞাসাকে আমরা নাকচ ক'রে দিতে চাই, তখন অনেক বড়ো বড়ো দুর্বোধ্য রকমের শব্দযোজনার দোহাই দিয়েও বহুরকম শর্ত আরোপ ক'রে তাকে ধামিয়ে দিই।

মা যারা বিজ্ঞানী ও বিশেষত বাস্তববাদী, তারা ঠিক ঐরকম ভাবেই গুহ্যতত্ত্ব ও অন্যান্য জ্ঞানকে অস্বীকার করে, যেমন ভাবে অবুঝ অন্ধ ব্যক্তিরা বিজ্ঞানীকে অস্বীকার করে। সোজা মনের কাছে যা প্রমাণ বাঁকা মনের কাছে তা প্রবঞ্চনা।

১৭-৯-১৯৬৯

১৫১—আমাদের মন যখন বস্তুর মধ্যে নিমগ্ন থাকে তখন সে ভাবে যে এটাই প্রকৃত বাস্তব ; যখন অবস্তু চেতনার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করি তখন বস্তুকে ভাবি যাহা মুখোস বা খোল মাত্র, শুদ্ধ চেতনার ভিতরকার অস্তিত্বকেই বোধ করি বাস্তবের স্পর্শময়। এর মধ্যে কোনটা সত্য? ঈশ্বর জানেন কিন্তু এই দুই রকমের অনুভূতিই যে লাভ করেছে সে অনায়াসে বলে দেবে যে কোনটা প্রকৃত জ্ঞান ও শক্তিবোধক ও আনন্দদায়ক।

১৫২—আমি বস্তু-চেতনার চেয়ে অবস্তু-চেতনাকেই পছন্দ করি। কারণ আমি জানি যে বস্তু-চেতনার মধ্যে লুকিয়ে থাকে তা অবস্তু-চেতনার মধ্যে প্রকাশ পায় এবং তা বস্তুকেও পরিচালিত করতে পারে।

প্রশ্ন মা, অবস্তু-চেতনার মধ্যে সর্বক্ষণ কেমন করে থাকা যাবে?

মা তা যায় না এবং তা ভালোও নয়।

শ্রীঅরবিন্দ এখানে বস্তু-চেতনার বাইরের জিনিসের কথা বলছেন না, এবং যাকে বলছেন অবস্তু-চেতনা তা অতিমানস চেতনা নয়, কারণ তার মধ্যে সকল রকম চেতনারই স্থান আছে, সুতরাং তার দ্বারা সত্তার সকল স্তরের সম্বন্ধেই জানা যায়। ঐ চেতনার জন্যই আকাঙ্ক্ষা করতে হবে, ওরই দ্বারা সত্যকে সমগ্রভাবে জানতে পারা যাবে।

১৮-৯-১৯৬৯

শ্রীমা

পথের কথা

১৪ মার্চ, ১৯৭০

(মা শ্রীঅরবিন্দের "চুম্বকবাণী" (Aphorism)-গুলি পড়ে শোনাচ্ছিলেন)

৩৮৩—আধুনিক মানুষদের যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য হয়েছে তাদের দুরাশোধ্য বর্বরতার জন্য। আমরা যদি আরামের আয়োজন ও বেশভূষার দিশাহারা বাহুল্যের মধ্যে নিজেদের সর্বদা জড়িয়ে রাখি, তাহলে সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও সহজ রীতিকে আমাদের ছাড়তেই হয়; কারণ সারল্য ও মুক্তিবোধ যেখানে ঘুচল সেখানে সৌন্দর্যবোধও ঘুচল। আমাদের পূর্বপুরুষদের সৌখিনতা খুব দামী ও জমকালো ছিল বটে কিন্তু এমন জড়ীভূত নয়।

৩৮৪—ইউরোপীয় জীবনের স্থূল আরাম ও আড়ম্বরকে আমি সভ্যতা বলতে পারি না। মানুষ যারা অন্তরে স্বাধীন নয় আর জীবন-ব্যবস্থা যাদের উদার ছন্দোময় নয় তাদের সভ্য বলা যায় না।

৩৮৫—বর্তমান যুগের আর্ট বিশেষত ইউরোপীয় প্রভাবে যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা যেন জীবনের উপর আব ওঠার মতো বা অপ্রয়োজনীয় চাকরের মতো কিন্তু হওয়া উচিত ছিল প্রধান সহায়ক ও অপরিহার্য সহচর।

মা মানুষের মনই যতদিন জীবনকে তার মানসিক নিশ্চয়তার জোরে পরিচালিত করছে ততদিন খাঁটি ভগবৎ রাজ্য কেমন ক'রে স্থাপিত হবে?

১২-৩-১৯৭০

৩৮৬—রোগকে প্রায়ই অনর্থক প্রলম্বিত ক'রে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুতে টেনে আনা হয় যদিও তা অপরিহার্য নয়, কারণ রোগীর মন তার সেই দৈহিক রোগটি নিয়েই চিন্তা ক'রে ক'রে তাকে সমর্থন দিতে থাকে।

মা এ নিছক খাঁটি কথা।

৩৮৭—ডাক্তারি-শাস্ত্র মানুষের উপকারী হওয়ার বদলে বরং অভিশাপের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহামারীর প্রকোপগুলো ওর দ্বারা থামানো গেছে বটে, এবং সার্জারি চিকিৎসাও আশাতিরিক্ত সাফল্যলাভ করেছে, কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক আরোগ্যশক্তিকে খর্ব ক'রে ব্যক্তিগত অসুখের মাত্রা অনেক বাড়িয়ে তুলেছে; লোকের মনে একটা ভয়

এনে দিয়েছে আর মন ও দেহকে ওর উপর নির্ভরশীল করেছে ; আমাদের স্বাস্থ্য এখন আর স্বাভাবিক শক্তির উপর নির্ভর করে না,-ধাতব ও উদ্ভিজ্জ জগতের যত সব জিনিস দিয়ে তৈরি উৎকট বিস্বাদ ও বিজাতীয় ওষুধের ঠেকনো দরকার হয়।

৩৮৮—ডাক্তাররা রোগকে লক্ষ্য ক'রে ওষুধের ঢিল মারে ; কোনোটা লাগে কোনোটা লাগে না। যেগুলো ফস্‌কে গেল সেগুলোর কথা বাদ দিয়ে যেগুলো লেগে গেছে সেইগুলোকে নিয়েই বিধিবদ্ধভাবে সাজিয়ে তাকে বিজ্ঞানের ছাপ দিয়ে জাহির করে।

মা এ চমৎকার, চমৎকার কথা !

৩৮৯—বন্য মানুষদের ওঝার উপর বিশ্বাসের কুসংস্কার দেখে আমরা হাসি ; কিন্তু সভ্য মানুষদের ডাক্তারের উপর বিশ্বাসের কুসংস্কারটাই-বা কম কিসে ? বন্য লোকে ভাবে যে মন্ত্রটা পড়ে দিলেই তার সব রোগ সেরে যাবে, কারণ তাই তার বিশ্বাস। আর সভ্য রোগীও ভাবে যে প্রেস্‌ক্রিপশনের ওষুধটা আনিয়ে খেলেই রোগ সেরে যাবে, কারণ তাই তার বিশ্বাস। এর মধ্যে তফাৎ রইল কোথায় ?

মা আসল কথা, বিশ্বাসেই রোগ সারে। যদি এমনি বিশ্বাস লোকে ভগবৎ-কৃপার উপর রাখতে পারতো, তাহলে তাতে অনেক রোগ থেকেই তারা রক্ষা পেতো।

১৩-১-১৯৭০

মা : তুমি ঐ শেষের চুম্বকবাণীটা দেখেছ কি ?

ভক্ত : হাঁ, রোগ আর ডাক্তারদের দিয়ে...কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের ঐ কথাটা খুব অদ্ভুত লাগল, "আধুনিক মানুষের যন্ত্রের দরকার তাদের দুরারোগ্য বর্বরতার জন্য"।

মা (মাথা নেড়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে) আজ খবর পেলাম যে X গত হয়েছে। ভয়ঙ্কর রকমের অপারেশন করা হয়েছিল, তার থেকে সেরে উঠে বাড়িতেও ফিরে এসেছিল, আমাকে লিখলে "আমি ক্রমে ক্রমে সুস্থ হচ্ছি"...তারপর হঠাৎ চলে গেল। আজই মাত্র খবর পেলাম। এই রকমই হয়।

Z-এর বেলাতেও তাই। সেই ব্যাপারই হলো, তেমনিই তার চেহারা। এই যে প্রচেষ্টা, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন বর্বরতা তার বিরুদ্ধে (হাত ঘুরিয়ে সারা পৃথিবী দেখিয়ে যেন মনে হয়...বলতে পারিনা ওটা মনের তৈরি ভাবধারা থেকে বেরিয়ে আসবার অনিচ্ছা বা অক্ষমতা কিনা। আর উপরকার চেতনার ক্রিয়া...(কি বলি ?) যা একেবারে নির্বন, সোজা দেখিয়ে দিচ্ছে মনের তৈরি সব কিছুই একেবারে মিথ্যা—সমস্ত কিছু, এমন কি যাকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া মনে করি তাও, কেবল জটিল মানসিক সংগঠনের ফল।

কিন্তু তুমি ওরই মধ্যে জন্মেছ, ওরকম বোধ করা খুব স্বাভাবিক বলেই ভাবো, প্রতি-

ক্রিয়াও সেই ভাবেই হয়, সমস্তই সেই ভাবে চলে, আর এই ভাবে সত্যকে এড়িয়ে যাও। এমন কি দেহের সম্বন্ধেও তেমনি ব্যবস্থা করা হয়। তাই সেখানে উপরের ক্রিয়া যখন প্রচণ্ড বেগে এসে আঘাত করে, তখন মনে হয় তা (আমাদের কাছে) খুবই নির্মম। কিন্তু তা আসে (মুষ্ট্যাঘাত ক'রে) যাতে শিক্ষা হয়।

(দীর্ঘ সময় নীরব থেকে)

শ্রীঅরবিন্দের দেহে অবস্থানের সময়কার কথা মনে পড়ল ..যখন আভ্যন্তর সত্তা উচ্চতর চেতনাতে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস দেখছে তখন শ্রীঅরবিন্দ অসুস্থ হলেন, তার পর এই সব ব্যাপার, প্রথমে তাঁর পায়ের হাড় ভাঙল...তখন দেহ, সে অনবরতই বলতে থাকল "এ কেবল স্বপ্ন, স্বপ্ন, এ সব আমাদের জন্য নয়, আমাদের দেহ ঐ রকম" (মাটির নিচের দিকে দেখিয়ে)...কী ভয়ানক কথা ! ...কিন্তু তা এখন আর নেই। এতগুলি বছরের প্রয়াসে তা চলে গেছে, দেহ বোধ করছে ভগবৎ উপস্থিতি, সে জানতে পারছে... এবার আপনিই পরিবর্তন আসবে। কয়েকদিন আগে যে সংগঠন ছেড়ে গেল (যা সকল মানুষেরই পার্থিব সংগঠন, অর্থাৎ যাদের দৃষ্টি আছে অনুভূতি আছে আর উচ্চসত্তার আস্পৃহা আছে তারাও যখন বাস্তবে নেমে আসে তখন এই সব যন্ত্রণার সম্মুখীন হয় যা নেতিবাচক) এবং দেহ পেলো মুক্তি, তখন আবার তা ফিরে এলো। ফিরে এসে দেখলে যেন মিথ্যা জিনিসকে দেখছে। তখন বুঝলাম কতখানি সে বদলেছে, কারণ সে তার অতীতকে দেখছে বিদ্রূপের হাসির সঙ্গে, যা দেখছে তার মধ্যে সত্য কিছু নেই। এ একটা অসাধারণ অনুভূতি যে—ঐ জিনিসের কাল ফুরিয়েছে—পালা ফুরিয়েছে। এখন জানি যে উচ্চ চেতনার চাপ, যার দ্বারা ক্ষুদ্র পীড়িত অন্ধ ব্যাপারগুলো, যার থেকে রেহাই ছিল না—সমস্ত পড়ে রইল পিছনে (কাঁধের পিছনে নির্দেশ), অতীতের আমল এখন অতিক্রান্ত। সবই আমি দেখলাম ও বুঝলাম, ঐ উচ্চ চেতনার কাজ (সে নির্মম, দুঃসাধ্যতাকে বা ভাঙাচোরাকে গ্রাহ্যই করে না), সে চায় যে স্বাভাবিকতার মধ্যে ঐসব ভঙ্গুরতার, মলিন, দুর্বোধ্য কিছু না থাকে—দিগন্তের উষাগমের মতো ফুটে উঠবে নতুন চেতনা—যা প্রকৃত সত্য, যা আলোকদীপ্ত।

শ্রীঅরবিন্দ রোগ সম্বন্ধে যা বলেছেন সেই কথাই, অর্থাৎ অভ্যাসের ক্রিয়া যাতে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে ওর থেকে কারো "রেহাই নেই" "নিষ্কৃতি নেই"। তাই যেন অনুভূতির চাপের পর চাপ দিয়ে শেখাতে চায় যে সবই নির্ভর করে মনোভাবের উপর, মানুষ যে ভাব নিয়ে মনের কারাগারে বন্দী হয়ে আছে...ওর থেকে ছাড়িয়ে আরো উপরে উঠে যাও, মুক্ত বাতাস গ্রহণ করো।

আর তা হলো দেহেরই অনুভূতি। আগেকার কালে যারা এমন আভ্যন্তর অনুভূতি পেতো, তারা বলতো "হাঁ, উপরে গিয়ে তাই বটে, কিন্তু এখানে...", সেই "কিন্তু এখানে" জিনিসটা আর থাকবে না এখানেও। সেই পরিবর্তন, সেই বিজয়লাভই উপস্থিত করা হচ্ছে। ভৌতিক জীবন আর মনের অধীনে নয়, সেও চলবে উচ্চ চেতনার

অধীনে। শাসনকর্তা বদলাবে...কাজটা কঠিন বটে। ভাঙাচোরা কিছু তো হবেই... কিন্তু দেখা তো যায়। এই হলো খাঁটি পরিবর্তন, যাতে নতুন চেতনা এসে নিজেকে বিকাশ করবে। আর দেহ নিচ্ছে সেই শিক্ষা—সকল দেহই।

(নীরব থেকে)

কেবল মনই ভাগাভাগি ক'রে দেখে আগের মতো তবে উপরে উঠলে সবই ঠিক, সব অনুভূতিই আসবে আর সবই আলোকদীপ্ত, অপূর্ব :—আর এখানে কিছুনা। আর এইরূপ বিশ্বাস যে এখানে জন্মালেই আবার এখানে জন্মাতে হবে অথচ কিছুই হবার নয়। তাই যারা দেখতে পায়নি যে অন্য রকমও হতে পারে তারা বলেছে "এর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ো, তবেই—" সব পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু এই যে এখনকার নতুন পরিবর্তন, এই যে নতুন কথা সেটা অপরিহার্য নয়, এই তো বহু বিজয়লাভ ; যে অমন আর অপরিহার্য নয়। দেখাই যাচ্ছে—বোঝাই যাচ্ছে—দেহ পর্যন্ত স্পষ্ট অনুভবে জানছে যে এ কথা আরো সত্য হয়ে উঠবে। জগতে একটা কিছু বিশেষ পরিবর্তন তো হয়েছেই নিশ্চয়।

(নীরব থেকে)

অবশ্য ওর প্রতিষ্ঠা ঘটতে সময় নেবে। এখন চলেছে সংগ্রাম। চারদিক থেকে আঘাত আসছে সকল স্তরে যাতে বাহ্যতঃ বোঝাচ্ছে পরিবর্তন কিছু হয়নি—কিন্তু তা ঠিক কথা নয়, দেহ জানে তা ঠিক কথা নয়। এখন সে জানছে, কোন দিক দিয়ে হচ্ছে।

শ্রীঅরবিন্দ এই সব চুম্বকবাণীতে যা বলেছেন, এখন আমি দেখছি তা যেন দৈববাণীর মতো ! খাঁটি সত্যের দৃষ্টিতে বলা, ঠিক ভবিষ্যদ্বাণী !

(নীরব থেকে)

এখন দেখতে পাচ্ছি তাঁর কর্ম এবং তাঁর তিরোধান...এতই ব্যাপক ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে সূক্ষ্মদেহে, তাতে কতখানি ফল হয়েছে ! কতখানি তাতে সাহায্য করেছে তৈরি ক'রে আনতে, (হাত নেড়ে) এই স্থূল পৃথিবীকে কতখানি বদলাতে !

অন্যান্য অনেকেই যারা এসেছিল, তারা উপরকার জগতের সংস্পর্শ লাভ ক'রে উপলব্ধি পেয়েছে, কিন্তু তাদের সে উপলব্ধি এই ভৌতিক পৃথিবীকে যেমন ছিল তেমনি রেখে গেছে, কিন্তু... কেমন ক'রে বলি ! আমার জীবনে প্রথম থেকে শ্রীঅরবিন্দের তিরোধান পর্যন্ত এই চেতনা ছিল যে আমি উপরে উঠে যেতে পারি, সব কিছুই জানতে ও সকল উপলব্ধি পেতে পারি (তাই হয়েছিল). কিন্তু যখন আবার দেহে ফিরে আসি...তখন সেই আবার মনের জগতের নিয়ম কানুনে সব কিছু বাঁধা। আর তার পর থেকে এই কয়টা বছর ধরে চলেছে কেবল প্রস্তুতি—প্রস্তুতি—কেবল প্রস্তুতি আর মুক্তি, আর এখন দেখছি—হাঁ, দেহ পর্যন্ত জানছে যে এবার বদলাচ্ছে।

এটা আরো বিশদভাবে তন্নতন্নভাবে সফল করতে হবে, কিন্তু তবু পরিবর্তন এসে গেছে—সে কাজ শুরু হয়ে গেছে। অর্থাৎ যখন বাস্তবের অবস্থাকে মনের ক্রিয়া এমন এঁটে বন্ধ করে রেখেছিল (মুষ্টিবদ্ধ ক'রে) যে উপলব্ধি যারাই পেয়েছে তারাই বলে গেছে

যে বস্তুজগৎকে ত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই, যদি সত্যের মধ্যে অবস্থান করতে চাও (সেই অনুসারেই প্রচলিত হয়েছে যত রকমের যোগতত্ত্ব ও সাধনাধারা) কিন্তু এখন আর সে কথা নয়। এই বস্তুজগতের স্থূল দেহই উপরের আলোকে, সত্যকে, সত্যচেতনাকে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, এবং তাকে অভিব্যক্ত করতে পারবে। অবশ্য সহজ নয়, যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি ও সহ্যশক্তির দরকার, কিন্তু একদিন তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে। এখন কেবল দরজা খুলল মাত্র—এর পরে আরো এগিয়ে চলো।

(নীরব থেকে)

অবশ্য এতদিন যা শিকড় গেড়ে বসেছিল তা নিজেকে টিকিয়ে রাখবার জন্য মরীয়া হয়ে লড়ছে। তাই এত সব গণ্ডগোল চলছে (মা চারদিকে হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন)—কিন্তু ওর খেলার পালা এবার ফুরিয়েছে। লীলাখেলা এবার খতম।

(নীরব থেকে)

প্রায়...প্রায় এক বছরেরও কিছু বেশি সময় লাগল ওকে জব্দ করতে উচ্চ চেতনার পক্ষে (১লা জানুয়ারি ১৯৬৯)। যদিও এখনও তা সকলের কাছে গোচর নয়, কেবল যাদের আভ্যন্তরিক দৃষ্টি আছে তারা ব্যতীত, কিন্তু...তা হয়ে গেছে।

(দীর্ঘ সময় নীরব থেকে)

এটা, এই কাজই আমাকে শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন। এখন তা বুঝতে পারি। কিন্তু সকল দিক থেকে—সর্ব দিকেই ঐ সব মনোময় জগতের শক্তিরা ভীষণ প্রতিবাদ তুলেছিল, তারা পুরোনো ধারা কায়েমী রাখতে চায়, কারণ "বরাবর যে তাই হয়ে আসছে"। কিন্তু বরাবর তা চলবে না, এবার তা ঘুচবে।

(নীরব থেকে)

গত কয়েকদিন ধরে এই সংগ্রামের কিছুটা অংশ এই দেহের উপর দিয়ে হয়ে গেছে।...নজর দেখ...বাইরের থেকে চেষ্টা চলছে দেহটাকে এমন অনুভূতিতে আনতে যাতে সে বলে ফেলে "বরাবর যা হচ্ছে তা হবেই, যতই কেন তড়পাও না সব মিছে," সঙ্গে সঙ্গে একটু কিছু ঘটল, কিছু কল বিগড়ে গেল। আর দেহ অমনি তার আপন ভাব নিয়ে স্থির শান্ত হয়ে নিজেকে ভগবানের হাতে একেবারে ছেড়ে দিয়ে (মুঠো খুলে দেখালেন) শুধু বললে "তোমার যেমন ইচ্ছা প্রভু, তোমার যা খুশি"...বাস্, চকিতের মধ্যে ঐসব মিলিয়ে গেল এমনি পুনঃপুনঃ হতে থাকল, দিনে অন্তত ডজন খানেক বার। আর এর পরেই দেহ বোধ করতে থাকল "এই তো! এই তো সেই পরমাশ্চর্য আর তার অনুপম আনন্দ!" যা ছিল তা আর নেই, তেমন জিনিস আর নেই।

এখনও অবশ্য সংগ্রাম ক'রে যেতে হবে, ধৈর্য সাহস ও আস্থার সঙ্গে—কিন্তু সেই "তেমনটি" আর থাকবে না। সেই পুরানো ধারা এখনও চালিয়ে যেতে চায়—কী ভয়ানক! কিন্তু...আর নয়, আর তা হচ্ছে না।

(নীরব থেকে)

আর সেই কথাটা কতদূর পর্যন্ত দেহটা আরো কাজ চালাতে পারবে? তার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা...পুরোপুরি নিশ্চিন্ত আনন্দের সঙ্গে: তোমার যা ইচ্ছা প্রভু।

(দীর্ঘ সময় নীরব থেকে)

বাকি সব মনে হয় পুরানো, কত পুরানো, যেন...মৃত অতীতের—যা আবার বেঁচে উঠতে চায়, অথচ পারে না। সব অবস্থা, সব অবস্থাই যথাসম্ভব শোচনীয় হতে পারে—দুশ্চিন্তা, জটিলতা বাধাবিপত্তি সব উঠে এসেছে, প্রচণ্ড, হিংস্র বন্যপশুর মতো, কিন্তু...সব শেষ। দেহ মানে এসবের শেষ। হয়ত কত শতাব্দি লাগবে, তবু শেষ। নিশ্চিহ্ন হতে লাগবে কত শতাব্দি, কিন্তু এবার শেষ।

এই উপলব্ধি একান্ত বাস্তব এবং শুধু জড় থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেই তা সম্ভব (মা আঙুল দিয়ে নিচে দেখালেন)।

এই উপলব্ধি খাঁটি ও নিরেট, যা কেবল জড়ের ভিতর থেকে (বাটির দিকে ইঙ্গিত) বেরিয়ে এসে নিলতে পারে, এখানে এলেই তা মিলবে।

(অনেকক্ষণ নীরব থেকে)

চৌদ্দ মাস হলো ঐ দিব্যচেতনা নেবে এসেছে—চৌদ্দ মাস, সাত দু গুণে চৌদ্দ।

(নীরব হলেন)

আজ কি মাসের চৌদ্দ তারিখ না?

ভক্ত হাঁ, আজ চৌদ্দ তারিখ বটে।

মা আশ্চর্য তো? (নীরব হলেন)

মনে হয় দেহের মধ্যে কিছু অঘটন ঘটছে। এর আগেকার সংগঠন চলে গেছে, অলৌকিক ব্যাপার।

তিনি যাবার পর থেকে কত কিছুই করলেন! ও: নিত্যই, সর্বক্ষণই!

সব কিছু পরিষ্কার হয়ে আসছে। দেখা যাক।

(নীরব থেকে)

প্রায় তাড়াতাড়ি কাজটা হয়ে গেল।

(নীরব থেকে)

তাহলে...

ভক্ত: তাহলে এমন কথা তো বলা যায় যে আত্মাবান প্রত্যেক মনুষ্য চেতনার পক্ষে মনের জগতের মোহ কাটিয়ে বেরোতে পারা সম্ভব?

মা হাঁ হাঁ, ঠিক তাই, ঠিক তাই।

যথার্থই তাই।

২০ মে, ১৯৭০

ভক্ত আপনার অনুভূতির একটুমাত্রও কি আমরা অনুধাবন করতে পারছি? ওর সঙ্গে একটুমাত্র যোগ দিতে চাইলেও কি আমরা তা করতে পারি?

মা কেউ কেউ অনুভূতি পেতে শুরু করেছে; কেউ কেউ পাচ্ছে অথচ নিজেরা সে কথা জানেনা (হাসলেন)—এর তো কিছু ফল আছে।

সব চেয়ে মুশকিল হলো মনকে নিয়ে, কারণ সে চায় তার আপন ধরনে বুঝতে। সেখানেই তো মুশকিল...এ ভাব না থাকলে অনেকেই যথেষ্ট তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারতো। তাদের ধারণা, মন দিয়ে বোঝা না গেলে তা বোঝাই হলো না।

২৭ জুন, ১৯৭০

ভক্ত অনেক দিন আপনি কিছু বলেননি।

মা (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) কোনো কিছুর সম্বন্ধে বলতে গেলেই আগে তাকে মনের বোধের গণ্ডীতে আনতে হয়, আর সেটা করা শক্ত, কারণ এ স্থলে দেহটাই পাচ্ছে যা কিছু অনুভূতি ও শিক্ষা, তাই যেননি কিছু বলতে যাবো অমনি সে বলে "না না, ঠিক কথা হলোনা, অমন ঠিক নয়"...(মা ছোটো ছোটো ছক এঁকে দেখালেন) এমনি যেন জীবনকে নিয়ে জ্যামিতির ছক কাটা হয়েছে। এই তার ধারণা হয়ে থাকে। তা ছাড়া জিনিসটা অব্যক্ত, কারণ তার এতই বৈচিত্র্য যে প্রকাশ করতে গেলেই জটিল ব্যাপার হয়ে ওঠে, আর ব্যাখ্যা করতে না পারলে বৃথা বলা...তা আর সত্য হয়না।

গত কয়েকদিন কেবল তাই হয়েছে, চেতনার সামান্য একটু এদিক ওদিক হবার মতো অনুভূতি (কেমন করে বলি), একটুমাত্র ভাবের অদল বদল যাকে বোঝানো যায়না,—একটা অবস্থায় বিপুল দিব্য আনন্দ, আবার সেই অবস্থার মধ্যেই নিদারুণ যন্ত্রণা, সর্বক্ষণ এই চলেছে। এক এক বার দেহটা যন্ত্রণাতে চেঁচিয়ে ওঠে...আর সামান্য একটু চেতনার পরিবর্তনেই বিপুল আনন্দ....সঙ্গে সঙ্গে সেই অপূর্ব ভাব, ভগবানই সব, তিনিই সর্বত্র। এই সব ভাব নিয়ে দেহ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অনবরত যাতায়াত করছে, জিম্‌ন্যাস্টিক করার মতো চেতনার দুমুখী সংগ্রাম।

আর তা যখন তীব্র হয়ে ওঠে, সেই সব মুহূর্তে দেহ বলতে শুরু করে: "যথেষ্ট হয়েছে, আর না" আর অমনি তখন, ফুঃ!...(হাত উল্‌টে ভঙ্গী) যা হয় তা বলাই অসম্ভব। যাই কেন বলি, ঠিক সত্য হবে না।

বেদনার স্পন্দনগুলি যেমন হয় তা সাধারণ মানব-চেতনাতে সকলেরই যা হয়ে থাকে—হাঁ, সেই রকমই। আর অন্য যেটা তা ওর তুলনায় অব্যক্ত (অনুরূপ ভঙ্গী)—বলা অসাধ্য।

সর্বক্ষণই রয়েছে—হয় এই অবর্ণনীয় প্রশান্তি একেবারে চড়ান্ত রকমের, আর সঙ্গে সঙ্গেই জানছি ("বোধ করছি" নয়, "জানাই") যে ওর রূপান্তর ক্রিয়া এতই দ্রুত যে বাস্তবে

চৈত্য পাবার মতো নয়। আর দুইই এমন জোড়া যে দেহ এর থেকে ওতে অনবরতই যাচ্ছে, কখনো-বা দুই-ই একত্রে (মাথা নেড়ে দেখালেন যে ঠিক বলা হলোনা)।

আর এতে সাধারণ দিক দিয়ে একটা দৃষ্টি আসে, যা দিব্য দৃষ্টি নয় কিন্তু তার সঙ্গে তুলনীয়—সেই দৃষ্টিতে বলে যে অল্পবিস্তর পাগল সকলেই, বস্তুত পাগলে আর সহজ মানুষে কোনো তফাৎ নেই...লোকে যে তফাতের কথা বলে তা হাসাকর। তাদের বলতে ইচ্ছা করে, তোমরা সবাই ভাই, কেবল মাত্রার একটু তারতম্য।

এমনি সব কত অনুভবেরই জগৎ সেটা তার বর্ণনা করা অসাধ্য।

এখানে কিছু নয় (মাথাটা দেখিয়ে), এর মধ্যে কিছু হচ্ছে না। এমন কিছু যার আকৃতি নেই কিন্তু অনুভূতি অসংখ্য, আর তা বলতে গেলেই আসে অসামর্থ্য।

(নীরব থেকে)

যেমন ধরো যেটা যেটা ঘটছে তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাখ্যা (ব্যাখ্যা বলা ঠিক হলো না, যাই হোক...) যে ব্যাখ্যা সাধারণ মানব চেতনার স্তরের (''মামুলী'' ব্যাখ্যা বলছি না, কেবল মানব চেতনার দিক থেকে), যেমন ব্যাখ্যা শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন তাঁর দীপ্তিযুক্ত মনের মাধ্যমে, দিব্য অনুভূতির কথা। কিন্তু একই জিনিসের তিন রকম, কেমন ক'রে বলি।

অথচ নিতাই তাই। আর এটা (দেহ দেখিয়ে) নিজেকে প্রকাশ করেনা, তার সময় এখন নয়!

যখন আমি লিখে বলি তখনও তাই। চেষ্টা করি ভাষার মধ্যে যতটা ধরানো যায়—এতটা! এতটা! কিন্তু প্রকাশ হয়না; কেউ যখন পড়ে শোনায় যে আমি কি লিখেছি, তখন বলতে ইচ্ছে করে—ঠাট্টা হচ্ছে? সব কথাই তো বাদ হয়ে গেল!...

১ জুলাই, ১৯৭০

একটা অনুভূতি পেলাম যা আমার কাছে খুব আশ্চর্যের কারণ হলো—এই প্রথম তেমন অনুভূতি। কাল না পরশু হলো ঠিক মনে নেই...যখন আমার সামনে X এসে দাঁড়ালো, আমি দেখলাম তার চৈত্য সত্তাটি তাকে ছাড়িয়ে প্রায় এতখানি লম্বা (আট ইঞ্চির মতো বেশি দেখালেন)। এই আমি প্রথম দেখলাম যে মানুষটার চেয়ে তার চৈত্য অতখানি বড়ো। আর তা পুরুষ নয়, স্ত্রী নয়, ক্লীবলিঙ্গ। তখন মনে মনে বললাম (হয়তো এইরকমই হয়, জানিনা, কিন্তু যা স্পষ্ট দেখলাম) এই হলো চৈত্যসত্তা, যা কালে অতিমানস সত্তায় পরিণত হবে।

ঐ রকমই আমি দেখলাম। বিশিষ্টতা কিছু ছিল, কিন্তু তা ছাড়া এই দেখা গেল যে তাকে পুরুষ বলাও যায়না, নারী বলাও যায়না, অথচ দুই রকমই লক্ষণগুলি আছে। আর তা মানুষটির চেয়ে এতখানি বড়ো (পুনরায় মাপটা দেখালেন)। আর তার রঙটা

ঠিক এইরকম (কমলা রং)...যেমন হবে অরোভিলের রঙ। গুণ্ঠনে ঢাকা বলে রঙটা অস্পষ্ট দেখালো, কিন্তু তা কমলাই। মাথার চুলও ছিল, কিন্তু সে অন্যরকমের। এর পরের বারে হয়তো আরো ভালো ক'রে দেখতে পাবো। কিন্তু আমার খুব ঔৎসুক্য হয়েছিল, কারণ সে যেন আমাকে বলতে চাইলে "তুমি তো এই নিয়েই ব্যস্ত আছো যে অতিমানস সত্তা কেমনতরো হবে—তা এই দেখে নাও। এই রকমই হবে।" সেই রকমই দেখলাম এর চৈত্যকে।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম চৈত্যসত্তা ঐভাবে রূপায়িত হচ্ছে...এমনি করে বিবর্তনের একটা ধারাবাহিকতা থাকবে। সৃষ্টির প্রণালী দেখলে বোঝাই যায় যে খামকা কিছু হয় না, তার পিছনে কিছু যুক্তি থাকে যা আমাদের মানুষের যুক্তির মতো নয়, তার চেয়ে অনেক উচ্চ পর্যায়ের, তাই যখন তাকে ঐরূপ দেখলাম তখন তাতেই সে পরিতুষ্ট।

খুব আশ্চর্য হলাম যখন ধীরভাবে আমাকে শোনালে "যা দেখতে চেয়েছিলে, এই দেখ, তাই।"

বুঝলাম যে এই চৈত্যকে রেখে মন ও প্রাণ কেন দেহ ছেড়ে যায় এই-ই তো সকল ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে, নতুন কিছু কথা নয়, সমস্যা মিটে গেল মন ও প্রাণের দ্বারা যে সব জটিলতা ঘটে তার কিছুই থাকে না। এই চৈত্য সত্তাই থাকে, আর এই হবে অতিমানস সত্তা।

কিন্তু সে কেমন দেখতে হবে তা জানতে চাইনি। ঐ Xকে দেখে...সেটা বুঝলাম। স্মৃতিটা এখনও রয়ে গেছে, এখনও দেখছি। মাথার চুল যেন লালচে (ঠিক তা নয়)—যার মুখের ভাব কি সুন্দর! ভারী মিষ্টি একটু ব্যঙ্গের হাসি...অতি অপরূপ, অসাধারণ।

অবশ্য আমার চোখ তখন খোলাই ছিল, যা দেখলাম তা বাস্তবের মতো। সকল প্রশ্নই মিটে গেল, সমস্ত যেন পরিষ্কার হয়ে গেল।

(নীরব থেকে)

এই চৈত্যসত্তাই বজায় থাকে। ও যখন রূপ নেবে, তার মানে তখন আর তাহলে মৃত্যু থাকবে না। যেগুলো সত্য জিনিস নয় তাই কেবল লোপ পাবে...যেগুলো চৈত্যের ছাঁচে ঢালাই হয়ে তারই নিজস্ব অংশস্বরূপ হতে পারে না।

এ খুবই স্মরণীয় কথা।*

শ্রীমা—

---

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

কঠিন ডানায় ওড়া

বীরবাহু

পেশাবরে হকার হারিকেন বিমান উড়াইবার এবং বিমান মেরামত করিয়া উড়িবার জন্য উপযুক্ত রাখার কৌশল খুব অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আয়ত্ত করিতে হইল। বোমারু বিমানে দুশমনদের এলাকায় বোমাবর্ষণে যাওয়ার সময় আমরা এতদিন পর্য্যন্ত বারখানা বিমান, খুব নিকটে থাকিয়া একযোগে উড়িয়া চলিতাম। এই ব্যবস্থায় বারখানা বিমানের প্রত্যেকটিই, দুশমনদের জঙ্গী-বিমান হামলা করিতে আসিলে, অন্য এগারখানা বিমানে-স্থিত বন্দুক গুলির সাহায্য সব সময় পাইত। সম্মুখভাগ হইতে আক্রমণ করিতে হইলে দুশমনদের জঙ্গী বিমানকে বারখানা বোমারু বিমানের সম্মুখে স্থিত সবগুলি মেশিনগানের পাল্লার মধ্যে আসিতে হইত। আর তার সংখ্যাও কম ছিল না, প্রত্যেক বিমানে চারখানা করিয়া বারখানা বিমানের মোট আটচল্লিশখানা ব্রাউনিং মেশিনগানের সম্মুখীন হইতে হইত। পশ্চাৎদিক হইতে আক্রমণ করিতে হইলেও সমান সংখ্যক ব্রাউনিং মেশিনগানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইত। পশ্চাতের মেশিনগানগুলি বেতার-বার্ত্তা-পরিবেশনকারী বৈমানিকের হাতে ছিল। মেশিনগান চারটি এমনভাবে সন্নিবেশ করা ছিল যাহাতে অতি শীঘ্র এবং সহজে সেগুলির মুখ উপর-নীচ বা দক্ষিণ-বামে ঘুরান সম্ভব। সম্মুখের চারটি কিন্তু সোজা সম্মুখ দিকেই গুলি নিক্ষেপ করিতে পারিত। সেগুলিকে উপর নীচে বা দক্ষিণে-বামে ঘুরান যাইত না।

এই অবস্থায় বোমারু-বিমানগুলির দৃঢ়বদ্ধ-ব্যূহ (tight formation) ছত্রভঙ্গ না করা পর্য্যন্ত জঙ্গী-বিমানের দল বোমারু-বিমাগুলিকে কাবু করিতে পারিত না। সেইজন্য দুশমনদের জঙ্গীবিমানগুলির প্রথম কাজ ছিল বোমারুবিমানগুলিকে ছত্রভঙ্গ করা। একবার ছত্রভঙ্গ করিতে পারিলে জঙ্গীবিমানের দল একটি একটি করিয়া বোমারুবিমানগুলিকে ভূপাতিত করিতে সমর্থ হইত। ছত্রভঙ্গ করার জন্য অনেকগুলি জঙ্গীবিমান একযোগে দশদিক হইতে ব্যূহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত। বোমারু-বিমানের দল সতর্ক না থাকিলে দৃঢ়বদ্ধ-ব্যূহ ভাঙ্গিয়া পড়িত—তখন আর রক্ষা নেই। কিন্তু দৃঢ়বদ্ধ-ব্যূহ যদি ছত্রভঙ্গ না করা গেল, তবে জঙ্গীবিমানগুলির সাফল্যের আশা রহিল না। বোমারু-বিমানের বৈমানিকরা সেইজন্য নিজেদের ব্যূহ যাহাতে ছত্রভঙ্গ হইয়া না যায় তাহার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প রহিত। দৃঢ়বদ্ধ-ব্যূহ লইয়া উড়িয়া চলার জন্য, বিশেষতঃ, বোমারু-বিমানের দল সব সময় অক্লেশে নিজেদের রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

জঙ্গীবিমানের বেলায় পরিস্থিতি অন্যপ্রকার। জঙ্গীবিমানের কাজ নিশ্চিন্তে নিশানার উপর বোমা বর্ষণ নয়—বরঞ্চ তাহার উলটা অর্থাৎ বোমাবর্ষণে রত অথবা বোমা

বর্ষণের জন্য নিশানার দিকে আগত বোমারু-বিমানকে বিধ্বস্ত করা। এছাড়া দুশমনদের জঙ্গীবিমানের সাথে আকাশে লড়াই করিয়া তাহাকে ভূপাতিত করা। সাধারণতঃ বোমারু-বিমানের দৃঢ়বদ্ধ-ব্যূহ যখন বারখানা বিমান লইয়া অথবা আরও বেশী সংখ্যক বিমান একযোগে বোমা বর্ষণের জন্য অগ্রসর হয় তখন হয় পথে অথবা নিশানার উপরে জঙ্গীবিমান তাহাদের আক্রমণ করে। উদ্দেশ্য, শুধু বোমারুবিমানকে ভূপাতিত করা নয়। যদি ভূপাতিত করা না-ও যায়, তখন যাহাতে বোমারুবিমান ধীরে-সুস্থে নিশানা মাফিক তাক্ করিয়া বোমা বর্ষণ করিতে না পারে—তাহার ব্যবস্থাও জঙ্গীবিমানগুলি করে।

যখন অনেকগুলি বোমারুবিমান একসঙ্গে ব্যূহ রচনা করিয়া হামলা করিতে আসে, সেই সময় বাধা দিতে হইলে অনেকগুলি জঙ্গীবিমানের একসঙ্গে আক্রমণ করিতে যাওয়া সমীচীন। তখন একখানা বা দুইখানা জঙ্গীবিমানকে বোমারু বিমানরা কোন আমলই দেয়না। কেননা, সাধারণতঃ তাহাদের প্রত্যেক বিমান হইতে একযোগে চারগুণ আটশত অর্থাৎ বত্রিশশত গুলি নিক্ষিপ্ত হইয়া জঙ্গী বিমানের উপর পতিত হইবে। সেইজন্য ছত্র-ভঙ্গ করিবার জন্য বহুসংখ্যক জঙ্গীবিমান একযোগে আক্রমণ করিতে আসে। উপর্য্যুপরি কয়েকবার নানাদিক হইতে আক্রমণ করিয়া প্রথমে ব্যূহ ছত্রভঙ্গ করিবার প্রয়াস করে। যদি ছত্রভঙ্গ করা সম্ভব না হয়, তবে অন্ততঃ বোমারুবিমানগুলির চালকদের কিছুটা বিচলিত অবস্থায় ফেলিবার জন্য ত্যক্ত-বিরক্ত করিতে থাকে। বোমারু-বিমানের চালকগণ বিচলিত হইলে নিশানা মাফিক বোমা বর্ষণ করা তাহাদের পক্ষে সহজ হইবেনা—এমনও হইতে পারে হয়ত কোন বোমাই নিশানার উপর পড়িবে না।

জঙ্গীবিমানগুলি আর এক প্রকার আক্রমণাত্মক কাজ করিত। একসাথে মোটে দুইটি বিমান উড়িয়া যাইত। প্রথমজন দলপতি, দ্বিতীয়জন, প্রথমজনের কিছু উর্ধ্বে দক্ষিণ-দিকে এবং একটি বিমানের দৈর্ঘ্যবত পশ্চাতে থাকিয়া খুব দৃঢ়বদ্ধ-ব্যূহ রচনা করিয়া উড়িয়া চলিত। উড়িবার সময় মনে হইত যেন মোটে একটিই বিমান উড়িয়া চলিয়াছে। প্রথম জনের কাজ ছিল নিশানা তাক করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোমা বর্ষণ করা নয়ত গুলি বা রকেট নিক্ষেপ করিয়া শত্রুর ট্যাঙ্ক বা বিমানধ্বংসী কামান বিধ্বস্ত করা। দ্বিতীয়জনের কাজ ছিল প্রথমজনের নিরাপত্তা বজায় রাখা,—শত্রুপক্ষের জঙ্গীবিমান যাহাতে তাহাদের বিমানদুইটিকে আক্রমণ করিতে না পারে, শত্রুপক্ষের বিমানগুলির গতিবিধি সব সময় নিজের নজরে রাখিয়া সময়মত তাহার দলপতিকে শত্রুর গতিবিধি ও চারিপার্শ্বের অবস্থার কথা আকার ইঙ্গিতে জানাইয়া দেওয়া। এইভাবে মোট দুইটি বিমান উড়িয়া শত্রুর এলাকায় খুব সহজে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়—বিশেষতঃ যখন তাহারা খুব নীচু দিয়া উড়িয়া চলে। মাটির খুব নিকট দিয়া উড়িয়া গেলে শত্রুর রাডারও তাহাদের অস্তিত্ব সহজে ধরিতে পারে না।

নানা ভঙ্গিতে উড়িবার এবং দৃঢ়বদ্ধ-ব্যূহ রাখিয়াই কেমন করিয়া শত্রুবিমান বা মাটির উপর অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিশানার উপর আক্রমণ চালাইয়া বিধ্বস্ত করা যায় তাহার শিক্ষা

সমাপন করিতে আমাদের দুইমাসের বেশী প্রয়োজন হইল না। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েকটি ঘটনা ঘটিল যা স্মরণে রহিয়া গিয়াছে।

একদিন পেশাবর বিমান-অবতরণ-ক্ষেত্রে আমাদের একটি হকার হারিকেন বিমানে পেট্রল ভর্ত্তি করিবার জন্য "বাউজার" আনা হইয়াছে। বাউজার মানে লরীর কাঠামোর (forme) উপর সন্নিবিষ্ট করা লোহার পাতে তৈয়ারী আধার—যাহার মধ্যে পেট্রল বহন করা হয়। এই যন্ত্রের সাথে একটি পাম্পও থাকে। পাম্পের সাহায্যে মাটির নিচে রক্ষিত আধার হইতে বাউজারের আধারে পেট্রল ভর্ত্তি করা হয়—অথবা বাউজারের আধার হইতে বিমানের আধারে পেট্রল ভর্ত্তি করা হয়। এই বাউজারটি আমাদের স্কোয়াড্রনের হেফাজতেই ছিল, কিন্তু তাহার চালক ছিল একজন স্থানীয় পাঠান। পাঠান ভদ্রলোকও বিমান-বাহিনীরই ছিলেন।

তিনি বিমানের সম্মুখে বাউজার আনিয়া, বাউজার হইতে রবারের নল টানিয়া বাহির করিয়া বিমানের ডানার মধ্যে রক্ষিত পেট্রলের আধারে লাগাইয়া দিলেন এবং কায়দা মাফিক পাম্প চালু করিলেন। এবার যে কল দিয়া পেট্রল মাটির নীচের আধারের সঙ্গে লাগান হয়, সেই কল খুলিয়া বাউজারের চালকের আসনে নিশ্চিন্ত মনে গিয়া বসিলেন। নীচের কল খোলা—সেইজন্য পেট্রল বিমানের আধারে ভর্ত্তি না হইয়া, নীচের খোলা কলের নল দিয়া বিমান বন্দরের কংক্রীটের আঙ্গিনায় পড়িয়া ভাসিয়া চলিল। ভদ্রলোকের সেদিকে কোন খেয়ালই ছিল না। কন্ট্রোল টাওয়ার হইতে বিমান-বন্দরের কংক্রীটের আঙ্গিনায় পেট্রলের বন্যা দেখিয়া "পাগলা-ঘন্টা" বাজাইয়া অগ্নি-নির্ব্বাপণের গাড়ী তলব করিয়া তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পাঠাইলান। অগ্নি-নির্ব্বাপণের গাড়ীগুলি ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে অতি দ্রুত আসিয়া হাজির হইল—কিন্তু ততক্ষণ বাউজার হইতে হাজার হাজার গ্যালন পেট্রল বাহির হইয়া বিমান-বন্দরের কংক্রীটের আঙ্গিনায় বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অগ্নি-নির্ব্বাপণের গাড়ীগুলির ঘন্টাধ্বনি শুনিয়া পাঠান ভদ্রলোকের চেতনা সমাধি হইতে সাধারণ অবস্থায় নামিয়া আসিল এবং তখন পেট্রলের আগুনে পুড়িয়া মরিবার ভয়ে তিনি বিষম চেঁচাইতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আঙ্গিনাতে ছড়ান পেট্রলের চারিদিকে অগ্নি-নির্ব্বাপণের বোতল-সহ বাঁটি বসাইয়া দেওয়া হইল, এবং সেইবারকার মত বিষম অগ্নিকাণ্ড হইতে আমরা সকলে বাঁচিয়া গেলাম।

পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইল যে তখন দ্বিপ্রহর ছিল বলিয়া কোন বিমানঅবতরণ করিতেছিল না বা কোন বিমানের এঞ্জিনও চালু করা হয় নাই। নয়ত একটা সামান্য স্ফুলিঙ্গ এঞ্জিন হইতে নির্গত হইয়া হাজারের অধিক গ্যালন পেট্রল সমুদ্রে পড়িলে কি ব্যাপার হইত তাহা যাহারা না দেখিয়াছে তাহাদের পক্ষে চিন্তায় আনাও কঠিন।

দ্বিতীয় ব্যাপারও পেট্রল লইয়া। আমাদের 'এ' ফ্লাইটের বৈমানিকদের কাজ-তত্ত্বাবধানের কর্ত্তা ছিলেন ফ্লাইট-সার্জেন্ট আলি। তিনি ছিলেন পঞ্জনদীর দেশের। একদিন 'এ' ফ্লাইটের একটি বিমান পেশাবর হইতে পাহাড় ডিঙাইয়া কোহাট পৌঁছায়,

এবং বিমানে পেট্রলের অভাব বোধ করিয়া সেখানকার বিমানবন্দরে অবতরণ করে। তারপর তিনি পেট্রল অভাবে কোহাটে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এই বলিয়া জরুরী তার পাঠান। জরুরী তার আসা মাত্র ফ্লাইট-সার্জেন্ট র. আলি একজন স্থানীয় পাঠান বাউজার-চালককে সাথে লইয়া পেট্রল ভর্তি বাউজারে কোহাট অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে একটি সাধারণ পাহাড় ডিঙাইতে হয়—এবং কিছুটা পথ পাঠানদের এলাকাভুক্ত। আমরা কেন—সকলেই বলিত সেই এলাকা "No-man's land" সেই এলাকা কাহারও নয়—অর্থাৎ বেওয়ারিশ মুলুক, পাঠানদেরও নয় আবার ব্রিটিশদেরও ভারতীয় এলাকা ভুক্তও নয়। বাউজারে রওনা হওয়ার পর তিনদিন পর্যন্ত না-বাউজার, না-ফ্লাইট সার্জেন্ট র. আলি বা পাঠান বাউজার-চালক কাহারও খোঁজ পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে আমাদের বিমান কোহাট হইতে পেশাবরে ফিরিয়া আসিয়াছে। কোহাট বিমান-বন্দরে ভারতীয় বিমান-বহরের অন্য আর একটি স্কোয়াড্রন ছিল এবং তাহাদের নিকটে যথেষ্ট পেট্রলও ছিল। তাহারাই আমাদের বিমানে পেট্রল ভর্তি করিয়া বিমান ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছে। কোহাটে পেশাবর হইতে পেট্রল-বাউজার পাঠাইবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। তিনদিন পরে ফ্লাইট সার্জেন্ট র. আলি পাঠান বাউজার-চালকসহ ফিরিয়া আসিলেন—তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন বিনা বাউজারে। ব্যাপার কি প্রশ্ন করায় জানা গেল যে পথে অর্থাৎ "কাহারও-নয়-এলাকায়" (No-man's land) পাঠানরা পেট্রল সুদ্ধ ফ্লাইট সার্জেন্ট র. আলি এবং পাঠান বাউজার-চালকের পথ অবরোধের পর তাহাদের নিকট হইতে পেট্রল-বাউজার কাড়িয়া লইয়া এবং তাহাদের তিনদিন পর্যন্ত আটক রাখিয়া শেষে ছাড়িয়া দিয়াছে। এর পর একটা অনুসন্ধান-কমিটি বসিয়া শীঘ্রই তাঁহারা ফ্লাইট সার্জেন্ট র. আলিকে সামান্য দোষারোপ করিয়া নিষ্কৃতি দিলেন। কিন্তু দিন কয়েক যাইতে না যাইতেই ফ্লাইট সার্জেন্ট র. আলিকে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ সহ ক্যান্টিনে গিয়া খুব আনন্দ করিতে দেখা যাইত। দুই লোকেরা তাঁহার এবং পাঠান বাউজার-চালকের নামে নানা গুজব রটাইতে সুরু করিল। বিমানবহরে এবং অসামরিক বিমান-চালকদের মধ্যে পেট্রলের আর একটা নাম আছে—সে নাম হইল "গলিত স্বর্ণ" liquid gold। এর কয়দিন পরে, অর্থাৎ আমাদের শিক্ষার সমাপ্তির দিন কয়েক পূর্বে এক মহা মজার কাণ্ড ঘটিল। এইবার সেই ঘটনার বর্ণনা।

হকার হারিকেন বিমান উড়াইবার কৌশল শিক্ষার একটা দিক ছিল মাটির খুব নিকট উপর দিয়া উড়িয়া যাওয়া। ইংরাজিতে উড়িবার এই কায়দাকে বিমান বাহিনী হইতে আখ্যা দিয়াছিল Hedge Hopping অর্থাৎ বেড়া-টপকান। মাটির দুই তিন ফুট উপর দিয়া বেশ বেগে উড়িয়া যাওয়া—যেখানে গাছ বা উঁচু ঢিবি দেখা গেল—সেখানে সেই গাছ বা উঁচু ঢিবি পার হওয়ার জন্য বিমানকে সামান্য উর্দ্ধে তুলিয়া বেড়া-টপকান হইল, এবং বেড়া পার হইলেই আবার একেবারে মাটির উপর নামিয়া পড়া। এবং মাইলের পর মাইল এই কায়দায় উড়িয়া যাওয়ার অভ্যাস করা। প্রথম প্রথম অনেকেই ঠিক মাটির

উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে সমর্থ হইত না—কিছুটা মাটির সাথে টক্কর খাওয়ার ভয়ে আর কিছুটা বিমানের উড়নভঙ্গী তখনও বৈমানিকের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে নাই বলিয়া। কিছুদিন অভ্যাসের পরই আমাদের মধ্যে অনেকেরই এই বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া গেল। তখন যাঁহাদের এই বিদ্যা আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া গেল তাঁহারা মাটির উপর কয়েক ইঞ্চি ব্যবধান রাখিয়া বিমান উড়াইতেন। দেখিলে মনে হইত যেন মাটি ছুঁইয়া বিমান উড়িয়া চলিয়াছে। অনেক সময় ছোট ছোট গাছ বা ঝোপঝাড় বিমানের ঘূর্ণায়মান প্রপেলারে লাগিয়া কাটিয়া যাইত—আবার অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের টুকরা বা কুচি প্রপেলারের টানে উঠিয়া আসিয়া প্রপেলারের ডগায় আঘাত-চিহ্ন রাখিয়া দিত। পাথরের আঘাত-চিহ্ন পাইলেই আমরা বুঝিতাম বিমান চালক মাটির খুব নিকট দিয়া উড়িয়াছেন। এই প্রকার উড়ন কায়দাকে আমরা "grass-cutting" অর্থাৎ ঘাস কাটা বলিতাম। ঘাসকাটা বারণ ছিল। কেননা সামান্য ত্রুটি বা ভুলেই বিমানের প্রপেলার দ্বারা ঘাস না কাটিয়া কবর কাটার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া। আর মাটির সাথে সামান্য ছোঁয়া লাগিলেই বিমানের প্রপেলার ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে এবং তখন মাটির সাথে টক্কর খাইয়া বিমান ডিগবাজি খাইতে থাকিবে। বিমানের মধ্যে চালকের আসনে বসা অবস্থায় বিমানের ডিগবাজি খাওয়া বিমান চালকের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়, বরঞ্চ ভীষণ মারাত্মক। এইরূপ ঘটনার পর বিমানচালক এবং বিমান দুইয়ের হিসাব প্রায়ই মিটাইয়া ফেলা প্রয়োজন হয়।

আমাদের সাথে বম্বাই হইতে আগত একজন আইনজীবী ছিলেন। লম্বা পাতলা ছিপছিপে গড়ন। খুব ফর্সা নয়—তবে শ্যামবর্ণও বলা চলে না। নাকটা কিন্তু খুব সুন্দর আর খড়্গের মত। তাঁহার সামনে কোন বিষয়ের প্রস্তাবনা হইলেই, সেই বিষয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি না-জানা পর্য্যন্ত তিনি শান্ত হইতে পারিতেন না। কিন্তু গল্প বলিতে বা মোটা মোটা পুস্তক পড়িতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

একদিন ফ্লাইং অফিসার গোকোর "বেড়া-টপকানর" পালা পড়িল। সাথীকে লইয়া কিছুক্ষণ উড়িবার পর তিনি সাথীকে পেশাবরে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। আর বলিলেন যে তিনিও অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিতেছেন। ঘটনার সূচনা সকাল নয়টা নাগাদ। দশটা বাজিয়া গেল কিন্তু তাঁহার কোন পাত্তাই নাই এবং কিছু সময় হইল বেতার-বার্ত্তাতেও তাহার কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। বেলা এগারটার মধ্যেই আমাদের কয়েকটি বিমান তাঁহার খোঁজে বাহির হওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হইল। এবার স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের হুকুমের জন্য শুধু সকলে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

বিমান-বাহিনীর কর্ত্তারা পাঠানদের এলাকায় একটা নির্জন অঞ্চল বৈমানিকদের নিশানা অভ্যাস করার জন্য সাব্যস্ত করিত। ঐ অঞ্চলের পাঠানদেরকে কিছু অর্থ আগাম দিয়া তাহাদেরকে সেখান হইতে দূরে সরিয়া যাইতে অনুরোধ করা হইত। তখন বৈমানিকরা তাহাদের বিমানের বন্দুক হইতে গুলি নিক্ষেপ হইতে সুরু করিয়া ছোট ছোট বোমা পর্য্যন্ত

নিক্ষেপের অভ্যাস বিধিমত করিত। প্রত্যেক বৈমানিককেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার নিশানা তাক করা নির্ভুল না হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে এই অভ্যাস করিয়া যাইতে হইত। ঐ অঞ্চলের পাঠানরা কিন্তু তাহাদের স্থান হইতে অন্য অঞ্চলে প্রায়ই যাইত না। বোমা বর্ষণ বা গুলি নিক্ষেপের সময় তাহারা পাহাড়ের আসে পাশে বা গুহায় লুকাইয়া থাকিত এবং বিমানগুলি ফিরিয়া যাওয়া মাত্র বাহির হইয়া পড়িত এবং নিজেদের কাজ লইয়া ব্যস্ত হইত। বৈমানিকেরা তাহাদের অভ্যাস স্বভাবে পরিণত করার জন্য যেমন চেষ্টা করিত অনুরূপ ভাবেই নিশানা অঞ্চলের পাঠানরাও বিমান বাহিনীর বিমানগুলির উপর নিশানা তাক করার সুবিধা খুঁজিয়া বেড়াইত। বিমান অল্প উচ্চ দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিলেই সেই উড়ন্ত বিমানের উপর তাক করিয়া তাহাদের রাইফেল চালাইত। পাঠানদের ইংরেজ-অধিকৃত এলাকার বাহিরে অসতর্কভাবে উড়িতে দেখিলেই তাহারা নিশানা তাক করিত এবং প্রায়ই দুই একটা রাইফেলের গুলির আঘাত-চিহ্ন লইয়া বিমান ফিরিয়া আসিত। নজীর অনেক আছে যখন ভারতীয় বিমান-বহরের এবং বিলাতি রাজকীয় বিমান-বহরের বিমান পাঠানদের রাইফেলের গুলিতে ভূপাতিত হইয়াছে। ভূপাতিত হওয়ার পর বৈমানিকরা যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে পাঠানরা তাহাদেকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া খুব আদর যত্নে তাহাদের অতিথি হিসাবে রাখিত। পলায়নের কোন উপায় থাকিত না। কেননা পাঠান যখন জবরদস্তি কাহাকেও তাহার অতিথি করিল, তখন অন্য পাঠানদের একমাত্র কার্য্য সেই অতিথি যাহাতে তাহার বন্ধুর আওতা হইতে পলাইতে না পারে। তারপর বৈমানিকের কদর অনুযায়ী অর্থের বিনিময়ে অতিথিদের মুক্তি মিলিত।

বেশ দ্রুতবেগে বেড়া টপকাইয়া উড়িয়া গেলে খুব ওস্তাদ গুলি-নিক্ষেপকারী পাঠানের পক্ষেও নিশানা তাক করিয়া রাইফেলের গুলি বিদ্ধ করা খুব কঠিন। কেননা বেড়া-টপকানর সময় বিমানের উচ্চতা এবং সেই সঙ্গে বিমান উড়িয়া যাইবার দিক, বিমান চালককে সব সময় বদল করিতে হয়। সেইজন্য পাঠানের নিশানা তাক করার পূর্বেই বিমান হয়ত অন্য দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে অথবা বেড়া অর্থাৎ গাছ-পালা বা বালীর পাহাড়ের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেলে পাঠানের আর উড়ন্ত নিশানা তাক করার অবকাশ রহিলনা। আবার এমনও হয়, নিশানা তাক করার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে আর সেই মুহূর্ত্তেই ক্ষুদ্র বালীয়াড়ীর উপর দিয়া অপর পার হইতে বিমান তাহার দিকেই উড়িয়া অগ্রসর হইতেছে। এমন সুযোগ কোন পাঠানই হাতছাড়া করে না। অন্ততঃ তাহার হাতের নিশানা নির্ভুল আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য সে নিশ্চয়ই উড়ন্ত বিমানের দিকে তাহার রাইফেল হইতে একটি গুলি নিক্ষেপ করিবে। এগুলি সে নিক্ষেপ করিল—শুধু তাহার হাতের নিশানা ঠিক আছে কিনা তাহা দেখার জন্য—বিমান ভূপাতিত করার জন্য নয়। এমত অবস্থায় পাঠানের কোন দোষ ধরা চলে না—কেননা এই ক্ষেত্রে বলিতে গেলে পাঠান-নিক্ষিপ্ত গুলির দিকেই বিমান আগাইয়া আসিয়া বিদ্ধ হইল। বিমান যদি মোড় ফিরিয়া অন্যদিকে উড়িয়া যাইত, তাহা হইলে পাঠানের গুলিতে বিদ্ধ হওয়ার কোন কারণই হইত না।

আমাদের পেশাবর বিমান-বন্দরে পৌঁছানর কিছুদিন পূর্বে সার্জেন্ট গোলাম আলির বিমান হকার অডাক্স্ এই ভাবেই ভূপাতিত হইয়াছিল। সে অন্য গল্প।

শীঘ্রই স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার হুকুম দিলেন তিনখানা বিমান অবিলম্বে উড়িয়া ঐ এলাকা তল্লাসী করিবে। আর প্রায় একই সময় স্থলসৈন্যদের কর্ত্তাদের বড় দপ্তর হইতে সংবাদ আসিল যে আমাদের একটি বিমান খুব নীচু দিয়া উড়িয়া যাওয়ার সময় বালি-পাহাড়ে হোঁচট খাইয়া ভূমে পতিত হইয়াছে। বিমান চালক খুব সম্ভব অক্ষত দেহ, কিন্তু পাঠানরা তাঁহাকে জবরদস্ত অতিথি করার জন্য চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিবার ব্যবস্থা করিতেছে। পরে তাঁহার ন্যায্য মূল্যের বিনিময়ে মুক্তি মিলিবে।

ততক্ষণে আমাদের তিনখানা হকার হারিকেন বিমান উড়িয়া গিয়াছে এবং ফ্লাইং অফিসার গোকোর বিমান খুঁজিয়া পাইয়াছে। সামান্য উঁচু বালিরাড়ির উপর বিমান পড়িয়া রহিয়াছে। যেন এইমাত্র বিমান সেইখানে অবতরণ করান হইয়াছে। আকাশ হইতে দেখিয়া বিমানের কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া বুঝা গেল না। আর দেখা গেল ফ্লাইং অফিসার গোকো ধরাশায়ী বিমানের বাম ডানার উপর বীরদর্পে পায়চারী করিতেছেন। আমাদের বিমান তিনখানা কিছু নিকটে আসিতেই হাতছানি দিয়া আমাদেকে অভিবাদন করিলেন এবং আমাদেকে বুঝাইলেন যে তিনি এখন অক্ষত রহিয়াছেন কিন্তু পাঠানদের এলাকায় অসম্ভব কিছু ঘটিতে খুব অল্প সময় প্রয়োজন হয় বলিয়া তাঁহাকে যত শীঘ্র সম্ভব ঐ এলাকা হইতে যেন উদ্ধার করা। একটি বিমান ফ্লাইং অফিসার গোকোর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া অন্য দুইটি বিমান ফিরিয়া আসিল। সেই বালির পাহাড়ের উপর কোন হকার হারিকেন বিমান অবতরণ করা অসম্ভব ছিল। অবতরণ করার অর্থাৎ নির্বিঘ্নে অবতরণ করার জন্য হকার হারিকেন বিমানের শক্ত কংক্রীটের বিমান অবতরণ পথ প্রয়োজন হইত। যদি বালিয়াড়ির উপর হারিকেন বিমান অবতরণ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে সেই বালি-রাড়ির উপর অবতরণ করিয়া ফ্লাইং অফিসার গোকোকে উদ্ধার করিয়া আনা হইত।

বিমান দুইটি ফিরিয়া আসার পথে স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারকে বেতার বার্ত্তায়, ফ্লাইং অফিসার গোকো কোথায় পতিত হইয়াছেন জানাইল এবং কোন প্রকার দেরী না করিয়া তাঁহার অক্ষত দেহ স্থানীয় পাঠানদের এলাকা হইতে উদ্ধার করার জন্য বলিল এবং বিমান যেখানে পতিত হইয়াছে সেই স্থানের একটা বিবরণ বলিয়া দিল।

স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিনিধি (পলিটিক্যাল এজেন্ট) ও টোচি স্কাউটদের মারফৎ, সেই এলাকার পাঠান কর্ত্তাদের নিকট হইতে ফ্লাইং অফিসার গোকোর মুক্তির ব্যবস্থা শীঘ্র হওয়ার জন্য আবেদন করিলেন এবং মুক্তি যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র হয় তাহার জন্য চেষ্টা এবং ব্যবস্থা করায় অগ্রসর হইলেন।

শীঘ্রই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজনৈতিক প্রতিনিধির একজন পাঠান কর্ম্মচারী আমাদের দপ্তরে আসিয়া হাজির হইলেন। রাজনৈতিক প্রতিনিধির নির্দ্দেশ মত আমরা চারজন—স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার, রাজনৈতিক প্রতিনিধির কর্ম্মচারী, টোচি স্কাউটদের

একজন অফিসার এবং আমাকে লইয়া চারজন একটি ওয়েপন ক্যারীয়ার গাড়ীতে ক্র্যাইং অফিসার গোকোর উদ্ধারের জন্য রওনা হইলাম।

পেশাবর-কোহাট পথে কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর আমাদের যান রাজপথ ছাড়িয়া প্রান্তর-পথ ধরিল। যান যেখান দিয়া চলিল তাহাকে পথ কিছুতেই বলা চলে না। ওয়েপন ক্যারীয়ার বলিয়াই মাঠ-প্রান্তর ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল। এবার "নেয়ারের," অর্থাৎ মাঠে জল দেওয়ার জন্য খালের, পাশে উঁচু পাড়ের উপর দিয়া কিছুদূর পর্যন্ত চলা গেল। তারপর সোজা দুই পাহাড়ের মাঝের প্রান্তরের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিল। পথ বলা সঙ্গত হইবে না। ইতস্ততঃ ছড়ান বড় বড় পাথরের চাঁইগুলি কখনও দক্ষিণে কখনও বামে রাখিয়া দূর পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। পাহাড়ের নিম্নদেশে একটা জায়গায় পাহাড়ের ধূসর রংয়ের সহিত মিল নাই দেখিলে পাহাড়ের ঠিক নিজস্ব অঙ্গ নয় বলিয়া মনে হয়—তাহা কোন বস্তু অনুসন্ধান করায় জানা গেল—পাহাড়ী শক্ত এঁটেল মাটি-নির্ম্মিত পাঠানদের দুর্গ। মাঝে মাঝে পাহাড়ের নিকটে কোথাও কোথাও দুই একজন পাঠান দৃষ্টিপথে আসিয়াই আবার পাহাড়ের ধূসর রংয়ের সাথে মিলাইয়া যাইতেছিল। দূর হইতেও তাহাদের স্কন্ধে বা হাতে ঝুলান হর বিলাতে প্রস্তুত বা তাহাদের নিজস্ব কারিগরের নির্ম্মিত রাইফেল দেখা যাইতেছিল। দূর হইতেও পাঠান-ভদ্রলোকের পরিধানের পোশাক দেখিয়া মনে হইতেছিল যে এ-পোশাক তাঁহার অনুপ্রাসনের সময় মিলিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পোশাক যতই অনাড়ম্বর হউক না কেন—হাতের রাইফেল ঐতিহাসিক। কতজন ব্রিটিশ সৈন্য যে সেই রাইফেলের গোলা আঘাতে (sniping) ধরাশায়ী হইয়াছে বলা কঠিন। হয়ত বা কয়েক বৎসর পূর্বে ঐ রাইফেলই পেশাবর ব্রিটিশ সৈন্যের অস্ত্রাগারে সযত্নে রক্ষিত ছিল। শুধু ব্রিটিশ সৈন্য কেন—পাঠানদের দুশমন অনেক—এবং বেশীর ভাগ সময়, বিশেষতঃ যখন বাহির দুনিয়ার সাথে শান্তিপূর্ণ অবস্থা, তখন অন্য পাঠানের সাথে যে বন্ধুত্বের একান্ত অভাব—তাহারাও যে দুশমন। হয়ত চৌডিখেলের পাঠানরা কয়েকজন মিলিয়া মোরিখেলের পাঠানদের দুহিতা অপহরণ করিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মোরিখেলের পাঠানরা এই অপমানের "বদলা" না লইল, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা পাঠানদের দরবারে অপদস্থ। বদলা যখন লওয়া হইল, তখন হয়ত চৌডিখেলের পাঠানদের কাহারও জান গেল। এখন চৌডিখেলের পাঠানদের ভীষণ অপমানকর অবস্থা। পাঠান দরবারের বিচারে তাহারা অস্পৃশ্য গণ্য হইবে। এইবার তাহাদের পালা আসিল মোরিখেলের কোন পাঠানের "জান-বদলা" লওয়ার জন্য। এই চলিয়াছে চিরন্তন কাল হইতে। কাজেই জন্ম হইতেই পাঠান বালককে রাইফেল চালাইতে অভ্যস্ত হইতে হয়, কেননা "জানের-বদলা" কখনও ফেলিয়া রাখিতে নাই—যত শীঘ্র সম্ভব বদলা লইতেই হইবে, না হইলে অন্য পাঠানকে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া। এইভাবে অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের কাহারও কিছুক্ষণের জন্য ওয়েপন ক্যারীয়ার হইতে অবতরণ করার প্রয়োজন হইল। বিমান-বাহিনীর প্রথানত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাজ সারিবার জন্য প্রস্তুত হইতেই নৌচি-স্কাউটদের অফিসার

গাড়ী হইতে লাফ দিয়া নামিয়া ভদ্রলোককে জবরদস্তি বসাইয়া দিলেন। কর্মকর্তাকে তিনি জবরদস্তি কেন বসাইয়া দিলেন সে কথা কার্য্য সমাধা করিয়া গাড়ীতে আরোহণের পর বুঝাইয়া বলিলেন। তিনি বলিলেন মাঠে-প্রান্তরে যদি কেহ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঐ কর্ম্ম করে, তবে পাঠানদের বিশ্বাস কর্ম্মকর্তার কৃত বস্তু কর্ম্মকর্তার পিতার মুখগহ্বরে গিয়া পড়ে। কোন পাঠান ভদ্রলোক এমন ইতরকার্য্য কখনও বরদাস্ত করিবে না, দুষ্কৃতকারী যেই হউক না কেন। পাঠান দুষ্কৃতকারীকে অবিচলিত চিত্তে তখনই উচিত শিক্ষা দিবে আর উচিত শিক্ষা দেওয়ার একটাই পন্থা আছে, রাইফেলের গুলির আঘাতে তখনই দুষ্কৃতকারীকে ধরাশায়ী করা। বিমান-বাহিনীর একজন এ যাত্রায় দেহ-প্রাণ লইয়া চৌচি স্কাউটদের অফিসারের দয়ায় বাঁচিয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে অনেক প্রান্তর মাঠ অতিক্রম করা হইল। পাহাড়ও কয়েকটা পশ্চাতে রহিল। এবার শুধু বালুকণা ও পাথরের নুড়ির প্রান্তর। মাঝে মাঝে ঢেউ-খেলান সামান্য উঁচু বালিয়াড়ি। ততক্ষণ দিন প্রায় পার হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা হয় হয়। আবার দুই একটি মাটি-নির্ম্মিত পাঠানদের দুর্গ। এইরূপ একটা দুর্গের সম্মুখে কয়েকজন বয়স্ক পাঠান আমাদেরকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা প্রথমে পুস্তভাষায় রাজনৈতিক প্রতিনিধির কর্ম্মচারী এবং চৌচি স্কাউটদের অফিসারের সহিত বাক্যালাপ সুরু করিলেন। তাঁহাদের আপ্যায়ন হইতে আমরাও বাদ পড়িলাম না। প্রথমে হাতে হাত মিলান এবং পরে দুজনের দুই আলিঙ্গন। যতজন পাঠান ততবার হাত মিলান এবং ততবার দুই-আলিঙ্গন। যেন কতদিন বিচ্ছেদের পর দুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইল। একবার আলিঙ্গন করিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া নয়। কয়েকবার দুইজনে দুইজনের বাহুবন্ধনে জড়াইয়া ধরিয়া তবে ক্ষান্ত হওয়া। একটা কথা এখানে স্বীকার করিতেই হইবে। প্রত্যেক আলিঙ্গনেই আন্তরিকতা পুরা মাত্রায় ছিল। কখনও পাঠানদের এই আলিঙ্গনে কপটতার আভাষ দেখি নাই বা পাই নাই। যাঁহাদের সাথে আমরা মিলিত হইলাম তাঁহাদের পোশাক কিন্তু খুব সুশ্রী ছিল—জাঁকজমক নয়—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আড়ম্বরহীন এবং প্রত্যেকের দেহ হইতে সুগন্ধ নির্গত হইতেছিল। কিন্তু চেহারা দেখিয়া তাঁহারা কখনও কোনদিন স্নান করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। সুগন্ধ বাহির হইতেছিল কানের নথে তুলায় রাখা আতর হইতে।

এইবার কাজের কথা। আমাদের সাথী দুইজনের কথায় বোঝা গেল যে ফ্লাইং অফিসার গোকো নিকটেই এই পাঠান সর্দারের হেফাজতে নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করিতেছেন। আমাদের সাথে একটা রফা হইয়া গেলেই—আমরা আমাদের ফ্লাইং অফিসার গোকোকে লইয়া পেশাবরে ফিরিয়া যাইতে পারিব। রফাটা প্রথমে হওয়া প্রয়োজন। যাঁহারা রফা করিবার জন্য উপস্থিত তাঁহারা সকলেই এক কথার ভদ্রলোক। তাঁহাদের কথার কখনও নড়চড় হয় না। তবে তাঁহারা বলিলেন যে তাঁহাদের এলাকায় অনেক পাঠান আছেন যাঁহারা ব্রিটিশ বা ব্রিটিশদের তাঁবেদারদেরকে বিশ্বাস করেন না। আর আমরা দুইজন ভারতীয় বিমান-বাহিনীর বা আমাদের বন্ধুটি কখনও ব্রিটিশদের তাঁবেদার নয়। কাজেই রফা প্রথম এবং সাক্ষাৎ পরে।

———

জম্বুকেশ্বর

সমীরকান্ত গুপ্ত

সারা সকালটা ঘোরা হয়েছে শ্রীরঙ্গমে। মধ্যাহ্নভোজের জন্য একটু নিরিবিলি গাছের ছায়া খুঁজতে খুঁজতে ছ'সাত মাইল ফালতু উজিয়ে এসে পড়লাম ত্রিচি-ষ্টেশনের বহিঃ-প্রাঙ্গণে ঝাঁকড়া গাছগুলির নিচে। সেখানে আমাদের গাড়ীর দরজা খুলে বসে পাত পাড়-লাম। হাতে আধঘন্টার মতো সময়। সুতরাং চালক থেকে বাবুরা সবাই তৈরী রসদে তাড়াতাড়ি হাত চালাল।

জম্বুকেশ্বর ত্রিচি শহরের প্রান্তে—শ্রীরঙ্গমের মাত্র মাইল খানেক পূর্বে। শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথ মন্দিরের তুলনায় দক্ষিণের এই শৈব মন্দিরটিকে বেশ ছোটখাটই বলতে হয়, এর ভক্তসমাবেশও আদৌ উল্লেখ-যোগ্য নয়। অথচ পরিপাটি এর নক্সা, সুসম্পূর্ণ এর গঠন, নিখুঁত এর প্রত্যঙ্গ বা অংশ-সন্নিবেশ—শিল্প রসিকদের কাছে নয়নমনোলোভা।

জম্বুকেশ্বরের আর এক প্রাচীন নাম তিরুবানক্কাভল্ (= গজপীঠ)। কথিত আছে জম্বুবৃক্ষের তলায় শিবলিঙ্গের উপরে এক ভক্ত মাকড়শা এসে পরমনৈপুণ্যে রোজ জাল রচনা করত। কিন্তু তেমনই আর এক ভক্ত হাতি এসে লিঙ্গস্নানের নিমিত্ত শুঁড়ভরতি জল ছিটিয়ে সেই জাল তছনছ করে দিত। ফলত মাকড়শা এবং হাতির দ্বন্দ্ব শুরু হল। দারুণ রাগে একদিন মাকড়শা হাতির শুঁড় বেয়ে উঠে নরম নাকে নোক্‌ন কামড় লাগিয়ে দিল। ব্যাপারটা ক্রমে বাড়া-বাড়ি হতে ত্রিচিনোপলির শিলাপাহাড়ের সাধু সারন মুনি এসে উপস্থিত—তিনি দুই ভক্তের বিবাদ মিটিয়ে দিলেন। স্থানের নামকরণে মাকড়শা বেচারীর দাবি কেন কম জোরদার হল

বলা যায় না। হাতির শুণ্ডনিঃসৃত জলকণায় হয়তো দেবতার মাথায় স্নানধন্য নেমে আসত কিন্তু উপাদানের সূক্ষ্ম তন্ত্রকারুকার্যে সৌন্দর্য ধরা পড়ত না সে কথা বলা চলে না।

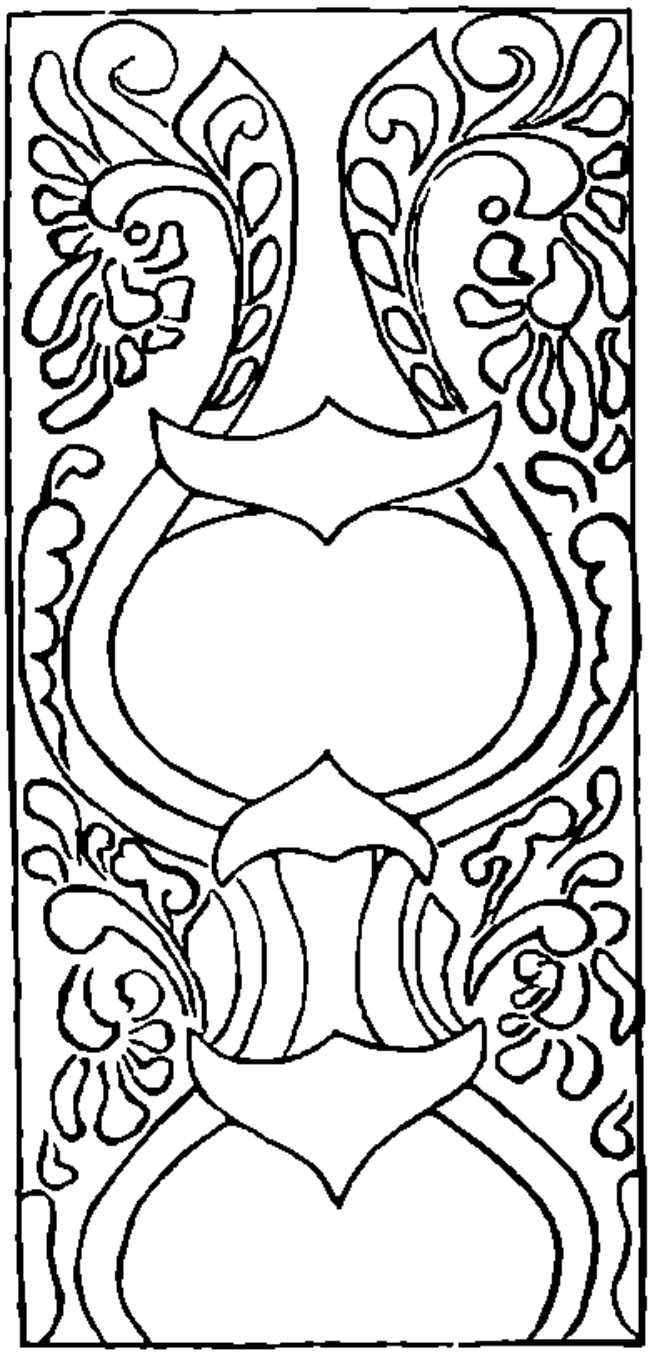

চারটি প্রাকার ঘেরা ভূবনেশ্বরের এই মন্দির। বাহিরের দুটি উন্মুক্ত, ভিতরের দুটি ছাদযুক্ত। মন্দিরের কাছের গোপুরম ছোট, ক্রমে বাহিরের গুলি বড়। আলোচ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ **Jouveau Dubreuil** ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্য-গতির সঙ্গে গাছের জৈবিক বৃদ্ধির তুলনা করেছেন—তার কেন্দ্রসন্নিহিত বৃত্তগুলি ঘননিবদ্ধ, ক্রমেই তারা বড় হতে থাকে এবং পরস্পরকে ছাড়িয়ে যেতে থাকে। তা থেকে তাদের আনুপাত এবং সমৃদ্ধি-চরিত্র জানা যায়। পক্ষিণী মন্দিরের এই ভিতরের প্রাকার থেকেও তার জন্মঠিকানার একটা নির্দেশ মেলে।

প্রথম বা বাহিরের দুটি প্রাকার নিতান্তই পাঁচিল-টানা চত্বর। দ্বিতীয় চত্বরের শেষে গোপুরমটি পেরুতেই যাদের পেয়ে গেলাম একটা গলি—দু পাশে উঁচু ভিত—তা প্রায় পঞ্চাশ ফুট পরে সমকোণে এর একটি গলিকে কেটেছে একটা ক্রুশ-চিহ্নের মতো। মাঝখানটা চৌকো খোলা হলের মত—চারকোণে চারটি স্তম্ভ, সেগুলির অষ্টমুখী মাথায় ঝুলছে নক্সার প্রস্তরফুল, অধোমুখী পিরামিডের ঝালরমালা। এই চৌকো হলে স্থাপিত শৈবধর্মের প্রতীক চারটি —লিঙ্গ, ধ্বজস্তম্ভ, নন্দী এবং বলিপীঠ। আর এই যে বলদান গলি তা দশ ফুট চওড়া—মধ্য থেকে চারদিকে চলে গিয়েছে। তার দুপাশে ছাদস্পর্শী স্তম্ভের বিস্তার হাজার খানেক। সেখানে কেটে তোলা ফুল-লতা-পাতা, সাধুসন্ত রূপসী-উর্বশী, পশুপাখি—যেন পক্ষপাত-নির্বিশেষে। ছোটখাট নক্সা নোটবুকে এঁকে নিলাম, কিন্তু

ছবি তুলেও নেওয়া হল। বিগ্রহ লিঙ্গমূর্তি—তার উপরে অনবরত পড়ছে পাতাল-নিঃসৃত ফোয়ার জল, সে-জলধারায় দক্ষিণ সীমান্তে একটি পুষ্করিণীর উদ্ভব। পুষ্করিণীর চারদিকে ত্রিতল বা দুই সারি খিলান। মন্দিরের পবিত্র নিভৃত অংশে বিধর্মীর প্রবেশাধিকার নেই।

মন্দিরটির গঠন ও অঙ্গ-বিন্যাসের সারল্য থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে এটি নায়ক বংশের (Nayak Dynasty) আগেই নির্মিত। বস্তুত দ্বিতীয় প্রাকারে দক্ষিণগাত্রে খোদাই অক্ষরে উল্লেখ আছে ভটাবর্মন সুন্দর পাণ্ডের দশম বছরে। সুন্দর পাণ্ডা রাজত্ব করেন ১২৫০ থেকে। তাহলে আমাদের সময় হল ১২৬১ সাল। অনেক গবেষকদের বিশ্বাস মূল দেবালয়টি তৈরি দ্বাদশ শতাব্দিতে, কি তারও দু'শ বছর আগে। বাহিরের প্রাকার হয়ত যুক্ত হয়েছে ষোড়শ শতাব্দির কাছাকাছি। জম্বুকেশ্বর মন্দির অন্য আর একটি কারণেও স্মরণীয়, এখানে দেয়াল-উদ্গত ভারবাহক শীলাখণ্ড (pilaster) নজর করলে দেখা যাবে তার মুণ্ড চোলরীতিসম্মত নিখাঁজ নিরলঙ্কৃত, অথচ তার ব্র্যাকেটের দুলটি পাণ্ড্য-রীতির নক্সায় সজ্জায় জোরদার। তাহলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়, বলছেন পার্সি ব্রাউন প্রমুখ পণ্ডিতরা, এ-সময়টা শিল্পে চলছিল একটা ট্রানজিশান—রীতান্তর, পল্লব-চোল সারল্য থেকে বিজয়নগর-মাদুরার জাঁকজমকের পথে মধ্যবর্তীস্থানে।

সুন্দর-পাণ্ডা গোপুরমের উল্লেখ করেছি। পাণ্ডারা বিশাল মন্দির রচনার কীর্তি রেখে যায়নি।

তারা মূলত স্তম্ভকক্ষের (Pillared hall) প্রবর্তক

ও প্রচারক, গোপুরমও তাদেরই হাতে মোটামুটি একটি পরিণত রূপ নিতে পেরেছে। সেক্ষেত্রে জম্বুকেশ্বরের সঙ্গে চিদম্বরনের একটি পূর্ব গোপুরম, তিরুভন্নামালাইয়ের একটি আভ্যন্তরপ্রাকারে পূর্বদিকের গোপুরম এবং কুম্ভকোনমের গোপুরমের উল্লেখ করতে হয়। প্রথমোক্ত দুটি সমসাময়িক—ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি; শেষোক্ত দুটি চতুর্দশ শতকের মধ্যকালে। উচ্চতার, বিপুল বিশালতার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বিচিত্র রূপ স্পৃহাই এদের গায়ে প্রস্ফুট।

পাণ্ড্যদের অপেক্ষাকৃত শিল্পবিরলতার কথা বলছিলাম। তবে এ অঞ্চলে কুম্ভকোনম থেকে তিন-চার মাইলের মধ্যে দারাসুরমের উল্লেখ না করলে এই রাজবংশের প্রতি অবিচার করা হবে। গবেষকদের ধারণা যদি সত্য হয় তবে দারাসুরমই পাণ্ড্যদের হাতে একমাত্র সুসম্পূর্ণ মন্দির—সম্ভবত তাদের রাজত্বের শেষ যানে, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে। একই সীমানার মধ্যে চাকাযুক্ত রথসদৃশ কেন্দ্রস্থ 'ঐরাবত মন্দির'কে ঘিরে আরো কয়েকটি প্রস্তরসৌধ—নক্সার দিক থেকে নূতন, আগামী বিজয়নগরশিল্পের প্রাক-ভাষ বা আভাস। তার স্তম্ভে স্তম্ভে উৎকীর্ণ রূপকৃতি নবজীবনের কল্লোল শুনতে পেয়ে যেন উৎফুল্ল। সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হল এখানে ৮০০ বছরের দুস্তর ব্যবধান পেরিয়ে পাণ্ড্যমন্দিরের গাত্রে পল্লবী গ্রিফন gryphon ও লিওগ্রিফের (Leogryff) পুনরাবির্ভাব। তবে দ্রাবিড় স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে এই অতীতের পুনরাবির্ভাব (atavism) আশ্চর্য লাগলেও বিসদৃশ বা অযৌক্তিক নয়। পরবর্তীকালের শিল্পেও দেখব তারা নূতন স্থান-কালের সঙ্গে সুন্দর মিশে গিয়েছে।